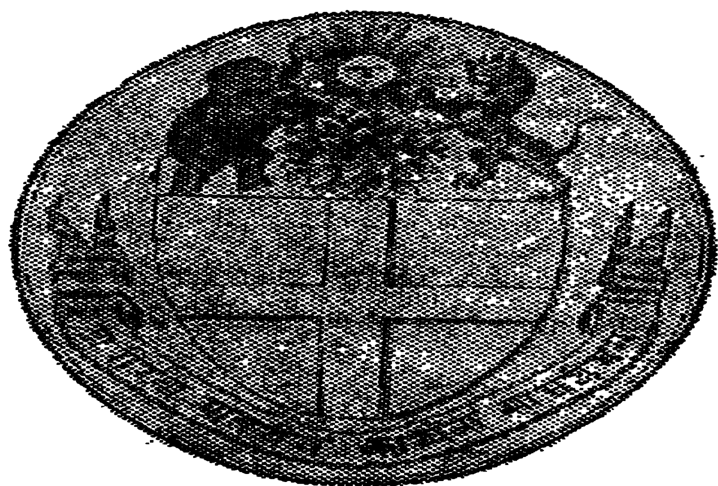


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা

মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
সম্পাদিত



সোনার তরী
৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৭

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০০০

প্রকাশক
কেশব আড়ু
সোনার তরী
৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৭

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্ট লাইন
৭৪, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০২৮

মুদ্রক
দেজ অফ্‌সেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

কৃতজ্ঞতা
গ্রন্থের প্রবন্ধাদির জন্য লেখক,
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট
ঋণ স্বীকার করছি

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

প্রাগ্‌-ভাষ

উনিশ শতকের বাঙালির মানস-আকাশ অসংখ্য তারকাখচিত ঐশ্বর্যের আলোকে দীপ্তিমান। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র—এক-একজন যেন বিধাতার চকিত চমক। এক শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি প্রতিভার আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর।

পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালির সুড়ঙ্গপথে অভিসার চলল। মধ্যযুগের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা, শিল্প-সাহিত্য—সবই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হল, নেমে এল যুগবিনাশের যবনিকা। আরো পরে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত হল। সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বণিকসভ্যতা, সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বণিকের দল এই বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পসরা সাজিয়ে বসল। কিন্তু এখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হলেও সরস্বতী রইলেন অবজ্ঞার আঁধারে প্রায় অবলুপ্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাইটারেরা ডেসপ্যাচ লেখে, রেশম-পাটের গাঁট ওজন করে, টাকা-আনা-পাই আর পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের হিসাব কষে; বাঙালি রায়ত, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সপরিবারে অনশনে দিন কাটায়। নবাবি আমলে দেশের ভূস্বামীরা টোল-চতুষ্পাঠীতে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাও বিনষ্ট হয়ে গেল, যার মূলে আছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী অভিশাপ। এর ফলে সামন্ত জমিদার বংশ ভেঙে পড়ল, তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষাদীক্ষা ঐতিহ্যবর্জিত ইজারাদারেরা। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে দেশীয় শিক্ষার নাভিশ্বাস ঘনিয়ে এল। ১৮১৩ সালে সনদ নবীকরণের সময়ে বার্ষিক লাখটাকা দেশীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে, এমন নির্দেশ থাকলেও বহু দিন এই বাবদ এক কপর্দকও ব্যয় করা হয়নি। ইতিমধ্যে কলকাতায় নবজীবনের বাতাস প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর খ্রীস্টান মিশন থেকে, উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলা গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত হলেও তার সঙ্গে বাঙালি সমাজের যোগ ছিল অল্প। উক্ত কলেজে শুধু সিভিলিয়ান সাহেব কর্মচারীরা অধ্যয়ন করতেন, তার সঙ্গেও বাঙালির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে, বাঙালি পাড়ায় শেঠ-বসাক-দাঁ-দের ব্যবসা একটু একটু করে জমে উঠেছে। কিন্তু তখনও এ শহরে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সাহেব-বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য মুৎসুদ্দি সম্প্রদায় সাহেবদের কাছ থেকে একটু-আধটু ইংরেজি শিখে নিয়েছে। ইতিমধ্যে দিগন্তে একটি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হল—রামমোহন রায়। ১৮১৪-১৫ সালের মধ্যে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে এই শহরে যৌবন তরঙ্গ প্রবেশ করল। রামমোহন কৈশোর-যৌবনে পাটনায় গিয়ে ইসলামি ভাষা (আরবি-ফারসি) শিখেছিলেন। কারণ তখন শাসনকাজে আরবি-ফারসির চল ছিল। ইসলামি ভাষা শিখতে গিয়ে তিনি মুসলমান 'মোতাজেলা' (যুক্তিবাদী) ও 'মুওয়াহিদ্দিন' (একেশ্বরবাদী) সম্প্রদায়ের দার্শনিক ও নৈয়ায়িক মতের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কাশীধামে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা, স্মৃতি-সংহিতা, বেদ-উপনিষদ-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। মুর্শিদাবাদে অবস্থানের সময় তাঁর প্রথম পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহিদ্দিন' (একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার) ফারসি ভাষায় মুদ্রিত হল, এর ভূমিকা লিখলেন আরবি ভাষায়। এতে যুক্তিমার্গের সাহায্যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি বেদ-বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দেখলেন, তাতেও মূলকথা একেশ্বরবাদ, মূর্তি-উপাসনা নয়। বেদ-উপনিষদ-বেদান্তের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শুরু করলেন। ফলে প্রথমে কলকাতায় ও পরে কলকাতার বাইরে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল যখন তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি-বুদ্ধির

শাণিত অস্ত্র ধারণ করে পুস্তক-পুস্তিকা লিখতে আরম্ভ করলেন। ১৮১৭ সালে হিন্দুদের অর্থসাহায্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সদর দরজা খুলে গেল। অবশ্য সরকারি দানে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনচর্চা ছিল যার মূল উদ্দেশ্য। রামমোহন এর বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন। এযুগে সংস্কৃতশাস্ত্র সংহিতা শেখাবার জন্য অর্থব্যয় নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম নতুনভাবে নির্ধারিত করতে গিয়ে সেই মনোভাবই ব্যক্ত করেছিলেন।

তখন নতুন কলকাতাকে ঘিরে চলেছে ভাবের সমুদ্র মন্থন। একদিকে রামমোহন ও রামমোহন-বিরোধীদের মতের সংঘর্ষ, অন্যদিকে ডিরোজিও-শিষ্য হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হিন্দুবিরোধী আচার-আচরণ, বিদ্যাসাগরের নব্য মানবতাবাদ, দেবেন্দ্রনাথের স্থিতধী ব্রহ্মোপলব্ধি, রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মসভার হাঁক-ডাক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের প্রতি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আকর্ষণ, সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের নবযুগের অগ্রদূত হয়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। এই সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহেরা বাংলার আকাশে অগ্নি-আখরে নবযুগের বার্তা লিখেছিলেন, যার সঙ্গে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যিনি ধূমকেতুর মতো বিরাট পুচ্ছতাড়নায় বাংলার আকাশ ও মৃত্তিকাকে ভীত-সংকুচিত করে তুলেছিলেন, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগ করেননি।

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭, ২৩ জুন) তিন বছর পরে (১৭৬০) কৃষ্ণনগর রাজসভার বিদগ্ধ কবি-রসিক ভারতচন্দ্রের অবসান হলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যবনিকা পড়ল। তারপর শুরু হল কবিওয়ালা, পাঁচালিকার, দাঁড়াকবি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই গানের নৈশাকাশবিদারী কলরব। হরুঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির উচ্চকণ্ঠ, চার জোড়া ঢোল ও চারজোড়া কাঁসির সঙ্গত-কোলাহল কলকাতার আকাশ চমকিত করে তুলল। ভারতচন্দ্র বিদায় নিলেও তাঁর প্রভাব রয়ে গেল। ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালংকার সেই ভগ্ন-বিধ্বস্ত ধ্বজপতাকা বহন করে চললেন। রঙ্গকৌতুক ও আদিরসের হুল্লোড় কলকাতার পথঘাট, নাটমন্দির, অলস-বিলাসী জমিদারদের মাতিয়ে তুলল, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ যার চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। এরই মধ্যে একজন আধুনিক-শিক্ষিত কবি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতচন্দ্রের যুগের অবসান হয়েছে, কাব্যে নবজীবনের কল্লোল ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে সুশিক্ষিত রঙ্গলাল আদিরস, কৌতুকরস ও ভাঁড়ামিকে পাশ কাটিয়ে ইতিহাস ও বীররসকে প্রাধান্য দিলেন, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নতুন যুগের বার্তা বহন করে আনল। কিন্তু তখনও নবযুগের বাণী প্রস্তুত হয়নি, ভাষাভঙ্গিমায় রঙ্গলাল কোনো নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেননি, বিষয়-পরিবর্তনকে তিনি আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ মনে করেছিলেন। তাই পয়ার-ত্রিপদী-একাবলী প্রভৃতি পুরাতন ছন্দেই নবযুগের বাণী অবধারণ করতে চাইলেন, ভারতচন্দ্রের মেজাজ পুরোপুরি ছাড়তে পারলেন না। তিনি মনে মনে নবযুগচেতনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রাণের গভীরে তা প্রবেশ করেনি। তখন নবজাগ্রত গরুড় শাখা সন্ধান করছিল, মহাক্ষুধার খাদ্য অন্বেষণ করছিল। নব্য প্রমেথ্যুস জ্বলন্ত মশাল নিয়ে দিগ্‌দাহ সৃষ্টি করছিল। সেই প্রমেথ্যুস হলেন 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'। তাঁর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সংস্করণ ১৮৬০ সালের মে মাসে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অর্থাৎ ইংরেজি ব্লাংক ভার্সের আদর্শে মধুসূদন পরিকল্পনা করেন। পয়ার পংক্তির শেষে মিত্রাক্ষর তুলে দেওয়াটাই এর প্রধান লক্ষণ নয়, অর্থানুসারে যতিপাত এর মূল চরিত্র। অনেকে মনে করেছিলেন, মিত্রাক্ষর বাদ দিয়ে বাংলা কবিতা রচনা সম্ভব

হবে না। রঙ্গের কবি ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, "কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।" তখন অনেক কৃতবিদ্য লোকেরই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। মধুসূদন এই ছন্দের পরিকল্পনা করে বাংলা কবিতার পংক্তিবিন্যাসের বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করলেন। বস্তুত মিলযুক্ত পয়ারছত্র যেন লৌহফাঁসের মধ্যে বন্দী হয়েছিল, মধুসূদন সে বন্ধন ঘোচালেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে' তার প্রথম সূচনা। অবশ্য প্রথম রচনায় কিছু ত্রুটি থাকে, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ নিখুঁত হতে পারে না, 'তিলোত্তমা'-তেও কিছু কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে—মধুসূদনের ছন্দের কান ছিল অতি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ। তাই তিনি চৌদ্দমাত্রার পয়ার-পংক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন, তারপর তার বন্ধন মোচন করেছিলেন। তারপর অমিত্রাক্ষর ছন্দে চৌদ্দমাত্রাই রক্ষিত হয়েছে, শুধু তার ছেদ ও যতির কৃত্রিম বন্ধন ঘুচে গেছে। বাংলা ছন্দের এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এই ছন্দই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র ছন্দে পরিণত হয়েছে, এমন কি তাঁর গদ্য-কবিতার পংক্তিবিন্যাসের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে এই সুর শোনা যাবে। এবার মধুসূদন নিশ্চিন্ত হলেন, এতদিন পরে তিনি বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বরূপ ধরতে পেরেছেন। কিন্তু বিষয়-নির্বাচনে 'তিলোত্তমার' বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই, পুরাণের আদিরসাশ্রিত কাহিনী হয়েছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন।

১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) প্রকাশিত হলে বাংলা কাব্যের যথার্থ নবযুগ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি। এই সম্পর্কে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন, "Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B.A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language." এ *real* B.A. হচ্ছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। একদা কিশোর রবীন্দ্রনাথ বি.এ. পাস সমালোচকের ভয়ে কতটা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, তা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' থেকেই বোঝা যাবে। মেঘনাদবধ কাব্যের উপাদান মূল বাল্মীকি থেকে গৃহীত হলেও এর ভাব-ভাষা ও আদর্শের মধ্যে ভারতীয় সনাতন আদর্শ উপেক্ষিত হয়েছে বলে সেকালে অনেক পাঠক ও সমালোচক মধুসূদনকে আক্রমণ করেছিলেন। মধুসূদন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের গৌরব বর্ধনের জন্য কলম ধরেননি, কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম নিবেদন করে কাব্য রচনায় অগ্রসর হলেও তিনি সে আদর্শ উপেক্ষা করে রাক্ষসবংশ, রাবণ-মেঘনাদকে বিরাট সৃষ্টির আলোকে ভাস্বর করে তুলেছেন। যা প্রচণ্ড, তীব্র, পৌরুষাত্মক, ন্যায়-অন্যায়ে যা উদাসীন তাকেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য যাঁরা বলেন, মধুসূদন একাব্যে ভারতীয় আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বিজাতীয় আদর্শকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন, তাঁরা বোধ হয় ঠিক কথা বলেন না। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা থাকলে তিনি সীতার চরিত্র অঙ্কন করতে পারতেন না। আসল কথা, উনিশ শতকের বাঙালি-চেতনা বন্ধন-অসহিষ্ণু আবেগের দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়েছিল। তারই প্রতীক মধুসূদন। রামচন্দ্র-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। নয়টি সর্গে সমাপ্ত এই আখ্যানকাব্য যথার্থ মহাকাব্য হয়েছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু এ-কাব্য সেকালে (এবং একালেও) যে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করেছিল, যার আলো ও দাহিকাশক্তিতে উনিশ শতকের বাঙালি ভীত হয়ে আকাশে ধূমকেতুর পুচ্ছতাড়না লক্ষ্য করছিল, সেই মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কাব্য।

এ কাব্যের প্রথম সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আশ্বিন ১২৭৪, ১৮৬৭ সাল)। মধুসূদনের কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট

সফল হলেও, কোনো কোনো স্থানে তাঁর অভিমত পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। সে যাই হোক, আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত ও ইংরেজি কাব্যের সুরসিক পাঠক হেমচন্দ্র যদিও তাঁর 'বৃত্রসংহারে' অমিত্রাক্ষর ছন্দে ততটা পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি, কিন্তু এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য ঠিক অবধারণ করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'ত্রয়ী কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলেও আবেগ বাহুল্যের জন্য তার প্রাণরস পাঠকচিত্তে সঞ্চার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করেও বলা যায়, এখনও পর্যন্ত মেঘনাদবধ কাব্য একক মহিমায় আসীন। সেজন্য এ কাব্যের একাধিক সংস্করণ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯১০ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সম্পাদিত সংস্করণ। এত পাণ্ডিত্য, এত গভীর রসবিশ্লেষণ, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এত মণিরত্ন আহরণ একালে কোনো গ্রন্থ-সম্পাদনে লক্ষ্য করা যায় না। দীর্ঘকাল পরে, প্রায় নব্বই বছর পরে সেই সংস্করণটির পুনঃপ্রকাশ করা হল। বহুদিন ধরে অনেকে এর নাম শুনে আসছিলেন, কিন্তু চাক্ষুষ করেননি। এবার তাঁরা এটি হাতে পেয়ে খুশি হবেন। দীননাথ সান্যাল আর এক রসিক সম্পাদক। ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৩৫) মেঘনাদবধ কাব্যের 'সীতা ও সরমা' নামে একটি চমৎকার রসভাষ্য প্রকাশ করেন। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৪১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় মেঘনাদবধের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এখনও সেটি এই কাব্যের প্রচলিত শ্রেষ্ঠ সংস্করণ রূপে পাঠক-সমাজে প্রচলিত আছে। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালিপদ সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত মেঘনাদবধের (১২ আষাঢ়, ১৩৫৬) সংস্করণটি ছাত্রমহলে সুপরিচিত।

বেশ কিছুদিন ধরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সংস্করণটি পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে এই কাব্য ও মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধাদি (তার মধ্যে বিদেশীর রচনাও আছে) এই সংস্করণে সংগ্রথিত হল। পাঠক-পাঠিকারা এই সমস্ত রচনা থেকে মেঘনাদবধ কাব্য ও তার কবির রচনা আস্বাদন করতে পারবেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পরিশ্রমসাধ্য এই সংস্করণটি বিচার করতে গেলেই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (দুখণ্ডে সমাপ্ত) এবং 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থ দুটির কথা মনে পড়বে। সারাজীবন সরকারি কাজের জোয়াল কাঁধে থাকলেও তিনি তারই অবকাশক্রমে এতগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করেছিলেন—বাঙালি প্রতিভার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। বাঙালি দলবেঁধে কোনো কাজ করতে গেলে দলাদলি করে কাজটি পণ্ড করে। কিন্তু এককভাবে যে-কোনো পরিশ্রমসাধ্য কাজে সাফল্য লাভ করে—যেমন 'বিশ্বকোষের' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বঙ্গীয় শব্দকোষের সম্পাদক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেঘনাদবধ কাব্য ও বাঙ্গালা অভিধানের সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। তার পর কাল যত অগ্রসর হয়েছে, বাঙালির কাজকর্ম ততই শিথিল হয়ে গেছে, পরিশ্রমসাধ্য কাজে প্রবল অনীহা দেখা যাচ্ছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় একার চেষ্টায় বিশাল মাপের 'বাঙালির ইতিহাসে'র আদিপর্ব রচনা করে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু মধ্যযুগ সম্বন্ধে সে ধরনের গ্রন্থ কে লিখবেন তার জন্য বাংলাদেশ অপেক্ষা করে আছে। আমাদের সৌভাগ্য, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণ তাঁদের আয়ুষ্কালের মধ্যেই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে গেছেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কথামুখ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশ (১৮৬১)। উনিশ শতকীয় নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় আমাদের রামায়ণ-কাহিনীকে নতুন করে তিনি রূপ দিয়েছিলেন। প্রাচীন কাহিনীর অন্তর্নিহিত কিছু মূল্যবোধ যুগের প্রয়োজনে মাইকেল রক্ষা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল মানবিকতার একটা অনমনীয় দুঃসাহসিক রূপকেও ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক যুগের মহাকাব্য রচনার যাবতীয় আয়োজনও তিনি করেছিলেন। তাতে যে মেধা ও পরিশ্রমের প্রমাণ ছিল তা বিস্ময়কর। ভাষা ও ছন্দ থেকে শুরু করে কাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার কৌশল পর্যন্ত সমস্তই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি।

সমসাময়িককালের অনেক কবি, সমালোচক ও সাহিত্যিক মাইকেলের এই কাব্যসৃষ্টি নিয়ে স্বভাবতই আলোচনা করেছেন। তাঁদের অনেকে যেমন মহাকাব্যের মূল রসটিকে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, তেমনি কেউ কেউ আবার মহাকাব্য রচনার কৃত্রিমতা ও ব্যর্থতাকেই বড় করে দেখেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ মর্ম গ্রহণও কেউ কেউ করতে পারেন নি, ব্যঙ্গ করে কাব্যও লিখেছিলেন।

কিন্তু ক্রমশ মাইকেলের এই অসাধারণ সৃষ্টি পাঠকের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে। টীকা-ব্যাখায় অনেকেই প্রচুর পরিশ্রম করে এই আশ্চর্য সৃষ্টির তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতটিকে স্পষ্ট করতে থাকেন। পরবর্তীকালে বহু গবেষক ও লেখক নানাভাবে মাইকেলের এই মহাকাব্যের নানা দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেছেন।

সামগ্রিকভাবে মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা কত বিচিত্র দিক স্পর্শ করে গেছে প্রায় দেড়শো বছরে (সঠিক বললে, একশো বিয়াল্লিশ বছর) তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে কাব্যের মূল পাঠের সঙ্গে প্রাচীন ও নবীন সমালোচকদের আলোচনা যুক্ত করে। সমস্ত আলোচনাই যে সংগৃহীত হয়েছে তা নয়। সম্ভবও নয়। কোথাও উত্তরাধিকারীর পারিবারিক মতানৈক্য, কোথাওবা প্রকাশকের আপত্তি। তবে উল্লেখযোগ্য আলোচনা তথা দুষ্প্রাপ্য আলোচনার এই সংকলন মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির একটা মোটামুটি পরিচয় দেবে, এটুকু আশা করা যায়।

আলোচনা সংকলনে অনেকের কাছেই আমরা সাহায্য পেয়েছি। বিশেষভাবে অধ্যাপক অলোক রায়, অধ্যাপিকা শ্রাবণী পাল, চিররঞ্জন সেন, সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত এবং ক্লিন্টন সিলি আমাদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটির প্রাগ্‌ভাষ লিখে দিয়েছিলেন। বইটির ছাপা হবার সময় তাঁর প্রয়াণ ঘটল। বইটি প্রকাশিত হচ্ছে ভেবে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হাতে বইটি তুলে দিতে না পারায় আমাদের দুঃখ রয়ে গেল।

গবেষণা পরিষদের শ্রীকেশব আড়ুর উদ্যোগেই বইটি প্রকাশিত হল। ছাপার ব্যাপারে শ্রীবাসুদেব মোশেল আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের শুভাশিস্ জানাই। এবার কাব্য প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি।

রামায়ণের রূপান্তর : মাইকেলের বিবরণে ও বিন্যাসে

মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ শতকের প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকেই মূলত প্রমাণ করে তা স্পষ্ট করে বুঝবার চেষ্টা অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে করেছেন। সে-সব চেষ্টার মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে বিশেষ করে রাবণ-ইন্দ্রজিতের চরিত্রগত দৃঢ়তা ও মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার ঝোঁকটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়াও মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে, ভাষার আভিজাত্য-নির্মাণে, উপমা-রূপক-উৎপেক্ষার প্রয়োগে, কাহিনি বিস্তারে কোথায় কোথায় প্রাচীন ও পরবর্তীকালের বিদেশি মহাকাব্যের অনুসরণ করেছেন, কিংবা কোন্ কোন্ দেব-দেবী বা কোন্ সংস্কৃতির স্বর্গ-মর্ত-পাতাল-কল্পনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন তারও খুঁটিনাটি আলোচনা অনেকেই করেছেন।

তাই এখানে জীবনদৃষ্টির কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য, যা বিশেষভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-দশকের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এসেছে, তারই প্রতিফলন মেঘনাদবধকাব্যে কতটা ঘটেছে তা-ই সূত্রাকারে বলবার চেষ্টা করব।

সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের প্রথাগত আদর্শের মধ্যে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রচলিত বন্ধনের মধ্যে মাইকেল থাকতে চাইছিলেন না। ইয়োরোপীয় সমাজজীবন ও দৃষ্টিভঙ্গির যতটুকু তিনি এদেশে থেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পেয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিশেষ করে ইংরিজি-সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যের জীবনদৃষ্টিকে মিলিয়ে নিয়ে স্রষ্টা হিসেবে তাঁর মনে হয়েছিল, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাপদ্ধতিকে সরিয়ে বাইরের হাওয়া নিয়ে আসতে হবে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার কিংবা বিদ্যাসাগর তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে তাঁদের চিন্তা, সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যে দেশি-বিদেশি ভাবনা-চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদেই। সেই তাগিদ মাইকেলেরও ছিল।

মাইকেলের বন্ধু রঙ্গলালও তাঁর সৃষ্টিকর্মে অনেকটাই দেশি-বিদেশি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের তুলনায় মাইকেলের পড়াশোনা ছিল অনেক ব্যাপক। ভাষাজ্ঞান ছিল অনেক তীক্ষ্ণ। সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই ব্যাপক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার মতো মুক্ত মানসিকতার মাত্রা ছিল অনেক বেশি, আর সৃষ্টি-ক্ষমতাও ছিল দুঃসাহসিক। কতোখানি দুঃসাহসিক, তা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে কাব্যে প্রয়োগ করার ক্ষমতা থেকেই বোঝা যায়। নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থেকেও কথাভঙ্গিকে কতো সহজেইতো একাধিক লাইনে প্রবাহিত করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। নাট্যসংলাপের নানা মেজাজি ভঙ্গি তিনি কাব্যের মধ্যেও কতো অনায়াসে এনে দিয়েছিলেন! ইয়োরোপীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় হাওয়া মাইকেলের জাদুতে বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমি হাওয়া হয়েই আমাদের প্রাণ জুড়িয়েছিল। কিন্তু যাকে 'জাদু' বলছি তা কিন্তু প্রেরণা ও পরিশ্রমেরই যৌথ ফল। অমিত্রাক্ষরে ভাবের প্রবাহ পঙ্ক্তি ডিঙিয়ে যাওয়াতে বিচিত্র রকমের স্বাধীনতা এসেছে। এসেছে নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্নের প্রবাহ এবং তার উত্তরের প্রবাহ। মাঝে মাঝে প্রকরণ ও সম্বোধনে কাব্যের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি যেন অনুভব করা যায় একেবারেই নাটকীয় সংলাপের মতো। অনেক সময় স্বগত সংলাপও আছে। তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য থেকেই এই চেষ্টা তিনি করছিলেন। নিজেই তো তিনি কুপার-এর ইলিয়াডের অনুবাদ এবং মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এর পঙ্ক্তি তুলে দেখিয়েছেন :

কি কারণে ত্যাজি লঙ্কা, কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ?

ইত্যাদি প্রশ্নাত্মক বাচনভঙ্গি Who of the gods impelled them to contend? Latona's son

and Jove's. (Homer's Iliad : Cowper) এবং Who first seduced them to that foul revolt?/The infernal serpent. (Milton's Paradise Lost, Book-I)-র অনুসরণ। এই রকম প্রশ্নের নাটকীয় ভঙ্গিতে বাচন শুরু করলে পরবর্তী ঘটনার জন্যে পাঠকের কৌতূহল তৈরি হয়ে যায়; এবং কাহিনীকাব্যের পক্ষে তা বিশেষ প্রয়োজনও। মধুসূদন নিজেও এব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই ওপরের ওই উদাহরণ তুলে রাজনারায়ণকে বলেছিলেন : 'These lines ought to give you some idea of the episode that follow.' কাজেই শুধু ছন্দমুক্তি নয়, বাক্যকে প্রসারিত করার সুযোগ তৈরি করে দিয়ে নাটকীয় কৌতূহল নিরন্তরই সৃষ্টি করে চলেছেন মাইকেল। এবং খুবই সচেতন ছিলেন যাতে বড় কাহিনিকাব্যে বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তা থাকে। নইলে কাহিনীর আকর্ষণই হারিয়ে যাবে।

আর শুধুই কি কৌতূহল বাড়াবার কৌশল? আত্মবিচার আছে, আক্ষেপও আছে। এমন এক-একটি অংশ আছে যেখানে তুলনা-উপমা ছাড়া সব রকম দুঃখ-কষ্ট বেদনাকে প্রকাশ করা হয়েছে ওই প্রশ্নাত্মক বাক্যেই। নিজের দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে রাবণ একটি তুলনা দিয়েছেন প্রথম সর্গে। শাখা কেটে কেটে অবশেষে যেমন কাঠুরিয়া বৃক্ষটিকেই কেটে ফেলে, তেমনি একে একে তাঁর পক্ষের বীরদের পতন তাঁর নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে! এই তুলনার পরেই দেখছি :

তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে?

সম্পূর্ণ ন'টি সর্গের মেঘনাদবধ-কাব্য এই রকম নাটকীয় পরিবেশে, নাটকীয় সংলাপে, প্রশ্নে ও সংকল্পে, বীরত্বে ও সম্মুখ সমরের উত্তেজনায়, এবং গভীর অথচ সংযত বিলাপে অসম্ভব রকমের নাটকীয় চারিত্র পেয়েছে। শেক্সপিরীয় নাটকে নায়কের পতনে যে দেহে-মনে সংগ্রামের শক্তির মহত্ত্ব দেখি, সেইরকম একটি শক্তিমান মানুষের মৃত্যুবরণে আর এক শক্তিমান মানুষের অভ্রভেদী সংযত সংহত বিলাপ শোনা গেছে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিন্যাসে মাইকেল কতোখানি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা দেখা যাক। ঘটনাটি ঘটেছে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যখন মেঘনাদের মুখোমুখি বিভীষণ ও লক্ষ্মণ।

২

প্রথমে দেখা যাক, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণকে দেখে যা বলেছিলেন তা বাল্মীকিকে কতোটা অনুসরণ করেছে। বিভীষণকে দেখে কঠোর বাক্যে তিনি বলেছিলেন, পিতৃব্য হয়ে কী করে আমার শত্রুতা করছ? দুর্বুদ্ধি, তুমি স্বজন ত্যাগ করে পরের দাস হয়ে সাধুজনের নিন্দাভাজন হয়েছ। যে স্বপক্ষ ত্যাগ করে পরপক্ষে যায়, স্বপক্ষ ক্ষীণ হলে পরপক্ষই তাকে বিনষ্ট করে। উত্তরে বিভীষণ বলেন, তুমি কি আমার স্বভাব জানো না? যদিও আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের কুলে জন্মেছি তবু মানুষের যা শ্রেষ্ঠ গুণ এবং রাক্ষসে যা দুর্লভ সেই সত্ত্বগুণই আমার স্বভাবগত। যে ব্যক্তি ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট এবং পাপবুদ্ধি তাকে হস্তস্থিত আশীবিষের মতো ত্যাগ করাই শ্রেয়।

পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীধর্ষক ব্যক্তি প্রজ্বলিত গৃহের মতোই ত্যাজ্য। মহর্ষিদের হত্যা, দেবগণের সঙ্গে বিরোধ, গর্ব, রোষ, শত্রুতা এবং হিতৈষীর প্রতিকূলতা এই সব দোষ আমার ভ্রাতার জীবন ও ঐশ্বর্য নষ্ট করছে। এই কারণেই তোমার পিতাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি অতি গর্বিত, অল্পবয়স্ক ও দুর্বিনীত, কালপাশ তোমাকে বদ্ধ করেছে। তুমি যা ইচ্ছে হয় বলো। আজ তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

মোট তিনটি সংক্ষিপ্ত সর্গে এই তর্কবিতর্ক আছে (যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ৮৫-৮৭)। এবার কৃত্তিবাসের রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে 'ইন্দ্রজিৎপর্ব' অংশ অনুসরণ করে দেখা যাক। লক্ষ্মণ যখন বাণ সন্ধান করে ইন্দ্রজিৎকে শমনের কাছে পাঠাবার জন্যে আস্ফালন করলেন তখন লক্ষ্মণকে এড়িয়ে বিভীষণের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রজিৎ বললেন, রাক্ষসের কুলে তোমার জন্ম। তোমাকে ধার্মিক বলেই সকলে জানে। তুমি সহোদর। অতএব পিতার সমান। সমান ভেবেই তোমার সেবা করেছি। কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে তুমি মানুষের আশ্রয় নিয়েছ। রাক্ষসবংশে বাতি দেবার আর কেউ রইল না। এত মৃত্যু ঘটিয়েও তোমার শান্তি নেই। এখন তুমি আমার মৃত্যুর কারণ বলে দিয়েছ। সমস্ত রাক্ষসকুলকে তুমি শেষ করলে। তোমাকে দেখলে পাপ অনেক বেড়ে যায়। জ্ঞাতি নির্গুণ হোক, সগুণ হোক, তবু জ্ঞাতি। জ্ঞাতি বন্ধু মিলে-মিশেই সকলে থাকে। এতো ভ্রাতুষ্পুত্র মেরেও তোমার ক্ষমা নেই! কোন্ লজ্জায় তুমি আমাকে মারতে এসেছ? বানরদের থেকে তুমি দূরে থাকো। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে আমি বর চেয়ে নেবো। আর তোমাকে মেরে আমি শনির প্রভাব ঘোচাব।

উত্তরে বিভীষণ বললেন, তুমি তো বিপরীত কথা বলছ। রাক্ষসকুলে জন্মেও কখনও কদাচার করিনি। পরদ্রব্য-পরদার কখনো নিই নি। তোমার পিতার ঘরে চোদ্দ হাজার নারী। তবু সে পরদার গ্রহণ করে। তপস্যায় তপস্বিনী নারীকেও সে হরণ করে এনেছে। শাপ-শাপান্ত করলেও সে তাকে ছাড়ে নি। কতো মুনি-ঋষি মেরেছে। তার পাপের অন্ত নেই। এতকাল সে-সব পাপের ফল ফলে নি। কিন্তু এইবার সময় হয়েছে।

মেঘনাদবধ-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে দেখি, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণকে দেখে মেঘনাদ অবাক হয়ে তাকে 'তস্কর' বলেন, কে তাকে এনেছে এই প্রশ্ন করেন। তারপর কোষা তুলে তাঁর মাথায় মারলেন এবং দেব-অসি তুলতে গিয়ে তুলতে পারলেন না। তখন অভিমানে দরোজার সামনে হঠাৎ বিভীষণকে দেখে বুঝলেন, কে লক্ষ্মণকে এই গোপন স্থানে নিয়ে এসেছেন। তারপর মাইকেলের মেঘনাদ যা বলেছেন তার সঙ্গে বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের মেঘনাদের উচ্চারণে এমন কোনো মৌলিক পার্থক নেই যাতে বিশেষ করে উনিশ শতকেরই কবির হাতের সৃষ্টি বলে মনে হতে পারে।

৩

কিন্তু পার্থক্য আছে বিন্যাসে—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আসার পূর্ব-প্রস্তুতিতে। বাল্মীকি-রামায়ণে ও কৃত্তিবাসে এই দীর্ঘ প্রস্তুতি নেই। দুটি ক্ষেত্রেই মেঘনাদবধের কৌশল বিভীষণ বলে দিয়েছেন। বাল্মীকিতে আছে, বিভীষণ বলেছেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বলেছিলেন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের আগে যে তাকে আক্রমণ করবে তার হাতেই তার মৃত্যু হবে। সেইজন্যেই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বিভীষণ গেছেন যজ্ঞের আগেই, যাতে মেঘনাদকে বধ করা যায়।

কৃত্তিবাসে দেখি, বিভীষণ বলেছেন, ব্রহ্মা যেদিন ইন্দ্রজিৎকে বর দেন সেদিন উপস্থিত ছিলেন তিনি। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বলেছিলেন, যজ্ঞ করার পর কেউ তাকে মারতে পারবে না। কিন্তু যজ্ঞের সময়ে যে এসে যজ্ঞ পণ্ড করবে তার হাতেই তার মৃত্যু হবে। কাজেই বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে গিয়ে

যজ্ঞ পণ্ড করেই লক্ষ্মণকে দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন।

কিন্তু মাইকেল এত সহজে বিভীষণ-লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে যান নি। কাব্যের প্রায় সূচনা থেকেই তো মাইকেল রাবণের সমস্ত শক্তি সংহরণ করবার পরিকল্পনা করেছেন এবং মেঘনাদবধকেই মূল লক্ষ্যে রেখে লক্ষ্মণের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার আয়োজন করেছেন। দ্বিতীয় সর্গে দেব-ষড়যন্ত্র তো ওই কারণেই। ওই সর্গের নাম 'অস্ত্রলাভ' রাখারও একই উদ্দেশ্য। এবং এই দেবষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি হোমারের ইলিয়াড থেকেই নেওয়া। উপকরণের উৎসগুলো জানানো এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মাইকেল যে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে সরে গিয়ে একটু অন্যভাবে রাম-লক্ষ্মণ এবং রাবণ-মেঘনাদকে দেখতে চাইছিলেন সে কথাটা স্পষ্ট করার জন্যেই এই উৎস-প্রসঙ্গটুকু বলা দরকার। রাম-লক্ষ্মণকে দৈববলে শক্তিমান করে এবং দেবতার আশীর্বাদচ্যুত রাবণকে আত্মনির্ভরশীল ও 'মানবিক' বলে বলীয়ান করতে গিয়েই মাইকেল রামায়ণ কাহিনীর এই বি-নির্মাণ ঘটিয়েছেন। মাইকেলের এই মনোভাবটিকেই স্পষ্ট করতে চাইছি।

ইন্দ্রজিৎ-বধের আগে পঞ্চম সর্গেও ইন্দ্রজিৎ-নিধনের 'উদ্যোগ' চলেছে। একদিকে পরামর্শ অনুযায়ী মায়াদেবী যাচ্ছেন ইন্দ্রজিৎবধে লক্ষ্মণের সাহায্যে, অন্যদিকে, এই মায়াদেবীই লক্ষ্মণকে চণ্ডীপুজো করিয়ে তাঁকে বর পাইয়ে দিলেন অনেক বাধা কাটিয়ে। আবার আর একদিকে, প্রমীলার স্বামীর মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা কৈলাসে পৌঁছোল না দেবচক্রান্তে। আবার রাম-লক্ষ্মণকে দুর্বল করে দেখানোর মধ্যেও খানিকটা ক্ষতিপূরণও করতে চেয়েছেন তিনি এই সর্গে—দেবশক্তির সাহায্য নিয়ে ও লক্ষ্মণের নিজস্ব চারিত্রিক সমুন্নতির পরিচয় দিয়ে। যদিও মহামায়া বলেছেন, 'মোর বলে পশিবি দুজনে অদৃশ্য', তবু মেঘনাদকে আক্রমণের সময় যেন 'শার্দূলবিক্রমে'-ই আক্রমণটি ঘটে। রামকে কিন্তু তেমনভাবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে দেখান নি মাইকেল। ইন্দ্রজিৎ-লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারে একপেশে না হয় এমনই একটা মনোগত বাসনা ছিল মাইকেলের মনে।

অন্যদিকে মেঘনাদ-প্রমীলার সম্পর্কটিকে প্রেম ও বীরত্বের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে মাইকেল এতই আগ্রহী যে, বৈপরীত্যে ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নীর দাম্পত্য-আলাপে দুর্বলতা ও অসহায়তাই দেখিয়েছেন। অর্থাৎ রাবণ-মেঘনাদের ট্র্যাজিক মহত্ত্বের প্রতি পক্ষপাতের জন্যে সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণের চেষ্টা ছাড়া দেবকুল ও রাম-লক্ষ্মণকে রাক্ষসকুলের সমপর্যায়ে আনতেই চান নি তিনি।

ষষ্ঠ সর্গেও তাই ইন্দ্রজিৎ-লক্ষ্মণের সংগ্রামের আগে মাইকেল আরও সময় নিয়েছেন। রামের ভয় ও দ্বিধা, লক্ষ্মণের জন্যে তাঁর আশঙ্কা, বিভীষণের সাহসদান, লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞা, আকাশসম্ভবা সরস্বতীর শিখী-সর্প-যুদ্ধের প্রপঞ্চ সৃষ্টি ইত্যাদি ঘটনার পরেও রামকে অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করতে দেখাগেছে : 'নিস্তার অধীনে'। আর অন্যদিকে, মায়া কমলাকে রামের প্রতি প্রসন্ন হতে বলেছেন এই চরম সংগ্রামের মুহূর্তে। এবং তার পরেই 'সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে/অদৃশ্য!' এই বিস্তৃত ভূমিকা করার উদ্দেশ্যই হল, পরোক্ষে মেঘনাদের শৌর্যবীর্যকে প্রমাণ করা। এরপর লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মেঘনাদের মধ্যে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলেছে তা মূল বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে সরে না গেলেও উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মেঘনাদের উচ্চারণে স্বজন স্বজাতির অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের এই কথাগুলোই মাইকেলের সমকালের জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকগ্রাহ্যতা বা reception theory অনুযায়ী পাঠকের কাছে নতুন করে অর্থবহ হয়ে উঠতেই পারে।

কিন্তু লক্ষ্মণ-বিভীষণ-মেঘনাদের কথোপকথনে মাইকেলের আরও একটা তাৎপর্যময় মনোভঙ্গি কিংবা মূল্যবোধের প্রকাশও ঘটেছে। সেটি হল, সুযোগ বুঝে নিরস্ত্র শত্রুকে সশস্ত্র হয়ে বধ করতে

আসা। একে তো 'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি' জলাঞ্জলি দেওয়ার মধ্যে কোনো ধর্মবোধ বা নৈতিক বোধ নেই একথা মেঘনাদ বলেই দিয়েছে, তারপরে সে লক্ষ্মণকে বলেছে, 'আতিথেয় সেবা,/ তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এধামে:/ রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি, হে, এবে।/ সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,/ নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে:/ এ বিধি, হে বীরবর অবিদিত নহে,/ ক্ষত্র তুমি, তব কাছে:— কি আর কহিব?' হেক্টর-একিলিস-এর লড়াই-এ হোমার বা শেক্সপিয়ার যে যুদ্ধনীতি বজায় রেখেছেন মাইকেলের মেঘনাদও সেই heroic code-কেই মেনে চলেছেন।

৪

মেঘনাদকে বধ করার পর মাইকেল বিভীষণকেও শোকাপ্লুত দেখিয়েছেন। তারপর লক্ষ্মণের সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হয়ে দুজনেই মায়ারই প্রসাদে দ্রুত গিয়ে হাজির হয়েছেন রামচন্দ্রের কাছে এই সংবাদ দিতে। রামচন্দ্র শুনে সীতা-উদ্ধারের সাফল্য যে অনুজেরই প্রাপ্য তা বলে 'ধন্য জন্মভূমি অযোধ্যা'— এই উচ্চারণও করেছেন। একজন জন্মভূমির জন্যে প্রাণ দিলেন, অন্যজন জন্মভূমি রক্ষার জন্যে প্রাণ নিয়ে জন্মভূমি রক্ষা করলেন। এই জন্মভূমি-চেতনার মধ্যে পুরোনো হলেও (জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী)—একটা সমকালীন চেতনা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রামচন্দ্রের উক্তির শেষ অংশটিতে মাইকেলের মানবিক বোধ উনিশ শতকীয় মাত্রায় খুবই স্পষ্টভাবে ছুঁয়ে গেছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে মনে করিয়ে দিয়েছেন :

'পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম; নিজবলে দুর্বল সতত
মানব; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে।'

রামচন্দ্র এখানে নিজেদের 'মানব' জাতির প্রতিনিধি বলেই মনে করেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন মানবিক দুর্বলতার কথা। অন্যদিকে রাক্ষসবংশ দেববল-বিচ্যুত হয়েও আত্মবিশ্বাসে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে, প্রাণ দিয়েছেও। মেঘনাদ মৃত্যুর আগে ভাগ্যকেই ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু পিতার হাতে যে লক্ষ্মণের নিস্তার নেই এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। দেবতাকে তিনি দোষ দেননি, তার প্রসাদও তিনি চান নি। পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে স্মরণ করেই লঙ্কার 'পঙ্কজ রবি' অস্তাচলে গেছে।

৫

কিন্তু এই মহান্ আত্মত্যাগের একটা বড় প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া তো দরকার। সেই প্রতিক্রিয়ায় রাবণের অসীম আত্মবিশ্বাসী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে সপ্তম সর্গে! আরাধ্য দেবতাকে এবং অন্যান্য দেবতাদেরও তিনি বিচলিত করেছেন তাঁর প্রতিহিংসা নেবার সংকল্পে। আবার মেঘনাদ যেমন লক্ষ্মণকে অতিথি হিসেবে বরণ করতে চেয়েছিলেন বীরোচিত ন্যায়বোধে, রাবণও তেমনি 'দেবাকৃতি' লক্ষ্মণের শৌর্যে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন অকপটে। একদিকে শক্তিশেল প্রয়োগের অটুট সংকল্প, অন্যদিকে সেই শত্রুরই প্রশংসা রাবণকে আদর্শ বীরত্বে পৌঁছে দিয়েছে। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মধ্যে যেমন নায়কোচিত গুণের প্রকাশ ঘটেছে, সপ্তম সর্গে তেমনি রাবণেরও অকল্পনীয় শক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। শক্তিবাণ দিয়ে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করাতেই তার প্রমাণ।

আপাতত, রাবণ যুদ্ধে জয়ী হলেও কাহিনির প্রয়োজনে লক্ষ্মণকে পুনর্জীবন দিতে হবে। সেই সূত্রেই দেবতারই কৃপায় রামচন্দ্র মায়ার সঙ্গে প্রেতপুরীতে গেলেন। সেইখানেই দশরথের সঙ্গে দেখা করে লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের উপায় জেনে নেবেন। প্রেতপুরীতে দশরথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে

দান্তে ও মিলটনের অনুসরণে রামচন্দ্রের নরক দর্শন হল। পাপীদের যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়ে বিধির বিধানকেই প্রমাণ করা হল। প্রমাণ করা হল, রামচন্দ্রের অসাধারণ সহনশীলতা। অম্লান সুখভোগ হয়তো তাঁর ভাগ্যে নেই। কিন্তু এই দুঃখবরণেই 'ভারতভূমি'-তে তাঁর যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। ভারতভূমির এই যোগ্য রাজাই মাইকেলের চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রশাসকের চরিত্র। পিতার পাপ যে পুত্রকেই বহন ক'রে সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় সেইভাবে—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'পাপের মার্জনা'—সেই পাপের মার্জনার ভার পড়ল রামচন্দ্রের ওপর। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে মাইকেল দেবতার প্রসাদে রামচন্দ্রের নিষ্পাপ সত্তাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু দেবতার প্রসাদ যারা পেল না—সেই মেঘনাদ ও রাবণকে পাপ-পুণ্য ধারণার মধ্যে রেখেও বিধির বিধানের ওপর দোষ দিয়েছেন বেশি। মেঘনাদকেও সেই বিধানের অংশীদার হয়ে প্রাণ দিতে হল। বিধি বিরূপ বলে তাঁর আক্ষেপ হয়েছে। কিন্তু দেবতার প্রসাদ-বঞ্চিত বলে কিছুতেই নয় : 'রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।' আর কিছু নয়। রাবণ কিন্তু শেষপর্যন্ত পাপবোধে বিচলিত হয়েছেন। তবু বলেছেন, প্রতিশোধ নিতেই তিনি বেঁচে থাকবেন। (সপ্তম সর্গ)

তাই এই অনমনীয় শক্তির উপযুক্ত সৎকারই হবে 'সংস্ক্রিয়া'য় বা শোধনে। সুতরাং সারণকে পাঠিয়ে সাতদিনের যুদ্ধবিরতি চাইলেন রাবণ। ইলিয়াডে একিলিসের প্রতি প্রায়ামের উক্তিতে এগারো দিনের যুদ্ধবিরতির কথা আছে। রাবণ হীন-বীর্য হয়েছেন বলে রামচন্দ্রও যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করা নিশ্চয় 'অধর্ম', কিন্তু তাঁর সৎকার করা 'ধর্ম-কর্ম'! কিন্তু যুক্তিটা বোধ হয় এইরকম যে, সে অন্যায় তো পাপ নাশের জন্যেই। কাজেই এখন রামচন্দ্রকে বলতে শুনি : 'ধর্ম-কর্মে রত জনে কভু না প্রহারে/ ধার্মিক!' সুতরাং যুদ্ধবিরতি হল। এবার ইলিয়াডের অনুসরণে (সর্গ ২৪) মেঘনাদের শবদেহ বহন করে যাত্রা। সর্বাগ্রে হস্তী পৃষ্ঠে দুন্দুভি, তারপরে পদাতিক, প্রমীলার দাসী, প্রমীলার অশ্বপৃষ্ঠে প্রমীলার বেশভূষা, মেঘনাদের রথ, মেঘনাদের শবের পাশে সোনার সিংহাসনে প্রমীলা, সধবা রাক্ষস নারীর দল ইত্যাদি, এবং শেষে, পদব্রজে 'রক্ষঃকুল রাজা' রাবণ। পরনে তাঁর বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী। রাবণের এই শুভ্র বেশ বর্ণনা ক'রে মাইকেল তাঁর সঙ্গে তুলনা দিলেন মহাদেবেরই, যে মহাদেবকে তুষ্ট করে মেঘনাদ রাবণকে পরাস্ত করার জন্যে দেবতাদের এতো হুড়োহুড়ি : 'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে!' আর তাঁর পেছনে আবালবৃদ্ধবনিতা লঙ্কাবাসী।

৬

এমন শোকযাত্রায় মাইকেল রামচন্দ্রের 'দশশত' রথীকেও যুক্ত করে দিলেন অঙ্গদের নেতৃত্বে। সিন্ধুতীরে পৌঁছোল শবাধার। দাহস্থল মন্দাকিনীর পবিত্র জলে ধোওয়া হল। রক্ষ-পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। প্রমীলা চিতায় উঠলেন। বোধহয় মেঘনাদ-প্রমীলার শৌর্য ও দাম্পত্য প্রেমকে বিশেষ মূল্য দিতে গিয়ে সহমরণ প্রসঙ্গ বাদ দেন নি মাইকেল। তারপর রাবণের শেষ সংহত বিলাপ। তাঁর মনে হয়েছে, পূর্বজন্মের ফলেই তাঁর এই সর্বনাশ। কৈলাসে ধূর্জটিও বিচলিত হলেন। রাবণকে তিনি ভালোবাসেন।শুধু সতীর অনুরোধেই তিনি যেন রাম-লক্ষ্মণকে ক্ষমা করলেন। অগ্নিদেবকে বললেন, মেঘনাদ প্রমীলাকে শীঘ্র 'পবিত্র' করে নিয়ে এসো। চিতা জ্বলে উঠতেই সোনার আসনে 'অনন্ত যৌবন কান্তি' নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। দাহস্থলের আগুন দুগ্ধধারায় নেভানো হল (ইলিয়াডে সুরা দিয়ে দাহস্থলের আগুন নেবানোর কথা আছে)। তারপর রক্ষ-শিল্পীরা দ্রুত নির্মাণ করে ফেললেন অভ্রভেদী 'স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ।' একেবারেই গ্রিক প্রথায় স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু দাহস্থল ধোওয়া হয়েছে মন্দাকিনী-জাহ্নবীর জলে।

কাহিনির সমস্ত উপকরণ, পরিবেশ, সংলাপ ও নাটকীয়তার আয়োজনের পেছনে কাজ করছে এমন এক বিনির্বাণ-চেতনা যাতে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণ উনিশ শতকের দেবপ্রসাদ-বিচ্ছিন্ন আত্মনির্ভরশীল দুঃসাহসী মানবিক চেতনার নতুন রামায়ণ হয়ে উঠেছে। নিজবলে দুর্বল সতত মানব এখন আর দেববলে সুফলের আশা করে না।

মিল্টনের Satan-চরিত্র সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে মাইকেল বলেছিলেন, 'He is Satan himself'। মাইকেলও এক দেহে রাবণ ও মেঘনাদ। তাই পরাজিত মানুষের আকাশ-ছোঁয়া স্মৃতিস্তম্ভ তুলে ধরলেন স্বর্গ-মর্তের দেব-মানব ও শত্রুমিত্র একাকার-করা জনতারই সামনে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন),
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী।
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।

বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতনা পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে,-
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকাল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,

আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ
মন্দোদরীমনোহর·—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা; "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছটা;
তরুরাজি; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,

জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহী-হর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ-ফণা—
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনূ,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে, কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু— বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ:—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীর-কুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,

উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত: বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
  অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি! হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
  এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র মিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার-রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর।
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র মিত্র সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
  কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
  উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে।
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ

মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহারা চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদল লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়

অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিলা উল্লাসে
গরজিল, গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্‌ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সেদিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে, কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ; "সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।

"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"

এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ-কটিদেশে।
দেউল-দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেবড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা

মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে— রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী:—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদগমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধিকূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী,
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া, ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"

শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে),
কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িল মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিলা লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি!
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বূরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো, শুন প্রতিধ্বনি;
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,

শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি

দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ-মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পুজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"

কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী:—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি: বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত;
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে, ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি-ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া,—কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।

কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বরী; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বর মধুর-সুস্বরে;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙ্গা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা;—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত; তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্বণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী; "হে নগনন্দিনি,

দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গগনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!"
  কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী;—
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকট শিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
  এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজি; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী: ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
  প্রবেশি সুবর্ণ গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণকাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিযাম্পতি-দূতী ঊষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!"
  এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিতা-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে:
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
  কহিলা শৈলেশসুতা; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"

অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে!
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা –
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে।
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।

কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি?
হান তব ফুল-শর"। দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!
শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া!" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা; "এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া;
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে। উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু!

মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"

চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,

(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিবে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি!"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে, কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!" কহিল হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে! প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী ঊষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী

মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ, মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি· গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙ্গিলে শৃঙ্খল লক্ষী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!

ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণপ্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে!
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল-ঝল ঝলে।
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে,
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী

প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে'লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
  কহিলা রঘুনন্দন; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
  হাসিয়া কহিলা দূত: "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা,—দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
  প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
  উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
  কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,— "কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি

ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
  এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
  আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?"
  অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি; চিকনিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
  কহিল বাসন্তী সখী; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
  রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
  এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
  যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্-ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী!
বারী-মাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
  নৃমুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,

দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা-বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ-নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে!
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী-যূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?

জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃমুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তার; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা!—"রঘুবর পতি-বৈরী মম;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।"
নৃমুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃমুণ্ড-মালিনী
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরী,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী!
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।

বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময় নাচে কুতূহলে; .
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগ-মাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী.
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা ঊষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে!
  শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে:
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে?"
  সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিলা হেথা?"
  বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা", কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
  হেন কালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃমুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
  উত্তরিলা ভীমা-রূপী; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ! আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে,
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিবে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে!"
  এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি; "শুন, সুকেশিনি,

বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি!"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে;
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ; "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি?" কহিলা রাঘব;—
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ড মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে;
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র রত্নোত্তম।

না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"
  উত্তরিলা বিভীষণ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
  কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া,
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
  কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
  উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃমুণ্ড-মালিনী, যথা নৃমুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
  কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;

কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা", বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী-শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেবড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃমুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হুড় হুড় হুড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।

খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনল
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্ত্তকী;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,

বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা, অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি;
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিতে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রাজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি,
মনোহর; কৃত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি!
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?"
কহিলা সরমা;—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে;

অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল রতন সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!); "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে?
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে

সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা?
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে! আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা।
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে! বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন,রথি!'
কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী

রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ;—'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই?—কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?

"দূরে গেল জটাজূট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে.
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে,
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেণ প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ। 'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী।
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,

মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে!
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইল রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা; শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা, শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয় রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষ--কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি", উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—

"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন;—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাসন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে!
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায় বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে?
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি।
বিরাট-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)
কাটিলা তাহার শিরঃ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধু, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে!
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!'
"উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে!"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীরসহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ';—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি; কাঁদিলা সরমা।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে

মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"
কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি। ৬৮৬

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত"; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে,
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে

নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত!)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে!
 সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?"
 উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পূরিব;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
 উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দঞ্চিব কর্ব্বুরে।"
 "উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে।" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
 ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!
 স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—

"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী; নীল নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি;
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেণ শম্ভু— ভীম-শূল-পাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস"; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দেবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—

ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!"
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর; "কে তুমি? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী; "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে!
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি!
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্বণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,

কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,.
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা।
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা!
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী! গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
  অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী!
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে!
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী: কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী!—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
  কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ;
পীঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা; ঘটে বারি; ধূপ ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল: দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
  প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা,
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ: বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!

সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে!

রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী,
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে

চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
  মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
  কহিলা বীর-কুঞ্জর; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"
  মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুণ এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে:
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
  বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
  সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে!

উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি,. যাই যজ্ঞাগারে।"
 যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
 কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
 এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য করচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"
 বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদাযি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান. বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা. শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
 কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল.যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে;

ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস; আইল গৰ্জ্জিয়া
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্‌ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধৰ্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধৰ্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধৰ্ম্ম কাৰ্য্য, আৰ্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র;—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে

রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী:—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ!—' উঠিনু জাগিয়া;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি;—মরি!
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
 উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা ঊর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা:—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
 "নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
 সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,

সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ;—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সাবসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে!
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে!
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে, রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে!"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা ঊষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,

রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি। সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে!"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙ্গা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা; হারাইলে, মরি!
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে. লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।

প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিলা আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিলা কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ়; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজ-রাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষার রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদগর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী;—ক্রমশঃ বাড়িছে

কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কেহ,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়!" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ

রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে! বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এতক্ষণে" অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,

ধীমান! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে!
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে ৬
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অাস,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি

খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূল হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে!
  ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!
  অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক তোরে!
রাবণ নন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাত
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
  কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক! উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!

হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে;
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দুলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে।
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেল মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে!

মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ!" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লাভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে!
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে!
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী!" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল! কোমল কণ্ঠে সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁব ধরি পা দুখানি!"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে,

নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি: ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে-
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,-
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।

দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব; "এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্‌গর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে!
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী
অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে!
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে!
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে!
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! রোধিছে কে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে?"
সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।

আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ; জাম্বুবান বলী;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ; রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বরা করি;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে!
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি!"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে!
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে!
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ; গাইছে সুতানে
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে!
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি,

কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
  উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!"
  বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে: শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে!
  সুধিলা মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী:
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে?—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে!"
  আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে!
  রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য: রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
  যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!"
  ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে;—
"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী;
অতল পাতালে নাগ। নর নরলোকে;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি

পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে!
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে;
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!”
নীরবিলা মহেম্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে!
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম; নল, নীল শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;—
“বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে!
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব, নাথ? পদাশ্রিতা দাসী!
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।”
হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
“কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে?’
উত্তরিলা কাঁদি মহী; “কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী!
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে!
দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে?”
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে

দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য; ঊর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে:
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি!" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দগ্ধাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে!"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ: মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে!
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী!"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে!
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে

বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"
  বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে, পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!
  আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
  বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
  সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথ গতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার! রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে: দেহ পথ ছাড়ি!"
  কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
  সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,

হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহের ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
ঊরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি!
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলি নিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম

ভীমপরাক্রম হনূ, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনূ, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেণ কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনূ।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারলোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে!
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ",—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,

উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণ রিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরি সম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহে! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে!
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচল চূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতনা পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্‌-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?

উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক! হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে?"
"কি না তুমি জান, দেব?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে,
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে

হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
 কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায়; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাবে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
 রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
 সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
 চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু, পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
 কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে!

সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!
সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!"
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্ম্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উম্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।

বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি! কভু, ধিক্! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে!
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে!
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি;
উর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্বু, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে!
দক্ষিণ দুয়ার এই, চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে!
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!
কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা

জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী!'' করপুটে কহিলা নৃপতি,
''ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে?'' উত্তরিলা মায়া,—
''নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে!
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!''
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
''কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!''
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, ''রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।''
উত্তরিলা প্রেত এক, ''জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি!'' দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে!
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, ''কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?''
''এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!'' উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
''সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!'' আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরাবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে
মায়া, ''এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে!'' দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে

দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি,
উন্মাদ যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বর। সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী.
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।

যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায় অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কালানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট। আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!

দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ি জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর; জুড়ায় কার শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নব-কুবলয়-ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখ-সংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কতক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলী শম্ভুনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ! করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি

রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পিরীতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে!" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ রতনে
খচিত আসনাসীন! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি।
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে!
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু
রথী; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে!
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী। বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি!
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে!
নিরন্তর পিকস্বর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরণ্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত,
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকত-পত্র-ছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে

অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষবাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম!" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমার দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ-কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষবাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে!
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনী রূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি

পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনু, আশুগতি-গতি;
প্রের তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমাপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে;—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অৰ্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম;—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে!
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে;—

"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজ। যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায়? কি কাজ কিন্তু বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে:
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী!
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;—
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।' "
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে

পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়! যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি. না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!" এতেক কহি নীরবিলা বলী।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি;—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি;
বিদ্যা, বুদ্ধি. বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী;
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?"
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে:
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকট ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে:
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে:
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে

হাহাকার-ধ্বনি, সখি।''—কহিলা সরমা
সুবচনী,—''কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবা নিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হরকোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?''
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
''কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!''—''দোষ তব,''—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—''কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?'' কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক্ ঝক্ ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে!
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা!
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী! চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে!

প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—আসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম!
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী!
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে!—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ। শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল-বনিতা-
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,

সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে!
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"
  দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
  উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
  মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
  চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!
  অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!

সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
লড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে;
নহে দোষী রঘুরথী: তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী;—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে!
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা

কালীপদ সেন

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি ইত্যাদি—কৃত্তিবাস রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত রাবণের অন্যতম পুত্র বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বীরবাহু-নিধনরূপ একটি সুনির্দিষ্ট রামায়ণীয় ঘটনা আশ্রয় করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি অভিনব পদ্ধতি। ইতঃপূর্বে প্রাচীন সকল বাঙ্গালা কাব্যই নায়ক অথবা নায়িকার জন্মবৃত্তান্ত,—কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের বৃত্তান্তও,—আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। অকালে—দৈববিড়ম্বনাহেতু অপরিণত বয়সে।

অমৃতভাষিণি—হে মধুরভাষিণি দেবি সরস্বতি! কবি প্রথমে সরস্বতীদেবীর আবাহনপূর্বক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই 'আবাহন' পাশ্চাত্য কাব্যের 'invocation'-এর অনুকরণ।

রক্ষঃকুলনিধি—রাক্ষসবংশের রত্নস্বরূপ রাবণ।

কি কৌশলে ইত্যাদি—রাজ্যভ্রষ্ট সামান্য মানব লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজয়ী বীর জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেঘনাদকে বধ করা একটি অসাধারণ ঘটনা। সাধারণভাবে ইহা ঘটা অসম্ভব। লক্ষ্মণ কি কৌশলে এই অসম্ভব কার্য সাধন করিয়াছিলেন ইহাই কবির জিজ্ঞাস্য।

রাক্ষসভরসা—অতিকায়, কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু প্রভৃতি রাক্ষসবীরের মৃত্যুর পর রাক্ষসপক্ষের একমাত্র আশ্রয়স্থল মেঘনাদ।

ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি—সর্বপ্রথম কবি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' দেবী সরস্বতীর আবাহন করিয়াছেন। তুলনীয়—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি।"—ইত্যাদি।

মেঘনাদবধ কাব্যে, সুতরাং তিনি 'আবার' তাঁহার আবাহন করিতেছেন।

যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া ইত্যাদি—পুরাকালে যেভাবে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলে। কথিত আছে যে, আদিকবি বাল্মীকি পূর্বজীবনে বর্ণজ্ঞানহীন দস্যু ছিলেন। তখন তিনি রত্নাকর দস্যু নামে পরিচিত ছিলেন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে তিনি অসৎ পথ পরিত্যাগ করেন, এবং দুশ্চর তপস্যাবলে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন। একদা প্রাতঃস্নানের জন্য যখন তিনি শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত তপোবনপার্শ্বস্থ তমসা নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন তখন দেখিলেন যে, বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ক্রৌঞ্চদম্পতীর মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে একটি ব্যাধ নিহত করিল। সঙ্গী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া বাল্মীকির মন করুণায় প্লাবিত হইল এবং ব্যাধের প্রতি তাঁহার অভিশাপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকরূপে বর্ষিত হইল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্ একমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

ইহাই সংস্কৃত ভাষার আদি কবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সরস্বতীর কৃপায় বাল্মীকি যে কবিত্বশক্তি লাভ করেন তাহার মূলে ছিল নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চীর শোকে বাল্মীকির সহানুভূতি। মধুসূদনও

বীরবাহু-নিধনের পরে রাবণের শোকে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া দেবীর কৃপায় কবিত্বশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন।

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে—ব্যাধ কেবল ক্রৌঞ্চকেই নিহত করিয়াছিল। সুতরাং এস্থলে 'ক্রৌঞ্চবধূ সহ' অর্থে ক্রৌঞ্চবধূর সহিত অবস্থিত বুঝিতে হইবে।

নরাধম আছিল যে নর ইত্যাদি—দেবী সরস্বতীর কৃপা থাকিলে রত্নাকরের ন্যায় অতিশয় পাষণ্ড ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়া চিরস্থায়ী কীর্তি অর্জনে সমর্থ হয়।

মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুজয়ী, অমর। যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—উমাপতি শিবের ন্যায়।

হায়, মা, এ হেন পুণ্য ইত্যাদি—বাল্মীকি সরস্বতীর কৃপায় অকস্মাৎ কবিত্বশক্তি লাভ করেন। কিন্তু পূর্বজীবনে কুকর্ম করিলেও পরবর্তী জীবনে তাঁহার সাধনাও কম ছিল না। কবির জীবনে এরূপ কোন সাধনাই নাই, সুতরাং বাল্মীকির ন্যায় দেবীর অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

কিন্তু যে গো গুণহীন ইত্যাদি—দেবীর কৃপালাভে কবির মনে সংশয়ের সহিত আবার এ আশ্বাসটুকুও আছে যে, তিনি মাতার অধমতম সন্তান বলিয়া হয়ত তাঁহার কৃপালাভ করিতেও পারেন; কারণ যে সন্তান নির্গুণ ও অসহায়, তাহার প্রতিই মাতার স্নেহ বেশি হইয়া থাকে।

উর—অবতীর্ণ হও, আবির্ভূত হও। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত এবং এক্ষণে প্রাদেশিক শব্দ। অব + √ তৃ (অনুজ্ঞায়) অবতার > ওতর > উতর, উতর > উর, উর, উল।

তুমিও আইস, দেবি, ইত্যাদি—দেবী সরস্বতীর আবাহনের পর কবি কল্পনাদেবীকে আবাহন করিতেছেন। কবি-কল্পনাকে এখানে একটি স্বতন্ত্র দেবীরূপে ধারণা করা হইয়াছে। কবি-মানস বা কবির কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্যের অভিব্যক্তি সম্ভবপর।

কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু ইত্যাদি—মধুকর যেমন নানা উদ্যানের নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র গঠন করে, কবিও তেমনিই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যরূপ কুসুমসমূহ হইতে মধুর ন্যায় নানারূপ ভাব ও ঘটনা সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, মেঘনাদবধ কাব্যে যে কেবল রামায়ণীয় চরিত্র ও আখ্যানাংশই গৃহীত হইয়াছে তাহা নয়;—সুযোগমত মধুসূদন এই কাব্যে হোমর, দান্তে, ট্যাসো, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যসমূহে বর্ণিত বহু ভাব ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার অব্যবহিত-পূর্ববর্তীকালে তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek Mythology on our own: in the present poem. I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki.......I shall not borrow Greek stories but write. rather try to write. as a Greek would have done."

কনক-আসনে বসে দশানন বলী ইত্যাদি—রাবণের ও তাহার রাজসভার বর্ণনা। এই বর্ণনায় রাক্ষসগণের সমাজ ও সভ্যতাকে একটি সম্পূর্ণ অভিনব রূপ দান করা হইয়াছে। রাবণকে মধুসূদনও 'দশানন' বলিয়াছেন বটে,—কিন্তু ইহা একটি নাম মাত্র। বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের ন্যায় মধুসূদন রাবণকে দশমুণ্ডবিশিষ্ট নৃশংস ভীষণাকৃতি 'রাক্ষস'রূপে কল্পনা না করিয়া তাহাকে সুবেশ ও সুরূপ একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত নৃপতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। রাবণ, মেঘনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করিয়া কবি-কল্পিত অভিনবরূপে তাহাদের গ্রহণ করিতে না পারিলে মেঘনাদবধ কাব্যের রসনিষ্পত্তি বিষয়ে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ফণীন্দ্র যেমতি ইত্যাদি—রাবণের সুবিস্তৃত সভার বিশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করিয়া আছে নানারত্নে গঠিত বিচিত্র স্তম্ভশ্রেণী,—যেন নাগরাজ বাসুকি মণিময় অসংখ্য উদ্যত ফণার উপর বিশাল

পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। ঝুলিছে ঝলি—বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া 'ঝল ঝল করিয়া' দীপ্তি পাইতেছে। মুকুতা < মুক্তা। বিপ্রকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ।

পদ্মরাগ—রত্নবিশেষ; sapphire. মরকত—হরিদ্বর্ণ রত্নবিশেষ; emerald.

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। রতনসম্ভবা বিভা—রত্নসমূহ হইতে উৎপন্ন জ্যোতিঃ।

চারুলোচনা কিঙ্করী—রাবণ নিজেই যে কেবল অসামান্য রূপবান তাহা নহে,—তাঁহার সভাস্থ সাধারণ পরিচারক-পরিচারিকাগণও অতুলনীয় সৌন্দর্যবিশিষ্ট।

হর-কোপানলে কাম ইত্যাদি—উমার সহিত শিবের মিলনের উদ্দেশ্যে কাম শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া তাঁহার নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হন। কবি এখানে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন যে, কাম ভস্মীভূত না হইয়া রাবণের সভাস্থলে ছত্রধররূপেই বুঝি অবস্থান করিতেছেন; অর্থাৎ রাবণের ছত্রধরও কামদেবের ন্যায় রূপবান। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

রুদ্রেশ্বর যথা শূলপাণি—কুরুক্ষেত্র সমরে ত্রিশূলধারী মহাদেব পাণ্ডবগণের শিবির রক্ষার ভার গ্রহণ করেন; রাবণের সভাগৃহের দ্বারে বিশালদেহ দ্বারিগণও মহাদেবের ন্যায় শূলহস্তে বর্তমান।

অনন্ত বসন্ত বায়ু—রাবণের প্রতাপে পবনদেব সর্বঋতুতে কেবল বসন্তকালীন সুরভিত বায়ুপ্রবাহই প্রেরণ করিতেন বলিয়া লঙ্কাপুরীতে চিরবসন্ত বর্তমান।

গোকুল বিপিনে—বৃন্দাবনের কাননে। বৃন্দাবনস্থ কুঞ্জবনসমূহ যেরূপ একদা শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল, সেইরূপ রাবণের সভাগৃহও অদূর হইতে বায়ু দ্বারা আনীত নানাবিধ মধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল।

কি ছার ইহার কাছে ইত্যাদি—অর্জুনকৃত উপকারের প্রতিদানে দানবশিল্পী ময় ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের জন্য কারুকার্যভূষিত অতি মনোহর একটি সভাগৃহ নির্মাণ করেন। এই সভাগৃহের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যদর্শনেই দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাবণের সভাগৃহের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের তুলনায় ময়দানব-গঠিত ইন্দ্রপ্রস্থের সেই সুবিখ্যাত সভাগৃহও তুচ্ছ। উপমান (ময়নির্মিত সভার) হইতে উপমেয়ের (রাবণ-সভার) উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার।

পৌরবে—পুরুবংশীয় যুধিষ্ঠিরাদিকে। সাধারণতঃ কৌরব বলিতে দুর্যোধনাদিকে এবং পাণ্ডব বলিতে পাণ্ডুপুত্রগণকেই বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে পাণ্ডবেরাও "কুরুবংশীয়" এবং "পুরুবংশীয়"। তুলনীয়- -"প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।" (গীতা)

তিতিয়া—সিক্ত করিয়া। ভগ্নদূত—যে দূত যুদ্ধে পরাজয়বার্তা বহন করিয়া আনে।

নৈকষেয়—নিকষা রাক্ষসীর পুত্র রাবণ। ইহার অন্য নাম 'কৈকসী' বলিয়া রাবণাদিকে 'কৈকসেয়'ও বলা হয়। বিশ্রবা ঋষির ঔরসে নিকষা বা কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এবং শূর্পণখার জন্ম হয়। পিতৃপরিচয়ে রাবণাদিকে 'বৈশ্রবণ'ও বলা হইয়া থাকে।

বলে যক্ষপতি সম—যক্ষপতি কুবেরের পুরাণে ঐশ্বর্য-খ্যাতিই আছে, বীরত্ব-খ্যাতি তত বেশি নহে। মধুসূদন অনুপ্রাসের অনুরোধে কয়েক স্থলে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি লঙ্ঘন করিয়া বলবীর্যাধিক্য জ্ঞাপনার্থ 'যক্ষপতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয় : "রক্ষঃ শত শত—,যক্ষপতিত্রাস বলে—" (মেঘনাদবধ, ৬।৪৪৫)

ফুলদল দিয়া ইত্যাদি—কোমল পুষ্পদল দ্বারা সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন যেরূপ অসম্ভব কার্য, রাজ্যভ্রষ্ট ভিখারী রামের পক্ষে বীরবাহুর ন্যায় শক্তিমান বীরের নিধনও তদ্রূপ অসম্ভব ব্যাপার। এস্থলে রাম ও ফুলদলের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া ফুলদলে অবাস্তব ধর্ম আরোপ করায় নিদর্শনা অলঙ্কার।

কি পাপে হারানু ইত্যাদি—এস্থলে রাবণের এই বিলাপের ভিতর দিয়া কবি তাহার চরিত্র পরিস্ফুট

করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। এই রাবণ রামায়ণ বর্ণিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র। এখানে রাবণ রাক্ষস নামক একটি সুসভ্য ও সুসমৃদ্ধ জাতির অধিনায়ক এবং প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হইয়াও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় অতি তুচ্ছ শত্রুর নিকটে পদে পদে পরাজিত। রামায়ণের রাবণ মায়াবী নিশাচর এবং ঘোর কুক্রিয়াসক্ত। তাহার মুখে "কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?" এবং "কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি," ইত্যাদি বিলাপ আত্মপ্রবঞ্চনাই হইত। কিন্তু মধুসূদন-কল্পিত রাবণের মুখে এই করুণ বিলাপ ততটা অসঙ্গত হইয়া উঠে নাই।

অকালে আমার দোষে—কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়াছিলেন যে, তিনি ক্রমাগত ছয়মাস নিদ্রাসুখ ভোগ করিবার পর একদিনমাত্র জাগ্রত থাকিয়া সেইদিন যদৃচ্ছভাবে আহার-বিহার করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি এই নিদ্রাকালে কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে তাঁহার বিনাশ ঘটিবে। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে যখন লঙ্কা প্রায় বীরশূন্য হইয়া উঠিল, তখন ভীতিবিহ্বল রাবণ পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ করেন এবং রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হয়। হায় সূর্পণখা........এ ভুজগে?—উপমান ভুজগকেই উপমেয় রামচন্দ্ররূপে কল্পনা করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। সূর্পণখা ও শূর্পণখা উভয়রূপই শুদ্ধ।

তোর দুঃখে দুঃখী ইত্যাদি—সূর্পণখা প্রথমে রামচন্দ্রকে ও পরে লক্ষ্মণকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিলে এবং সীতার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। সূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণকৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থই রাবণ সীতাহরণ করেন।

দেউটী, (দেউটি)—প্রদীপ। দীপবর্তিকা > দীব্‌অট্টিআ > দীব্‌ট্টি > দেউটি।

রবাব—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র (ফরাসী শব্দ)। মুরজ—মৃদঙ্গ। মুরলী—বাঁশী।

হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে ইত্যাদি—জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরীতে অবস্থান করিয়া ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের মুখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধনাদি শতপুত্রের নিধনসংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ—জ্ঞানবান প্রধানমন্ত্রী। অভ্রভেদী—মেঘস্পর্শী, অত্যুচ্চ। কুবলয়—পদ্ম।

মৃণাল—পদ্মলতার মূলদেশে অবস্থিত এবং পঙ্কের উপর বিস্তৃত সূক্ষ্ম, কোমল ও শ্বেতাভ তন্তু। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণতঃ কণ্টকময় পদ্ম-'নাল' অর্থেই প্রযুক্ত। শব্দের অর্থান্তর গ্রহণের (semantics) দৃষ্টান্ত। তুলনীয়—"কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!" (মেঘনাদবধ, ২।৩৭১) এবং "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।"—(মৃণালিনী)

হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম ইত্যাদি—যে নালটির অগ্রভাগে পদ্মটি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইতে ফুলটি ছিঁড়িয়া লইলে তাহা যেমন জলে নিমগ্ন হয় সেইরূপ হৃদয়রূপ বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুত্ররূপ পদ্মকে কাল ছিন্ন করাতে হৃদয়ও শোক-সলিলে নিমগ্ন হয়। 'তুলনাবাচক' যথা শব্দের প্রয়োগে বাক্যের শেষাংশ উপমা অলঙ্কার। কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দাদি ব্যতীত দৃষ্টান্ত কথনের জন্য বাক্যের প্রথমাংশে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

মদকল করী—মদমত্ত হস্তী। পরিণত বয়স্ক হস্তী উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাহার গণ্ডদেশাদি হইতে যে ঘর্ম নির্গত হয় তাহার নাম 'মদ'। মদপূর্ণ কল (মধুর অব্যক্ত ধ্বনি) যাহার—বহুব্রীহি সমাস।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ, বীর কুঞ্জরের মত,—উপমিত সমাস। পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে ধনুর্দ্ধর—ধনুর্দ্ধর বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (দূরান্বয় দোষ)

ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। জলধি—সমুদ্র। জল+ধা+কি। তুলনীয় : অম্বুধি, উদধি, তোয়ধি, পয়োধি, বারিধি ইত্যাদি। পবনপথে—আকাশে। কোদণ্ড-টঙ্কার—ধনুকের জ্যা বা ছিলা আকর্ষণজনিত শব্দ।

যূথনাথ—দলপতি। ঘন ঘনাকারে—ঘন (গাঢ়, বিশেষণ) ঘন (মেঘ, বিশেষ্য) রূপে। চকমকি—(নাম ধাতু) চকমক করিয়া। কলম্বকুল—বাণসমূহ। শনশনে—(ক্রিয়াবিশেষণ) শন্ শন্ শব্দ করিয়া।

কনক-মুকুট শিরে—স্বর্ণমুকুটপরিহিত। পার্থিব ঐশ্বর্যলুব্ধ কবিমন জটাবল্কলধারী বনবাসী রামচন্দ্রের মস্তকেও স্বর্ণমুকুট দান করিয়াছে এবং ভোগবিলাস-বিমুখ সর্বত্যাগী শিবকেও স্বর্ণাসনে উপবেশন করাইয়াছে। তুলনীয়—"ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে," (মেঘনাদবধ, ৪।২০৪)

বাসবের চাপ যথা—রামচন্দ্রের বিশাল ধনুঃ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিস্তৃত ও বিবিধ বর্ণে সমুজ্জ্বল।

সন্দেশবহ—সন্দেশ অর্থাৎ সংবাদ বহনকারী দূত। হর্যক্ষ—হরি (হরিদ্‌বর্ণ) অক্ষি যাহার, সিংহ।

দ্বন্দ্বি—দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া। সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি ইত্যাদি—বায়ুর সহিত সংগ্রাম করিবার সময়ে সমুদ্র যেভাবে প্রচণ্ড গর্জন করিতে থাকে।

ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম ইত্যাদি—কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য ঢালের মধ্যে শাণিত তরবারির উজ্জ্বল ফলকগুলি ধূমরাশির অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখাসমূহের ন্যায় ঝকমক করিয়া উঠিল।

নাদিল কম্বু অম্বুরাশিরূপে—রণশঙ্খসমূহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করিয়া উঠিল।

পূর্বজন্ম দোষে—দেশরক্ষার জন্য সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণের গৌরব হইতে বঞ্চিত দূত নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতেছে।

ক্ষত বক্ষঃস্থল মম ইত্যাদি—দূত যে প্রাণের প্রতি মমতায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে নাই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে যে, তাহার প্রতি শত্রুগণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থলই বিদ্ধ করিয়াছে; পলায়নের চেষ্টা করিলে সেগুলি পৃষ্ঠেই আঘাত করিত।

হরষে বিষাদে—পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণে বীর পিতার পুত্রগৌরবজনিত হর্ষ এবং নিহত পুত্রের শোকজনিত বিষাদ। সাবাসি—প্রশংসা করি। প্রশংসা সূচক ফারসী অব্যয়। অব্যয় শব্দকে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

কনক-উদয়াচলে ইত্যাদি—বিশালদেহ তেজস্বী রাবণ কাঞ্চনময় সমুন্নত প্রাসাদ-চূড়ায় আরোহণ করিলে মনে হইল যেন উজ্জ্বল কিরণশোভিত সূর্যদেব স্বর্ণময় উদয়গিরির শিখরে আবির্ভূত হইলেন। 'দিনমণি' ও 'অংশুমালী' উভয় শব্দই সূর্যবাচক। এস্থলে অংশুমালী শব্দটিকে দিনমণির বিশেষণরূপে গ্রহণ করা উচিত। উপমেয় রাবণকে উপমান দিনমণি (সূর্য) বলিয়া সংশয় হেতু উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—স্বর্ণময় প্রাসাদসমূহকে মুকুটের ন্যায় ধারণ করিয়াছে যে লঙ্কাপুরী। এখানে এবং অন্য সর্বত্রই কবি লঙ্কাকে অশেষ সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যপূর্ণ নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কমল-আলয় সরঃ—সরোবরসমূহ পদ্মশোভিত। উৎস রজঃছটা—রজতের ন্যায় শুভ্র জলধারাবিশিষ্ট উৎস বা ফোয়ারা। মধুসূদন বহুস্থলে রজত অর্থে রজঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রজঃ শব্দের অর্থ রেণু, ধূলি ইত্যাদি। সেই অর্থ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন অর্থে শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাকে অবাচকতা দোষ বলে। নানা রাগে—বিবিধ বর্ণে।

হীরাচূড়া শিরঃ—হীরকশীর্ষ। 'হীরাচূড়' অথবা 'হীরাশির' হওয়া উচিত ছিল। পুনরুক্তি দোষ।

জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন—কবি লঙ্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, পৃথিবীর সকল প্রকার সুখপ্রদ সামগ্রীর সমাবেশ তোমার মধ্যে হইয়াছে; অতএব তুমি জগতের সকল লোকের কামনার বস্তু।

বৈদেহীহর—বিদেহের রাজকন্যা সীতার হরণকারী রাবণ। করভসম—হস্তিশাবকের ন্যায়। কঞ্চুক—সর্পের নির্মোক বা খোলস; আবরণ। হিমান্তে—শীতঋতুর অবসানে। লুলি—লোল অর্থাৎ কম্পিত করিয়া। অবলেপে—গর্বের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ।

দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ ইত্যাদি—প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ লঙ্কা চারিদিকে কিভাবে শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আছে তাহা দেখিলেন। দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন বালিপুত্র কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ। তিনি নবীন হস্তি-শাবকের ন্যায় শক্তিশালী; অথবা শীতঋতুর অবসানে সদ্যঃ নির্মোক পরিত্যাগ করিয়া বিষধর প্রকাণ্ড সর্প যেমন উজ্জ্বল বিচিত্র দেহে গর্বভরে দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা আন্দোলিত করিয়া উদ্যত ফণা লইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, তিনি সেইরূপ আতঙ্কজনক।

শত প্রসরণে ইত্যাদি—শত্রুদল সৈন্যশ্রেণীর পর সৈন্যশ্রেণীর সমাবেশ করিয়া শত বেষ্টনে লঙ্কাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শত প্রসরণে—শত বেষ্টনে।

কেশরি-কামিনী—সিংহী। লঙ্কা স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া সিংহীর সহিত উপমিত হইয়াছে। ভীমা—ভয়ঙ্করী; (বিশেষণ)। ভীমাসমা—চণ্ডীর ন্যায়; (বিশেষ্য)। পাকশাট, (পাখসাট)—পক্ষের আঘাত। নিষাদী—হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সেনানী। সাদী—আরোহী; এস্থলে অশ্বারোহী। ভিন্দিপাল—নিক্ষেপণীয় বর্শাজাতীয় শস্ত্র। কিরীট—মুকুট। শীর্ষক—উষ্ণীষ, পাগড়ি। কৃষীদলবলে—কৃষীদলের অর্থাৎ কৃষকগণের শক্তিতে। কৃষি+ইন্=কৃষী; অপ্রচলিত শব্দ। রবিকুলরবি—সূর্যবংশের প্রধান।

কালপৃষ্ঠধারী—'কালপৃষ্ঠ' নামক ধনুক ধারণকারী। কর্ণের ধনুর নাম ছিল 'কালপৃষ্ঠ'।

যথা হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত ইত্যাদি—মাতা হিড়িম্বার স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্ধিত এবং গরুড়ের ন্যায় শক্তিশালী, ভীমপুত্র ঘটোৎকচ যেরূপ মৃত্যুকালেও নিজের বিরাট দেহের পেষণে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য মথিত করিয়া কুরুক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন সেইরূপ বীরবাহুও মৃত্যুর পূর্বে অসংখ্য শত্রুসৈন্য বধ করিয়া তাহাদের শবদেহস্তূপের উপর পতিত হইয়াছিলেন। পুরাণে আছে, হিড়িম্বা রাক্ষসী পাণ্ডবগণের বনবাসকালে ভীমকে পতিত্বে বরণ করে। ইহার গর্ভে ভীমপুত্র ঘটোৎকচের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ অসংখ্য কৌরব-সৈন্য বধ করিতে থাকিলে নিরুপায় হইয়া দুর্যোধন কর্ণকে 'একাঘ্নী' শর নিক্ষেপপূর্বক ঘটোৎকচকে বধ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। একাঘ্নী অব্যর্থ শর; কিন্তু উহা একবার মাত্রই প্রয়োগ করা যাইত। কর্ণ এই শরটি তাঁহার পরম শত্রু অর্জুনকে বধ করিবার জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অবশেষে কর্ণ এই একাঘ্নী শর নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে বধ করেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও ঘটোৎকচ নিজের বিশাল দেহ শত্রুসৈন্যের উপর নিক্ষেপপূর্বক বহু সৈন্য দেহভারে পিষ্ট করিয়াছিলেন। বীরকুল সাধ—বীরগণের কাম্য। সাধ<শ্রদ্ধা—একান্ত কামনা।

এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রাঘাতের ন্যায় নিদারুণ পুত্রশোকের আঘাতে। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

বিহনে<বিহীনে—বিরহে, ব্যতিরেকে।

মেঘশ্রেণী যেন অচল ইত্যাদি—প্রাসাদশীর্ষ হইতে রাবণ দূরে সমুদ্রের উপর রামচন্দ্রকৃত সেতুবন্ধ দেখিলেন। দূর হইতে সেতুবন্ধের সুবৃহৎ প্রস্তরগুলিকে গতিশূন্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল।

বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে—সেতুবন্ধে বাধাপ্রাপ্ত সমুদ্রের স্রোত সেতুর দুইপাশে তরঙ্গধ্বনি তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কি সুন্দর মালা ইত্যাদি—প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা বা ধিক্কার প্রয়োগে এস্থলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।

প্রচেতঃ—প্রচেতস্ শব্দ সম্বোধনে। সমুদ্রাধিপতি বরুণের নামান্তর প্রচেতাঃ।

প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি—গ্রীক পুরাণে সিন্ধু ও বায়ুদেবকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা হইয়াছে। তুলনীয়—"সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।" (১।১৮৩)

যাদুকর—ঐন্দ্রজালিক, বাজিকর। ফারসী যাদু (জাদু) শব্দের অর্থ ইন্দ্রজাল, magic.

কেশরীর রাজপদ—শক্তিমান সিংহের চরণ। "কেশরিরাজের পদ" সঙ্গত প্রয়োগ হইত।

বীতংসে (বিতংসে)—পাখী ধরিবার ফাঁদে।

হৈমবতী পুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ। হেম=স্বর্ণ এবং হৈম=স্বর্ণময়। সুতরাং স্বর্ণময়ী অর্থে হৈমবতী শব্দের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ। মধুসূদন একাধিক স্থলে হৈম অর্থে হৈমবতী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কোন টীকাকার হৈম অর্থে 'হেমময় অলঙ্কার' অর্থ করিয়া হৈমবতী শব্দটির প্রয়োগ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটি অনাভিধানিক, এবং মধুসূদনের রচনায় এইরূপ অবাচকতা দোষ এত বেশি যে, ইহার সমর্থনের জন্য উপনিষদ হইতে দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে—নীল সমুদ্রের বক্ষে অবস্থিত স্বর্ণময়ী লঙ্কা শ্যামল বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিত কৌস্তুভ-রত্নের ন্যায় শোভমান। তুলনীয়—"নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা, কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ-রতন।" (তিলোত্তমাসম্ভব ১।৩৩০) কুস্তুভ—বিষ্ণু। কুস্তুভের রত্ন—কৌস্তুভ। কৌস্তুভ-রতন—বিষ্ণুর বক্ষে অবস্থিত রত্ন বিশেষ।

জাঙাল<জঙ্গাল; সেতু, বাঁধ।

মিনতি—কাতর প্রার্থনা; অনুনয়। আরবী 'মিন্নৎ' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দ হইতে উৎপন্ন 'বিঞঞত্তি'>'বিনতি' শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন জোড়কলম শব্দ।

কিঙ্কিণীর বোল—ঘুঙুরের ধ্বনি। নূপুর, চন্দ্রহার প্রভৃতি অলংকারের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বা ঘুঙুরকে কিঙ্কিণী বলে।

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে— এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেবল রাবণপত্নী চিত্রাঙ্গদাই রূপবতী নহেন; তাঁহার অনুচরীবৃন্দও সুন্দরী ও সুবেশারূপে কল্পিত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা—রাবণের অন্যতমা পত্নী; বীরবাহুর জননী। কবরী-বন্ধন—সুবিন্যস্ত কেশভার, খোঁপা।

হিমানীতে—শীতঋতুতে। হিমানী (হিম+ঈপ) শব্দের অর্থ তুষার বা বরফ। অবাচকতা দোষ।

পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। কিন্তু মধুসূদন সর্বত্রই পদ্মদল বা পদ্মের পাপড়ি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার শোকাশ্রুপূর্ণ আয়ত চক্ষুর সহিত পদ্মপত্র অপেক্ষা পদ্মদলের সাদৃশ্যই সমধিক। তুলনীয়—"পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন," (৩য় সর্গ। ২); "পদ্মপর্ণ বর্ণ বিভারাশি উজ্জ্বলে সে বনরাজী" (৮ম সর্গ। ৬৪০) ইত্যাদি।

বিহঙ্গিনী<বিহঙ্গী; পক্ষিণী। সংস্কৃত-ইন্ ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীপ্রত্যয়ের সাদৃশ্যে বাঙ্গালা স্ত্রীবাচক বহু শব্দে অযথা -ইনী প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে; যথা বিহঙ্গিনী, সিংহিনী, অশ্বিনী, সর্পিণী, চাতকিনী, সুকেশিনী ইত্যাদি।

শোকের ঝড় বহিল সভাতে ইত্যাদি—বিলাপ-পরায়ণা চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সভায় যেন শোকের ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড় আরম্ভ হইলে তাহার সহিত বিদ্যুৎ চমক, মেঘ-গর্জন, প্রবল বায়ুপ্রবাহ এবং বর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এস্থলে চিত্রাঙ্গদার অনুচরীগণ ছিল বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী; তাহাদের আলুলায়িত কেশপাশ মেঘের ন্যায় ঘন কৃষ্ণ; তাহাদের শোকজনিত দীর্ঘশ্বাস ঝটিকা প্রবাহের ন্যায় প্রবল; তাহাদের অশ্রুধারা বর্ষণের ন্যায়, এবং তাহাদের হাহাকার ধ্বনি ছিল মেঘগর্জনের ন্যায়। এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করিয়া তদনন্তর ঝড়ের অঙ্গীভূত বিদ্যুৎ ইত্যাদির সহিত সুন্দরীগণের রূপ ইত্যাদির সামঞ্জস্য সাধন করায় সাঙ্গ-রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

সুরসুন্দরী—বিদ্যুৎ। আসার—ধারাবর্ষণ। "ধারাসম্পাত আসারঃ—" (অমরকোষ)। জীমূতমন্দ্র—মেঘগর্জন। নিষ্কোষিলা—তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিল।

গ্রহদোষে দোষী জনে—এখানেও রাবণের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, স্বকৃত দুষ্কৃতির ফল ভোগ

করিতেছেন এরূপ কোন বোধ তাঁহার নাই; তিনি নিজেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত বলিযাই মনে করেন।

বিধিবশে—সম্পূর্ণ দৈবাধীন হইয়া। নিদাঘে—গ্রীষ্ম ঋতুতে। বরজে—পান উৎপন্ন করিবার জন্য চতুর্দিকে উত্তমরূপে আবৃত এবং উপরে স্বল্প-আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে।

সজারু (শজারু)—পুচ্ছদেশে তীক্ষ্ণ কণ্টকপুঞ্জযুক্ত পশুবিশেষ; শল্যক। শল্যক + (স্বার্থে) রূপ>শল্যকরূপ>শেজ্জঅরুঅ>শেজ্জারু>শজারু, সজারু।

বারুই—বারুজীবী; পানের চাষ ও ব্যবসায় করেন এরূপ সম্প্রদায় বিশেষ।

শিমুল-শিম্বী—শিমুল ফল। শিমুল<শাল্মলী; শিম্বী>শিম, সীম।

বিধি প্রসারিছে বাহু ইত্যাদি—এখানেও রাবণের খেদোক্তির ভিতরে স্বীয় অপরাধ অপেক্ষা দৈবাধীনতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুনিভাননে—(সম্বোধনে) ইন্দুর অর্থাৎ চন্দ্রের নিভ অর্থাৎ সদৃশ আনন যাহার এইরূপ স্ত্রী। বহুব্রীহি। বীরপ্রসূন—প্রসূন অর্থাৎ পুষ্পবৎ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যযুক্ত বীর। বীর প্রসূনের মত; উপমিত সমাস। প্রসূ—প্রসবিত্রী, জননী। রজত-প্রাচীরসম শোভেন জলধি—লঙ্কার চতুষ্পার্শ্বে সমুদ্রের রৌপ্যবৎ শুভ্র ফেনিল ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ প্রাচীরের ন্যায় বর্তমান। সরযূতীরে—অযোধ্যানগরী সরযূতীরে অবস্থিত।

ক্ষুদ্র নর—মেঘনাদবধ কাব্যে কবি রাম-লক্ষ্মণকে সর্বদাই সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। দৈব বিরুদ্ধ হইলে রাবণের ন্যায় ত্রিভুবনবিজয়ী বীরও কিরূপে অতি ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা সবংশে ধ্বংস হইতে পারে, তাহাই এই কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয়।

বামন হইয়া কে চাহে ধরিতে চাঁদ—চিত্রাঙ্গদার তিরস্কার বাণীর ভিতরেও রাবণ যে শৌর্যে, বীর্যে, প্রতিষ্ঠায়, সর্বতোভাবে রামচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগ্নীর অপমানের প্রতিশোধার্থই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক,—রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়াই রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযান। অন্যথা রাজ্যভ্রষ্ট বিপন্ন রামের পক্ষে প্রবল প্রতাপান্বিত রাবণের রাজ্য আক্রমণ করিবার স্পর্ধা অসম্ভব ছিল;—ইহাই চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য বিষয়। কাকোদর—সর্প। কু (কুৎসিত) + অক (গমন) কাক = বক্রগতি। কাক উদর যাহার = কাকোদর।

শোকে, অভিমানে,—পুত্রের বিয়োগজনিত শোকে এবং স্ত্রীর নিকট ভর্ৎসিত হওয়ায় অভিমানে।

রঘুকুলমণি—পরম শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগই স্বাভাবিক। সুতরাং শত্রু রামচন্দ্রকে এখানে রাবণের 'রঘুকুলমনি' এইরূপ শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক উল্লেখ খুব স্বাভাবিক হয় নাই।

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি—অদ্যকার সংগ্রামে জগৎ হয় রাবণশূন্য অথবা রামশূন্য হইবে। তুলনীয় : রামায়ণে রামের উক্তি—"অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।" (লঙ্কাকাণ্ড—১০১।৪৮)

কর্ব্বুরবৃন্দ (কর্ব্বুর)—রাক্ষসগণ। দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—কর্ব্বুরবৃন্দের বিশেষণ। বারী—(বারি)—হস্তিশালা। বারণযূথ—হস্তিদল। মন্দুরা—অশ্বশালা। মুখস্—অশ্বের মুখের লাগাম। আইল রড়ে—দ্রুতগতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শব্দ। পদাতিকব্রজ—পদাতিক সৈন্য; ব্রজ=সমূহ। কনক শিরস্ক শিরে—মস্তকে স্বর্ণময় উষ্ণীষ পরিহিত।

ভাস্বর পিধানে অসিবর—উজ্জ্বল কোষে নিবদ্ধ সুবৃহৎ তরবারি লইয়া। অপি+ধা+অনট্=অপিধান, পিধান। ব্যাকরণকার ভাগুরির মতে অব এবং অপি উপসর্গদ্বয়ের আদ্য অকার বিকল্পে লুপ্ত হয়। অপিনদ্ধ, পিনদ্ধ; অবগাহন, বগাহন।

আয়সী—অয়ঃ অর্থাৎ লৌহ দ্বারা গঠিত বর্ম। কাতারে—শ্রেণীবদ্ধভাবে। আরবী কতার্=শ্রেণী। ধ্বজধর বলী—শক্তিমান পতাকাবাহক। হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ। হেষিল<হ্রেষিল; অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি

করিল। মধুসূদন হ্রেষে, হ্রেষিল, ক্রিয়ার 'র' সর্বদা বর্জন করিয়াছেন। বারীশ—সমুদ্রাধিপতি দেবতা বরুণ। বারুণী—বরুণপত্নী, বরুণানী। বরুণানীকে মধুসূদন 'বারুণী'রূপে পরিবর্তিত করিয়াছেন।

যথা জলতলে ইত্যাদি—বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গ; বারুণী কর্তৃক মুরলাকে লক্ষ্মীদেবীর নিকট দূতীরূপে প্রেরণ; প্রমোদকাননে মেঘনাদের অবস্থিতি এবং মেঘনাদকে লঙ্কাসমরের সংবাদদানার্থ ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর তথায় গমন:—এই ঘটনাগুলি রামায়ণ-বহির্ভূত। বিভিন্ন পাশ্চাত্য কাব্য হইতে এই ঘটনাগুলি মধুসূদন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানে মুরলা নামটি সম্ভবতঃ তিনি উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ ঐ নাটকে মুরলা নাম্নী সীতার সখী নদীদেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। মুরলা বারুণীর প্রশ্নের উত্তরে 'কলকলনাদে' উত্তর করিলেন,—ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানেও মুরলা নদীদেবতারূপেই কল্পিত হইয়াছেন। কবিরচিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও আছে—"আইলেন ভগবতী তমসা, সহ মুরলা বিমল সলিলা, বৈদেহীর সখী দোঁহে।" কিন্তু বারুণী-মুরলা সংবাদটি কল্পিত হইয়াছে মিল্টনের কোমাস্ কাব্যে বর্ণিত 'সেবান' নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'সাব্রিনা' এবং তাঁহার সখী লীজিয়ার কথোপকথনের ছায়ায়।

স্বজনি—সখি (সম্বোধনে)। স্বজন=বান্ধব; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী (অর্ধতৎসম সজনী)। জলেশ পাশী—পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। গ্রীক পুরাণের Nereus. বায়ুপতি—পবনদেব। গ্রীকপুরাণের Aeolus. দেবেন্দ্রের সভায় ইত্যাদি—কাহিনীটি গ্রীকপুরাণের অনুগামী। ভারতীয় কোন পুরাণে এইরূপ কাহিনী নাই।

সেদিন—অতি অল্পদিন পূর্বে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধকালে। কিরূপ কৌশলে কবি রামায়ণীয় ঘটনার সহিত গ্রীক্ পুরাণে উল্লিখিত একটি কাহিনীর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়।

লাঘবিতে—লাঘব করিতে; খর্ব করিতে। বিগ্রহ—যুদ্ধ। বারতা<বার্তা; সংবাদ।

যেখানে তাঁর রাঙা পা দু'খানি ইত্যাদি—পুরাণে কথিত আছে যে, দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীদেবী সমুদ্রগর্ভে কিছুকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি যেস্থলে তাঁহার চরণকমল স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার সমুদ্রগৃহ ত্যাগের পরে স্বর্ণপদ্মবনের সৃষ্টি হইয়াছে।

গিয়াছেন গৃহে—স্বগৃহ বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

রজঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম—রৌপ্যবৎ দেহের উজ্জ্বল শুভ্র শোভা। তুলনীয়—"উৎস রজঃছটা।"

বিভাবসু—সূর্য। লঙ্কাপুরে—রাবণ নিজের সৌভাগ্যবলে লক্ষ্মীদেবীকে লঙ্কায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মদনমোহন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

দেবীর কমলপদ পরিমল আশে—দেবীর পাদপদ্মের সুরভি লাভের উদ্দেশ্যে। পরিমল শব্দের আভিধানিক অর্থ—কস্তুরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি বস্তুর মর্দনজাত সুগন্ধ। (মর্দনোত্থে পরিমলম্)। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণভাবে সুবাস অর্থে শব্দটি সুপ্রচলিত।

ধনদের—যক্ষপতি কুবেরের। গন্ধরস—ধূপ, গুগ্‌গুল ইত্যাদি সুগন্ধি বৃক্ষনির্যাস। দেউল < দেবকুল; দেবগৃহ, দেবমন্দির।

হীনতেজাঃ খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা ইত্যাদি—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় জোনাকির আলো যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত সুবর্ণ প্রদীপসমূহের আলোকও লক্ষ্মীদেবীর রূপপ্রভায় সেইরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

ফিরায়ে বদন—লঙ্কার প্রত্যাসন্ন অমঙ্গলের সূচনাস্বরূপ লক্ষ্মীদেবী 'বিমুখ' হইয়া বসিয়া আছেন। বিন্যাসিয়া—স্থাপন করিয়া। কপোল—গণ্ডস্থল। তেজস্বিনী—দীপ্তিময়ী, প্রভাশালিনী।

পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?—লক্ষ্মীদেবী শোকমগ্ন বিষণ্ণ মুখে অবস্থান করিতেছেন।

তাঁহার কুসুমের ন্যায় স্নিগ্ধ, কোমল ও পবিত্র হৃদয়েও কি দুঃখশোকের অবস্থিতি সম্ভবপর? কাকু নামক শব্দালঙ্কার।

রমার আশার বাস ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবীর সকল আশার অবস্থান হরির বক্ষঃস্থলে, অর্থাৎ হরির উপরেই তাঁহার সকল সুখ ও সৌভাগ্য নির্ভর করে। সমুদ্রগৃহে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবার সময় তিনি যে হরির বিরহে বাঁচিয়া ছিলেন তাহা সমুদ্রপত্নীর অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতির জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল।

তেঁই—সেই হেতু। তেঁই<তেঁঞি<তেন<তেন কারণেন। যাদঃপতি—সমুদ্র। যাদঃ (জলজ প্রাণী) সমূহের পতি। রোধঃ—তটদেশ। যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে—চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে ভঙ্গুর সমুদ্রতটের ন্যায়। দুঃশ্রাব্যতা দোষ।

অকম্পন—রাক্ষস সেনানীবিশেষ। অতিকায—রাবণের অন্যতম পুত্র। দুকূলবসনা—পট্টবস্ত্র পরিহিতা। নয়নরঞ্জন কাঞ্চী—অতিশয় সুদৃশ্য মেখলা বা কটিহার। কৃশ কটিদেশে—ক্ষীণ মধ্যদেশ নারীর সৌন্দর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চক্রনেমি—চক্রের পরিধি বা বেষ্টনী। দন্তী—বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট হস্তী। দণ্ডধর—যম। কালদণ্ড—যমদণ্ড। নিক্কণ—বাদ্যযন্ত্র এবং অলঙ্কারাদির ধাতব মধুর ধ্বনি। তেজস্কর—সমুজ্জ্বল, দীপ্তিশালী।

ভুবনমোহিনী লঙ্কাবধূ—লঙ্কানগরীর রূপবতী রাক্ষস রমণীগণ। এস্থলে পুনরায় লঙ্কার সমৃদ্ধি এবং রক্ষঃকুলবধূগণের অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা ইঙ্গিত হইয়াছে।

ত্রিদিব-বিভব--স্বর্গের ঐশ্বর্য। "ত্রয়ো দিব্যস্তি অত্র"—ত্রিদিব = স্বর্গ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দময় বাসস্থান। স্বরীশ্বর—স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র। স্বর্ = স্বর্গ। প্রক্ষেড়ন—নারাচ বা লৌহময় বাণ। বৈশ্বানর—অগ্নি।

যথা যবে বৈশ্বানর ইত্যাদি—গভীর অরণ্যে দাবানল উৎপন্ন হইলে যেমন সুবৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়, সেইরূপ এই কাল সমরে মহাবীর রাক্ষস সকল নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

প্রমোদ-উদ্যানে—এখানে লঙ্কানগরীর বহির্দেশে প্রমোদোদ্যানে মেঘনাদের অবস্থিতি, লক্ষ্মীদেবীর দৌত্যকর্ম, এবং মেঘনাদের আত্মগ্লানি ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি,—এই সকল রামায়ণ-বহির্ভূত কাহিনী ইতালীয় কবি ট্যাসো রচিত 'জেরুসালেম-উদ্ধার' (La Gerusalemme Liberta) কাব্যে বর্ণিত কুহকিনী আর্মিডার উপবনে বিলাসব্যসনে মত্ত রিনাল্ডোর কাহিনী হইতে গৃহীত।

প্রাক্তনের ফল—রাবণের পূর্বানুষ্ঠিত কর্মের ফলস্বরূপ তাহার সবংশে বিনাশ। শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। শিখণ্ড (ময়ূরপুচ্ছ) + ইন্ + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। আখণ্ডল—পর্বতের পক্ষচ্ছেদকারী ইন্দ্র। মঞ্জু—সুন্দর, মনোরম।

যথা শিখণ্ডিনী ইত্যাদি—ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরী যেভাবে মনোরম কুঞ্জবনে উড্ডীন হয়, সুন্দরী মুরলা সেইরূপ নিজের বিচিত্র ও উজ্জ্বল পরিচ্ছদাদির সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে আকাশপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন।

হৃষীকেশ—বিষ্ণু। হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) ঈশ (অধিপতি দেবতা)। বৈজয়ন্ত ধাম—ইন্দ্রের অমরাবতীস্থ প্রাসাদ। অলিন্দ—বারান্দা। হৈমময়—হৈম, হেমময়। ব্যাকরণদুষ্ট পদ। তুলনীয়—"এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী।" নন্দন কানন—অমরাবতীস্থ দেবোদ্যান। নিষঙ্গ-সঙ্গে—তূণীরের সহিত। বিজলী—বিদ্যুৎ > বিজ্জু > বিজু + লী (স্বার্থে)। ঝলা—বিকাশ, দীপ্তি, চমক। শিঞ্জিত—শিঞ্জন; অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি। সপ্তস্বরা—জলতরঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

রজনীনাথ বিহারেন যথা ইত্যাদি—চন্দ্র যেরূপ দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি কন্যার

সহিত সুখে অবস্থান করেন। ভানুসুতে—(সম্বোধনে) হে যমুনে। যমুনা সূর্যকন্যা।

মেঘনাদ-ধাত্রী ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে প্রমোদোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যেও চার্লস্ এবং য়ুবাল্‌ডো রিনাল্‌ডোকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আর্মিডার উপবনে গিয়াছিলেন।

প্রভাষা—রামায়ণে এই নামে একটি রাক্ষসীর উল্লেখমাত্র আছে। বিশদ-বসনা—বার্ধক্য ও বৈধব্যহেতু শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। অম্বুরাশিসুতা—সমুদ্রের কন্যাস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী।

জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু ইত্যাদি—ইতঃপূর্বে মেঘনাদ যুদ্ধে রামলক্ষ্মণকে নাগপাশ অস্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর নিকট রামচন্দ্রের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ছিঁড়িলা কুসুমদাম ইত্যাদি—লঙ্কার চরম দুর্দিনে প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন বলিয়া প্রবল আত্মগ্লানিতে মেঘনাদ বিলাসের উপকরণ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 'জেরুসালেম উদ্ধার'. কাব্যেও রিনাল্‌ডো-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> "His nice attire in scorn he rent and tore:
> For his bondage vile that witness bore:—
> That done.—he hasted from the charmed fort." (Book XVI. 34)

রথীন্দ্রর্ষভ—শ্রেষ্ঠ রথিগণের মধ্যেও প্রধান। রথীন্দ্র ঋষভের (বৃষের) মত;—উপমিত সমাস।

হৈমবতীসুত—হিমবানের কন্যা উমার পুত্র কার্ত্তিকেয়। হৈমবতী—হিমবৎ + অপত্যার্থে যঃ + স্ত্রীলিঙ্গে-ঈ। তারকে—কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেন। বৃহন্নলারূপী—বিরাটগৃহে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ও নপুংসকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিরীটী—নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করায় অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকট কিরীট বা মুকুট লাভ করিয়া 'কিরীটী' আখ্যা পান।

কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী ইত্যাদি—পাণ্ডবগণের বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে একদা কৌরবেরা বিরাটের গোধন হরণ করিবার জন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। বিরাট যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন বিরাটপুত্র উত্তরের রথের সারথি হইয়া গোধন রক্ষা করিতে যান। কুরুসৈন্যের সংখ্যা দর্শনে ভীত হইয়া উত্তর পলায়নের উপক্রম করিলে, অর্জ্জুন তাহাকে আশ্বস্ত করেন এবং ছদ্মবেশ গ্রহণকালে যে শমীবৃক্ষে তাঁহাদের গাণ্ডীবাদি অস্ত্র গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উত্তরকে লইয়া যান। বৃক্ষ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণপূর্বক অর্জ্জুন ক্লীববেশ পরিত্যাগ করিয়া বীরবেশে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। বৃহন্নলা যেরূপ অক্ষম ক্লীবের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্তমধ্যে বীরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, মেঘনাদও সেইরূপ অপৌরুষসূচক বিলাসবেশ ত্যাগ করিয়া অতি সত্বর বীরবেশে সজ্জিত হইলেন।

ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী—মেঘনাদের রথের পতাকা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র ও উজ্জ্বল।

তুরঙ্গম বেগে আশুগতি—মেঘনাদের রথের অশ্বগুলি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন।

মেঘবর্ণ রথ ... বেগে আশুগতি—আপাতদৃষ্টিতে এখানে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার বলিয়া মনে হইলেও এখানে আদৌ রূপক অলঙ্কার হয় নাই। উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনা ব্যতীত রূপক সৃষ্টি হয় না। এখানে মেঘের বর্ণের সহিত রথের বর্ণের সাদৃশ্য তুলিত হওয়ায় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ না থাকায় লুপ্তোপমা অলঙ্কার হইয়াছে। পরবর্তী বাক্যদ্বয় 'চক্র বিজলীর ছটা' এবং 'তুরঙ্গম বেগে আশুগতি'তেও তদ্রূপ।

প্রমীলা সুন্দরী—মেঘনাদ-পত্নী। রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। প্রমীলা নামটি কবি কাশীরামের

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রমীলা কবির একটি সার্থক ও অপূর্ব সৃষ্টি। তৃতীয় সর্গে ইহাকে 'মহাশক্তি-অংশে' জাত এবং কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রমীলার বিলাপ 'ইলিয়ড' কাব্যে হেক্‌টরের যুদ্ধ যাত্রাকালে তৎপত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকীর, এবং 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যে বিনাল্‌ডোর বিদায়কালে আর্মিডার বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ব্রততী—লতা। হায়, নাথ, গহন কাননে...ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?—এস্থলে উপমেয় ও উপমান দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে রহিয়াছে এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দ না থাকায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

বাঁধে—বন্ধনে। শিঞ্জিনী—জ্যা, ধনুকের গুণ বা ছিলা। বাজনা—বাদ্য > বজ্জ > বাজ + (স্বার্থে) না প্রত্যয়। কৌশিক (কৌষিক)—কীটবিশেষের কোশ (কোষ) হইতে উৎপন্ন সূত্রের বস্ত্র; রেশমী কাপড়। কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণময় বর্মের দীপ্তি। অসুরারি-রিপু—অসুরগণের অরি ইন্দ্র; তাঁহার রিপু অর্থাৎ শত্রু মেঘনাদ। ছার < ক্ষার—তুচ্ছ।

হাসিবে মেঘবাহন—মেঘবাহন ইন্দ্র মেঘনাদের হস্তে পরাজিত হইবার পর সর্বদা তাহার ছিদ্রান্বেষণে রত। আজ লঙ্কার দুর্দিনে মেঘনাদ বর্তমান থাকিতে রাবণ যুদ্ধ করিতে গেলে ইন্দ্র মনে মনে মেঘনাদকে অপদার্থ কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবার সুযোগ পাইবেন।

রুষিবেন দেব অগ্নি—মেঘনাদ অগ্নির উপাসক ছিলেন। উপযুক্ত পুত্র বর্তমানে রাবণ যুদ্ধ করিতে গেলে মেঘনাদের কাপুরুষতায় ইষ্টদেব অগ্নি কুপিত হইবেন।

দুইবার আমি হারানু রাঘবে—রামায়ণে মেঘনাদ নিহত হইবার পূর্বে তিন বার রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে তিনি নিশারণে রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন; সেবার গরুড়ের সাহায্যে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়বারে মেঘনাদ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, অবশেষে রাম ও লক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় পতিত থাকিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহা ছাড়াও তৃতীয়বারে তিনি রামের মোহ উৎপাদনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া রামের সমক্ষে মায়াসীতা বধ করিয়াছিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ—যুদ্ধের পূর্বে মেঘনাদ লঙ্কার নিকুম্ভিলা নামক পর্বতগুহায় অগ্নিদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে যুদ্ধে অজেয় হইতেন।

অস্তাচলগামী দিননাথ এবে—বীরবাহু যে দিবসে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল সেই দিনের অবসানে সূর্য অস্ত যাইতেছে। অভিষেক—সেনাপতিপদে বরণ।

বন্দী—বন্দনাকারী; স্তুতি-পাঠক। এই তৎসম শব্দটি অবরুদ্ধ অর্থ-জ্ঞাপক ফারসী বন্দী (বন্দি) শব্দ হইতে পৃথক্।

নয়নে তব.......হে রাজ সুন্দরি তোমার—অচেতন লঙ্কাপুরীতে সমান লিঙ্গ, সমান কার্য ও সমান বিশেষণ ব্যবহার দ্বারা 'সজীবত্ব আরোপ' করায় এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার।

বিভাবরী—রাত্রি। সূর্যের বিভাকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করে যে। রাণী—রাজ্ঞী > রঅঞ্‌ঞী > রাণী। আধুনিক বানান—রানী। পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র—যে ভীষণ অস্ত্র স্বয়ং পশুপতি শিবেরও ত্রাসজনক। পাশুপত—অমোঘ শৈব-তেজঃসম্পন্ন শর। অরিন্দম—শত্রুনিপীড়ক, রিপুজয়ী।

বিভীষণ, রক্ষঃকুলকালি—সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া বিভীষণ সম্মান লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভ্রাতৃদ্রোহিতার জন্য তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে তাহাও যে অনপনেয়, "ঘরসন্ধানী বিভীষণ"—এই প্রবাদবাক্যই তাহা সপ্রমাণ করে। মধুসূদন বিভীষণের চরিত্রের এই গ্লানিজনক দিকটিই দেখিয়া তাঁহাকে "scoundrel Vibhisana" বলিয়াছিলেন। উল্লিখিত বাক্যও বিভীষণের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণার পরিচায়ক।

দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত—রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর সৈন্য। ইহাদের প্রতিও কবি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, কবিগুরু বাল্মীকি একপাল বানরসৈন্যের পরিবর্তে যদি অল্পসংখ্যক মানুষ অনুচরও রামকে দিতেন, তবে মেঘনাদবধ কাব্যের রসনিষ্পত্তি তিনি অন্যভাবে করিবার চেষ্টা করিতেন এবং মেঘনাদবধ ঘটনাটি লইয়া একখানি আর্য্যবিজয়গাথা রচনা করিতে পারিতেন। তুলনীয়: "He (Indrajit) was a noble fellow, and but for that scoundrel Vibhisana, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad."

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে ইত্যাদি—সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া মধুসূদন অষ্টাধিক সর্গে তাঁহার কাব্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের অনুকরণে সংস্কৃত ভাষায় সর্গের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম সর্গের প্রধান ঘটনা হইল রাবণ কর্তৃক মেঘনাদকে সৈনাপত্যে অভিষেক; তাই এই সর্গের নাম হইয়াছে "অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি—প্রথম সর্গের শেষাংশে রাবণ মেঘনাদকে বলিয়াছেন :

"দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

বীরবাহুর মৃত্যুদিবসে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ করিবার অব্যবহিত পরে সূর্য অস্ত গেল।

একটি রতন ভালে—গোধূলি কালে কেবল উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারকাকেই (শুক্র গ্রহ বা শুকতারাকে) আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশের ফলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

মুদিলা সরসে আঁখি বিরস বদনা নলিনী—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরে পদ্মগুলি নিমীলিত হইল। এ স্থলে গোধূলিতে এবং নলিনীতে সজীবত্ব আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার।

সরসে—(সরঃ শব্দ সপ্তমীতে) সরোবরে; অপ্রচলিত প্রয়োগ। কুলায়—নীড়, পাখীর বাসা।

গাভীবৃন্দ—গাভী শব্দটি অর্ধতৎসম শব্দ হইলেও (গবী > গাভী) সাধু বাংলা ভাষায় প্রচুরভাবে প্রযুক্ত। সুচারুতারা—সুন্দর নক্ষত্র শোভিতা। শর্বরীর বিশেষণ। দূরান্বয় দোষ। শর্বরী—রজনী

কূজনি পাখী .. শর্বরী—বস্তুর বা স্বভাবের যথাযথ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা হওয়ায় এখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। সুগন্ধবহ—সুরভি বায়ু। বিলাসী—মৃদু মন্দ বায়ু বলিয়া 'শৌখিন'।

কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা—কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন : These lines, will, no doubt recall to your mind the lines—

"And Whisper whence they stole
Those balmy spoils" (Milton)
And—"Like the sweet South
That breaths upon a bank of violets
Stealing and giving odour" (Shakespeare)

কিন্তু কবির ধারণা ছিল যে, চৌর্যবাচক steal শব্দের পরিবর্তে 'চুম্বন' শব্দের ব্যবহার সার্থকতর হইয়াছে। দেবীর চরণাশ্রমে—নিদ্রাদেবীর চরণে। শশিপ্রিয়া—রাত্রি, রজনী। তুলনীয়—রজনীনাথ, নিশাপতি—চন্দ্র।

উতরিলা—উপস্থিত হইল, অবতরণ করিল। অব-তৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুলনীয় উর শব্দ (১ম সর্গ) শব্দটি 'উত্তরিলা' (উত্তর করিল) শব্দ হইতে স্বতন্ত্র।

ত্রিদশ-আলয়ে—দেবগণের বাসস্থল স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন, কেবল এই তিনটি দশা প্রাপ্ত হন বলিয়া দেবতাগণকে 'ত্রিদশ' বলা হয়।

পুলোম-নন্দিনী—পুলোমা (পুলোমন্) নামক দানবের কন্যা। পুলোমাকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন। চামরী—চামর দ্বারা ব্যজনকারী। ত্রিদিব-বাদিত্র—স্বর্গীয় বাদ্য। ত্রিদিব = স্বর্গ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই দেবতাত্রয়ের আনন্দময় বাসস্থান।

ছয় রাগ, মূর্তিমতী ছত্রিশ রাগিণীসহ—ভারতীয় সংগীতে ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী এবং মেঘ এই প্রধান ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের সঙ্গিনী ছয়টি করিয়া মোট ৩৬ রাগিণীর উল্লেখ আছে। উর্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা, মিশ্রকেশী—স্বর্গীয় অপ্সরাদের মধ্যে চারিজন।

সুকেশিনী—শুদ্ধরূপ 'সুকেশা' বা 'সুকেশী'।-ইনভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে ছন্দের অনুরোধে -ইনী প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

শিঞ্জিতে—শিঞ্জন অর্থাৎ নূপুরাদি অলঙ্কারের মধুর শব্দের দ্বারা। সুধারস—অমৃত; nectar. দেব-ওদন—দেবভোগ্য খাদ্য; ইংরেজি ambrosia শব্দের অন্বর্থক শব্দ চয়ন করা হইয়াছে। কেশর—পুষ্পরেণু বা পরাগ। মন্দারদাম—মন্দার ফুলের মালা। নন্দন-কাননের বৃক্ষগুলির মধ্যে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পতরু ও হরিচন্দন এই কয়টি প্রসিদ্ধ। বৈজয়ন্ত ধাম—অমরাবতীস্থ ইন্দ্রের প্রাসাদ। পদ্মাক্ষী—কমল-কোরকের ন্যায় সুন্দর ও আয়ত লোচন বিশিষ্টা।

পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেত পদ্মের ন্যায় আয়তলোচন যাঁহার; বিষ্ণু।

হে বারীন্দ্রসুতে—হে লক্ষ্মীদেবি! দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস করায় তাঁহাকে সমুদ্রের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভারতীয় পুরাণসম্মত এই কল্পনার সহিত কিন্তু প্রথম সর্গোক্ত সমুদ্রপত্নী 'বারুণী'-কর্তৃক লক্ষ্মীকে 'প্রিয়তমা' সখীরূপে উল্লেখ ভারতীয় পুরাণসম্মত নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণের জন্যই এইরূপ অসঙ্গতি আসিয়া পড়িয়াছে।

হে বৃত্রবিজয়ি—হে বৃত্রাসুর পরাভবকারী ইন্দ্র!

বিলক্ষণ জান তুমি তারে—কথাটির মধ্যে প্রছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে। অন্য কেহ না জানিলেও রাবণ-পুত্র 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদের কথা ইন্দ্র নিশ্চয়ই ভুলেন নাই।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ—লঙ্কাপুরীস্থ নিকুম্ভিলা নামক পর্বতগুহায় মেঘনাদ অগ্নিদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যুদ্ধে অজেয় হইতেন। বৈদেহীনাথ—বিদেহ অর্থাৎ মিথিলার রাজকন্যা সীতাপতি রামচন্দ্র।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র গরুড়। বলা-জ্যেষ্ঠ—পরাক্রমে প্রধান।

বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা ইত্যাদি—অন্য সকল পক্ষীর সহিত তুলনায় গরুড় যেরূপ শক্তিশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ অন্যান্য রাক্ষস বীরের তুলনায় সেইরূপই পরাক্রমশালী। স্বকর্ম—গীতবাদ্য।

বসন্তকালে পাখীকুল যথা ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই এরূপ মধুর যে, বসন্তকালে কোকিলের মধুর স্বর শ্রবণে অন্যান্য পক্ষী যেরূপ স্তব্ধ হইয়া থাকে, লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে দেব-সভাস্থ আলাপপরায়ণ রাগরাগিণীসমূহও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

স্বরীশ্বর—স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র।

পন্নগ-অশনে—সর্পভক্ষক গরুড়কে। পদ্+ন+গ–পন্নগ, যে পদ দ্বারা চলে না। পন্নগ হইয়াছে অশন (খাদ্য) যাহার; বহুব্রীহি সমাস। দম্ভোলি—বজ্র। তেঁই—< তেঞি < তেন < তেন কারণেন—সেইহেতু। সর্বশুচি—অগ্নি; অগ্নিস্পর্শে সকল দ্রব্য শুদ্ধ হয়।

উপেন্দ্রপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীদেবী। একসময়ে বিষ্ণু ইন্দ্রের অনুজরূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামান্তর 'উপেন্দ্র'। বারতা < বার্তা—সংবাদ

না পারি সহিতে ভার—রাবণের পাপভারে প্রপীড়িত হইয়া। কবি রাবণ-চরিত্র অত্যুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও রামায়ণের রাবণ-চরিত্রের নিন্দনীয় অংশটি একেবারে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হন নাই,—হওয়া সম্ভবপরও নহে। সেইজন্য লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাগণের এবং সীতা, সরমা, জটায়ু, বিভীষণ প্রভৃতির উক্তিতে রামায়ণীয় পাপিষ্ঠ রাবণ-চরিত্র মধ্যে মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যে ইঙ্গিত হইয়াছে। অনন্ত ক্লান্ত এবে—রাবণের পাপভারে পৃথিবী ভারগ্রস্ত হওয়ায় পৃথিবীধারক বাসুকিনাগও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিরূপাক্ষ—শিব।

কোন পিতা দুহিতারে ইত্যাদি—কোন সদ্‌বিবেচক পিতাই বিবাহের পর কন্যাকে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন না। লক্ষ্মীদেবী শিবের কন্যা; অথচ স্বীয় কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে শিবভক্ত রাবণের মঙ্গল কামনায় বিষ্ণুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লঙ্কায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহা শিবের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন কার্য নহে। ত্র্যম্বক—শিব; ত্রি অম্বক (নেত্র) যাঁহার।

অনম্বর-পথে—আকাশ পথে। অম্বর শব্দের অর্থও আকাশ। অম্বর শব্দের অর্থান্তর হইল 'বসন', 'আবরণ'। শেষোক্ত অর্থে ন + অম্বর (আবরণ) যাহার = অনম্বর, উন্মুক্ত আকাশ।

কেশব-বাসনা—বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী।

অধোদেশে—স্বর্গ হইতে নিম্নদেশে পৃথিবীস্থ লঙ্কায়।

সোণার প্রতিমা যথা ইত্যাদি—স্বর্গ হইতে লক্ষ্মীদেবী যখন উন্মুক্ত আকাশ পথে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন, তখন স্বচ্ছ সলিলে বিসর্জিত প্রতিমার উজ্জ্বল বর্ণে জল যেমন ঝল্‌মল্ করিয়া উঠে, সেইরূপ তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। মৃণালের রুচি—পদ্মনালের শোভা। বিকচ কমল গুণে—প্রস্ফুটিত পদ্মের জন্য।

চলহ দেবী ... শুনলো ললনে!—কার্যোদ্ধারের সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইন্দ্র সুন্দরী শচীকে তাহার সহযাত্রিণী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন যে, বায়ুপ্রবাহ সুরভিত হইলে তাহার আদর সমধিক হয় এবং মৃণালের আদর হয় কেবল তদগ্রে বিকশিত সুন্দর পদ্মটির জন্যই। এস্থলে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সাহায্যে ইন্দ্র শচীকে সহযাত্রিণী হইতে অনুরোধ করায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

বাহিরি বেগে ... আববিলা কমল বদন—ইন্দ্রের বিমান আকাশপথে স্বর্গ হইতে কৈলাসে গমনের সময়ে সেই দেবরথের বিভায় সারা জগৎ আলোকিত হওয়ায় সকলেই প্রভাতে সূর্যোদয় হইতেছে এই ভ্রান্তিতে প্রভাত-কালোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইল। অত্যধিক সাদৃশ্যবশতঃ অত্যুজ্জ্বল ইন্দ্ররথের আকাশে আবির্ভাবকে সূর্যোদয় বলিয়া কবি-কল্পিত ভ্রমের ফলে এস্থলে চমৎকার ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

বাসর < বাসঘর—প্রচলিত অর্থ—যে ঘরে নব-বিবাহিত বরবধূ রাত্রি যাপন করে। এখানে কুলবধূর সাধারণ শয়নাগার অর্থই করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে 'কুসুম শয্যা' কেন? স্বামি-স্ত্রী নিত্য পুষ্পশয্যায় শয়ন করেন না। মানস-সকাশে—মানস সরোবরের তীরে।

শিখিপুচ্ছ চূড়া ইত্যাদি—প্রচুর উদ্ভিজ্জহেতু শ্যামল দেহ কৈলাস পর্বতের চূড়ায় নানা রত্নে গঠিত শিবালয় শ্যামদেহ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভামান। তুলনীয়—"শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে।" (তিলোত্তমাসম্ভব ১।৬৭) ধড়া < ধট—কটিবস্ত্র, বসন।

মানস-সকাশে শোভে ... চর্চিত সে বপুঃ।—উপমেয় কৈলাস পর্বত এবং তদঙ্গীভূত ভবের ভবন, স্বর্ণবর্ণ ফুলরাশি, এবং নির্ঝর-নির্গত শুভ্র জলরাশিকে উপমান শ্রীকৃষ্ণ এবং তদঙ্গীভূত

শিখিপুচ্ছ-চূড়া, পীতধড়া এবং শ্বেতচন্দনপ্রলেপ বলিয়া বিতর্ক করায় এখানে অতি চমৎকার 'সাঙ্গ-উৎপ্রেক্ষালঙ্কার' হইয়াছে।

আনন্দ-ভবনে—চিরানন্দময় কৈলাসপুরীতে। বিজয়া ও জয়া—দেবীর সহচরীদ্বয়।

হায়রে, কেমনে, ... ভাবি মনে মনে!—শিব-ভবনের অতুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করিতে কবি সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া খেদোক্তি করিতেছেন। ভাবুক ব্যক্তিরা স্ব স্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে যে যাহার সাধ্যমত কৈলাসের এবং শিব-ভবনের শোভা সৌন্দর্য কল্পনা করিয়া লউন।

কিনা তুমি জান মাতঃ ইত্যাদি—সর্বজ্ঞা দেবীর পক্ষে পৃথিবীস্থ লঙ্কাসমরের হেতু ও গতি অজ্ঞাত থাকার কথা নহে। আকুল বিগ্রহে—যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হওয়ায় অস্থির হইয়া। বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি—কারণ পূর্বে দুইবার মেঘনাদ যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াছিল। পরন্তপ—শত্রু-নিপীড়নে সমর্থ। পর (শত্রু) + তপ + খচ্। বিশ্বধর শেষ—পৃথিবীধারণকারী অনন্তনাগ। ইষ্টদেবে—ইষ্টদেব অগ্নিকে। অবিদিত নহে মাতঃ ইত্যাদি—সর্বজ্ঞা দেবীর নিকট বিশ্বের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মেঘনাদের বলবীর্যের কথাও অজ্ঞাত নহে। রাবণি—রাবণপুত্র মেঘনাদ। কুলিশে—বজ্রকে। কাত্যায়নি—(সম্বোধনে) দেবীর নামান্তর বিশেষ।

পরম অধর্ম্মাচারী ইত্যাদি—বাল্মীকির অনুসরণে এস্থলে ইন্দ্র রাবণকে পরম পাপিষ্ঠরূপে উল্লেখ করিতেছেন। এই কাব্যে কোন কোন স্থলে রাবণবিরোধী পাত্রপাত্রীর মুখে রাবণের চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটি ইঙ্গিত হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে রাবণের কবিকল্পিত চারিত্রিক অভ্যুন্নতি সবিশেষ ক্ষুণ্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে রাবণের তেজস্বী বীর চরিত্রের সহিত তুলনায়, একমাত্র সীতা চরিত্র ব্যতীত, এই সকল ষড়যন্ত্রকারী রাবণদ্বেষী দেবদেবীচরিত্রের স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত প্রকট হইয়া তাঁহাদের চরিত্রকেই যেন কলঙ্কিত করিয়াছে।

একটি রতনমাত্র—স্ত্রীরত্ন-স্বরূপ সীতা। উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অমূল < অমূল্য—মহার্ঘ।

পাতি মায়াজাল—রাবণ সীতাহরণ ব্যাপারে কোন বলবীর্যের পরিচয় দেয় নাই। সে প্রথমে মায়ামৃগবেশে মারীচকে প্রেরণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করে, এবং সীতার অনুরোধে রাম মৃগটি ধরিবার জন্য গহন বনে প্রবেশ করিলে, রামই বিপন্ন হইয়া যেন লক্ষ্মণকে সাহায্যার্থ 'আহ্বান' করিতেছেন এই মায়া আর্তনাদ দ্বারা লক্ষ্মণকে কুটীর হইতে অপসারিত করিয়া ঋষির ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে।

পর-ধন, পর-দার লোভে সদালোভী—রামায়ণে বর্ণিত রাবণ এইরূপই বটে; কিন্তু কবির কল্পিত রাবণ, কবিরই নিজের ভাষায় "a grand fellow."

কহিতে লাগিলা বীণাবাণী ইত্যাদি—দেবীর নিকট ইন্দ্রের অনুনয়ের পর শচীও মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করার জন্য মধুরস্বরে দেবীর অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পরম শৈব রাবণের বিরুদ্ধে দেবীকে প্ররোচিত করার জন্যই দেবদম্পতীর এই আপ্রাণ চেষ্টা।

কি মনোবেদনা ইত্যাদি—দেবী অন্তর্যামিনী বলিয়াও বটে এবং স্বয়ং সতীশিরোমণি বলিয়াও বটে, রামচন্দ্রের বিরহে সীতা কি দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত থাকার কথা নহে। দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ ইত্যাদি—মেঘনাদ যে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিল এ কথা সে জীবিত থাকিতে কেহই বিস্মৃত হইবে না। মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া দেবী ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রপত্নীরও গ্লানি দূর করুন। শরমে—লজ্জায় (ফারসী শব্দ)। জিষ্ণু—সতত জয়শীল ইন্দ্র।

মঞ্জুনাশিনী—'মঞ্জুনাশী' অর্থে সুন্দরী রমণী। 'সর্পিণী', 'সুকেশিনী' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইন্‌ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে "ইনী" প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। বৃষধ্বজ—বৃষের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা,

শিব। যোগাসন নামে শৃঙ্গ—কৈলাস পর্বতস্থ কবিকল্পিত শৃঙ্গবিশেষ। দেবভূমি 'অলিম্পিয়ার' অন্তর্গত 'আইডা' শৃঙ্গের অনুকরণে এই দুর্গম গিরি-শৃঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। আইডা-শৃঙ্গে অবস্থিত জুপিটারকে প্রলুব্ধ করার জন্য তৎপত্নী জুনো নিদ্রাদেব সম্‌নাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইলিয়ড, ১৪শ সর্গ)।

পক্ষীন্দ্র গরুড় ইত্যাদি—যোগাসন শৃঙ্গের সমুচ্চতা ও দুর্গমতা জ্ঞাপক।

অদিতি-নন্দন—অদিতির পুত্র ইন্দ্র। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতিব গর্ভে দেবগণের উৎপত্তি হয়।

ত্রিপুরারি—ত্রিপুর নামক অসুরের নিহন্তা শিব। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় পুরীরূপে আকাশে সঞ্চরণশীল এই অসুর নানারূপ উৎপাত সৃষ্টি করিতে থাকায় শিব ইহাকে বধ করেন।

বিনাশি, দেবি ইত্যাদি—মেঘনাদবধের উপায় করিয়া রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করিলে দেবী ত্রিভুবনকে রাক্ষসগণের ত্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, ধর্মের জয় হইয়া ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, রাবণের পাপভার হইতে মুক্ত হওয়ায় পৃথিবী লঘুভার হইবে, বাসুকির শ্রম লাঘব হইবে, এবং সর্বোপরি দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্র প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিবেন। এক মেঘনাদবধের ব্যবস্থা দ্বারা এক সঙ্গে এতগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

হেনকালে গন্ধামোদে ইত্যাদি—ইন্দ্র ও শচী মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবীর অনুনয় করিবার কালে অকস্মাৎ পুষ্পের সুগন্ধে কৈলাস পূর্ণ হইল এবং দূরাগত কোকিল-রবের ন্যায় মৃদু ও মধুর 'শঙ্খ ঘণ্টা' ধ্বনি কৈলাসে আসিয়া পৌঁছিল। পৃথিবীতে ভক্তগণ দেবদেবীর উপাসনা করিলে কিরূপ সূক্ষ্মভাবে তাহার সাড়া স্বর্গে আসিয়া পৌঁছায়, কবি এখানে তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন।

ভবেশ-ভাবিনী—শিবের মনোমোহিনী উমা। ভাবিনী শব্দের অর্থ হাবভাব বিশিষ্টা বিদগ্ধা নারী; coquettish. ভামিনী শব্দও প্রায় অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে কোপন স্বভাবা নারী; shrew.

কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে—রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার বৃত্তান্ত বাল্মীকি উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু পুরাণান্তরে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণবধ কামনায় রামচন্দ্রের নীলোৎপল দ্বারা দেবী-পূজাব উল্লেখ আছে। শরৎকালে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। তখন দক্ষিণায়ন এবং শাস্ত্রমতে দেবগণের রাত্রিকাল। অসময়ে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া পূজার পূর্বে রামকে দেবীর বোধন করিতে হইয়াছিল।

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে—দেবীর আজ্ঞানুসারে বিজয়া মন্ত্রাদির সাহায্যে এবং খড়ি দিয়া ভূমিতে ছক্ কাটিয়া গণনা করিয়া ব্যাপারটি জানিয়া লইলেন।

সংঘটিত—মিলিত। বারি সংঘটিত—জলপূর্ণ।

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া—কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র হনুমানের সাহায্যে নীলোৎপল সংগ্রহ করিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কাঞ্চন আসন তাজি—ইন্দ্র ও শচীর সমবেত প্রার্থনায় দেবী শিবের অসন্তোষজনক যে কার্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, এক্ষণে ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সহজেই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধূর্জটি—ধূর (বিশ্বের ভার) বহন করেন যিনি; শিব। দ্বিরদ-গামিনী—গজবৎ মন্থরগতিবিশিষ্টা। দ্বি + রদ (দন্ত) যাহার, হস্তী। চিররুচি—চিরকাল যাহার শোভা অক্ষুণ্ণ থাকে। চির বিকচিত—চিরকাল যাহা সমভাবে বিকশিত থাকে, কখনও ম্লান হয় না। ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল।

স্বপনে শুনিয়া শিশু ইত্যাদি—কৈলাসের আনন্দোৎসবের সূক্ষ্ম তরঙ্গ পৃথিবীতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট স্ব স্ব অভীষ্ট মধুরধ্বনিরূপে আসিয়া পৌঁছিল।

ভেটিব—অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে গমন করিব। অভি + অটন (গমন) হইতে উৎপন্ন।

পরিমল—চন্দন, কস্তুরী, কর্পূর প্রভৃতি বস্তুর মর্দনোত্থ সুরভি। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ সুগন্ধ অর্থে ব্যবহৃত। নিশান্তে—প্রভাতে।

ত্বিষাম্পতি দূতী—কিরণরাশিসম্পন্ন গ্রহগণের অধিপতি সূর্যের দূতী; ঊষার বিশেষণ। ত্বিষাম্ পতি। অলুক ষষ্ঠীতৎ।

নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ইত্যাদি—দেবীর স্মরণমাত্র রতি আসিয়া দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। দেবীও সুন্দরী, রতিও সুন্দরী। উভয় সৌন্দর্যের পার্থক্য কবি অতি চমৎকাররূপে সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পার্বতী ঊষার ন্যায় মহিমময়ী এবং রতি প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোলোভা। রতি আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিল,—যেন প্রভাতে সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলটি মৃদু বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া সূর্যের আগমনবার্তা-বহনকারিণী ঊষাদেবীর উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

সমাধি—ধ্যান। পিনাকী—ত্রিশূল অথবা ধনুকধারী শিব। শিবের ত্রিশূল এবং শিবধনুঃ উভয়কেই পিনাক বলে। ঋতুপতি—বসন্ত, শিবের সহিত উপমিত। বনস্থলী কুসুমকুন্তলা—পুষ্পসমৃদ্ধ বনভূমি; রত্নালঙ্কারভূষিতা দেবীর সহিত উপমিত। বিনানিলা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেণী রচনা করিল। রত্নসঙ্কলিত-আভা—নানারূপ রত্নের সমাবেশে উজ্জ্বল। কৌযেয় (কৌশেয়)—কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন সূত্রে প্রস্তুত; ক্ষৌম, পট্ট। লাক্ষারস—অলক্তক, আলতা। রসান < রসায়ন—স্বর্ণকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ববহৃত প্রস্তরবিশেষ অথবা রাসায়নিক দ্রব বিশেষ।

রসানে মার্জ্জিত ইত্যাদি—দেবী স্বভাবতঃই অতুলনীয়া সুন্দরী। তদুপরি রতির প্রসাধন ও বেশভূষা ধারণে তাঁহার সৌন্দর্য রসান প্রয়োগে উজ্জ্বলীকৃত স্বর্ণের ন্যায় সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

স্মর-হর-প্রিয়া—কামদেবের নিধনকর্তা শিবের প্রেয়সী পার্বতী।

স্মর-প্রিয়া—কামদেবের প্রেয়সী রতি।

আসে যথা ইত্যাদি—প্রবাসে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট স্বদেশীয় ভাষার সংগীত দুর্লভ বলিয়া প্রবাসে সেইরূপ সংগীত শ্রবণে সে যেমন মনের আনন্দে ব্যগ্রভাবে সেখানে ছুটিয়া আসে, রতির স্মরণমাত্রে কামদেবও সেইরূপ ব্যগ্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মায়ার নন্দন মদন—ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলিয়াছেন, শিবের কোপানলে ভস্মীভূত হইবার পর মদন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহৃত হইয়া শম্বর নামক দৈত্যের গৃহে মায়াবতী নাম্নী ছদ্মবেশিনী রতি কর্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হন। সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই মদনকে মায়ার নন্দন বলা হইয়াছে।

উত্তরিলা ভয়ে—এখানে মদনের আশঙ্কার সহিত অনুরূপ ক্ষেত্রে ইলিয়ড কাব্যে বর্ণিত সম্নাসের আশঙ্কা তুলনীয়—

Somnus to Juno :

"But how unbidden shall I dare to steep
Jove's awful temples in the dew of sleep?
Long since too venturous, at thy bold command
On these eternal lids I laid my hand.
What time deserting Ilion's wasted plains,

His conquering son. Alcides, plunged the main;
When lo! the deeps arise, the tempests roar,
And drive the hero to the ocean-shore:
Great Jove awaking, shook the blessed abodes
With rising wrath, and tumbled gods on gods :
Me chief he sought, and from the realms on high
Had hurled indignant to the nether sky"—etc.

And Juno's reply :

"Vain are thy fears," the Queen of heaven replies,
And speaking rolls her large majestic eyes :
"Thinkest thou that Troy has Jove's high power won,
Like great Alcides,—his all-conquering son?
Hear and obey the mistress of the skies,
Nor for the deed expect a vulgar prize :
For, know, thy loved one shall be ever thine
The youngest Grace,—Pasithae the divine,"—etc.(Ilaid.-XIV)

যে কৌশলে মধুসূদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর অদ্ভুত সমন্বয়সাধনে এবং মূল গ্রীক কাহিনীটিকে ভারতীয় করণে সমর্থ হইয়াছেন তাহা লক্ষণীয়।

ফুলশর—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন গুণবিশিষ্ট যথাক্রমে অরবিন্দ, অশোক, চূত (আম্রমঞ্জরী), নবমল্লিকা এবং নীল (মতান্তরে রক্ত) উৎপল,—কামদেবের পঞ্চ পুষ্পশর।

হাহাকার রবে ডাকিনু বাসবে ইত্যাদি—কারণ এই সকল দেবতার অনুরোধেই কামদেব শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে স্পর্ধিত হইয়াছিলেন। বিভাবসু—অগ্নি। ক্ষেমঙ্করি—(সম্বোধনে) শুভঙ্করি, মঙ্গলদাত্রি। মিনতি—অনুনয়, কাতর প্রার্থনা। প্রার্থনাবাচক আরবী 'মিন্নৎ' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' > বিঞ্ঞত্তি > 'বিনতি' শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন 'জোড়কলম' শব্দ।

যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা ইত্যাদি—উপযুক্ত ভেষজবিদ্যাবলে প্রযুক্ত প্রাণবিনাশক অতি তীব্র বিষ যেরূপ প্রাণদায়ক ঔষধে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রথমবারে অশুভ মুহূর্তে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গেলে শিবের ললাটস্থ যে অগ্নি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, আজ দেবীর প্রভাবে সেই অগ্নিই কামদেবকে পরম আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিবে।

মুহূর্তে মাতিবে মাতঃ ইত্যাদি—মোহিনী বেশে দেবীকে দেখিলে সমগ্র জগৎ তাঁহার রূপে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। বিশ্বজননী পার্বতীর নিকট সন্তানতুল্য কামের এই উক্তি অসঙ্গত। ভারতীয় দেবদেবী চরিত্রের উপর অতিরিক্তভাবে হোমরীয় দেবদেবী চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়ায় এইরূপ পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে।

সুরাসুরবৃন্দ যবে ... এদাসের শরে।—সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত বণ্টন করিবার সময়ে বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি ধারণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গ (Allusion) অলঙ্কার। বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি দর্শনে বিবদমান দেবদানব অমৃতের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

অধর-অমৃত-আশে ... উচ্চ কুচযুগ!—অমৃত, নাগদল এবং মন্দরপর্বত, এই উপমান সমূহের বৈকল্য অথবা বৈফল্য প্রদর্শন করায় এখানে প্রতীপ অলঙ্কার। মলম্বা < আরবী মুলম্মা (সোনার পাত)। মলম্বা অম্বরে তাম্র ইত্যাদি—স্বর্ণপত্রে আচ্ছাদিত তাম্রখণ্ডই যদি দেখিতে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, তাহা হইলে তাম্রের মিশ্রণশূন্য বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ড কত বেশি মনোহর হইবে! নারীর ছদ্মবেশে পুরুষ বিষ্ণুই যদি মোহিনী বেশে জগৎকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী দেবীর রূপের

ত কথাই নাই। 'অপ্রস্তুত' মলম্বা-অম্বরে তাম্র ও বিশুদ্ধ কাঞ্চনের পার্থক্য দ্বারা 'প্রস্তুত' নারীবেশী বিষ্ণুর ও দেবীর মোহিনীরূপের পার্থক্য ব্যক্ত হওয়ায় অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার।

সুবর্ণ বরণ ঘন—স্বর্ণবর্ণ মেঘ। ইলিয়ড কাব্যে বহুস্থলে দেবদেবীগণ মায়ামেঘের আবরণে দেহ আবৃত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩য় সর্গে স্বর্ণমেঘের অন্তরালে থাকিয়া আফ্রোদিতি মেনেলাউসের আক্রমণ হইতে প্যারিসকে রক্ষা করেন; ১৪শ সর্গে জুপিটার ও জুনো স্বর্ণবর্ণ মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করেন; ২০শ সর্গে স্বর্ণমেঘের অন্তরালে থাকিয়া এপোলো আকিলিসের আক্রমণ হইতে হেক্টরকে রক্ষা করেন।

হায়রে, নলিনী যেন ইত্যাদি—স্বর্ণমেঘ উজ্জ্বল বটে, কিন্তু দেবীর কান্তি তদপেক্ষা বহুগুণে উজ্জ্বলতর বলিয়া স্বর্ণমেঘের দ্বারা দেবী দেহ আবৃত করিলে মনে হইল, (১) যেন দিবাবসানে পদ্ম ম্লান হইয়া গেল; (২) যেন উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ভস্মাচ্ছাদিত হইল, (৩) যেন চন্দ্রমণ্ডলে রক্ষিত উজ্জ্বল সুধাভাণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তিত সুদর্শন চক্রের ছায়া পতিত হওয়ায় তাহার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া পড়িল। একাধিক উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে স্বর্ণমেঘাচ্ছাদিত দেবীর রূপ বর্ণনার চেষ্টার ফলে এস্থলে মালোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়াছে। দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত—হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত।

মেঘাবৃতা যেন ঊষা—স্বর্ণমেঘাবৃত দেবী কৈলাসের গজদন্ত নির্মিত দ্বারপথে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে অরুণরাগরঞ্জিত মেঘাবৃত ঊষার ন্যায় আবির্ভূত হইলেন।

কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী—দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন;—পশ্চাতে অস্ত্রাদি-সমন্বিত মদন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় অস্ত্র-সজ্জিত মদনের পুরোভাগে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী দেবীকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কণ্টকময় মৃণালের অগ্রভাগে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম অবস্থিত। তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দুইটি পৃথক বাক্যে উপমেয় কামের পুরোবর্তিনী দেবীর সহিত উপমান মৃণালের অগ্রে স্থির পদ্মের সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

ভৃগুমান—ভৃগু (উচ্চ শৃঙ্গ) বিশিষ্ট। জলদল—পর্বতের উপরিস্থ নির্ঝর ও জল-প্রপাতের জলরাশি। নীরবিলা—নির্ঝর ও প্রপাতের গর্জনশীল জলরাশি দেবীর আগমনহেতু শান্ত এবং স্তব্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল। জলকান্ত যথা শান্ত শান্তি-সমাগমে—ঝড়ের পর প্রকৃতি শান্ত হইলে গর্জনকারী সমুদ্র যেমন স্তব্ধ হয়। কপর্দ্দী—কপর্দ অর্থাৎ জটাজূটধারী শিব। তপসী—তপস্বী, তাপস (অপ্রচলিত)। বিভূতি-ভূষিত—ভস্মানুলিপ্ত।

কহিলা মদনে হাসি ইত্যাদি—দেবী যে উদ্দেশ্যে কামদেবকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য শিবের প্রতি পুষ্পশর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। এস্থলেও গ্রীক দেবী জুনোর প্রভাব পতিত হইয়া জগজ্জননী পার্বতীর চরিত্র অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছে।

শম্বর-অরি—মদন। মদনভস্মের পর মদন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিলে শম্বর তাহাকে কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহরণ করে, এবং প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তৎকর্তৃক নিহত হয়।

মীনধ্বজ—মৎস্যের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা; কামদেব শিঞ্জিনী—ধনুর জ্যা বা ছিলা। সম্মোহন শর—কামের প্রথম পুষ্পশর।

শিহরিলা শূলপাণি ইত্যাদি—কামশরে বিদ্ধ হইয়া শিব অকস্মাৎ অধীর হইয়া উঠিলেন। কুমারসম্ভবে বর্ণিত অনুরূপ ক্ষেত্রে শিবের চিত্রের সহিত এই চিত্রের তুলনা করিলে মধুসূদনের কল্পিত শিব অতি সাধারণ ব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়া আসেন। কুমারসম্ভবে কালিদাস বলিয়াছেন : "হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য / শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।"

কামশরের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিবের উপর পতিত হইল বটে, কিন্তু যোগিশ্রেষ্ঠ জগৎপিতার

মানসিক সংযম ও গাম্ভীর্য চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় 'কিঞ্চিন্মাত্র' বিচলিত হইল।

ভালে—ললাটস্থ নেত্রে। চিত্রভানু—অগ্নি।

ভয়াকুল ফুলধনু ইত্যাদি—ভীত ত্রস্ত কামদেব তৎক্ষণাৎ পার্বতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই চিত্রটি কল্পনার সময়ে কবির মনে গ্রীক্ পুরাণোক্ত 'শিশু মদনের' (Child Cupid) ভাবটি নিশ্চয়ই ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা কামদেবের পক্ষে দেবীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় কল্পনা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়া উঠে।

কেশরি-কিশোর—সিংহশিশু। এ দাসীরে ভুলি, ইত্যাদি—শিব অকস্মাৎ পার্বতীর দুর্গম যোগাসন শৃঙ্গে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে পার্বতী প্রকৃত হেতু গোপন করিয়া উত্তর করিলেন যে, বহুদিন শিবের পাদপদ্ম দর্শন না করায় তিনি সেখানে আসিয়াছেন। ইলিয়ড কাব্যেও অনুরূপ স্থলে জুনো জুপিটারের নিকট কপট উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

একাকী প্রত্যূষে ইত্যাদি—প্রসিদ্ধি আছে যে, সন্ধ্যাসমাগমে চক্রবাক দম্পতী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রভাতে পুনর্মিলিত হয়।

যে রমণী ... প্রাণকান্ত তার—এস্থলে উপমেয় পতিব্রতা নারীর একাকিনী পতির নিকটে গমন। পরবর্তী বাক্যস্থিত উপমান চক্রবাকীর একাকিনী চক্রবাকের নিকট গমনের সহিত তুলিত হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

অজিন-আসনে—চর্মাসনে। শিলীমুখবৃন্দ—ভ্রমরগণ। মনসিজ—কামদেব। মনসি (মনে) জন্মে যে, ৭মী, অলুক সমাস। কুসুমেষু—পুষ্পশরবিশিষ্ট কামদেব।

লজ্জাবেশে রাহু আসি ইত্যাদি—কামশরে বিদ্ধ শিবকে কামোন্মত্ত দেখিয়া শিবের মস্তকস্থ চন্দ্র লজ্জায় রাহুগ্রস্ত অবস্থার ন্যায় ম্লানদশা প্রাপ্ত হইল এবং ললাটস্থ অগ্নিও ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

মোহন-মুরতি ধরি,—যোগিবেশ ত্যাগ করিয়া মোহন বেশে। হরপার্বতীর এই চিত্র পুরাণসম্মত নহে। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত জুপিটার-জুনোর বিলাস বৃত্তান্ত অবলম্বনে ইহা কল্পিত হইয়াছে।

কহিলা হাসিয়া দেব—পার্বতী তাঁহার আগমনের কারণ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলেও সর্বজ্ঞ শিব প্রকৃত কারণ জানেন বলিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন। শিবের এই সর্বজ্ঞত্ব তাঁহার চরিত্রকে যেন আরও হীন করিয়া ফেলিয়াছে। সকল ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও কেবল স্ত্রৈণতার জন্য তিনি পরম-ভক্তের বিনাশের উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাক্তনের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিলেন।

তারে আদেশ— ইন্দ্রকে আদেশ কর। মায়াদেবী—পুরাণে মায়াদেবী (মহামায়া) এবং পার্বতী অভিন্ন, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আবার এই সর্গেই অন্যত্র ইহাকে "কুহকিনী শক্তীশ্বরী"ও বলা হইয়াছে। ভারতীয় ও গ্রীসীয় পৌরাণিক আখ্যান ও চরিত্রের সংমিশ্রণ সাধন করায় মধুসূদন কোন কোন স্থলে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা ইহারই নিদর্শন।

নীড় ছাড়ি উড়ে ইত্যাদি—পক্ষী যেমন নীড় হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে উড্ডীন হয় সেইরূপ ভবানীর বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গত হইয়া কামদেব আকাশ-পথে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সে সুখ-সদন—দেবীর বক্ষঃস্থল কামদেবের পক্ষে সুখময় নিবাস। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে, "কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে ইহা হতে!"

ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি—পুঞ্জ পুঞ্জ স্বর্ণবর্ণ মেঘ সুরভিত বায়ুপ্রবাহের সহিত রাশি রাশি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করিয়া বিশ্রম্ভালাপরত হরপার্বতীকে বেষ্টন করিল।

হৈমময়—হৈম বা হেমময়। স্বর্ণময়। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ। মধুসখা—বসন্ত ঋতুর সখা কামদেব। পসারি < প্রসারি—বিস্তৃত করিয়া। ললনে—ললনাকে, সুন্দরী রতিকে।

পাই প্রাণধনে ধনী—সুন্দরী রতি প্রাণস্বরূপ পতি কামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া।

সারী-শুক—শুক (টিয়াপাখী) পুরুষ এবং সারী স্ত্রীপক্ষী বলিয়া কল্পিত। কিন্তু পক্ষিতত্ত্বে সারী বা সারিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় পক্ষী। সারিকা > সালিক, শালিক।

স্মরি পূর্বকথা যত—শিবের ক্রোধানলে মদনভস্ম, রতির সহমৃতা হইবার উদ্যোগ ইত্যাদি পূর্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া।

কিরে < কিরিয়া < সচ্চ-কিরিয়া < সত্যক্রিয়া—অগ্নি, বিষ, শস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে শপথ; দিব্য।

ছায়ার আশ্রয়ে কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!—রতির অমূলক ভীতি দূর করিবার জন্য কামদেব বলিলেন যে, ঘন ছায়ায় অবস্থিত ব্যক্তিকে সূর্যকিরণ যেমন তাপিত করিতে পারে না, সেইরূপ দেবীর স্নেহময় আশ্রয় লাভ করায় শিবের ক্রোধানল তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। প্রস্তুতের উল্লেখ না করিয়া অপ্রস্তুত ছায়া এবং ভাস্করকর দ্বারা দেবীর স্নেহ এবং শিবের ক্রোধ নির্দেশ করায় অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার।

অগ্নিময় তেজঃ বাজী—অগ্নির ন্যায় তেজস্ব অশ্ব। ইংরেজি "Fiery steed"-এর অনুবাদ।

অকম্প চামর শিরে—বেগগমনহেতু অশ্বের স্কন্ধের কেশরাজিকে স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (তুলনীয় 'নিষ্কম্প-চামর-শিখাঃ"—শকুন্তলা ১।১) সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। দেউলে < দেবকুলে—দেবীমন্দিরে।

সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত আভাময় স্বর্ণাসন—প্রখর সূর্যের কিরণসমূহ একত্র করিলে যেরূপ দীপ্তি সম্ভব হয় সেইরূপ প্রদীপ্ত সুবর্ণময় সিংহাসনে।

কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী—কৃত্তিকাগণের প্রিয় পুত্রস্বরূপ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। বল্লভ = প্রিয় (প্রণয়ী বা পতি অর্থে)। সন্তান অর্থে বল্লভ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত বলিয়া এস্থলে নিহতার্থতা দোষ হইয়াছে। উমার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তিনি শরবনে পরিত্যক্ত হন। আকাশপথে গমনকালে ছয়জন কৃত্তিকা তাহাকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যপ্রযুক্ত সকলে একসঙ্গে স্তন্যদান করিতে উদ্যত হইলে শিশুটি ছয় মুখে ছয়জন ধাত্রীর স্তন্য পান করেন। ছয় কৃত্তিকার পুত্রস্থানীয় বলিয়া শিশুর নাম কার্ত্তিক, কার্ত্তিকেয় এবং ষাণ্মাতুর; এবং ছয়মুখ বিশিষ্ট বলিয়া নামান্তর 'ষড়ানন'। তুলনীয়—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত, কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।" (তিলোত্তমাসম্ভব—৩। ২৬৫) সেনানী—সেনাপতি; কার্ত্তিক দেব-সেনাপতি।

সুনাসীর—শোভন সৈন্যদলের পশ্চাতে অবস্থিত ইন্দ্র। নাসীর = সৈন্যাগ্রভাগ (vanguard)।

দিবাকর-পরিধি যেমতি—বিশাল উজ্জ্বল ঢালখানি বিশালতায় এবং ঔজ্জ্বল্যে সূর্যগোলকস্বরূপ।

কিন্তু হেন বীর নাহি ইত্যাদি—তারকাসুরকে কার্ত্তিকেয় রুদ্রতেজঃপূর্ণ যে সকল অস্ত্রসাহায্যে বধ করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্র দ্বারাই কেবল মেঘনাদের নিধন সম্ভবপর। কিন্তু মেঘনাদের পরাক্রম এতই অধিক যে, এই সকল দৈবাস্ত্র সাহায্যেও স্বাভাবিক ন্যায়যুদ্ধে তাহাকে বধ করা যাইবে না।

পূর্বাশা—পূর্বদিক, প্রাচী। পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া—প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিক-চক্রবাল প্রদীপ্ত স্বর্ণের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তৎপূর্বে রাত্রির অন্ধকার অপনোদনের সহিত পূর্বদিক ঈষৎ আরক্ত উষার আবির্ভাবে গোলাপীবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। দুইটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে কবি এই সুন্দর দৃশ্যটি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। উষা আবির্ভূত হইয়া নিজের পদ্মকর দিয়া প্রথমে রাত্রির অন্ধকারময় কপাট খুলিতে থাকেন। তাঁহার পদ্মকরস্পর্শে অন্ধকারে ঈষৎ গোলাপী

আভা ধরে। পরে কপাট সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলে পূর্বাশার স্বর্ণময় দ্বার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুলনীয়—"উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে একচক্ররথ, খুলি পদ্মকর দিয়া পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার।" (তিলোত্তমাসম্ভব—১।২১৩)

তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী ইত্যাদি—তোমার চিরদিনের ভীতিস্থলস্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মৃত্যুবরণ করিয়া তোমাকে ভয়শূন্য করিবে। কেহ কেহ বীরেন্দ্রকেশরী শব্দকে লক্ষ্মণবোধক শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা করিলে বাক্যটি অযথা 'দূরান্বয় দোষদুষ্ট' হইয়া পড়ে এবং উহা করা নিরর্থক।

লঙ্কার পঙ্কজ রবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কবি মেঘনাদের বিশেষণরূপে কথাটি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটির সমাস গঠন যথাযথ হয় নাই। "লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি," অথবা "লঙ্কা-পঙ্কজের রবি" সঙ্গততর প্রয়োগ হইত। তুলনীয়—"কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু"—(১ম সর্গ)। কবি অন্যত্র নির্দোষ সমাস গঠনও করিয়াছেন—"কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ" (চতুর্দশপদী কবিতা), "পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির-রাহুগ্রাসে"—(বীরাঙ্গনা কাব্য) ইত্যাদি।

চিত্ররথ—গন্ধর্বপতি। কিছু পরে ইন্দ্র নিজেই তাঁহাকে 'হে গন্ধর্বকুলপতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মেঘদলে আমি আদেশিব আবরিতে গগনে—সতর্ক রাক্ষস প্রহরীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বায়ুপতি—পবনদেব, গ্রীকপুরাণের বায়ুদেব Æolus-এর আদর্শে কল্পিত।

কারাবদ্ধ বায়ুদলে—এই ভাবটিও গ্রীকপুরাণ হইতে গৃহীত। প্রথম সর্গেও বারুণী-মুরলা-সংবাদে ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। তুলনীয়—

Here Æolus in a cavern vast
With bolt and barrier fetters fast
Rebellious storm and howling blast." (Æneid, Book I)

দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব কর, সংগ্রাম কর।

বৈরী বারিনাথ—গ্রীকপুরাণে বায়ুদেব Æolus ও সমুদ্রদেব Nereus পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন।

নির্ঘোষে—নির্ঘোষ বা ভীষণ গর্জন সহকারে, (ক্রিয়া-বিশেষণ)। তুলনীয়—"গর্জ্জিয়া উঠিল সিন্ধু দ্বন্দ্বে রত সদা, চিরবৈরী হেরি; সাজিল তরঙ্গদল রণরঙ্গে মাতি।" (তিলোত্তমাসম্ভব—৩।৩৮৫)

অন্তরিত পরাক্রমে—অন্তর্নিহিত শক্তিতে। অন্তর্নিহিত অর্থে অন্তরিত শব্দের প্রয়োগ অবাচকতা দোষ। জাঙ্গাল < জঙ্গাল—বাঁধ। তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্বতের মত। মন্দ্রে—গর্জনধ্বনিসহ, (ক্রিয়াবিশেষণ)। জীমূত—মেঘ। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। দম্ভোলি—বজ্র। মহাঝড় বহিল আকাশে—এই ঝটিকা বর্ণনায় ভার্জিলের ঈনীড্ কাব্যে বর্ণিত ঝটিকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। আসার—ধারাবর্ষণ। আচম্বিতে—অকস্মাৎ। দিবাকর যেন অংশুমালী—কিরণশোভিত সূর্যবৎ। তুলনীয়—"দিনমণি যেন অংশুমালী" (১ম সর্গ। ২০৬)। সারসন—কটিবন্ধ।

রাশিচক্র—আকাশস্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ নক্ষত্রমণ্ডল। সূর্য প্রতি মাসে এক এক রাশিতে অবস্থান করেন।

রাশিচক্র-সম তেজোরাশি—চিত্ররথের পরিহিত কটিবন্ধ আকাশস্থ রাশিচক্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

সৌর কিরীটের আভা স্বর্ণময়ী—সূর্যমণ্ডলের ন্যায় ভাস্বর মুকুটের সুবর্ণময় দীপ্তি।

ত্রিদিব ব্যতীত আছা ইত্যাদি—চিত্ররথের দেবোচিত আকৃতি ও কান্তিদর্শনে রামচন্দ্র সহজেই তাঁহাকে দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, 'হে ত্রিদিববাসি' সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গের অধিবাসী ব্যতীত এরূপ মহিমময় রূপ অন্য কাহারও হইতে পারে না।

পাদ্য, অর্ঘ্য—সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য পাদপ্রক্ষালনের জল এবং মস্তকে পুষ্পাদিরচিত বরণসামগ্রী। এ শুভসংবাদে—দেবগণ রামচন্দ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং স্বয়ং পার্বতী তাঁহার প্রতি অনুগ্রহশীলা এই সংবাদে। সত্যদেবী সেবা—ইংরাজিতে সত্য (Truth) স্ত্রীরূপে কল্পিত। বলি—পূজার উপকরণ। শান্তিলা—শান্ত হইল।

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ ইত্যাদি—ঝড়বৃষ্টির ফলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চন্দ্র-তারকালুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং লঙ্কাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ঝড়ের অবসানে আকাশ পরিষ্কার হইয়া আবার চন্দ্রতারকা আবির্ভূত হওয়ায় তাহাদের আলোকে লঙ্কাপুরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কৌমুদিনী < কৌমুদী—জ্যোৎস্না। -ইন-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীপ্রত্যয়ের সাদৃশ্যে -ইনী প্রত্যয়।

তরল সলিলে পশি, কৌমুদিনী ইত্যাদি—ঝড়ের পর প্রকৃতি শান্ত হইলে সরোবরাদির নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছজলে শুভ্র জ্যোৎস্না অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঝড়ের সময় চন্দ্র অদৃশ্য হওয়াতে কুমুদফুলগুলি ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল; এক্ষণে পুনরায় চন্দ্র আকাশে শোভা পাওয়ায় কুমুদগুলিও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

রজোময় < রজতময়——রৌপ্যবৎ শুভ্র। অবাচকতা দোষ। তুলনীয়—"উৎস রজঃছটা" এবং "রজঃকান্তি-ছটা-বিভ্রম"—(১ম সর্গ)।

রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ—ঝটিকারম্ভে প্রহরী রাক্ষসগণ আশ্রয়লাভের জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ("পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।") ঝটিকাবসানে তাহারা পুনরায় স্বকর্মে বহির্গত হইল।

অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ—লক্ষ্মী, ইন্দ্র, শচী, পার্বতী, শিব, মায়াদেবী প্রভৃতির সহায়তায় লক্ষ্মণের দৈবাস্ত্রলাভই এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া ইহার নাম কবি 'অস্ত্রলাভ' রাখিয়াছেন।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে—প্রথম সর্গোক্ত লঙ্কাপুরীর বহির্দেশস্থ মেঘনাদের প্রমোদকাননে।

কাঁদে—মেঘনাদ বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অকস্মাৎ উপবন ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় পতির বিরহে ব্যাকুল হইয়া। দানব-নন্দিনী—কালনেমি নামক দানবের কন্যারূপে কবি প্রমীলার কল্পনা করিয়াছেন। তুলনীয় : "কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।" (৩য় সর্গ, ৪১৫।১৬)

প্রমীলা—মহাবীর্যবতী ও অতুলনীয়া সুন্দরী মেঘনাদপত্নীরূপে এই কাব্যে চিত্রিত। প্রমীলা নামটি কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বোক্ত নারীদেশের অধিনেত্রীর নাম হইতে গৃহীত। কাশীরাম-কল্পিত অসাধারণ তেজস্বিতা এই প্রমীলার মধ্যেও রহিয়াছে এবং উভয় চরিত্রের মধ্যে এই দিক দিয়া খানিকটা সাদৃশ্যও আসিয়া গিয়াছে বটে, তথাপি মধুসূদন-কল্পিত প্রমীলা চরিত্র কোমলে কঠোরে আরও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রু-আঁখি—অশ্রুপূর্ণ আঁখি যাহার; (বহুব্রীহি সমাস)।

ভ্রমে ফুলবনে—পুষ্পোদ্যানের মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে বিরহ-সন্তাপ ভুলিবার উদ্দেশ্যে।

পীতধড়া—পীত (হরিদ্রাবর্ণের) ধড়া < ধট (উত্তরীয়) যাহার, শ্রীকৃষ্ণ। পীতাম্বর—পীতধড়া ও পীতাম্বর প্রায় সমার্থক শব্দ। এস্থলে, পীতবসন-পরিহিত। মুরলী—বংশী। বিবশা—ব্যাকুলা, অধীরা। কভু বা উঠি ইত্যাদি—মেঘনাদের বিরহে কাতরা প্রমীলা কখনও বা উচ্চ ছাদে উঠিয়া মেঘনাদের বর্তমান অবস্থানস্থল দূরবর্তী লঙ্কানগরীর দিকে সাগ্রহে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। পুঁছিয়া—মুছিয়া। প্র+উঞ্ছ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। মুরজ—মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরা<মঞ্জীর—ক্ষুদ্র করতাল।

কে না জানে ইত্যাদি—প্রমীলা পতিবিরহে বিষাদিনী বলিয়া তাহার আশ্রিতা সহচরীগণও বিষণ্ণবদনা। একটি উপমার সাহায্যে এই ভাবটি ব্যক্ত করা হইয়াছে। বসন্তের অবসানে গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে যখন বনভূমি সন্তপ্ত হইয়া উঠে তখন সেই বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিও ম্লান হইয়া যায়। এখানে মধু অর্থাৎ বসন্তের সহিত মেঘনাদের, বনস্থলীর সহিত প্রমীলার, গ্রীষ্মতাপের সহিত বিরহ-সন্তাপের এবং ফুলকুলের সহিত প্রমীলার সুন্দরী সখীবৃন্দের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে উপমেয় প্রমীলা, সখীগণ, মেঘনাদ ও বিরহতাপের সহিত উপমান বনস্থলী, ফুলকুল, মধু ও গ্রীষ্মতাপের সাধারণ ধর্ম এক, অথচ উপমাসূচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত না হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ-উদ্যানে—লঙ্কার বহির্দেশস্থ প্রমীলার উপবনে রাত্রি নামিয়া আসিল। বীরবাহুবধের পর যে রাত্রিতে দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাও সেই রাত্রিতেই ঘটিয়াছে। তুলনীয়—"উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে।" (২য় সর্গ। ১৪)

উতরিলা—অবতরণ করিল, উপস্থিত হইল। অব +√ তৃ— অবতর < ওতর < উতর < উর, উর। শিহরি—বিরহহেতু রোমাঞ্চিত দেহে। রাত্রিকালেই বিরহজনিত দুঃখ তীব্রতর হইয়া উঠে বলিয়া রাত্রির আগমনের সহিত প্রমীলা শিহরিয়া উঠিল। কলস্বরে—অব্যক্ত মধুর স্বরে। বসন্ত সৌরভা—বসন্ত ঋতুর ন্যায় সৌরভবিশিষ্টা; সুগন্ধি প্রসাধনাদি ব্যবহারহেতু সুবাসিত দেহবিশিষ্টা। তিমির যামিনী—তিমিরময়ী অর্থাৎ অন্ধকারময়ী রাত্রি।

কালভুজঙ্গিনীরূপে—কালসর্পীরূপে। রাত্রিকালেই বিরহী-বিরহিণীর সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়া বিরহিণী প্রমীলা অন্ধকারময়ী আসন্না রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা কালসর্পীর সহিত তুলনা করিয়াছে।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। মেঘনাদ নিজের শক্তিতে সকল শত্রুকেই দমন করিতে সমর্থ। আসন্না রজনী প্রমীলার বিরহ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া উহা প্রমীলার পরম শত্রু; কিন্তু উহার হস্ত হইতে প্রমীলাকে রক্ষা করিতে সমর্থ শক্তিমান মেঘনাদ এখন উপস্থিত নাই।

এখনি আসিব বলি ইত্যাদি—মেঘনাদ পূর্বে অনায়াসে দুইবার রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল। এবারেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামচন্দ্রকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া ফিরিয়া আসিবে ভাবিয়া "ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া" বলিয়া সন্ধ্যার পূর্বে প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়াছিল। কিন্তু রাবণের আদেশে সে রাত্রিকালে যুদ্ধযাত্রায় বিরত থাকে। প্রমীলা এই সংবাদ জানিত না বলিয়া মেঘনাদের প্রত্যাগমনে বিলম্বহেতু তাহার এই উৎকণ্ঠা।

ব্যাজ—বিলম্ব। কুহরে—কুহুধ্বনি করে। বসন্তসখা—কোকিল। সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী 'বসন্তসখ' পদটিই শুদ্ধ।

সীমন্তিনি—(সম্বোধনে) সাধব্যসূচক সিন্দূরাঙ্কিত সীমন্তবিশিষ্টা নারী, আয়ুষ্মতী। মেঘনাদ সম্বন্ধে প্রমীলার উৎকণ্ঠা ভবিষ্যৎ দুর্নিমিত্তসূচক। সখী বাসন্তী সুরাসুর কর্তৃক অপরাজেয় মেঘনাদের বিপদাশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাই 'সীমন্তিনি' সম্বোধন দ্বারা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে।

কে তাঁরে আটিবে বিগ্রহে—যুদ্ধে কে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে? চিকণিয়া—চিকণ অর্থাৎ সুন্দর করিয়া। বিজয়ী রথচূড়ায়—যুদ্ধজয়ী বীরের রথের শীর্ষদেশে। যথায় সরসী সহ ইত্যাদি—উদ্যানে যে স্থলে সরোবরের জলে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে। সিঁথি (সীঁথি < সীমন্তিকা)—কপালের উপরিস্থ কেশরাশির মধ্যরেখায় সংলগ্ন অলঙ্কার বিশেষ; tiara. জোনাক (জোনাকি < জোণ্হা+কি < জ্যোৎস্না)—খদ্যোৎ; স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ করে বলিয়া এই নাম। পাঁতি < পংক্তি—শ্রেণী।

শোভিছে আনন্দময়ী ইত্যাদি—বনের মধ্যে বৃক্ষাদির সু-উচ্চ শাখাপ্রশাখায় সংলগ্ন উজ্জ্বল

জোনাকি পোকার সারি বনভূমির ললাটস্থ মণিমাণিক্যখচিত উজ্জ্বল ও আনন্দজনক সীঁথিরূপে শোভা পাইতেছে। 'বনরাজী-ভালে' শব্দটি 'সমস্ত' পদ হওয়ায় 'আনন্দময়ী' শব্দটিকে 'বনরাজী' শব্দের পরিবর্তে 'পাঁতি' শব্দের বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইহাতে দূরান্বয় দোষ আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু মধুসূদনের রচনায় এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই।

কত যে ফুলের দলে ইত্যাদি—পুষ্পচয়ন করিতে যাইয়া পতির বিরহে প্রমীলা অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকায় তাহার অশ্রুবিন্দুগুলি স্বচ্ছ মুক্তাফলের ন্যায় অসংখ্য পুষ্পদলের উপর শোভিত হইতেছিল। অশ্রুর সহিত মুক্তার তুলনা সর্বদেশীয় কবিপ্রসিদ্ধি। তুলনীয়—

মুকুতা মণ্ডিত-বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! (৫ম সর্গ, ৫৬।৫৭)

"Decking with liquid pearl the bladed grass." (Midsummer Night's Dream—I.I)

মুক্তিল—মুক্তাদ্বারা শোভিত করিল। সূর্য্যমুখী দুঃখী—সূর্যমুখী সূর্যোদয়ে প্রস্ফুটিত হয় এবং সর্বদা সূর্যের অভিমুখীন থাকে। সূর্য অস্ত গেলে ফুলটি ম্লান হইয়া যায়। মিহির বিরহে—সূর্যের অভাবে। ভানুপ্রিয়ে—(সম্বোধনে) হে সূর্য-প্রেয়সী সূর্যমুখী ফুল! যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি—প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী যে মেঘনাদের লাবণ্যময় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমি প্রাণধারণ করি। অস্তাচলে আচ্ছন্ন—অস্তগত সূর্যের ন্যায় দৃষ্টিবহির্ভূত। আর কি পাইব আমি—এই কথাটির দ্বারা প্রমীলার হৃদয়ে আসন্ন বিপদে যে ছায়া ফেলিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উষার প্রসাদে—উষাই যেন দূতীরূপে সূর্য ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিবে। প্রাণেশ্বরে—সূর্যমুখীর হৃদয়েশ্বর সূর্যকে। অবচয়ি—চয়ন করিয়া, তুলিয়া। ফুল-চয়ে—পুষ্পসমূহকে; চয় সমূহার্থক শব্দ। স্বজনি—(সম্বোধনে) হে সখি। স্বজন = বান্ধব; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী।

মৃগরাজে—সিংহকে অর্থাৎ সিংহপরাক্রম মেঘনাদকে। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান মৃগরাজকেই উপমেয়রূপে উল্লেখহেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

চমূ—সৈন্য। প্রকৃত অর্থ হইতেছে একটি বিশেষ আয়তনের সেনাদল। ইহাতে ৭২৯ রথ, ৭২৯ গজ, ২১৮৭ অশ্ব এবং ৩৬৪৫ পদাতিক সেনা থাকিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম সেনাদলের নাম ছিল পত্তি এবং ইহার পরিমাণ ছিল ১ রথ, ১ গজ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতিক। ইহা হইতে ক্রমশঃ ত্রিগুণিত সেনাদলের নাম যথাক্রমে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ এবং অনীকিনী। বৃহত্তম সেনাদলের নাম ছিল অক্ষৌহিণী এবং ইহা দশটি অনীকিনীর সমবায়ে গঠিত হইত।

দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা—যমদণ্ডধারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী ইত্যাদি—পর্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত নদী যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে যায় তখন তাহার গতি ও বেগ হয় দুর্বার। সেইরূপ স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত প্রমীলার গতিও কেহ রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের সাধারণ-ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার না হইয়া দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। সাধারণ-ধর্ম এক এবং পরিস্ফুট হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইত। যেমন, "চারিদিকে সখীদল যত ... যবে তাপে বনস্থলী" (১৩—১৬ পংক্তি) বাক্যটিতে সাধারণ ধর্ম এক হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

ভিখারী রাঘবে—রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট অথচ দেবানুগৃহীত সাধারণ মানবরূপেই মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রিত করা হইয়াছে। কবি নিজেই একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "I hate Rama and his rabble" এবং "Ravana is a grand fellow, he fires me with enthusiasm." ইহার জন্য

কবিকে বহু বিরূপ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এককালে কবির এই উক্তির কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রকে হীন করিয়া রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রকে সমুন্নত ও সমুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করার কারণ তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণ এবং তজ্জনিত বিজাতীয় মনোভাব,—কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইলেও, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মধুসূদনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় তাঁহার রচনায় বহুস্থলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রামায়ণীয় চরিত্র সমূহের বিকৃতির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। কবির ঐশ্বর্যলুব্ধ মন রাজ্যচ্যুত জটাবল্কলধারী রামের মধ্যে পার্থিব সমৃদ্ধির কোন সন্ধান না পাইয়া স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা ব্যতীত, দৈব-বিড়ম্বিত রাবণের ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে তিনি গ্রীক্ সাহিত্যের নির্মম অদৃষ্টবাদকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিবার একটি অতি উপযুক্ত অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার কাব্যের মধ্যে রাবণ ও রাক্ষসগণের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র। একই বাক্যে একবার 'ভিখারী রাঘব' বলিয়া অবহেলা করিয়া পরমুহূর্তেই আবার 'নৃমণি' বলায় বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় "ব্যাহতত্ব দোষ" ঘটিয়াছে।

পরন্তপ—শত্রুদমনকারী; পর অর্থাৎ শত্রুকে ক্লেশ দিতে সমর্থ। পার্থ—পৃথার অর্থাৎ কুন্তীর পুত্র অর্জুন। নারীদেশে—কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে যজ্ঞাশ্বসহ অর্জুনের নারীরাষ্ট্র প্রমীলার দেশে উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। প্রমীলার নাম ও চরিত্র কল্পনায় মধুসূদন যে মূলতঃ কাশীরামের নিকট ঋণী, এই উপমাটি সেই ঋণের স্বীকৃতি।

দেবদত্ত শঙ্খ—অর্জুনের যুদ্ধ-শঙ্খের নাম। তিনি নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করিয়া ইন্দ্রের উপকার করায় ইন্দ্র তাঁহাকে ইহা উপহারস্বরূপ দান করেন।

বীরাঙ্গনা—নারীরাষ্ট্রের অধীশ্বরী প্রমীলার নারীবাহিনী। উথলিল < উৎ + স্থল—প্লাবিত করিল। চারিদিকে—প্রমীলার প্রমোদ কাননের সর্বত্র। কার্মুক—ধনুঃ। আস্ফালি ফলকপুঞ্জ—ঢালগুলিকে ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করিয়া। কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণময় পরিচ্ছদাদির দীপ্তি। কঞ্চুক—বহির্বাস, আলখাল্লা জাতীয় পোষাক। মধুসূদনের রচনায় বহুব্যবহৃত শব্দ। মন্দুরায়—অশ্বশালায়। হেষে < হ্রেষে—হ্রেষাধ্বনি করে। ক্রিয়াপদরূপে শব্দটির ব্যবহারে মধুসূদন সর্বত্রই 'র' বর্জন করিয়াছেন।

কিঙ্কিণীর বোলী—নূপুর ইত্যাদিতে সংলগ্ন ঘুঙুরের শব্দ।

মন্দুরায় হেষে অশ্ব ইত্যাদি—সাপুড়িয়ার ডমরুধ্বনির তালে তালে কালসর্প যেমন চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ বীরাঙ্গনাগণের অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণে অশ্বশালায় আবদ্ধ যুদ্ধের অশ্বগুলিও ঊর্ধ্বকর্ণ ও চঞ্চল হইয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। বারীমাঝে—হস্তিশালার অভ্যন্তরে।

নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—শান্ত উপবনের পর্বত, বন, গিরিগুহা প্রভৃতি স্থান অস্ত্রশস্ত্রের ও রণবাদ্যের শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এতকাল স্তব্ধ উপবনে প্রতিধ্বনি যেন সুপ্ত ছিল, এখন সে জাগিয়া উঠিল। সমান কার্য, সমলিঙ্গ ও সম-বিশেষণের সাহায্যে অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ধর্ম আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। প্রতিধ্বনির উপর সজীব পদার্থের সমান কার্য 'নিদ্রাভঙ্গ' আরোপ করায় এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

নৃমুণ্ডমালিনী—প্রমীলার অনুচরীগণের মধ্যে প্রধানা। উগ্রচণ্ডা—অতি কোপনস্বভাবা। অলিন্দ—বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ চত্বর বা বারান্দা। চেড়ী < চেটী, চেটিকা—অন্তঃপুররক্ষিণী দাসী।

অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি ইত্যাদি—প্রমীলার শত অনুচরী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে তাহাদের কটিবন্ধসংলগ্ন কোষবদ্ধ তরবারিসমূহ অশ্বসমূহের পার্শ্বদেশে বিলম্বিত

হইয়া অশ্বগণের অস্থিরতাহেতু কোষমধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

শীর্ষক-চূড়া—উষ্ণীষের অগ্রভাগ।

হাতে শূল ইত্যাদি—সুন্দরীগণের হস্তধৃত শূলগুলি তাহাদের সুগঠিত কোমল বাহুর পার্শ্বদেশ দিয়া ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। তাহাদের হস্তসমূহ পদ্মবৎ, বাহুসকল মৃণালবৎ এবং তাহাতে সংলগ্ন তীক্ষ্ণ শূল মৃণাল-কণ্টকবৎ।

বিরূপাক্ষ—শিব, মহাদেব।

দানব দলনী-পদ্ম-পদযুগ ইত্যাদি—দৈত্যদলনী কালীর পাদপদ্মদ্বয় বক্ষে ধারণ করিবার সুযোগ পাইয়া শিব যেমন আনন্দধ্বনি করেন, সুন্দরী অনুচরীগণ অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইলে তাহাদের স্পর্শসুখেই যেন অশ্বসমূহ সেইরূপ আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। বিরূপাক্ষের সহিত অশ্বের উপমা অত্যন্ত অসঙ্গত এবং হাস্যকর হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তন্ত্রে নিষ্ক্রিয় শিব শবাকারে দেবীর চরণতলে পতিত বলিয়া কল্পিত। সুতরাং দেবীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাঁহার আনন্দধ্বনিও তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম। এখানে অত্যন্ত স্থূল পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে। দিবে—স্বর্গে। দিব্ = স্বর্গ। রোষে—রামচন্দ্রের সৈন্য তাহার লঙ্কাপ্রবেশে বাধা দিবে,—সখী বাসন্তীর এই উক্তির জন্য ক্রোধে। লাজভয় ত্যজি—কুলনারী হইয়া পুরুষোচিত বীরবেশে বিপক্ষসৈন্যের ভিতর দিয়া যাইবার সঙ্কোচ ও ত্রাস পরিত্যাগ করিয়া।

কিরীট-ছটা ইত্যাদি—প্রমীলার ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির উপরে পরিহিত নানা রত্নখচিত মুকুটের উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর প্রতিফলিত ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈচিত্র্যের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠিল। অঞ্জনের রেখা—কজ্জল-রেখা, কাজলের তিলক।

লেখা ভালে ইত্যাদি—প্রমীলা কপালে কাজলের তিলক পরিয়াছিলেন। উহা দুর্গাদেবীর ললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় শোভিত ছিল। অঞ্জনের রেখা কালো হইলেও চন্দ্রকলার আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে। কেহ কেহ কাজলের টিপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার টিপের সহিত চন্দ্রকলার সাদৃশ্য কি? এখানে অঞ্জনের পরিবর্তে রঞ্জন শব্দ থাকিলে একটি অত্যন্ত চমৎকার উপমার সৃষ্টি হইত। রঞ্জন অর্থে রক্তচন্দন। প্রমীলা নিজের ললাটে রক্তচন্দনের অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিয়াছিলেন; বর্ণে ও আকারে উহা দুর্গাদেবীর ললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় শোভমান। মধুসূদন অন্যত্র রঞ্জন শব্দের সার্থক ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায় —

> "অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
> সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী
> রঞ্জনের রেখা।" (৪র্থ সর্গ, ৬২৮-৩০)

স্বর্ণ সারসনে—স্বর্ণখচিত মেখলা বা কটিবন্ধ। নিষঙ্গ—তূণীর। ফলক—ঢাল। রবির পরিধি হেন—উজ্জ্বলতায় সূর্যমণ্ডলস্বরূপ। কবচ—বর্ম।

বর্তুল যথা ইত্যাদি—স্থূল ও সুগোল উরুদ্বয় বনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ রক্তিমাভ 'রাম রম্ভা' (কদলী) বৃক্ষের ন্যায়। কালিদাসও উমার রূপবর্ণনায় কুমারসম্ভবে উরুর বর্ণনা প্রসঙ্গে 'রামরম্ভার' উল্লেখ করিয়াছেন—"নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদ্ একান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ।" (১।৩৬)

হৈমময়—হৈম বা হেমময়, স্বর্ণনির্মিত। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ। খরশান—তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট, সুশাণিত। হৈমবতী যথা ইত্যাদি—হিমালয় কন্যা দুর্গা দেবী প্রথমে মহিষাসুরকে এবং পরে অন্যরূপ ধারণ করিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন।

ডাকিনী যোগিনী সম ইত্যাদি—অসুরবধকালে দেবীর সহিত ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি অনুচরীগণ

বর্তমান ছিল; দেবীর ন্যায় মহিমময়ী প্রমীলার সহিতও তাহার একশত অনুচরী বর্তমান ছিল।

বড়বা নামেতে বামী—বড়বা ও বামী উভয় শব্দের অর্থই ঘোটকী। এস্থলে প্রমীলার ঘোটকীর নামই 'বড়বা'। বাড়বাগ্নিশিখা—সমুদ্রজলে প্রজ্বলন্ত শিখার নাম বাড়বাগ্নি, বড়বাগ্নি বা ঔর্বাগ্নি। প্রমীলার ঘোটকী 'বড়বা' সমুদ্র-জলস্থ ঔর্বাগ্নির ন্যায় চঞ্চলা ও তেজস্বিনী। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণ গর্ভবতী ঔর্ব-জননীর গর্ভনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে ঔর্ব মাতার উরু ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় রত হন। তাঁহার তপস্যার তাপে পৃথিবী দগ্ধ হইতে থাকিলে পিতৃলোক হইতে পিতৃগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তপস্যা ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি প্রতিজ্ঞাহানির ভয়ে তপস্যা হইতে বিরত হইতে অসম্মত হন। তখন পিতৃগণ বলেন যে, জলই সর্বভূতের জীবনস্বরূপ। সুতরাং জলে তাঁহার ক্রোধাগ্নি বিসর্জন করিলে তাঁহার সৃষ্টিধ্বংসের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইবে অথচ পৃথিবীও সমূলে ধ্বংস হইবে না। তখন ঔর্ব সমুদ্রে ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করেন। সেই অগ্নি অশ্বমুণ্ডের আকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্রজল শোষণ করিতে থাকে। তাই ইহার নাম 'বাড়বাগ্নি'।

কাদম্বিনী—মেঘমালা। নিতম্বিনী—শোভন নিতম্ব বা শ্রোণীদেশ যে নারীর; সুন্দরী। বিকট কটক কাটি—দুর্ধর্ষ শত্রু-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া। জিনি—জয় করিয়া।

দ্বিষৎ-শোণিত-নদে ইত্যাদি—যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়া যদি মরিতেই হয়, তবে শত্রুর রক্ত-স্রোতের মধ্যে ডুবিয়া অর্থাৎ বহু শত্রু-সৈন্য বিনাশ করিয়া মরাই আমাদের ধর্ম।

অধরে ধরিলো মধু, ইত্যাদি—আমরা নারী এবং অন্তঃপুরবাসিনী; পুরুষের মন মুগ্ধ করিবার জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন অধরসুধা এবং নয়নের কটাক্ষ হইলেও আমাদের মৃণালবৎ কোমল বাহু একেবারে বলশূন্য নহে। পিসী < পিউসী < পিতৃস্বসা—রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা মেঘনাদের পিসী, সুতরাং প্রমীলার পিসী-শাশুড়ী।

মাতিল মদন মদে—বীররসের মধ্যে আদিরসের সমাবেশে "বিরুদ্ধ-রসভাব" দোষ হইয়াছে।

বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে—দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী বলিয়া বিভীষণের প্রতি কবির মন অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রামায়ণে বিভীষণ সত্যসন্ধ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হইলেও তাঁহার চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটিও লোকে যে একেবারে ভুলিতে পারে নাই, "ঘর-সন্ধানী বিভীষণ" এই প্রবাদবাক্যটি তাহার প্রমাণ। মধুসূদন বিভীষণ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী উপেক্ষা করিয়া তাঁহার চরিত্রের এই নিন্দনীয় দিকটিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে "scoundrel Vibhisana" আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রমীলার 'রক্ষঃ-কুলাঙ্গার' তিরস্কার 'scoundrel Vibhisana' এরই প্রতিধ্বনি।

মাতঙ্গিনী < মাতঙ্গী—হস্তিনী। ইন্‌ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে —ইনী প্রত্যয়।

হুহুঙ্কার—প্রচণ্ড হুঙ্কার বা গর্জন। যথা বায়ু সখা সহ ইত্যাদি—অগ্নির সখা বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে যেরূপ বনদগ্ধকারী অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া উঠে। ঘন ঘনাকারে—ঘন মেঘবৎ। রেণু—ধূলি।

কিন্তু নিশাকালে ইত্যাদি—যেমন রাত্রিকালে ধূমরাশি দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আবৃত হয় না, তেমনই প্রমীলা দলবলসহ অশ্বারোহণে যাত্রা করিলে তাহাদের অশ্বের গতিবেগে প্রচুর ধূলি উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিলেও, তাহা ভেদ করিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রমীলার প্রদীপ্ত রূপজ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ উপমেয় ধূলিপুঞ্জ ও প্রমীলার উজ্জ্বল রূপের সহিত উপমান ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিশিখার সাদৃশ্য পৃথক্ বাক্যে ব্যক্ত হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

বামা-বল-দলে—নারী-সৈন্যগণের সহিত। পশ্চিম দুয়ারে—কারণ, এই দ্বারেই রামচন্দ্রের শিবির

অবস্থিত। নিষাদী—হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সৈনিক। সাদিবর—শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈনিক। অবরোধে—অন্তঃপুরে।

কাঁপিল মাতঙ্গে ... কুলবধূ—একই 'কাঁপিল' ক্রিয়ার সহিত 'নিষাদী', 'রথী', 'সাদিবর', 'রাজা' এবং 'কুলবধূ' শব্দের অন্বয় হওয়াতে এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হইয়াছে। পরের বাক্যটিতেও সেইরূপ। পবন-নন্দন হনূ—হনুমান পবনদেবের ঔরসে অঞ্জনানাম্নী বানরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হনু ও হনূ উভয় বানানই প্রচলিত। গরজি কহিলা—ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল। জাগে—সতর্কভাবে পাহারায় রত।

কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ইত্যাদি—হনুমান মনে করিয়াছিল যে, মায়াবী রাক্ষসগণ মায়াবলে নারীবেশ ধারণ করিয়া রামসৈন্যকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে। কিন্তু হনুমান বাহুবলে রাক্ষসগণের সকল মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতেছে। কোদণ্ড—ধনুঃ।

বর্ব্বর—বর্বর ও ক্ষুদ্রজীবী শব্দদ্বয়ের সাহায্যে কিষ্কিন্ধ্যাবাসী হনুমানের প্রতি নৃমুণ্ডমালিনীর অপরিসীম ঘৃণা ব্যক্ত হইয়াছে। কবিও রামসৈন্যকে "rabble" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য একখানি পত্রেও কবি প্রসঙ্গক্রমে রামের বানর সৈন্যের প্রতি বিরূপভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "By the bye, if the father of our Poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad." মেঘনাদবধ কাব্যে মানবিকতা (human interest) একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই মানবিকতার জন্যই রামায়ণ-কল্পিত দেবাংশ-সম্ভূত রাম-লক্ষ্মণাদির, এবং কদাচার ও কুক্রিয়াসক্ত বীভৎসাকৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীগণের অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং মানবেতর বন্য বানরগণ কবির সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই কাব্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি কুত্রাপি লাঙ্গুলযুক্ত বানর বলিয়া চিত্রিত হয় নাই,—তাহারা অসভ্য বন্য মানবরূপেই কবিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।

কোন যোধ-সাধ্য—কোন যোদ্ধা সমর্থ? পাবনি—পবনদেবের পুত্র হনুমান। রঙ্গে—বিচিত্র বীরভূষায় ভূষিত ও স্ব-গর্বে অবস্থিত। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম ইত্যাদি—প্রমীলার সুন্দর উজ্জ্বল দেহের প্রভায় সুবর্ণময় বর্ম সূর্যকিরণদীপ্ত মণিমাণিক্যাদির ন্যায় ঝলমল করিতেছে। খর্পর খণ্ডা হাতে—দুই হস্তে রুধির-পাত্র এবং খড়্গধারিণী।

মুণ্ডমালী < মুণ্ডমালিনী—নরমুণ্ডমালাধারিণী। ছন্দের অনুরোধে ইন্-ভাগান্ত মালিন্ শব্দে ইন্ প্রত্যয় লুপ্ত করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে -ঈ-প্রত্যয় করা হইয়াছে।

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি—মন্দোদরী ময়দানবের কন্যা।

কিন্তু নাহি হেরি ইত্যাদি—প্রমীলার রূপ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভীষণতা ও মধুরতার এমন একটি অপূর্ব মিশ্রণ দৃষ্ট হয় যে, ভয়ঙ্করী চণ্ডীর ভীষণত্ব এবং মন্দোদরাদি রাবণ-মহিষীগণের সৌন্দর্য,—এমন কি, স্বয়ং সীতার অনবদ্য রূপ-মাধুর্যও যেন তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

রঘুকুল-কমলেরে—রঘু-বংশরূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপা সীতাকে। রঘুকুলকে সরোবর কল্পনা করিয়া সীতাকে উহার কমলরূপে কল্পনা করায় লুপ্ত-রূপক অলঙ্কার।

হেন সৌদামিনী—এইরূপ বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী প্রমীলা। এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। অকালে—গভীর নিশীথে। প্রসাদ—অনুগ্রহ। বিবাদি—বিবাদ করি (নামধাতু)।

যে বিদ্যুৎ-ছটা রমে আঁখি—প্রমীলা ও তাঁহার অনুচরীগণ সকলেই কুলরমণী এবং অপূর্ব সুন্দরী। বিদ্যুৎ রূপে নয়ন-রঞ্জন হইলেও যেমন তাহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণ অতুলনীয় সৌন্দর্য-বিশিষ্ট হইলেও প্রয়োজনস্থলে তাহারা শত্রু নিধনেও

সমর্থ। নৃমুণ্ডমালিনী দূতী ইত্যাদি—দৈহিক সৌন্দর্য-বিশিষ্টা হইলেও তেজস্বিতায় নরমুণ্ডমালাধারিণী চামুণ্ডার ন্যায় ভয়োদ্রেক-কারিণী নৃমুণ্ডমালিনী নাম্নী প্রমীলার অনুচরী।

গরুৎমতী তরি—পালবিশিষ্ট নৌকা। গরুৎ = পক্ষ আছে যাহার গরুত্মান্, তরির বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে গরুত্মতী। তরি ও তরী উভয় রূপই শুদ্ধ। নিকর—সমূহ।

অকূল সাগর জলে ভাসে একাকিনী—পাল-দেওয়া-নৌকা যেমন অবলীলাক্রমে অকূল সমুদ্রবক্ষে সমুদ্র-তরঙ্গগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ নৃমুণ্ডমালিনীও সাগর সদৃশ বিশাল রাম সৈন্যব্যূহের ভিতর দিয়া অনায়াসে অগ্রসর হইয়া চলিল।

চমকে গৃহস্থ যথা ইত্যাদি—নৃমুণ্ডমালিনীর ত্রাসজনক ভীষণ রূপ অকস্মাৎ নয়নগোচর হওয়ায় গভীর নিশীথে হঠাৎ ঘরে আগুন লাগিতে দেখিলে গৃহবাসী যেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, রামের বীর সেনাগণেরও সেইরূপ অবস্থা হইল।

ভামিনী—কোপনস্বভাবা স্ত্রী। ভাম = ক্রোধ। হাসিলা ভামিনী মনে মনে—তাহাকে দেখিয়া রঘুসৈন্য যে বিস্মিত ও ভীত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া। দড়ে রড়ে—দৃঢ় অথচ দ্রুতপদে। কাঞ্চী—মেখলা, কটিহার। জরজরি সর্ব্বজনে ইত্যাদি—নৃমুণ্ডমালিনীর আকৃতি বীরত্বের আধিক্যহেতু পরুষ ও ত্রাসজনক হইলেও তাহার দৈহিক সৌন্দর্যও মনোমুগ্ধকর। শিরোপরি—শিরঃ + উপরি, মস্তকোপরি; সন্ধি সমর্থনীয় নহে।

চন্দ্রক-কলাপময়—উজ্জ্বল চক্রসমূহ শোভিত ময়ূরপুচ্ছনির্মিত। চন্দ্রক = ময়ূরপুচ্ছস্থ উজ্জ্বল চক্রসমূহ। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। কলাপ— ময়ূরপুচ্ছ। ধকধকে—পীনোন্নত বক্ষের উত্থান-পতনের জন্য ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। রত্নাবলী—রত্নহার। পীবর—স্থূল।

দুলিছে পৃষ্ঠে ইত্যাদি—নৃমুণ্ডমালিনীর দৈহিক শোভা ও বেশভূষাবর্ণন-প্রসঙ্গে তাহার পৃষ্ঠবিলম্বিত বেণীকে বসন্ত ঋতুতে সঞ্চালিত 'কামের পতাকা'র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এক টীকাকার 'কামের পতাকা' অর্থে 'মদনের নিশান অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন' লিখিয়াছেন। কিন্তু 'মধুকালে' শব্দের দ্বারা কবি কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর সহিতই বেণীর তুলনা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত অভিধানে কাম, কামায়ুধ, কামাঙ্গ, কামফল প্রভৃতি আম্রবাচক শব্দ। পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান বেণীর সহিত বায়ুভরে আন্দোলিত নবপল্লবের চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে 'কামের পতাকা' অর্থে বসন্তকালে প্রস্ফুটিত এবং বায়ুভরে আন্দোলিত আম্রপল্লব অর্থ গ্রহণই সঙ্গত। তুলনীয় : "সে অঞ্চল.................পীন-স্তনোপরে

.... কামসখা

বসন্ত হিমান্তে তারে উড়ায় কৌতুকে" (তিলোত্তমাসম্ভব ১।৩৫৮-৬০)

কৌমুদী যেমতি ইত্যাদি—নির্মল জলপূর্ণ সরোবরে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নার ন্যায়, অথবা উন্নত পর্বত-শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে আবির্ভূত উষার উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় নৃমুণ্ডমালিনী রামচন্দ্রের বিশাল ও স্তব্ধ সৈন্যদলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

করপুটে—যুক্তকরে। রুদ্রকুল সমতেজঃ—বলে একাদশ রুদ্রতুল্য। দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ—দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত দৈবাস্ত্রসমূহ। পীঠোপরি—উচ্চ আসনের বা বেদীর উপর। পীঠ, পীঠিকা > পীঁড়ি। রঞ্জিত রঞ্জনরাগে—দৈবাস্ত্র বলিয়া সেগুলিকে উন্নত আসনে স্থাপন করিয়া রক্তচন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধূপ-দীপ প্রজ্বালিত করা হইয়াছে। দেউটি < দীবট্টিআ < দীপবর্তিকা—প্রদীপ। বাখানেন—ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশংসা করেন। চর্ম্মবর—বিশালায়তন ঢাল। সুবর্ণ মণ্ডিত যথা ইত্যাদি—বিশাল ঢালটি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সুবর্ণ-খচিত বলিয়া দিবাবসানে সূর্য-কিরণে রঞ্জিত মেঘের

ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

কেহ বাখানেন ... কেহ বর্ম্ম তেজোরাশি—একই ক্রিয়াপদ বাখানেন দ্বারা বহু শব্দ অন্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার। তেজোরাশি—অত্যন্ত দীপ্তিশালী, ভাস্বর। বর্মের বিশেষণ। পিনাক—হরধনুঃ। "পিনাকোঽজগবং ধনুঃ"—(অমরকোষ)। ঠাট—সৈন্যদল। রক্ষোরথী—রামশিবিরে অবস্থিত একমাত্র রাক্ষস বিভীষণ।

চেয়ে দেখ রাঘবেন্দ্র ইত্যাদি—শিবিরের সন্নিকটে অকস্মাৎ অপূর্ব রূপজ্যোতিঃসম্পন্না নৃমুণ্ডমালিনীর আবির্ভাব হওয়াতে বিভীষণ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া সংশয় প্রকাশ করিতেছেন যে, এই গভীর নিশীথেই কি স্বয়ং উমাদেবীর অকালে আবির্ভাব হইল! উপমেয় ও উপমান উভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য যেখানে এরূপ সংশয় কাব্যোচিত চমৎকারিত্বের সহিত প্রকাশিত হয় সেস্থলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। সন্দেহ প্রকৃত হইলে অলঙ্কার হয় না। এ স্থলে নৃমুণ্ডমালিনীর উল্লেখ না থাকিলেও, উপমেয় সুন্দরী নৃমুণ্ডমালিনী এবং উপমান উমা উভয়পক্ষেই সন্দেহ পরিব্যক্ত হওয়ায় অতি চমৎকার অলঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে।

ইন্দ্রজাল—মায়া, কুহক। কামরূপী তবাগ্রজ—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ পরম মায়াবী। এ দুর্ব্বল বলে—সৌভাগ্যবশতঃ নানাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে মায়াবী রাক্ষসগণের তুলনায় দুর্বল আমার সেনাগণকে। ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে—ছত্রিশ রাগিণীর সুরমাধুর্যকে একটি সুরে ঘনীভূত করিয়া; অর্থাৎ অত্যন্ত মধুর স্বরে। তাঁর দাসী—আমি নৃমুণ্ডমালিনী, মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার দাসী। সুধিলা—জিজ্ঞাসা করিলেন। ভর্ত্রিণী < ভর্ত্রী—স্বামিনীর সাদৃশ্যে-ইনি প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ। পরেই ৩৪০ পংক্তিতে 'ভর্ত্রী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভীমারূপী—চণ্ডিকা দেবীর ন্যায় বীরবেশধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী।

রূপসী—রূপবতী, অর্ধতৎসম শব্দ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন যে, সম্ভবতঃ রূপ আছে এই অর্থে 'শ' প্রত্যয়-যোগে রূপশ এবং তাহা হইতে স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। সরসী, তাপসী ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্যে রূপসী। মধুসূদন পুংলিঙ্গে রূপস শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন : "রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি ...." (৮ম সর্গ।৪৫০)

চিত্রবাঘিনী < চিত্রব্যাঘ্রী—বাঘের স্ত্রীলিঙ্গে বাঙ্গালা -ইনী-প্রত্যয়যোগে বাঘিনী পদ নিষ্পন্ন।

কিরাতিনী < কিরাতী—কিরাত বা ব্যাধজাতীয়া নারী। ছন্দের অনুরোধে -ইনী-প্রত্যয়।

প্রফুল্ল কুসুম যথা—প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্যে কোমল সৌন্দর্য ব্যতীত অন্যভাবের অনস্তিত্ব থাকায় বীর্যবতী নৃমুণ্ডমালিনীর উপমারূপে প্রয়োগটি সার্থক হয় নাই।

নোমাইয়া—নোয়াইয়া, নত করিয়া। প্রবেশ—(অকারান্ত করিয়া পঠনীয়) প্রবেশ কর।

রঘুরাজকুলে—দিলীপপুত্র দিগ্‌বিজয়ী রঘুর বংশে। বীরের বংশে জন্ম, সুতরাং ভাগ্যদোষে বনবাসী হইলেও বীরের ও বীরাঙ্গনার সম্মান রক্ষা করিতে জানি—এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে।

ললনে—(সম্বোধনে) হে নারি। বীরপণা—বীরত্ব; সংস্কৃত -ত্বন প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন-পণা (-পনা) প্রত্যয়যোগে বাঙ্গালা গুণবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। পরিহার—উপেক্ষা, দোষের জন্য ক্ষমা। প্রসাদ—উপহার। বলি—(সম্বোধনে) হে শক্তিমান্!

ভীমারূপী ইত্যাদি—ভীমারূপে আবির্ভূতা চামুণ্ডা দেবীর ন্যায়। ভীষণাকৃতি রুদ্র বা শিবের নামান্তর ভীম, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী ভীমা।

রক্তবীজকুল-অরি—শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনানী রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তপাত হইলে প্রতি রক্তবিন্দু

হইতে রক্তবীজের ন্যায়ই পরাক্রমশালী একটি করিয়া দৈত্য উৎপন্ন হইতেছিল। সেই অসুরগণদ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন হইতে চলিল দেখিয়া দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলে, দুর্গাদেবী চামুণ্ডাদেবীকে বদনবিস্তারপূর্বক রক্তবীজের শোণিত পান করিতে বলেন। এইরূপে চামুণ্ডা কর্তৃক পীত-শোণিত রক্তবীজ রক্তক্ষয়হেতু দুর্বল হইয়া অবশেষে দুর্গাদেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়।

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে—নৃমুণ্ডমালিনীকে দেখিয়া রামের ভীতির চেয়ে বিস্ময়ই যে বেশি হইয়াছিল, দূতীর সহিত ধীর, সংযত ও শিষ্ট আলাপনে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে রামচন্দ্রের মুখে 'ডরিনু' ও 'যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিনু' বাক্য দুইটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বীরাঙ্গনাগণের বীরত্বের প্রশংসাসূচক বাগ্‌ভঙ্গি হিসাবেই অর্থ করা উচিত। মধুসূদন রামচন্দ্রের প্রতি সর্বত্র সুবিচার না করিলেও অন্ততঃ এস্থলে কোন অবিচার করেন নাই। এই উক্তির ভিতর দিয়া বরং রামচন্দ্রের বীররমণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসামূলক মনোভাবই (chivalry) প্রকটিত হইয়াছে।

বিভারাশি নির্ধূম আকাশে—দাবানলে অগ্নির সহিত ধূম বর্তমান থাকে; কিন্তু প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণের অপূর্ব রূপচ্ছটায় আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে রূপালোক নির্ধূম।

ঘোড়া দড়বড়ি—অশ্বের দ্রুতগমন শব্দ।

সে রোলের সহ মিশি—ভীষণ অস্ত্রের শব্দ ও অশ্বপদধ্বনির সহিত মধুর রণবাদ্য মিলিত হইয়া যেন ঝড়ের ভীষণ গর্জনের সহিত শ্রুতিমধুর কোকিল রবের সংমিশ্রণ হইল।

রত্ন-সঙ্কলিত-আভা—নানারত্ন হইতে নিষ্পন্ন অপূর্ব দীপ্তি সমন্বিত। পতাকার বিশেষণ।

আস্কন্দিতে—দুলকি চালে। বোলিছে—শব্দিত হইতেছে। ঘুঙ্ঘুরাবলী—অলঙ্কারাদি-সংলগ্ন ঘন্টিকাসমূহ, ঘুঙুরগুলি। ঘুনু ঘুনু বোলে—রুনু-ঝুনু শব্দে।

উপত্যকা পথে—দুইটি উন্নত পর্বতের মধবর্তী নিম্নদেশস্থ পথে। দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান সৈন্যশ্রেণীর সহিত পর্বতের তুলনা করা হইয়াছে। গরজে—গর্জনশব্দে, বৃংহণ বা বৃংহিতধ্বনিতে। কৃষ্ণ হয়ারূঢ়া—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের উপর অবস্থিতা। হৈমময় < হৈম বা হেমময়—স্বর্ণনির্মিত। ব্যাকরণদুষ্ট পদ। বিদ্যাধরী—কিন্নর বা গন্ধর্ববৎ দেবযোনি বিশেষকে বিদ্যাধর বলে। ইহারা রূপের জন্য প্রসিদ্ধ। নিক্বণে—শব্দে। তারার দলে শশিকলা যথা—রূপের আধিক্যহেতু তারাসমূহের মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রের ন্যায় দর্শনীয়।

রতন-সম্ভবা বিভা—পরিহিত অলঙ্কারাদি-সংলগ্ন রত্নসমূহ হইতে নির্গত দীপ্তি।

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি—প্রমীলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া কামদেব ঘন ঘন ফুলশর বর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন, যাহাতে স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছা প্রমীলার মনে তীব্রতর হয়। জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা আছে—

> "Fast by her side unseen smil'd Venus' son,
> As erst he laughed when Alcides spun." (Book VI—92)

খগেন্দ্রে—গরুড়পৃষ্ঠে। সিংহপৃষ্ঠে যথা মহিষমর্দিনী দুর্গা ... বড়বার পিঠে—প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত একাধিক উপমা প্রয়োগে মালোপমা অলঙ্কার হইয়াছে। বামী-ঈশ্বরী—ঘোটকীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। শিঞ্জিনী—জ্যা, ধনুকের ছিলা। টিটকারি < ধিক্কার—উপহাস করিয়া। হাসিলা কেহ বা ইত্যাদি—স্ত্রীলোকের শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া ভয়ে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করার জন্য।

কি আশ্চর্য্য নৈকষেয় ইত্যাদি—প্রমীলার অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ সাহস দর্শনে রামচন্দ্র বিস্ময়াভিভূত হইয়া নিকষাপুত্র বিভীষণকে বলিতেছেন যে, ত্রিভুবনে নারীর এইরূপ রূপ ও সাহস দেখেন নাই, শুনেনও নাই। প্রপঞ্চ—মায়া, ইন্দ্রজাল।

চিত্ররথ-রথি-মুখে ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গের শেষাংশে গন্ধর্বপতি চিত্ররথ ইন্দ্রাদেশে রামশিবিরে দৈবাস্ত্রসমূহ পৌঁছাইয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, পরদিন প্রভাতে মায়াদেবী আবির্ভূত হইয়া মেঘনাদবধকার্যে লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবেন। দেবী কি তবে প্রমীলার ছদ্মবেশে আসিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন? ইহাই রামের জিজ্ঞাস্য। প্রমীলার মহিমময় রূপদর্শনে বিস্মিত রাম তাহাকে সামান্যা স্ত্রীলোক মনে না করিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী বলিয়াই মনে করিতেছেন।

কালনেমি—মধুসূদন-কল্পিত দৈত্যবিশেষ, প্রমীলার পিতা। মহাশক্তি—আদ্যাশক্তি, শিবানী। দম্ভোলি-নিক্ষেপী—বজ্র-নিক্ষেপকারী। সহস্রাক্ষে সহস্র নেত্র ইন্দ্রকে। যে হর্য্যক্ষ—যে সিংহ, অর্থাৎ সিংহপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ।

সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র ইত্যাদি—বিভীষণ রামকে বলিতেছেন যে, কালী যেরূপ শিবকে নিজের বশীভূত করিয়া আপন পদতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে মনোমোহিনী প্রমীলা নিজের সৌন্দর্যে বশীভূত করিয়া পদতলে স্থাপন করিয়াছে। ১১০-১১৩ পংক্তিতে যেরূপ মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উপমায় পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে এখানেও প্রায় তদ্রূপ।

এ নিগড়ে—প্রণয়ের শৃঙ্খলস্বরূপ এই প্রমীলাকে।

মদকল কাল হস্তী—মদমত্ত সর্বধ্বংসী হস্তিস্বরূপ সমগ্র জগতের উপদ্রবকারী মেঘনাদ।

এ কালাগ্নি—প্রলয়াগ্নির ন্যায় জগতের ধ্বংসকারী মেঘনাদ।

যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—অতি ক্রূর ও প্রাণবিনাশক কালীয়নাগ যমুনার স্নিগ্ধ জলে ডুবিয়া থাকে বলিয়া যেরূপ প্রাণিগণ তাহার দংশন হইতে অব্যাহতি পায়, সেইরূপ মেঘনাদরূপ কালসর্পও প্রমীলার স্নিগ্ধ ও সুরভিত প্রেমনীরে মগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে সকল লোক নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে।

ত্রিদিবে—স্বর্গে, 'ত্রয়ো দিব্যন্তি অত্র'—ত্রিদিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দে বাস করিবার স্থান। না দেখি এ হেন শিক্ষা ইত্যাদি—কারণ, রামচন্দ্র ইতঃপূর্বে দুইবার মেঘনাদহস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ভৃগুরাম—ভৃগুবংশীয় রাম, পরশুরাম। ভৃগুমান গিরিসদৃশ—উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় অটল। এ মৃগপালে—সিংহ-বীর্য মেঘনাদের পরাক্রমের তুলনায় তুচ্ছ ও দুর্বল হরিণদলের ন্যায় রামসৈন্যকে।

উথলিছে চারিদিকে—আমি একেই ত বিপদ সাগরে মগ্ন,—এখন আবার মহাবীর মেঘনাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণে এবং মেঘনাদসহ মহাবীর্যবতী প্রমীলার সম্মেলনে সেই বিপদসমুদ্র হলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল;—অর্থাৎ বিপদের মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

নীলকণ্ঠ—সমুদ্রমথনোত্থিত হলাহলপানে নীলবর্ণ কণ্ঠবিশিষ্ট শিব। নিস্তারিণী—জগতের ত্রাণকর্ত্রী শিবানী। নিস্তারিলা ভবে—বিষপান করিয়া সমুদ্রমথনজাত হলাহলের দাহ-জ্বালা হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রকারে- -যে কোন কৌশলে। সফল তবে মনোরথ হবে—সীতার উদ্ধাররূপ মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। সুরনাথ—দেবরাজ ইন্দ্র।

লাভে—লাভ শব্দ হইতে প্রথম পুরুষে নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ। সাধারণ প্রয়োগে 'লভে'।

লঙ্কার পঙ্কজরবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কথাটি মধুসূদন বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। "লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি", অথবা "লঙ্কা-পঙ্কজের রবি" সমাস হিসাবে দোষহীন হইত। আসক্তি-অনুসারে প্রথমে লঙ্কারূপ পঙ্কজ এই কর্মধারয় সমাস না করিয়া পঙ্কজের সহিত রবি শব্দের সমাস সমর্থনীয় নহে। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণেও এই জাতীয় সমাসের অপ্রাচুর্য নাই। এইরূপ স্থলে "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" স্বীকার করা হয়। এই প্রয়োগটিকেও এইভাবে সমর্থন করা যায়।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠার্থে কুঞ্জর শব্দের সহিত উপমিত সমাস।

ভীমা—ভীষণা, ভয়ঙ্করী (বিশেষণ)।

নিশায় পাইলে রক্ষা মারিবে প্রভাতে—ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়া দৈবাস্ত্র প্রেরণকালে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, প্রভাতে মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিবেন। দেববাক্য মিথ্যা না হইতে পারে; কিন্তু প্রমীলা আসিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হওয়ায় রামপক্ষীয়গণের বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে যদি প্রমীলাসহ মেঘনাদ আসিয়া ধ্বংস না করে, তবেই দৈবাস্ত্র-সাহায্যে প্রভাতে মেঘনাদকে বধ করা যাইবে।

অঙ্গদ—কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ, বালির পুত্র এবং সুগ্রীবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

নীল—অগ্নির অংশে জাত রামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ বানর সেনানী। মিতা < মিত্র—বন্ধু।

উর্ম্মিলাবিলাসী শূরে—উর্ম্মিলাপতি বীর লক্ষ্মণকে।

সুরপতিসহ ইত্যাদি—বিভীষণ যখন লক্ষ্মণকে লইয়া লঙ্কার চারি দ্বার পর্যবেক্ষণ করিতে বহির্গত হইলেন, তখন মনে হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং তারকাসুরের বধকর্তা কার্ত্তিকেয়, অথবা সূর্য এবং চন্দ্র একত্র বিরাজমান হইলেন। উপমেয় বিভীষণ ও লক্ষ্মণকে শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ উপমান ইন্দ্র ও কার্ত্তিকেয় এবং সূর্য ও চন্দ্র বলিয়া উৎকট সংশয়হেতু এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ত্বিষাম্পতি—সূর্য, ত্বিষ (ত্বিট্) শব্দের অর্থ কিরণ, ত্বিষাম্ (কিরণসমূহের) পতি, ষষ্ঠী অলুক্ সমাস।

সুধানিধি—সুধা অর্থাৎ অমৃতের আশ্রয়স্থল চন্দ্র। সমুদ্রমথনলব্ধ অমৃত চন্দ্রে স্থাপিত হইয়াছিল।

বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি ঘোররবে—অবরুদ্ধ লঙ্কার দ্বারে সশস্ত্র অনুচরীগণ-সহ প্রমীলার আকস্মিক আবির্ভাবকে শত্রুর অতর্কিত আবির্ভাব মনে করিয়া লঙ্কার রাক্ষস-প্রহরিগণ সতর্কতাসূচক শৃঙ্গ ও ভেরী নিনাদ করিয়া উঠিল।

বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, প্রমত্ত—রাক্ষস সেনানীগণের নাম। প্রক্ষেবড়ন—লৌহময় বাণ বা নারাচ অস্ত্র। দুরন্ত—প্রচণ্ড শক্তিমান। কৌন্তিককুল—কুন্ত অর্থাৎ ভল্ল বা বল্লম জাতীয় অস্ত্রধারী সৈনিকগণ। অগ্নিময় আকাশ—উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে অতি ভাস্বর আকাশ। ভীরু—কাপুরুষ; ভয়হেতু প্রকৃত বিষয় বুঝিতে অক্ষম, দিশাহারা ব্যক্তি। হুড়ুকা < হুড়ুক্ক—দ্বারের অর্গল। আবলী (আবলি)—সমূহ। পৌরজন—পুরবাসী; পুর + ষ্ণ্য (বিশেষণ) হুলাহুলি—মাঙ্গল্যসূচক হুলুধ্বনি। বরষি কুসুমসারে—প্রচুর পুষ্পবর্ষণ করিয়া। আসার = বৃষ্টিধারা। বন্দী—বন্দনাকারী, স্তুতি পাঠক। অবরুদ্ধার্থক ফারসী শব্দ 'বন্দী' বা 'বিন্দি' হইতে স্বতন্ত্র তৎসম শব্দ।

চলিলা অঙ্গনা ইত্যাদি—নিবিড় বনের অসংখ্য বৃক্ষাদির মধ্যে যেমন দাবানলের লেলিহান শিখাগুলি উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ লঙ্কাপুরীর জনপূর্ণ রাজপথ দিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল রূপবিশিষ্টা প্রমীলা অনুচরীবৃন্দসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একজন টীকাকার লিখিয়াছেন, "নিবিড় কানন অন্ধকারব্যঞ্জক।" কিন্তু এখানে লঙ্কার রাজপথে প্রমীলার অভ্যর্থনার জন্য চারিদিক হইতে উৎসুক লোকের সমাবেশ এবং গবাক্ষদ্বার খুলিয়া পুরনারীগণের প্রমীলার অপূর্ব বেশভূষা অবলোকন প্রভৃতি বর্ণনা দ্বারা রাজপথের অন্ধকার সূচিত হওয়া অসম্ভব। ইহা ছাড়াও,

"শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূমশূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।" (৫৬১-৬৩ পংক্তি)

লঙ্কার সমুজ্জ্বলতাসূচক এই উপমাটিও অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্য উপায়ে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "নিবিড় কানন" এস্থলে বৃক্ষগুল্মাদির ঘন সন্নিবেশসূচক। অসংখ্য বৃক্ষপূর্ণ অরণ্যের

ন্যায় লঙ্কার রাজপথ প্রমীলার দর্শনোৎসুক অসংখ্য জনগণ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল।

বাদ্যকরী বিদ্যাধরী—বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দরী ও বাদ্যনিপুণা বাদ্যকরী।

পিধানে—আবরণ বা কোষের মধ্যে। অপি + ধা + ন। ভাগুরি নামক বৈয়াকরণের মতে 'অব' এবং 'অপি' উপসর্গদ্বয়ের আদ্য 'অ' লুপ্ত হয়; যথা পিহিত, পিনদ্ধ, বগাহন ইত্যাদি।

মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে—প্রসিদ্ধি আছে যে, কালসর্পের মস্তকে মণি থাকে, এবং কোনক্রমে উহা স্খলিত হইলে সর্প অত্যন্ত ব্যাকুল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। প্রমীলাও পতি-বিরহে এতক্ষণ মণিভ্রষ্ট সর্পের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; এক্ষণে মেঘনাদের পুনর্দর্শনে সে যেন পুনর্জীবন লাভ করিল।

কৌতুকে—প্রমীলার বীরবেশ দর্শনে পরিহাসচ্ছলে। ভব-বিজয়িনী—পৃথিবীর সর্বত্র জয়লাভে সমর্থা। মনমথে < মন্মথে—কামদেবকে। তেঁই < তেঞ্চি < তেন < তেন কারণেন —সেইহেতু।

পশিল সাগরে আসি ইত্যাদি—নদীর শেষ গতি যেমন সমুদ্র, সেইরূপ সতীর শেষ আশ্রয়স্থল হইতেছেন পতি। প্রমীলার উক্তির অর্থ এই যে, সাগর-সঙ্গমে নদী যেমন তাহার পূর্ণতা লাভ করে এবং তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেইরূপ আমিও স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারিয়া চরিতার্থতা লাভ করিলাম।

দুকূলে—ক্ষৌম বা রেশমী বস্ত্র; শুভ্র বসন। রতনময় আঁচল—রত্নখচিত অঞ্চলবিশিষ্ট, দুকূলের বিশেষণ। কাঁচলি < কঞ্চুলিকা—স্ত্রীলোকের বক্ষোদেশ আবরক বস্ত্র, bodice. পীন—স্থূল। শ্রোণিদেশে—কটিদেশে, নিতম্বে। শ্রোণি ও শ্রোণী উভয় রূপই প্রচলিত। ভাতিল মেখলা—রত্নখচিত সমুজ্জ্বল কটিহার শোভিত হইল। উরসে (উরঃ)—বক্ষঃস্থলে। জ্বলিল ভালে—ললাটে উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান হইল।

তারাগাঁথা সিঁথি—তারার ন্যায় উজ্জ্বল মণিদ্বারা ভূষিত সীমন্তের অলঙ্কার, tiara

অলকে—গণ্ডদেশ ও ললাটস্থ চূর্ণকুন্তলের বা অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছের মধ্যে।

দম্পতী—স্বামি-স্ত্রী; দ্বিবচনবাচক শব্দ বলিয়া 'দম্পতী' বানানই সঙ্গত।

ত্রিদশ-আলয়ে—দেবগণের বাসস্থান স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা ভোগ করেন বলিয়া দেবতাগণকে 'ত্রিদশ' বলা হয়।

ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি—প্রমীলা ও মেঘনাদ বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলে নানারূপ নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। চারিদিকে সুখের ও আনন্দের হিল্লোল এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, মেঘনাদ-পুরীর পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণও স্বাধীনতাহানির দুঃখ সাময়িকভাবে ভুলিয়া মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল। অথবা অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। রামকর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কার অধিবাসিগণ এতদিন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অসুখী ছিল। মেঘনাদের পরাক্রমে তাহাদের দুঃখের দিন সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে মনে করিয়া, বহুদিন পরে তাহারা আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। প্রথম অর্থে স্বভাবোক্তি এবং দ্বিতীয় অর্থে রূপক অলঙ্কার।

সুধাংশুর অংশুস্পর্শে ইত্যাদি—চন্দ্রকিরণস্পর্শে সমুদ্রের জল যেমন উতলা হইয়া উঠে, সেইরূপ লঙ্কানগরীর ফোয়ারাগুলিও সক্রিয় ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুলনীয় : "চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ" (কালিদাস)।

ঋতুরাজ—বসন্ত (নায়ক)। বনস্থলী—বনভূমি (নায়িকা)। মধু মধুকালে—মধুর বসন্তকালে।

হেথা ইত্যাদি ৪৮৭-৫৫১ পংক্তি পর্যন্ত প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ, পুরবাসিগণ কর্তৃক তাহার অভ্যর্থনা এবং মেঘনাদের সহিত তাহার মিলন বর্ণনা করিয়া কবি পূর্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন।

রামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ লঙ্কার অবরোধ পর্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়া পশ্চিম দ্বার হইতে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দ্বার ঘুরিয়া রামশিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বৃথা নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে—পূর্ব দ্বারে নীল সৈন্যগণসহ অতন্দ্রভাবে অবস্থিত।

ক্ষুধাতুর হরি যথা ইত্যাদি—ক্ষুধিত সিংহ আহারান্বেষণে যেভাবে অস্থিরচিত্তে ভ্রমণ করে, দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদ শত্রুচরের সন্ধানে সেইরূপ বিচরণ করিতেছিল।

কিম্বা নন্দী শূলপাণি ইত্যাদি—অথবা সতর্কভাবে অবস্থিত অঙ্গদের সহিত কৈলাসরক্ষক শিবানুচর শূলধারী নন্দীর তুলনা করা যাইতে পারে।

শত শত অগ্নিরাশি—সতর্ক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রজ্বালিত।

শত শত অগ্নিরাশি ইত্যাদি—অবরুদ্ধ লঙ্কার চারিদিকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য শত শত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে। রাত্রি বলিয়া অগ্নিসমূহ নির্ধূম ও উজ্জ্বল। চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড দ্বারা বেষ্টিত উজ্জ্বল আলোক শোভিত স্বর্ণলঙ্কাকে নীল আকাশমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রবেষ্টিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। এস্থলে রাত্রি সর্বব্যাপী অন্ধকারের সহিত কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অগ্নিকুণ্ডের সহিত নক্ষত্রসমূহের এবং দীপালোকিত উজ্জ্বল লঙ্কার সহিত চন্দ্রের তুলনায় অতি চমৎকার উপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

কৃষী—কৃষক, কৃষীবল। কৃষি (কৃষিকার্য) + ইন্ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ; (অপ্রচলিত)।

জাগে বীরব্যূহ— রামের বীর সৈন্যসমূহ সতর্কভাবে অবস্থিত।

হৃষ্টমতি—সকলে সতর্কভাবে স্ব স্ব কর্মে রত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে।

হাসিয়া কৈলাসে উমা—পুনর্বার প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রমীলা যখন বীরবেশে লঙ্কাপ্রবেশে উদ্যতা, তখন তাহার অপূর্ব বীরাঙ্গনা-মূর্তি দেখিয়া দেবী মনের আনন্দে সখী বিজয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

সাজিনু এ বেশে আমি ইত্যাদি—সত্যযুগে মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিবার জন্য আমি স্বয়ং যেরূপ বীরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলাম, তাহার সহিতই প্রমীলার এই অপূর্ব বীরবেশের তুলনা চলে।

তুরঙ্গম আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে ইত্যাদি—অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া স্বর্ণকান্তি প্রমীলার সুন্দর দেহখানি অশ্বের গতিবেগে সঞ্চালিত হওয়ায় তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত স্বর্ণপদ্মের ন্যায় ক্ষণে ঊর্ধ্বে উত্থিত এবং ক্ষণে নিম্নে অবনমিত হইতেছে। রাত্রি বিশাল সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে প্রমীলার সুন্দর স্বর্ণবৎ অঙ্গের এই উত্থানপতন যেন মানস সরোবরের নীল জলের মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত স্বর্ণপদ্মের উত্থানপতনের মত। উপমান কনককমল ও উপমেয় স্বর্ণকান্তি প্রমীলার মধ্যে সাদৃশ্যহেতু সংশয় প্রকাশে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

কিরূপে আপন কথা রাখিবে—ভক্ত রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

বায়ুসখী—অগ্নিশিখা স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া তাহার বিশেষণ বায়ুসখী স্ত্রীলিঙ্গ।

ক্ষণকাল চিন্তি—কারণ, এই অপ্রত্যাশিত বাধার বিষয়ে পূর্বে চিন্তা করা হয় নাই; সুতরাং উপায় নির্ধারণার্থে দেবীকে ঈষৎ ভাবিতে হইল।

মম অংশে জন্ম ধরে—বিভীষণ প্রমীলার পরিচয়দানকালে রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

"মহাশক্তি-অংশে দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে!"

রবিচ্ছবি-করস্পর্শে ইত্যাদি—সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণস্পর্শে যে মণি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সন্ধ্যাগমে

সূর্যকিরণের অভাবে তাহা ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ আমার যে শক্তিতে প্রমীলা শক্তিমতী, সেই শক্তি আকর্ষণ করিয়া আমি তাহাকে নিস্তেজ করিব।

পতিসহ আসিবে প্রমীলা ইত্যাদি—এক ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অপর ভক্তের অহিতাচরণ দেবীর মনে হয়তো পীড়ার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি আত্মসমর্থনার্থই যেন বলিতেছেন যে, এই ব্যাপারে প্রমীলা ও মেঘনাদেরও প্রকৃত কল্যাণ করা হইবে। মেঘনাদ মৃত্যুর পর পাপ রাক্ষসযোনি ও পাপপূর্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবানুচরের পদ লাভ করিবে এবং প্রমীলা পতির সহমৃতা হইয়া কৈলাসে আসিয়া দেবীর সখীর গৌরব লাভ করিবে। ভবের ভালে—শিবের ললাটদেশে।

উজলিল সুখধাম রজোময় তেজে—পূর্ণ সুখের আলয় কৈলাসধামকে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রজোময়—রজতময়, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র। রজত অর্থে মধুসূদন বহুবার রজঃ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ।

সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ—তৃতীয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে প্রমোদোদ্যান হইতে বিরহিণী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদের নিকটে আগমন; তাই এই সর্গের নাম "সমাগম"।

চতুর্থ সর্গ

কবিগুরু—আদি কবি বাল্মীকি। ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ প্রথম কাব্য এবং ক্রৌঞ্চনিধনকারী ব্যাধের প্রতি তাঁহার অভিশাপ বাণী—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্ একম্ অবধীঃ কাম-মোহিতম্।।"

প্রথম লৌকিক কবিতা বা শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শিরঃচূড়ামণি—মস্তকের ভূষণ; 'শিরোমণি' বা 'চূড়ামণি' হইলেই সার্থক প্রয়োগ হইত। অধিকপদতা দোষ। ছন্দের অনুরোধে এবং দুঃশ্রাব্যতা দোষ দূর করিবার জন্য সন্ধি পরিত্যক্ত। তুলনীয়, "হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ"—১ম সর্গ। ২১২ পংক্তি।

তব অনুগামী দাস—এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বাল্মীকির নিকট ঋণস্বীকার এবং বশংবদতা প্রকাশ কবির পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কাব্যখানি রচনার প্রারম্ভে কবি লিখিয়াছিলেন,—"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki." বাস্তবিকই মেঘনাদবধ কাব্যের ২য়, ৩য়, ৫ম, ৮ম ও ৯ম সর্গোক্ত ঘটনাবলীর সহিত রামায়ণের কোন সম্বন্ধ নাই। ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গে রামায়ণীয় কাহিনীর ক্ষীণ সূত্রটুকুর আশ্রয় করিয়া কবি নূতন মাল্য রচনা করিয়াছেন। কেবল এই চতুর্থ সর্গটিতেই কবি বাল্মীকির প্রকৃত অনুগামী হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র সঙ্গমে—শ্রেষ্ঠ রাজার সাহচর্যে। রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা ইত্যাদি—দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাব বশতঃ দূরদেশস্থ তীর্থস্থান দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া যেমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির অনুগামী হইয়া নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ কবিও যশের মন্দিররূপ তীর্থে উপস্থিত হইবার আশায় বাল্মীকির অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

তব পদচিহ্ন ধ্যান করি—তোমার রচিত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া। পশিয়াছে কত যাত্রী ইত্যাদি—কত শত কবি কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী ও অমর হইয়াছেন।

শ্রীভর্তৃহরি—সংস্কৃত ভট্টিকাব্য নামক রামজীবনীমূলক মহাকাব্যের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত।

সূরী ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ—ভবভূতি নামে বিখ্যাত সুপণ্ডিত শ্রীকণ্ঠ রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে 'মহাবীর-চরিত' ও 'উত্তর-রামচরিত' নাটকদ্বয় রচনা করেন।

কালিদাস—ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত 'রঘুবংশ' রচয়িতা কালিদাস।

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি—'অনর্ঘ-রাঘব' নামক সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা মুরারি মিশ্র,—যাঁহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ন্যায় মধুর।

কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি—প্রথম বাঙ্গালা রামায়ণ রচয়িতা কীর্তির আবাসস্থল স্বরূপ কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের নামটির বানানে মধুসূদন সর্বত্রই প্রমাদে পড়িয়াছেন। কৃত্তি (ব্যাঘ্রচর্ম) বাস (পরিধান) যাঁহার—কৃত্তিবাস = মহাদেব। চতুর্দশপদী "কীর্ত্তিবাস" নামক কবিতাটিতেও পাই—

"জনক-জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কীর্ত্তিবাস নাম তোমা।"

স্বর্গীয় দীননাথ সান্যাল মহাশয় মধুসূদন-প্রযুক্ত বানানটির সমর্থনে বলিয়াছেন, "কৃত্তিবাসের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে—"কৃত্তিবাস" অথবা "কৃর্ত্তিবাস"। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামায়ণে আছে "কীর্ত্তিবাস"। মধুসূদন বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে একপ্রকার নিরঙ্কুশ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত 'কপোতাক্ষ' নদকে তিনি 'কবতক্ষ' লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার একটি প্রমাদ সংশোধনের জন্য সুপ্রচলিত 'কৃত্তিবাস' বানানের সহিত শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিগণের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত পুস্তকে প্রাপ্ত 'কীর্ত্তিবাস' বানানের প্রতিযোগিতা-কল্পনা অনাবশ্যক।

হে পিতঃ—তুলনীয়—বাল্মীকি সম্বন্ধে কবির উক্তি,—"father of our Poetry" সরে—সরোবরে। কবি অন্যত্র সপ্তম্যন্ত 'সরসে' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। "মুদিল সরসে আঁখি" ২।৩।

রাজহংস-কুলে—কবিতা-সরোবরের রাজহংস-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ কবিগণের সহিত।

গাঁথিব নূতন মালা ইত্যাদি—রামায়ণীয় কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করিয়া অভিনব কাব্য রচনা করিব। রত্নাকর—রত্ন সমূহের আকর বা উৎপত্তিস্থল সমুদ্র। অন্যদিকে বাল্মীকি পূর্বজীবনে রত্নাকর নামক দস্যু ছিলেন। শ্লেষ অলঙ্কার।

অকিঞ্চনে—দরিদ্রকে, অভাজন ব্যক্তিকে। ন (নাই) কিঞ্চন (কিছুই) যাহার।

ভাসিছে কনকলঙ্কা ইত্যাদি—মেঘনাদ রামচন্দ্রকে কল্য প্রভাতে পরাজিত করিয়া লঙ্কার অবরোধ মোচন করিবে এই আশায় রত্নহার-শোভিতা রাজমহিষীর ন্যায় সুবর্ণ-দীপশ্রেণী-শোভিতা লঙ্কানগরীর সমস্ত লোক আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে। বাজনা—বাদ্য > বজ্জ > বাজ + (স্বার্থে) না।

নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী—প্রণয়িনী নারীগণ স্ব স্ব প্রণয়ীর সহিত নানারূপ আমোদপ্রমোদে মত্ত। নায়ক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নায়িকা; 'নায়কী' শব্দটি ব্যাকরণ সঙ্গত নহে।

শীধু (সীধু)—মদ্য, সুরা। গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ—গৃহসমূহের শীর্ষদেশে নিশান উড়িতেছে। বাতায়ন—জানালা, বায়ুসঞ্চালনের পথ। বাত + অয়ন (পথ)। বাতি < বর্তিকা—প্রদীপ।

জাগে লঙ্কা আজি ইত্যাদি—সমগ্র লঙ্কার অধিবাসিগণ আজ রাত্রিকালে অনিদ্র; কেহই বিশ্রাম গ্রহণের অভিলাষে নিদ্রার শরণাপন্ন নহে। অচেতন নিদ্রার উপর চেতনা-বিশিষ্ট জীবের সমান কার্য 'পরিভ্রমণ' আরোপ করায় এস্থলে সমাসোক্তি অলঙ্কার। শৃগাল-সদৃশ—অতি তুচ্ছ।

পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদের রাহু—এতকাল চন্দ্রবৎ সুন্দর ও উজ্জ্বল লঙ্কা শত্রুবেষ্টিত হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হইয়াছিল; এক্ষণে শত্রু বিতাড়িত হওয়ায় উহা রাহুমুক্ত হইবে। উপমেয় লঙ্কা এবং শত্রুসৈন্যের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান চন্দ্র ও রাহুকে উপমেয়রূপে নির্দেশের ফলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। দেউলে—< দেবকুলে—দেবালয়ে, মন্দিরে।

আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—অচেতন আশার উপর চেতন মানবের সমান কার্য গান করার ভাব আরোপিত হয়। এখানেও সমাসোক্তি অলঙ্কার।

রাঘব-বাঞ্ছা—রামচন্দ্রের কামনার ধন সীতা। হীনপ্রাণা—মুমূর্ষু।

মলিন বদনা দেবী ইত্যাদি—সীতা অপূর্ব সুন্দরী হইলেও আজ রামচন্দ্রের বিরহে তিনি বিষণ্ণমুখী বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য ও লাবণ্যের উপর যেন একটা ছায়া পড়িয়াছে। কবি দুইটি সুন্দর উপমার সাহায্যে সীতার এই বিষাদময়ী সুন্দর মূর্তিটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সূর্যকান্তমণি অত্যন্ত উজ্জ্বল বটে; কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য কেবল সূর্যকিরণস্পর্শেই সম্ভবপর। অন্ধকারময় অশোকবনের নিবিড় ছায়ায় উপবিষ্টা বিষণ্ণমুখী সীতা রামচন্দ্রের বিরহহেতু অন্ধকার খনি-গর্ভস্থ সূর্য-কিরণবঞ্চিত সূর্যকান্তমণির ন্যায়, অথবা অন্ধকারময় গভীর সমুদ্র-গর্ভে অবস্থিত লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় স্বভাবতঃ সুন্দরী হইয়াও ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বনিছে পবন দূরে—উৎসবমত্ত লঙ্কানগরীর এক প্রান্তে সীতার অবস্থান-স্থল। এই অন্ধকারময় ও বিষাদময় অশোকবনেই কেবল আনন্দের অভাব। এখানে দূর বনপ্রান্তে বৃক্ষ শাখার ভিতর দিয়া যে বায়ু-প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যেও যেন বিলাপের বিষণ্ণ সুর ব্যক্ত হইতেছে।

অরবে—আনন্দশূন্যতা হেতু নীরবে।

রাশি রাশি কুসুম পড়েছে ইত্যাদি—বৃক্ষতলে রাশীকৃত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সীতার বিরহ-দুঃখে দুঃখিত বৃক্ষগুলি অলঙ্কারাদি দেহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয় বৃক্ষকে উপমান মনস্তাপিত ব্যক্তিরূপে সংশয় বা বিতর্কহেতু উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। বীচিরবে—তরঙ্গোত্থিত শব্দচ্ছলে। এ দুঃখ কাহিনী—সীতার বিরহ-দুঃখের বার্তা। দূরে প্রবাহিণী ইত্যাদি—এখানেও পূর্বোক্ত কারণে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?—অর্থাৎ কখনও ফোটে না ইহাই কবির বাচ্য। কাকু অলঙ্কার। প্রভা আভাময়ী—দীপ্তিশালিনী সূর্যপত্নী প্রভা। তমোময় ধামে—অন্ধকারময় যমালয়ে। যম সূর্যপুত্র বলিয়া সূর্যপত্নী প্রভার যমালয়ে অবস্থিতি কল্পনা স্বাভাবিক।

সরমা—গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা ও বিভীষণ-পত্নী। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৩৩শ সর্গে সীতার প্রতি সহানুভূতিশীল সরমার উল্লেখ আছে।

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে—ধর্মশীলা সুন্দরী বিভীষণ-পত্নী সরমা রূপে ও চরিত্রের পবিত্রতায় যেন রাক্ষসগণের কুললক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। এয়ো—< আইয় < আইহ < অবিধবা—সধবা স্ত্রীলোক।

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? ইত্যাদি—পদ্মের সুন্দর সুকোমল দলগুলি কেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া পদ্মকে শ্রীভ্রষ্ট করিতে চায় না। নিষ্ঠুর রাবণ সীতার সুন্দর অঙ্গ হইতে কি করিয়া অলঙ্কারসমূহ অপহরণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিল তাহা সরমার বুদ্ধির অতীত। বাক্যভঙ্গিহেতু কাকু অলঙ্কার। কোন টীকাকার এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়াছেন। বিশেষ দ্বারা সামান্য অথবা সামান্য দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইলে উক্ত অলঙ্কার সৃষ্টি হয়। এখানে পদ্মপর্ণ কেহ ছিন্ন করে না এই উক্তিটি রাবণই অলঙ্কার হরণ করিয়াছে সরমার এই প্রতীতি দ্বারা সমর্থিত হয় নাই বলিয়া অর্থান্তরন্যাস বলা চলে না। গোধূলি-ললাটে, আহা! ইত্যাদি—সরমা সীতার বিষণ্ণ-ললাটে সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিলে উজ্জ্বল সিন্দূর বিন্দুটি গোধূলিকালীন ম্লানায়মান আকাশে সন্ধ্যাতারার ন্যায় শোভিত হইল।

আহা মরি! সুবর্ণ-দেউটী ইত্যাদি—এই চমৎকার উৎপ্রেক্ষাটির সাহায্যে কবি সীতা ও সরমা উভয়ের চরিত্রই যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে অত্যুজ্জ্বলরূপবিশিষ্টা সরমা পবিত্র

চরিত্রা সতীশিরোমণি সীতার পদতলে আসিয়া বসিলেন; মনে হইল যেন সন্ধ্যাকালে পবিত্র তুলসীমূলে কেহ স্বর্ণময় উজ্জ্বল দীপটি স্থাপন করিয়াছে।

বৃথা গঞ্জ দশাননে ইত্যাদি—সীতা সরমাকে বলিতেছেন যে, তাঁহার অলঙ্কার হরণের জন্য রাবণকে দোষারোপ করা অন্যায়। এই উক্তিটির ভিতর দিয়া সীতার সত্যনিষ্ঠ, পবিত্র, সরল হৃদয়টি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; যে রাবণ তাঁহার সকল দুঃখ-বিপদের মূল কারণ, তাহাকেও অযথা অপবাদ দিতে তিনি কুণ্ঠিতা। চিহ্ন-হেতু— রামচন্দ্রের পক্ষে হরণকারীর পথের নিদর্শন স্বরূপ।

সেই সেতু—নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারসমূহ সেতুর ন্যায় রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগমনের পথ সুগম করিয়াছে। এ ধনে—এই শ্রেষ্ঠ রত্ন-স্বরূপ রামচন্দ্রকে।

শুনিয়াছে দাসী ইত্যাদি—সীতার প্রতি অনুরক্তা ও সহানুভূতি-পরায়ণা সরমা যে সুযোগ পাইলেই সীতার সহিত মিলিত হইতেন তাহার পরিচায়ক।

দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে—তোমার মধুর বচনে আমার শ্রবণাভিলাষ পূর্ণ কর। উপমেয় শ্রবণ এবং বচনের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান তৃষা এবং সুধাকে উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। ঠাকুর—< ঠক্কুর—পূজনীয়, সম্মানার্হ। এ চোর—চৌরবৎ পরস্বাপহারী রাবণ। কি মায়াবলে—কারণ, ছল-কৌশলের আশ্রয় না লইয়া রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় বীরদ্বয়ের নিকট হইতে সীতাকে হরণ করা রাবণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সরমা মনে করিয়াছিলেন।

গোমুখী—হিমালয়স্থ গিরিরন্ধ্র-বিশেষ; এখানে গঙ্গাধারা রন্ধ্রপথে পর্বতের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। পূত বারিধারা—পবিত্র গঙ্গোদকস্রোতঃ; সীতার বাক্যের পবিত্রতাজ্ঞাপক।

গোদাবরী তীরে—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদীকূলে। জনস্থান বা দণ্ডকারণ্য ইহার তীরে অবস্থিত।

পঞ্চবটী—দাক্ষিণাত্যের সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। বর্তমান বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলার অন্তর্গত। বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, আমলকী ও নিম্ব বা অশোক এই পাঁচটি বৃক্ষ যে বনে থাকে তাহাকে পঞ্চবটী বলে। পঞ্চ বটের সমাবেশ (সমাহার দ্বিগু সমাস)।

মর্ত্যে সুরবনসম—পৃথিবীতে নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর বন।

দণ্ডক—দণ্ডকবন; ইক্ষ্বাকু-পুত্র দণ্ডের রাজ্য শুক্রাচার্যের শাপে বিজন অরণ্যে পরিণত হয়।

সৌমিত্রি—সুমিত্রা-পুত্র লক্ষ্মণ।

মৃগয়া করিতেন কভু ইত্যাদি—প্রয়োজন হইলে রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে পশু-বধ করিয়া মাংস আনিতেন। কিন্তু স্বাভাবিক দয়াপ্রবণতার জন্য রাম বৃথা প্রাণিহত্যা করিতে চাহিতেন না।

সই < সখী—প্রিয় সঙ্গিনী। (সম্বোধনে) পিরীতি—< প্রীতি— আনন্দ, সন্তোষ।

পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি—মধু অর্থাৎ বসন্ত ঋতু সর্বসময়ে পঞ্চবটী বনে বিরাজমান; অর্থাৎ তথায় চিরবসন্ত। কুহরি—কুহুধ্বনি করিয়া। বৈতালিক— রাজপুরীর রাজস্তুতি গায়ক কর্মচারী, বন্দনা-সঙ্গীতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ করা ইহাদের কর্তব্য কর্ম ছিল।

শিখী, শিখিনী—ময়ুর, ময়ূরী। করভ, করভী—হস্তি-শাবক। চিত্রিত— বিচিত্রবর্ণ।

মেঘে না চিত্রিত, ইত্যাদি—মেঘের বুকে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণের ন্যায় নানাবর্ণে চিত্রিত পক্ষিগণ।

পালিতাম পরম যতনে, ইত্যাদি—মেঘ প্রসাদে বর্ষার জলে পরিপুষ্টা নদী যেমন সুপেয় জলদ্বারা মরুভূমিতে পিপাসাতুরের পিপাসা দূর করে, সেইরূপ আমিও রামচন্দ্রকর্তৃক সংগৃহীত আহার্য-সম্ভারে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তাহা দিয়া এই বিজন বনে পশুপক্ষীদিগকে আহার্য প্রদান করিতাম। এস্থলে মেঘের সহিত রামের, নদীর সহিত সীতার, নদীজলের সহিত খাদ্যাদির এবং মরুভূমে তৃষাতুরের সহিত পঞ্চবটীস্থ প্রাণিগণের তুলনা করা হইয়াছে।

সরসী—স্বচ্ছ সরোবর। আরসি (আরশি) < আদর্শিকা—দর্পণ। কুবলয়—পদ্ম। অমূল < অমূল্য—বহুমূল্য, মূল্যদ্বারা অলভ্য। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ;—অর্থাৎ সকল আশার সার; রূপক অলঙ্কার। তিতি—আর্দ্র হইয়া, সিক্ত হইয়া। প্রিয়ম্বদা—প্রিয়ভাষিণী, মধুরভাষিণী সীতা। কাদম্বা—কলহংস, শ্যামবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট বালি-হাঁস; মধুর স্বরের জন্য কাব্যে প্রসিদ্ধ। সুভাগে—(সম্বোধনে) সৌভাগ্যবতী।

বরিষার কালে, সখি, ইত্যাদি—যেরূপ বর্ষাকালে বন্যার প্রচণ্ড শক্তিতে ক্লিষ্ট হইয়া নদীর প্রবাহ দুইতীরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া জলরাশি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত করে, সেইরূপ দুঃখের ভারে পীড়িত ব্যক্তিও দুঃখেব কাহিনী নিজের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্তী অপর ব্যক্তিকে বলিতে চায়। অররু-পুরে—শত্রুপুরীতে। কান্তার-কান্তি—দুর্গমবনের শোভা।

সতত স্বপনে শুনিতাম বন-বীণা ইত্যাদি—নির্জন গভীর অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষশাখা ও বেণুকুঞ্জে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহ বনদেবীর করধৃত বীণার মধুর সঙ্গীতের মত তন্দ্রার মধ্যেও আমার কর্ণে প্রবেশ করিত। সৌরকর-রাশি-বেশে সুরবালাকেলি পদ্মবনে—সূর্যকিরণে পদ্মগুলি বিকশিত হইয়া সমগ্র পদ্মবন অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; মনে হয় যেন সূর্যকিরণসমূহের রূপ ধারণ করিয়া দেবকন্যারা স্বর্গ হইতে পদ্মবনে ক্রীড়া করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের রূপচ্ছটায় পদ্মবন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। ঋষি-বংশ-বধূ—রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে অত্রিজায়া অনসূয়া প্রভৃতি ঋষিবধূ সীতার কুটীরে আসিতেন।

সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে—চন্দ্রকিরণস্পর্শে অন্ধকারময় গৃহ যেরূপ আলোকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানবসংস্পর্শবর্জিত সীতার নিরানন্দ কুটীরও ঋষিবধূগণের পদার্পণে আনন্দময় হইয়া উঠিত। অজিন—চর্ম, মৃগচর্ম। রঞ্জিত আহা, কত শত রঙে—শবল জাতীয় হরিণের নানাবর্ণে চিত্রিত চর্ম।

সম্ভাষিয়া ছায়ায়—একান্ত নির্জনতাহেতু নিজের অথবা বৃক্ষের ছায়াকেই সখীরূপে সম্ভাষণ করিয়া। কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি—বনের হরিণীগণের নৃত্যবৎ চটুল পদক্ষেপের অনুকরণ করিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতাম।

নব-লতিকার ইত্যাদি—লতার সহিত বৃক্ষের দাম্পত্য সম্বন্ধ কবিপ্রসিদ্ধি।

নাতিনী বলিয়া—বৃক্ষ ও লতা সন্তানস্থানীয় বলিয়া তাহাদের সন্তানস্বরূপ মঞ্জরী বা পুষ্পসমূহ নাতিনী। শকুন্তলা নাটকে তপোবনের বৃক্ষাদিকে শকুন্তলা ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতেন—তুলনীয়, "কেবলং তাদ-নিওও, অত্থি মে সোদর সিনেহো বি এদেযু।" নাতিনী < নপ্তী—পুত্রের কিংবা কন্যার কন্যা। নাতিনী-জামাই— পুষ্পের সহিত ভ্রমরের নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধও কবিপ্রসিদ্ধি।

দেখিতাম তরল সলিলে ইত্যাদি—নদীর শান্ত নির্মল জলে আকাশ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়া মায়াময় অভিনব আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ ও চন্দ্রের শোভা ধারণ করিত ইহা দেখিতাম। তুলনীয়—

"সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ
শোভিল পুলকে যেন নূতন গগনে
তরলতর।" (তিলোত্তমাসম্ভব,—১।৪৩১-৩৩)

ব্রততী—ব্রততী, বল্লরী, লতা। রসাল—আম্র অথবা কাঁঠাল বৃক্ষ। ব্যোমকেশ—মহাদেব, অনন্ত আকাশ যাঁহার জটাস্বরূপ।

স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে—পার্বতীর সহিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট মহাদেবের কল্পনা পৌরাণিক প্রসিদ্ধি-ত্যাগ। পুরাণে সর্বত্রই মহাদেবকে জটাজূটধারী, ভস্মানুলিপ্ত দেহ, চর্মপরিহিত এবং চর্মাসনে

আসীন যোগিমূর্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আগম—তন্ত্রশাস্ত্র। "আগতং গিরিশ-বক্ত্রাদ্ গতং তু গিরিজাশ্রুতৌ।
মতং চ মাধবস্য স্যাৎ তস্মাদ্ আগম উচ্যতে।"

পুরাণ—প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ। প্রধান পুরাণ অষ্টাদশখানি।

বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিখানি মন্ত্রসংহিতা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ। "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।"

পঞ্চতন্ত্রকথা—তন্ত্রের সংখ্যা বহু; শিবের পঞ্চমুখের জন্যই 'পঞ্চ' তন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। রূপসি—(সম্বোধনে -'ই') রূপ আছে এই অর্থে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা (যেমন লোমশ, লোমশা)। তাহা হইতে সরসী, আয়সী, তাপসী প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে 'রূপসী'।

সাঙ্গ—অঙ্গসমূহের সহিত বর্তমান অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ; তাহা হইতে গৌণ অর্থ 'পরিসমাপ্ত' 'শেষ'।

সে সঙ্গীত—সঙ্গীতবৎ মধুর সেই বাক্যালাপ। আয়ত-লোচনা—বিশাল-লোচনা, সুন্দর নয়নবিশিষ্টা সীতা। রবিকর যবে, ... সর্ব্বজন তথা?—সীতার পঞ্চবটীবনে সুখশান্তিময় জীবন-যাপনের কাহিনী শুনিয়া সরমা ঐরূপ শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, এই শান্তির কারণ বিজনবনবাস নহে, ইহার কারণ সীতারই চরিত্র মাধুর্য। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য সরমা রবিকিরণ ও নিশার আবির্ভাবে জগতে কি পরিবর্তন ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া সীতার চরিত্র-মাধুর্যই যে তাঁহার বনবাস জীবনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিতে চান। এখানে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকায় এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত না হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা মলিন তোমার রূপে—উপমান চন্দ্র হইতে উপমেয় সীতার রূপের উৎকর্ষ-প্রদর্শন-হেতু ব্যতিরেক অলঙ্কার। পিঁইছেন হাসি—আনন্দ সহকারে পান করিতেছেন। (অপ্রচলিত)

ননদিনী—ননদ < ননন্দা, স্বামীর ভগ্নী। জঞ্জাল—উৎপাত, অনিষ্ট। শরমে—লজ্জায়। ফারসী শব্দ। আইলা ধাইয়া রাক্ষস—সূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ। তুমুল রণ বাজিল কাননে—ভীষণ যুদ্ধের শব্দে বন পূর্ণ হইল। কোদণ্ড-টংকারে—ধনুকের নির্ঘোষে। মুদি আঁখি—ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া। আঁখি < অংখি < অক্ষি।

আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে—পরাজিত ও আহত রাক্ষসগণের আর্তনাদ এবং বিজয়ী রামলক্ষ্মণের জয়সূচক ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল।

অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে—যুদ্ধের ভীষণতায় কোমলহৃদয়া সীতা মূর্ছিতা হইলেন।

স্বজনি—হে সখি। স্বজন = বন্ধু; তাহার স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। আধুনিক অর্ধতৎসমরূপ সজনী।

হায় লো, যেমতি স্বনে মন্দ সমীরণ ইত্যাদি—বসন্তকালে পুষ্পবনে প্রবাহিত মৃদুমন্দ বায়ুর শব্দের ন্যায় অস্ফুট কোমল কণ্ঠে। এই কি শয্যা—এই কঠিন ও মলিন ভূমিশয্যা।

সহসা পড়িলা মূর্চ্ছিত হইয়া—রামচন্দ্রের গভীর প্রণয়ের স্মৃতি মনে পড়ায় সীতা আত্মহারা হইয়া হঠাৎ মূর্ছিত হইলেন। ললিত গীত—মধুর গান।

সুকেশিনী—সুকেশী, সুকেশা।—ইন্‌ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে অযথা -ইনী প্রত্যয়।

মারীচ—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র; রাবণের আদেশে এই রাক্ষসই মায়াস্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করে। মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণিকা; জলশূন্য স্থানে জলভ্রম। মরীচি (সূর্যকিরণ) বালুকারাশিকে উত্তপ্ত করিয়া দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বস্তুর বিপরীত ছায়া প্রতিফলিত করে এবং

উহাকে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়।

কুলগ্নে—অশুভ মুহূর্তে। কুরঙ্গে—মারীচ যে মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়াছিল সেই হরিণটিকে।

বিদ্যুৎ-আকৃতি—অত্যুজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। বারণারি-গতি—রাবণের (হস্তীর) অরি সিংহের ন্যায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট। হারানু নয়ন-তারা ইত্যাদি—আমার নয়নের মণিস্বরূপ রাম বনের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন এবং সেই শেষবারের মত তাঁহাকে আমি দেখিলাম।

কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, ইত্যাদি—সীতার রক্ষণে নিযুক্ত লক্ষ্মণকে কুটীর হইতে অপসারিত করার জন্য মারীচের পূর্ব-সংকল্পিত আর্তনাদ। রামই যেন বনমধ্যে বিপন্ন হইয়া লক্ষ্মণের সাহায্য চাহিতেছেন। চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী—প্রথম শব্দশ্রবণে সিংহবিক্রম লক্ষ্মণও চমকিয়া উঠিলেন। মিনতি—কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ ও সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শব্দের সংমিশ্রণজাত শব্দ। রঘুবংশ-অবতংসে—রঘুকুলের শিরোভূষণ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্রকে।

ভৃগু-রাম গুরু বলে—শক্তিতে পরশুরাম হইতেও শ্রেষ্ঠ। সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরামের সহিত রামের শক্তিপরীক্ষা হয় এবং পরশুরাম পরাস্ত হন।

মরি আমি এ বিপত্তিকালে ইত্যাদি—দ্বিতীয়বারের আর্তনাদ আরও সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। রাম যে শুধু বিপদেই পড়িয়াছেন তাহা নয়, তিনি যেন প্রাণ হারাইতেও বসিয়াছেন, এইভাবে সাহায্য চাহিতেছেন এবং এবার লক্ষ্মণের সহিত জানকীকেও স্মরণ করিতেছেন। ধৈরয—ধৈর্য। স্বরসম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত। নারিনু < না + পারিনু—পারিলাম না। পদ্যে এবং প্রাদেশিকভাবে ব্যবহৃত।

শাশুড়ী—স্বামীর মাতা। শ্বশ্রূ > সস্সু (শশু) > শাশু + (স্বার্থে) ড়ী।

পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা ইত্যাদি—ইহার সহিত ঈনীড কাব্যের নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি তুলনীয় :

"Not sprung from noble blood, nor goddess-born,
But hewn from hardened entrails of a rock,
And rough Hycranian tigers gave the suck."

রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, ইত্যাদি—লক্ষ্মণের প্রতি সীতার তিরস্কার তীব্র হইলেও শালীনতাবর্জিত নহে। রামায়ণে সীতা লক্ষ্মণকে ইহা হইতেও পরুষ ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জঘন্য অপবাদ দিয়াছিলেন। তুলনীয়—"রে নৃশংস! কুলনাশক! তুমি রামকে মারিয়া দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব এই দয়া আর্য-জনোচিত নহে। বুঝিলাম, রামের এই মহৎ বিপদ তোমার পরম প্রীতিকর হইয়াছে; সেইজন্য তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়াও এইপ্রকার কথা বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় নিয়ত প্রচ্ছন্নাচারী নৃশংস-স্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমি নিতান্ত দুষ্ট-প্রকৃতির, সেইজন্য রাম একাকী বনে আসিলে আমার প্রতি লোভবশতঃ তুমিও একাকী তাঁহার অনুগামী হইয়াছ; অথবা ভরতকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই এরূপ করিয়াছ।"—ইত্যাদি। (অনুবাদ—অরণ্যকাণ্ড; ৪৫ সর্গ, ২১—২৪ শ্লোক)।

মধুসূদন চতুর্থ সর্গে সীতার যে অনবদ্য মনোরম চিত্রটি অঙ্কন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সীতার শালীনতা-হানিকর এই উক্তিগুলি বাদ দিয়া ভালই করিয়াছেন।

ক্রোধভরে, আরক্ত নয়নে—অযথা নিন্দাশ্রবণহেতু।

মাতৃসম মানি তোমা—জ্যেষ্ঠ রাম পিতৃতুল্য সম্মানার্হ বলিয়া তাঁহার স্ত্রীও মাতৃতুল্যা। বনাগমনকালে সুমিত্রাও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম।
অযোধ্যাম্ অটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্।। (অযোধ্যাকাণ্ড; ৪০।৮)

তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে—সীতা ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণ না গেলে তিনি নিজেই রামের সন্ধানে যাইবেন। এই সঙ্কটে লক্ষ্মণের যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগশিশু যত—বাক্যটি ত্রুটিযুক্ত। কুরঙ্গ অর্থে হরিণ এবং বিহঙ্গ পক্ষী; এই উভয়বিধ প্রাণীর সহিত মৃগশিশু অর্থাৎ হরিণশাবকের, (অথবা পশু-শাবকের) অন্বয় কর্তব্য। কিন্তু তাহার কোন অর্থ হয় না। এস্থলে 'জীবগণ' বা 'প্রাণিগণ' পাঠই সঙ্গততর হইত, এবং সেই অর্থেই মৃগশিশু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সদাব্রত ফলাহারী—সীতাকর্তৃক নিত্য নিয়মিতভাবে প্রদত্ত ফলাদি ভক্ষণকারী। সদাব্রত = অন্নসত্র; সর্বদা সকলকে অন্নদানের অনুষ্ঠান।

উত্তরিল—উপস্থিত হইল; অবতীর্ণ হইল। অব + তৃ ধাতু হইতে অবতর > ওতর > উতর ধাতু।

বৈশ্বানর সম—অগ্নির ন্যায়। বিভূতি—ভস্ম।

ফুলরাশি মাঝে ... বিমল সলিলে বিষ—যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ব্যবহার না করিয়া ছদ্মবেশী রাবণের সহিত ফুলের মধ্যে অবস্থিত সর্পের এবং বিমল সলিলে বিষের তুলনা করায় লুপ্ত-মালোপমা। ঘোমটা < গুণ্ঠিকা,—অবগুণ্ঠন। রাঘবেন্দ্র যিনি—স্বামীর নাম উল্লেখ না করিয়া পরিচয়দান। তুলনীয়, "জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।" (ভারতচন্দ্র)

প্রতারিত রোষ—ছল বা কৃত্রিম ক্রোধ; প্রতারণা করিবার জন্য রোষের ভান। এ স্থলে 'রোষ' প্রতারিত নহে,—রোষের পাত্র প্রতারিত; সুতরাং প্রতারিত শব্দটি অবাচকতা দোষদুষ্ট।

এ কলঙ্ক-কালি—ক্ষুধিত অতিথিকে প্রত্যাখ্যানরূপ অযশঃ। কি গৌরবে—কিসের অহঙ্কারে।

দুরন্ত রাক্ষস এবে ইত্যাদি—যোগীর ছদ্মবেশধারী রাবণ বলিতেছে যে, সীতা অবিলম্বে ভিক্ষা না দিলে তাহার শাপে অতি প্রচণ্ড রাক্ষস এখনই রামচন্দ্রের শত্রুরূপে আবির্ভূত হইবে।

না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ... আমায় তখনি।—এখানে পক্ষী ফাঁদে পা দিলে ব্যাধ তাহাকে যেমন ধরিয়া ফেলে, রাবণও তাহার প্রতারণায় সীতা কুটীরের বাহিরে আস্যমাত্র তাহাকে তেমনই ধরিয়া ফেলিল,—এই ভাবটি প্রকাশ পাওয়ায় এবং যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ও উপমান ব্যাধ ও পক্ষী লুপ্ত হওয়ায় লুপ্তোপমা অলঙ্কার।

ভাসুর < ভ্রাতৃ-শ্বশুর—শ্বশুরের ন্যায় সম্মানিত স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'ভাশুর' বানান সঙ্গত। ইরম্মদাকৃতি—বজ্রাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পীতাভ দেহবিশিষ্ট।

বন সুন্দরীরে—বনের সৌন্দর্যস্বরূপ হরিণীকে।

শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি—সীতা নির্জন বনে নিজের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন যে, বোধহয় বনদেবীই তাঁহার দুর্দশা দর্শনে ক্রন্দন করিতেছেন।

হুতাশন—অগ্নি। হুত (যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃত) অশন (ভক্ষণ) করেন যিনি।

হুতাশন-তেজে গলে লৌহ ইত্যাদি—যাহার হৃদয় কঠিন তাহাকে শক্তির দ্বারা দমন করা যায়;—কাতর অনুনয় বা কোমল বাক্যে বশীভূত করা যায় না। এস্থলে বারি সিঞ্চনের পরিবর্তে অগ্নিতেজে লৌহের গলনরূপ সাধারণ একটি কার্যের সাহায্যে, রাবণের লৌহবৎ কঠিন হৃদয়কে দমন করার জন্য কাতর ক্রন্দনের পরিবর্তে শক্তি সামর্থ্যই যে প্রয়োজন, এই ভাবটি ব্যক্ত হওয়ায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার।

কহিল যে কত দুষ্টমতি ইত্যাদি—রাবণ কখনও ভীতিপ্রদর্শন করিয়া, কখনও বা প্রলোভনসূচক মধুর স্বরে সীতাকে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে বলিতেছিল। সীতার প্রতি প্রবল সহানুভূতিবশতঃ সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই একটি মাত্র সর্গে কবি তৎ-কল্পিত বীর রাবণ চরিত্রের রূপান্তর ঘটাইতে বাধ্য

হইয়াছেন। এই সর্গে সীতার, সরমার ও জটায়ুর উক্তিসমূহে রাবণ-চরিত্র রামায়ণোল্লিখিত রাবণের ন্যায় পরস্ত্রীহারক লম্পটরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কাল সর্প মুখে কাঁদে যথা ভেকী—সীতার একান্ত বিপদ ও অসহায়তা জ্ঞাপক।

ফাঁফর- -(ফাঁপর)—বুদ্ধিশূন্য বা বিমূঢ় হইয়া। ফাঁফর হইয়া—ফাঁপরে পড়িয়া। কাঞ্চী—মেখলা, কটিহার, চন্দ্রহার। ছড়াইনু পথে—রামচন্দ্রের পক্ষে সীতার গমনপথের নিদর্শনস্বরূপ।

এখনও তৃষাতুরা ইত্যাদি—উপমেয় উৎকট শ্রবণেচ্ছা এবং মধুর বাক্যের উল্লেখ না করিয়া উপমান তৃষ্ণা এবং সুধাকেই উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। তুলনীয়—পূর্ববর্তী "দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।" (১০৬ পংক্তি)

ইন্দুনিভাননা—চন্দ্রবৎ মনোরম মুখশ্রীবিশিষ্টা। নিভ = সম, তুল্য।

তুমি শব্দবহ—ধ্বনিবহন আকাশের ধর্ম। তুলনীয়, "শব্দবহ আকাশ বহিলা" (৫ম সর্গ।৬০২ এবং ৬ষ্ঠ সর্গ।২১৮) গন্ধবহ তুমি—বায়ুর ধর্ম গন্ধবহন। বারতা < বার্তা—সংবাদ। পঞ্চ স্বরে—পঞ্চম স্বরে; কোকিল ধ্বনি সপ্ত স্বর-তরঙ্গের মধ্যে 'পঞ্চমে' ধ্বনিত হয়। পঞ্চ = পঞ্চম—অবাচকতা দোষ। শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে—বিরহীর নিকট কোকিল-ধ্বনি বিরহ দুঃখের উদ্দীপনাকারী বলিয়া সীতা-বিরহ-ক্লিষ্ট রামচন্দ্র কোকিলের ডাক নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবেন।

চলিল কনক-রথ—রাবণের স্বর্ণময় বিমানযান 'পুষ্পক রথ।'

স্বর্ণরথ চলিলে অস্থিরে—ভীত অশ্বগণের গতি-বৈষম্যহেতু পুষ্পকের গতিও বিষম হইল।

দেখিনু মেলিয়া আঁখি—রাবণ কর্তৃক গৃহীত হইবার পর হইতে সীতা ভয়ে এবং শোকে চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রচণ্ড গর্জন শুনিয়া এবং রথের গতি বাধাপ্রাপ্ত বুঝিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন।

ভৈরব-মুরতি ইত্যাদি—প্রলয়কালীন সুবৃহৎ কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর বিরাট দেহবিশিষ্ট এক বীরপুরুষ পর্বতোপরি অবস্থিত।

চোর তুই, লঙ্কার রাবণ ইত্যাদি—এই স্থলেও রাবণের রামায়ণানুগত নিন্দনীয় অত্যাচারী ও লম্পট রূপই ধ্বনিত হইয়াছে। সীতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বশতঃ এই সর্গে কবি রাবণের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক সাহানুভূতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অস্ত্রিদল-অপবাদ—শস্ত্রধারী বীরগণের নামের কলঙ্কস্বরূপ রাবণ নাম।

ব্রহ্ম-মণ্ডলে—ব্রহ্মাণ্ডে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে—প্রচণ্ড গর্জনে অস্থির হইয়া আমি রথের মধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।

পাইয়া চেতন পুনঃ ইত্যাদি—সীতার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তিনি আর রাবণের পুষ্পক রথের মধ্যে নাই, মাটিতে অবস্থান করিতেছেন। উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে—রাবণ শূন্যদেশে পুষ্পকে জটায়ুর সহিত যুদ্ধে রত। এই সুযোগে বিজন বনের মধ্যে পলায়ন করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন ভাবিয়া সীতা উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

মা আমার—সীতা ধরিত্রী দেবীর কন্যা,—মিথিলার রাজা জনক ভূমি-কর্ষণ করিতে যাইয়া 'সীতা' বা হল কর্ষিত ভূমি-রেখার মধ্যে ইহাকে প্রাপ্ত হন বলিয়া ইঁহার নাম সীতা রাখা হইয়াছিল।

আরাধিনু বসুধারে ইত্যাদি—পলায়নের উদ্দেশ্যে উঠিয়া সীতা নিকটস্থ প্রচণ্ড যুদ্ধের ভীষণ আলোড়নে আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিজের জননী পৃথিবীকে স্মরণ করিয়া এই দারুণ বিপদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

তস্কর—পরস্ত্রী-অপহরণকারী রাবণ। পরধন—রাবণের নিকট পরস্ব-স্বরূপ রাম-পত্নী সীতা।

আরবে—শব্দে, গর্জনে। রব, রাব আরব এবং আরাব সমার্থক। দেখিনু স্বপনে আমি ইত্যাদি—সীতা পুনর্বার মূর্ছিতাবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখিলেন। এই স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্ত রামায়ণ-বহির্ভূত।

বিধির ইচ্ছায়—বিধাতার অভিপ্রায়ে সবংশে নিজের বিনাশ সাধন করিবার জন্য।

ধরিনু গো গর্ভে তোরে ইত্যাদি—রাবণের নিধনের নিমিত্তস্বরূপ হইবে বলিয়াই রাবণের পাপভারে পীড়িত আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম।

যে কুক্ষণে তোর তনু ইত্যাদি—যে অশুভ মুহূর্তে পাপিষ্ঠ রাবণ তোমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অচিরে রাবণের বিনাশ সাধন করিয়া আমাকে পাপভারমুক্ত করিবেন।

জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—সীতাহরণহেতু রাবণের বিনাশ, এবং রাবণ-বিনাশে ধরণীর যন্ত্রণার অবসান প্রত্যাসন্ন।

ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে!—সীতা হরণের পর ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটিবে তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গুহায় নিহিত। এই ভবিষ্যতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পৃথিবী সীতাকে ঘটনাগুলি প্রদর্শন করিতেছেন। ভার্জিলের ঈনীড কাব্যের নায়ক ঈনীয়াস্‌কে তাঁহার পিতা আঙ্কাইসিস ভবিষ্য ঘটনাবলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ঘটনার ছায়াতেই আলোচ্য ঘটনাটি কল্পিত হইয়াছে। রামায়ণেও ত্রিজটা নাম্নী সীতার প্রতি অনুকম্পাশীলা জনৈক রাক্ষসীর রাবণের পক্ষে দুর্নিমিত্তসূচক একটি স্বপ্নদর্শনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত আলোচ্য ঘটনার কোন সাদৃশ্য নাই।

অভ্রভেদী গিরি—অত্যুন্নত কিষ্কিন্ধ্যার ঋষ্যমূক পর্বত। এই পর্বতেই সুগ্রীবাদির সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চজন বীর ইত্যাদি—কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালি কর্তৃক অত্যাচারিত বিষণ্ণবদন নল, নীল, হনুমান্, জাম্বুবান্ এবং সুগ্রীব। এই চিত্রটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত; বাল্মীকি অন্যরূপে রামের সহিত সুগ্রীবের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন।

ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারিপাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।।
নল, নীল, হনুমান পবন-নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন।। (কৃত্তিবাস—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

অনুজে—রামানুজ লক্ষ্মণকে। সুন্দর নগরে—কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে।

মারি সে দেশের রাজা—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালিকে বধ করিয়া।

তুমুল সংগ্রামে—বালিবধের জন্য রামকে 'তুমুল সংগ্রাম' করিতে হয় নাই;— তিনি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধরত বালিকে তীরনিক্ষেপে বধ করেন। এইরূপ উক্তি প্রসিদ্ধি-ত্যাগের দৃষ্টান্ত। এই কাব্যের অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীতে রাম যখন বালির প্রেতাত্মার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তখন বালিও বলিয়াছেন— "অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে," (৮ম। ৬১২-১৩)

শ্রেষ্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে— পাঁচজনের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে।

ধাইলা চৌদিকে দূত—রাম-সুগ্রীব-মিত্রতার প্রধান শর্তই ছিল এই যে, রাম বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিবেন এবং সুগ্রীব সীতার সন্ধান ও উদ্ধারকার্যে রামকে সাহায্য করিবেন। সেই চুক্তি অনুসারে সীতার অন্বেষণার্থ চারিদিকে দূত প্রেরিত হইল।

কহিলা হাসিয়া—চারিদিকে যুদ্ধের ভীষণ আয়োজন দেখিয়া সীতা ভয়ে চক্ষু রুদ্ধ করায় পৃথিবী

দেবী সীতার উদ্ধার কার্যের জন্যই যে এই সৈন্যসমাবেশ এবং ইহাতে তাঁহার ভয়ের পরিবর্তে যে আনন্দ হওয়াই উচিত ইহা বুঝাইবার জন্য ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। সৈন্যদল---রামের সেনাদল।

ভাসিল সলিলে শিলা—লোকের ধারণা এই যে, বিষ্ণুর অবতার রামের প্রভাবে প্রস্তরখণ্ডসমূহ জলে না ডুবিয়া ভাসানো সেতু রচনা করিয়াছে।

শৃঙ্গধরে—পর্বতকে। শিল্পিকুল মিলি—বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানরের তত্ত্বাবধানে বানর শ্রমিকগণ দ্বারা সেতু নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। বারীশ পাশী --পাশাস্ত্রধারী সমুদ্রপতি বরুণ। প্রভুর আদেশে—রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে। বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ২১শ ও ২২শ সর্গে ক্রুদ্ধ রামসমীপে সমুদ্রের আগমন এবং সেতুবন্ধের বিবরণ আছে। পরিল শৃঙ্খল পায়ে—শৃঙ্খলবৎ সেতুদ্বারা স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইল। কটক—সেনাদল। ধীর ধর্ম্মসম বীর এক—সরমার স্বামী সংযত ও ধর্মপরায়ণ বিভীষণ। রাঘবারি—রামচন্দ্রের শত্রু রাবণ। বীরকুঞ্জর---বীরশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠার্থক কুঞ্জর শব্দের সহিত উপমিত সমাস। কবন্ধ—মস্তকবিহীন ভূতযোনিবিশেষ। গৃধিনী < গৃধ্র ---শকুনি জাতীয় মাংসাশী পক্ষী। ভৈরবে—ভৈরব অর্থাৎ ভীষণ কোলাহলে। দেখিনু কর্ব্বুরনাথে পুনঃ সভাতলে—রামচন্দ্রের সহিত প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষীণবল হইবার পর। লাঘব-গরব—গর্ব বা দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে যাহার।

হায় বিধি, এই কিরে ছিল তোর মনে?—প্রবল শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ভাগ্যদোষে তুচ্ছ শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় রাবণ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে।

শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণে মম—মেঘনাদবধ কাব্যে কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধে রাবণকর্তৃক এই 'স্থির বিশেষণটি' সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। শূলধারী মহাদেবের ন্যায় শক্তিমান কুম্ভকর্ণকে।

জাগাও যতনে---সাবধানে জাগ্রত কর। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার নিকট বিঘ্নশূন্য সুচিরনিদ্রা বর প্রার্থনা করিয়াছিল। লঙ্কা-সমরের সময়ে সে নিদ্রাভিভূত ছিল। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হইয়া অবশেষে রাবণ কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করে এবং কুম্ভকর্ণ নিহত হয়।

সে যদি না পারে?—বিশাল দেহ ও প্রভূত শক্তিসম্পন্ন কুম্ভকর্ণ ব্যতীত রাক্ষসকুলকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই।

মরিল অকালে জাগি—কৃত্তিবাস বলিয়াছেন, ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ ছয়মাস কাল নিদ্রামগ্ন থাকিয়া একদিন জাগ্রত হইয়া সে যথেচ্ছ পানভোজন করিতে পারিবে; কিন্তু অকালে কেহ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাহার বিনাশ হইবে। রাবণ ক্রমাগত পরাজয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার বরেব তাৎপর্য ভুলিয়া অকালে তাহাকে প্রবুদ্ধ করে এবং রামচন্দ্রের হস্তে কুম্ভকর্ণ নিহত হয়।

রক্ষঃকুল-দুঃখে বুক ফাটে ইত্যাদি—সীতার চরিত্র এতই কোমল যে, পরম শত্রু রাক্ষসগণের দুঃখেও তিনি শোকে মর্মাহত হইয়াছিলেন।

ক্ষম, মা, মোরে—আর এই সকল শোকাবহ দৃশ্য আমাকে দেখাইও না।

হাসিয়া কহিলা বসুধা—কন্যা সীতার কোমল ও সরল চরিত্র দেখিয়াও বটে, এবং এই যুদ্ধ ও শোণিতপাত যতই ভীষণ হউক না কেন,—ইহার ভিতর দিয়াই রাবণের বিনাশ এবং তাঁহার নিজের মুক্তি হইবে ভাবিয়া পৃথিবী দেবী হাসিয়া বলিলেন।

মন্দারের মালা—স্বর্গের নন্দনকাননস্থ মন্দারপুষ্পের মালা। স্বর্গের তরুসমূহের মধ্যে পারিজাত, মন্দার, সন্তানক, কল্পতরু ও হরিচন্দন এই পাঁচটি বৃক্ষ প্রসিদ্ধ। অবগাহ দেহ—অবগাহন স্নান কর। অবগাহন অর্থেই দেহ-নিমজ্জনপূর্বক স্নান; সুতরাং দেহ শব্দের ব্যবহার নিরর্থক।

পর নানা আভরণ—স্বামি-সন্দর্শনার্থ বেশভূষা ধারণ কব। রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইবার সময়

হইতে সীতা যে নিরাভরণাই ছিলেন ইহা সর্গারম্ভেই সরমার উক্তি হইতে জানা যায়।

কাঁদিয়া হাসিয়া ইত্যাদি—রামের নিকটে যাইবার উদ্দেশ্যে দেববালাগণের কথামত বেশভূষায় সজ্জিত হইবার সময়ে মনের অত্যধিক আবেগহেতু সীতা কখনও কাঁদিতে, আবার কখনও হাসিতে লাগিলেন। এতকাল রামের বিরহে বন্দিনী অবস্থায় যে দুঃখ ও অপমান ভোগ করিয়াছেন তজ্জন্য ক্রন্দন; এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রামের সহিত মিলন আসন্ন ভাবিয়া হাস্য।

জাগিনু অমনি—এতক্ষণ সীতা মূর্ছিত অবস্থায় ধরিত্রীদেবী-প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী স্বপ্নে চিত্রের ন্যায় দেখিতেছিলেন। যে মুহূর্তে রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ধাবিত হইবার চেষ্টা করিলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার মূর্ছাভঙ্গ হইল এবং স্বপ্নের চিত্রগুলিও মিলাইয়া গেল। এখানে স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রাভঙ্গের অতি চমৎকার স্বাভাবিক বর্ণনাহেতু স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। দেউটি < দীঅট্টিঅ < দীঅবট্টিআ < দীপবর্তিকা—প্রদীপ।

আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে—স্বপ্নে দৃষ্ট রামচন্দ্রকে হারাইয়া পুনরায় কঠিন দুঃখময় বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ায়। কি সাধে—কোন আশায়। সাধ < সদ্ধা < শ্রদ্ধা।

নীরবে যেমতি বীণা ইত্যাদি—ছিন্নতন্ত্রী বীণা বাজিতে বাজিতে যেমন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, মধুরভাষিণী সীতা মধুরকণ্ঠে পূর্বকাহিনী বলিতে বলিতে সেইরূপ স্তব্ধ হইলেন।

সত্য এ স্বপন তব ইত্যাদি—সরমা সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার স্বপ্ন সত্য হইবে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিতেছেন যে, স্বপ্নের প্রথম দিকে দৃষ্ট ঘটনাগুলি যখন সবই ঘটিয়াছে, জলে শিলা ভাসিয়াছে, কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে এবং বিভীষণ রামের সেবা করিতেছেন,—তখন রাবণের বিনাশ এবং সীতারামের পুনর্মিলনও অবশ্যই ঘটিবে।

মিলি আঁখি—মূর্ছাভঙ্গের পর চক্ষু মেলিয়া।

ভূতলে, হায়, সে বীর কেশরী—দ্বিতীয়বার মূর্ছিত হইবার পূর্বক্ষণে সীতা প্রথম বারের মূর্ছাভঙ্গের পর নিজেকে ভূমিতলে অবস্থিত এবং রাবণ-জটায়ুকে শূন্যে যুধ্যমান অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারের মূর্ছাপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ধরিত্রী-প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ ঘটনার চিত্রাবলী দর্শনের পর পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া দেখিলেন যে, রাবণ সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং রাবণের সহিত যুদ্ধরত জটায়ু বজ্রাহতপর্বত শৃঙ্গের মত আহত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন।

ইন্দীবর-আঁখি—পদ্ম-নয়ন। জটায়ু—গরুড়-পুত্র। হীনায়ু—মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়। অতি মৃদু স্বরে—মরণোন্মুখ বলিয়া। দেবালয়ে—দেবপুরে, স্বর্গে। (অপ্রচলিত)

পড়িলি সঙ্কটে ইত্যাদি—সীতার পরিচয় না জানিলেও জটায়ু তাঁহার অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি অসামান্য বংশের কুলবধূ, এবং তাঁহাকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণের বিপদ আসন্ন।

নীলোর্ম্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গপূর্ণ।

অনম্বর-পথে—আকাশ পথে। শব্দটি মধুসূদন একাধিক স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়—

"অনম্বর-পথে সুকেশিনী
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে" (২।১০৫)

এবং "অনম্বর আঁধারি ধাইল—" (৭।৬১২)

অম্বর শব্দের অর্থও আকাশ। সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দুইটি শব্দ দ্বারা একই বস্তু জ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অনম্বর শব্দের অন্তর্গত অম্বর ভিন্নার্থক শব্দ। এই স্থলে অম্বর অর্থে বস্ত্র, আবরণ। ন + অম্বর (আবরণ) এই অর্থে আবরণশূন্য উন্মুক্ত আকাশ।

মনোরথ-গতি—ইচ্ছার বা মানুষের চিন্তার ন্যায় অবাধ ও দ্রুতগতি বিশিষ্ট। তুলনীয়—

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।। (ভারতচন্দ্র)

এবং—

"How fleet is a glance of the mind!
Compared with the speed of its flight
The tempest itself lags behind,
And the swift-winged arrows of light." (Cowper)

রঞ্জনের রেখা—রক্তচন্দনের ফোঁটার ন্যায়।

কিন্তু কারাগার যদি ইত্যাদি—লঙ্কার শোভা সৌন্দর্য অতুলনীয় হইলেও সীতার নিকট উহা কারাগার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বন্দীর নিকট সুবর্ণগঠিত কারাগারের ন্যায়, অথবা আবদ্ধ পক্ষীর নিকট সুবর্ণনির্মিত পিঞ্জরের ন্যায় লঙ্কার সৌন্দর্য সীতার নিকটে নিরর্থক। 'অপ্রস্তুত' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক সুবর্ণময় কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীর এবং সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষীর উল্লেখ দ্বারা 'প্রস্তুত' অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সুবর্ণময় লঙ্কাপুরে অবরুদ্ধা সীতার অবস্থা জ্ঞাপন করার জন্য অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার।

কুঞ্জবিহারিণী—বনবিহারিণী পক্ষিণী। সীতার সহিত উপমিত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ। বিধির নির্ব্বন্ধ—বিধাতার অভিপ্রায়। কিন্তু সত্য যা কহিলা বসুধা—পৃথিবী স্বপ্নে তোমাকে যাহা যাহা দেখাইয়াছেন তাহা সবই সত্য হইবে। বীর-যোনি—বীর-প্রসবিনী।

ভেটিবে < অভি + অট ধাতু—অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে; মিলিত হইবে।

ভেটিবে রাঘবে তুমি ইত্যাদি—বসন্ত ঋতুতে পুষ্পপল্লব সজ্জিতা পৃথিবীরূপিণী নায়িকা যেরূপ বসন্তের অভ্যর্থনা করেন, সেইরূপ তুমিও মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিবে।

কৌমুদিনী < কৌমুদী—জ্যোৎস্না। ছন্দের অনুরোধে ইন্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয়।

মরুভূমে প্রবাহিণী ... শিরোমণি—নিরানন্দ শত্রুপুরীতে সরমার সাহচর্য পর পর পাঁচটি বিভিন্ন রূপক সাহায্যে ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে মালা-রূপক অলঙ্কার।

তপন-তাপিত—দুঃখরূপ প্রখর সূর্যতাপে দগ্ধ।

ভুজঙ্গিনী-রূপী—কালসর্প নয়ন বিমোহন হইলেও যেরূপ ভয়ঙ্কর, লঙ্কা মনোরম হইলেও সীতার পক্ষে সেইরূপ ভয়াবহ।

কাঙ্গালিনী সীতা ... অযতনে, ধনি?—দরিদ্র রত্ন পাইলে তাহাকে অযত্ন করে না—এই সামান্য বা সাধারণ উক্তি দ্বারা সীতা সরমার ন্যায় স্নেহশীলা বান্ধবীকে কখনও বিস্মৃত হইবেন না এই বিশেষ উক্তিটি সমর্থিত হওয়ায় এস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে।

রহিলা দেবী সে বিজন বনে ইত্যাদি—সরমা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে সেই নিরানন্দ নির্জন বনে সুন্দরী সীতা বনমধ্যে প্রস্ফুটিত একটি মাত্র ফুলের ন্যায় দর্শনীয় ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ—অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঘটিয়াছিল বলিয়া এই সর্গের নাম 'অশোকবন' রাখা হইয়াছে।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশা তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে তারকা দীপ্ত উজ্জ্বল রজনীকাল।

দ্বিতীয় সর্গে পাই : "উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।" (১৪)
তৃতীয় সর্গে : "উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।" (১৭)
চতুর্থ সর্গে : "..........................জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে।" (৩৩-৩৬)

এই চারি সর্গোক্ত ঘটনা প্রায় তুল্যকালীন;- একই রাত্রিতে সংঘটিত। পঞ্চম সর্গোক্ত ঘটনা একই রাত্রিতে সর্বশেষে ঘটিয়াছে।

ত্রিদশ-আলয়—দেবনিবাস স্বর্গভূমি। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা ঘটে বলিয়া দেবতাগণের নাম ত্রিদশ। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ। ত্রিদিব-পতি—স্বর্গপতি ইন্দ্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দপূর্ণ বাসস্থান বলিয়া স্বর্গের অন্য নাম ত্রিদিব।

কিন্তু চিন্তাকুল এবে—রাত্রি প্রভাত হইলেই মেঘনাদের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালী মেঘনাদের আক্রমণে লক্ষ্মণ রক্ষা পাইবেন কিনা এই চিন্তায় ইন্দ্র ব্যাকুল।

অভিমানে—শচীকে উপেক্ষা করিয়া বিনিদ্রভাবে চিন্তামগ্ন থাকার জন্য।

স্বরীশ্বরী—স্বর্গের অধীশ্বরী শচী; স্বর্ (স্বর্গবাচক অব্যয়) + ঈশ্বরী। সুরেশ—দেবরাজ।

ক্ষণেক মুদিছে, ইত্যাদি—দেবরাজ স্বয়ং বিনিদ্র থাকায় তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য আগতা মেনকাদি অপ্সরারাও বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিতে পারিতেছে না। অথচ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঢুলিয়া পড়িয়া পরমুহূর্তেই ইন্দ্রের ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছে। তরাসে < ত্রাসে—ইন্দ্রের অসন্তুষ্টির ভয়ে। স্পন্দহীন যেন—তন্দ্রাচ্ছান্নতাহেতু নিশ্চল।

চিত্র পুত্তলিকা-সম চিত্রলেখা—চিত্রলেখা নাম্নী অপ্সরা চিত্রে অঙ্কিত মূর্তির ন্যায় স্থির।

আর কারে ভয় তাঁর—ইন্দ্রের নিদ্রার অনিচ্ছা বুঝিয়া নিদ্রাদেবী ভয়ে তাঁহার কাছে যাইতেছেন না। ইন্দ্র ব্যতীত অপর কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা তিনি গ্রাহ্য করেন না।

দৈত্যদল আসি ইত্যাদি—ইন্দ্রকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া শচী পরিহাস করিয়া বলিতেছেন যে, প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণ কি পূর্বের মত স্বর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে?

রাবণি—রাবণপুত্র মেঘনাদ। পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গে পার্বতীর আনুকূল্যে ইন্দ্র মেঘনাদের নিধনকার্যে সমর্থ দৈবাস্ত্র মায়াদেবীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ চিত্ররথ নামক গন্ধর্বের সাহায্যে তাহা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন,—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পৌলোমী—পুলোমা (পুলোমন্) নামক দানবের কন্যা শচী। ইন্দ্র পুলোমাকে নিহত করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

অনন্ত-যৌবনা—কারণ দেবদেবীগণের যৌবনের পর অন্য দশা নাই।

যাহে বধিলা তারকে ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবীর দৈবাস্ত্রের পরিচয় দিবার সময়ে ইন্দ্রকে বলিয়াছেন: "দুরন্ত তারকাসুর, সুরকুলপতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী,
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।

বধিতে দানবরাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভধ্বজ সৃজি রুদ্রতেজে অস্ত্রে।" (৪৯২-৯৮)

দাসীর সাধনে—শচীর প্রার্থনায়। দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শচীও পার্বতীকে মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিতে ইন্দ্রের সহিত কৈলাসে গিয়াছিলেন। সাধ্বী—সতীশ্রেষ্ঠা। কালি—রাত্রি প্রভাত হইলে।

মায়া দেবীশ্বরী—দ্বিতীয় সর্গে মায়া ও পার্বতী স্বতন্ত্র দেবী। শিব পার্বতীকে বলিয়াছেন—

"পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে।" (৪৩৫-৩৭ পংক্তি)

কিন্তু এই সর্গে চণ্ডীর দেউলে দেবীর আবির্ভাব বর্ণনায় দেবী ও মায়া অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ৩৪৪-৩৫৮ পংক্তি দ্রষ্টব্য। ভাবতীয় পুরাণের দেবদেবী-চরিত্রের সহিত গ্রীক্ পুরাণোক্ত দেবদেবী-চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটাইবার ফলেই এরূপ অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। বধের বিধান—মেঘনাদবধের উপায়। দন্তী—হস্তী। আঁটে মৃগরাজে—পশুরাজ সিংহের সমকক্ষ হয়।

জানি আমি ... আঁটে মৃগরাজে?—এস্থলে লক্ষ্মণ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদের সমকক্ষ নহেন। এই উক্তিটি পরবর্তী দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুটিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

দম্ভোলি-নির্ঘোষ—বজ্র-গর্জন। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। মধুসূদন কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত শব্দ। বিমান—ইন্দ্রের আকাশ-যান। "ব্যোমযানং বিমানঃ" (অমরকোষ)। চাপে—ধনুকে।

মহেম্বাস—মহাধনুর্ধর। ইষুর (বাণের) আস (আসন) = ধনুক; মহৎ ইম্বাস যাহার, মহেম্বাস।

ঐরাবত—সমুদ্রোদ্ভূত ইন্দ্রের হস্তী। "ঐরাবতোভ্রমাতঙ্গৈরাবণাভ্রমু-বল্লভাঃ"—(অমরকোষ) ঐরাবত, অভ্রমাতঙ্গ, ঐরাবণ এবং অভ্রমু-বল্লভ এই চারিটি ঐরাবতবাচক শব্দ।

ত্রিদিব-দেবী—ত্রিদিববাসিনী অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী দেবী। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

সরসে—সরোবরে। সরঃ (সরস্) শব্দের উত্তর অধিকরণে 'এ' বিভক্তি।

সরসে যেমতি ইত্যাদি—সরোবরে রাত্রিকালে নিমীলিত ম্লান পদ্মের চারিপাশে জ্যোৎস্নারাশিকে যেমন দেখায়, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট ইন্দ্র-শচীর চারিপাশে অবস্থিত মেনকাদি সুন্দরীগণকেও তেমন দেখাইতেছিল; উপমেয় ইন্দ্র-শচী ও মেনকাদি এবং উপমান মুদিত পদ্ম ও সুধাকর-কররাশি। ইহাদের সাধারণ ধর্ম (ক্রিয়াগত) প্রথম বাক্যে 'দাঁড়াইলা চারিদিকে' এবং পরবাক্যে 'বেড়ে' বিভিন্ন হইলেও একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া বস্তু-প্রতিবস্তুভাব-বিশিষ্ট উপমা অলঙ্কার। কিম্বা দীপাবলী ইত্যাদি—অথবা শারদীয়া দুর্গাপূজাকালে দুর্গাদেবীর বেদীর নিম্নে প্রদীপসমূহের দীপ্তির সহিত ইন্দ্র-শচীর সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত মেনকাদির দেহকান্তির তুলনা করা চলে। একই উপমেয়ের সহিত একাধিক উপমানের তুলনাহেতু মালোপমা অলঙ্কার।

চির-বাঞ্ছা—সর্বকালীন কামনার ধন। 'মায়েরে' শব্দের বিশেষণ। মৌনভাবে—চিন্তাকুলতা হেতু। দম্পতী—স্বামি-স্ত্রী। জায়া ও পতি শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসে জায়াপতী, জম্পতী, ও দম্পতী হয়; দ্বিবচনান্ত শব্দ বলিয়া 'ঈ'-কারান্ত। উতরিলা < অব + তৃ—অবতীর্ণ হইলেন; উপস্থিত হইলেন। দেবালয়ে—দেবধাম স্বর্গে। (অপ্রচলিত)

রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল ইত্যাদি—তেজস্বিনী মায়াদেবী ইন্দ্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভা রত্নসমূহের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় নন্দনকাননে প্রস্ফুটিত স্বভাবতঃ উজ্জ্বল মন্দারপুষ্প সূর্যকিরণস্পর্শে যেরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, সেইরূপ রত্নসমূহ হইতে নির্গত

জ্যোতিও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা ইত্যাদি—মায়াদেবী ইন্দ্রাদি হইতে মহত্তরা বলিয়া শচী ও ইন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সুধিলা (শুধিলা)—জিজ্ঞাসা করিলেন। আদিতেয়—অদিতির পুত্র দেবতা; এস্থলে ইন্দ্র। মনোরথ তোমার পূরিব—তোমার পরমশত্রু মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব।

রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে—শক্তিদ্বারা না পারিলেও দৈবীমায়ার সাহায্যে রাক্ষসবংশের শ্রেষ্ঠরত্নস্বরূপ মেঘনাদের বিনাশ ঘটাইব। রূপক অলঙ্কার।

পোহাইছে—প্রভাত হইতেছে। প্র + ভান > পোহানো। ভবানন্দময়ী—বিশ্বের আনন্দদায়িনী।

লঙ্কার পঙ্কজরবি—মেঘনাদের বিশেষণরূপে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। লঙ্কারূপ পঙ্কজের পক্ষে সূর্য স্বরূপ মেঘনাদ। শব্দটিকে সমাসের নিয়মানুসারে সার্থক প্রয়োগ বলা চলে না। প্রথমে লঙ্কারূপ পঙ্কজ এই রূপক কর্মধারয় সমাস গঠন না করিয়া রবির সহিত সমাসবন্ধন করা যায় না। 'লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি' অথবা 'লঙ্কা-পঙ্কজের-রবি' সার্থকতর প্রয়োগ হইত। মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতা "কমলে কামিনী"তে "কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ" এই সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও এই জাতীয় সমাস-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় এবং 'সাপেক্ষত্বেপি গমকত্বাৎ সমাসঃ' (অর্থাৎ পদসমূহের পরস্পর সাপেক্ষত্ব সত্ত্বেও সুস্পষ্ট অর্থবোধহেতু সমাস) এই বচন দ্বারা সমাস স্বীকৃত হয়।

নিকুম্ভিলা—রামায়ণে লঙ্কার একটি পর্বতগুহার নাম। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের যজ্ঞগৃহরূপে কল্পিত। অসুরারি—হে অসুর-রিপু ইন্দ্র। নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী—বলবান হইলেও নিরস্ত্র অবস্থায় শক্তিহীন মেঘনাদ। আনায়-মাঝারে—জাল বা ফাঁদের মধ্যে আবদ্ধ। বারতা < বার্তা—সংবাদ। রঘুমিত্র—বিভীষণের বিশেষণ। দেবেন্দ্র—(সম্বোধনে) হে দেবরাজ ইন্দ্র। কৃতান্ত সদৃশ—যমস্বরূপ ভয়ঙ্কর। কৃত অন্ত যাহা দ্বারা,—কৃতান্ত = যম। নমুচিসূদন—নমুচি নামক দৈত্যের বধকর্তা ইন্দ্র। কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব—রাক্ষস-বংশের দর্প-স্বরূপ মেঘনাদকে। সমরিবে—(নামধাতু) সমর বা যুদ্ধ করিবে। বজ্রি—হে বজ্রধারি ইন্দ্র। পিরীতি < প্রীতি—সন্তোষ, আনন্দ। শক্তীশ্বরী—মহাশক্তি মায়াদেবী। দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা ইত্যাদি—মায়াদেবীর সুস্পষ্ট আশ্বাসবাক্যে নিশ্চিন্ত হওয়ায় ইন্দ্র নিদ্রিত হইলেন। অচেতন নিদ্রায় চেতনা বিশিষ্ট মানবের সমান কার্য প্রণাম করা আরোপহেতু সমাসোক্তি অলঙ্কার।

মহা-ইন্দ্র—মহেন্দ্র শব্দটিকে ছন্দের অনুরোধে অসংহিত রাখা হইয়াছে।

কিঙ্কিণী—নূপুর, মেখলা ইত্যাদিতে সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টিকা বা ঘুঙুর।

কাঁচলি < কঞ্চুলিকা—স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরক বস্ত্রবন্ধন। সৌরকররাশিরূপিণী সুরসুন্দরী—সূর্যের কিরণমালার ন্যায় সমুজ্জ্বল-দেহা মেনকাদি দেবপুরীর সুন্দরীগণ।

পরিমলময় বায়ু—সুগন্ধি বায়ুপ্রবাহ। পরিমল শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন প্রভৃতি মর্দিত বা পিষ্ট বস্তু হইতে উৎপন্ন সুগন্ধ "মর্দনোত্থে পরিমলম্" (অমর)। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সুবাস অর্থেই ব্যবহৃত। অলক—কপাল ও গণ্ডস্থলে সংসর্পিত চূর্ণ-কুন্তল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ।

প্রফুল্লিত < প্রফুল্ল—বিকশিত, প্রস্ফুটিত। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ।

বিমোহিনী—বিশ্বের বিভ্রম উৎপাদনকারিণী মায়া।

স্বপন-দেবীরে—স্বপ্ন বা নিদ্রার দেবতা; গ্রীক্-পুরাণের 'সম্‌নাসের' অনুকরণে কল্পিত। ইলিয়ড্ কাব্যেও জুনো বা হীরী দেবীকর্তৃক গ্রীক্ সেনাপতি আগামেম্‌নের নিকট আশ্বাসবাণী-বহনকারী নেষ্টর-রূপধারী সম্‌নাস্‌কে প্রেরণের কাহিনী আছে। তুলনীয়, "Oh Aterus'on! Canst thou indulge thy rest?" (Canto III) দেউল < দেবকুল—দেবমন্দির।

দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে—মায়াদেবীর অধীরতার কারণ এই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের পক্ষে অপরের অজ্ঞাতসারে চণ্ডীর দেউলে যাইয়া দেবীর পূজা করা অসম্ভব হইবে এবং অন্যদিকে মেঘনাদ যজ্ঞ সমাপন করিয়া শক্তিলাভের সুযোগ পাইবে।

উরি < উতরি < অব + তৃ—অবতীর্ণ হইয়া, আবির্ভূত হইয়া।

কুহকিনী—কুহক বা মায়া সৃষ্টি করিতে সমর্থা স্বপ্নদেবী।

যবে আমি বিদায় হইনু ইত্যাদি—লক্ষ্মণের অযোধ্যা ত্যাগকালে সুমিত্রা নিশ্চয়ই পুত্রবিরহে আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে কবির উক্তির মধ্যে তাঁহার ধর্মান্তরগ্রহণ এবং স্নেহময়ী মাতার সহিত চিরবিচ্ছেদের দুঃখই যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ। বীরকুঞ্জরের (হস্তীর) মত; উপমিত সমাস।

কুঞ্জর-গমনে—হস্তীর ন্যায় স্থির ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে।

রক্ষঃপুরে রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে—রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র যে বিভীষণের উপর একান্ত নির্ভরশীল তাহা রামচন্দ্র পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। কবির ব্যক্তিগত ধারণাও যে এইরূপ ছিল তাহা "He (Meghanad) was a noble fellow, and but for that scoundrel Vibhisana, would have kicked the monkey army into the sea." এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

> "শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
> আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
> এ দুর্ব্বল বলে, কহ এ বিপত্তি কালে?" (৩য়। ৩০০-৩০২)
> "নীলকণ্ঠ যথা
> (নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলা ভবে,
> নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।" (৩য়। ৪৪২-৪৪৪)
> "নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
> জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে।" (৬ষ্ঠ। ২৩৫-২৩৬)
> "শুভক্ষণে, সখে,
> পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
> রাঘবকুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে!
> কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
> গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
> মিত্র-কুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।" (৬ষ্ঠ। ৭৩২-৭৩৭)

মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণ সম্বন্ধে রামচন্দ্রের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি কবির নিজস্ব ধারণারই প্রতিফলন মাত্র। আপনি রাক্ষসনাথ পূজেন সতীরে—কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাবণকর্তৃক দেবীপূজার উল্লেখ আছে। আয়াসিতে—(নাম ধাতু) আয়াস বা ক্লেশ দিতে।

আয়সী-সদৃশ— লৌহময় বর্মস্বরূপ। অয়ঃ (লৌহ) গঠিত—আয়স; স্ত্রীলিঙ্গে আয়সী।

বীতিহোত্র-রূপী—অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। বীতি (ভোজন) হোত্র (হোম) যাহার, অথবা বীতি (দীপ্তি) হোত্রে (হোমকার্যে) যাহার; সমানাধিকরণ বা ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস।

দীপিছে ললাটে ইত্যাদি—মহাসর্পের মস্তকে উজ্জ্বল মণির ন্যায় লক্ষ্মণ-দৃষ্ট ভীষণ-দর্শন মূর্তির কপালে চন্দ্রকলা দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল।

জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে ইত্যাদি—সেই ভীষণ মূর্তির মস্তকস্থিত পিঙ্গল জটারাশির মধ্যে গঙ্গার শুভ্র জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন শরৎকালের রাত্রিতে মেঘের মধ্যে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। 'যেন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমানকেই উপমেয়রূপে প্রবল সংশয় প্রকাশ করায় এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়াছে।

রজোরেখা < রজতরেখা—রৌপ্যবৎ শুভ্র বিকাশ। রজত অর্থে মধুসূদন বহুস্থলে রজঃ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ। বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ—দেহখানি ভস্মলিপ্ত।

চিনিলা সৌমিত্রি ভূতনাথে—বিশাল ও ভীষণ আকৃতি, ললাটস্থ চন্দ্রকলা, জটাজালের মধ্যে গঙ্গাধারা, ভস্মলিপ্ত দেহ এবং হস্তস্থিত ত্রিশূল দর্শনে লক্ষ্মণ উদ্যানরক্ষী মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন।

নিষ্কোষিয়া—কোষমুক্ত করিয়া। তেজস্কর—প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল।

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ—রঘুর পুত্র অজ, তাহার ঔরসজাত দশরথ।

বিলম্ব না সহে—কারণ অধিক বিলম্বে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলে কার্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।

যথা শুনি বজ্রনাদ, ইত্যাদি—বজ্রধ্বনি পর্বতে যেরূপ গম্ভীর শব্দে প্রতিধ্বনিত হয় সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে। বৃষধ্বজ—মহাদেব; বৃষ দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা। বৃষ ধ্বজ (চিহ্ন বা উপলক্ষণ) যাঁহার; বহুব্রীহি। বাখানি < ব্যাখ্যান—প্রশংসা করি।

কেমনে আমি যুঝি ইত্যাদি—তোমার সাহস দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট ত হইয়াছিই, তাহার উপর স্বয়ং দেবী আজ তোমার প্রতি তুষ্ট বলিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রসন্নময়ী—ভক্তের প্রতি প্রসন্না দেবী পার্বতী। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ।

কপর্দ্দী—কপর্দ অর্থাৎ জটাজূটধারী মহাদেব। "কপর্দোহস্য জটাজুটঃ পিনাকোই-জগবংধনুঃ।" (অমরকোষ) কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি—লক্ষ্মণের চণ্ডীর দেউল যে বনে অবস্থিত, সেই বনে প্রবেশ করিয়া নানারূপ বিভীষিকা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হইবার চিত্রসমূহ ট্যাসো-রচিত "জেরুসালেম উদ্ধার" কাব্যের ১৫শ ও ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত।

আইল ধাই ইত্যাদি—এই মায়াসিংহের কাহিনী উল্লিখিত কাব্যের ১৫শ সর্গের ৫০তম অনুচ্ছেদে আছে। হর্য্যক্ষ—হরি (হরিদ্বর্ণ) অক্ষি যাহার; সিংহ।

উলঙ্গিলা—উন্মুক্ত করিলেন। উলঙ্গ < ওলঙ্গ < ওনঙ্গ < অব-নগ্ন—আবরণশূন্য।

নির্ঘোষে—গভীর গর্জনধ্বনির সহিত। ক্রিয়া-বিশেষণ। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

দ্বিগুণ আঁধার দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে—ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ বিকাশের পর অন্ধকারকে গাঢ়তর বলিয়া মনে হয়। বাহুবলে উপাড়িলা তরু প্রভঞ্জন—এই মায়া-ঝটিকার কাহিনীও উল্লিখিত কাব্যের ১৮শ সর্গের ৩৭তম অনুচ্ছেদে আছে।

দাবানল পশিল কাননে—মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাতে সমস্ত বন যেন দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। গর্জ্জিল জলধি দূরে, ইত্যাদি—যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধশঙ্খ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া এবং অসংখ্য ধনুকের টঙ্কারের সহিত মিশিয়া যেরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে সেইরূপ ভীষণ শব্দে দূরস্থিত ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল।

গর্জ্জিল জলধি দূরে, ইত্যাদি—যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধশঙ্খ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া এবং অসংখ্য ধনুকের টঙ্কারের সহিত মিশিয়া যেরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে সেইরূপ ভীষণ শব্দে দূরস্থিত ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল।

সে রৌরবে—অগ্নিময় ভীষণ নরকে। এস্থলে রৌরবের ন্যায় ভীষণ দাবানলের মধ্যে। উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান রৌরবকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

আচম্বিতে—অকস্মাৎ, হঠাৎ চমকিত করিয়া; আচমকা।

কুসুম-কুন্তলা মহী—অরণ্যকে মহী অর্থাৎ পৃথিবীর কেশরূপে কল্পনা করিয়া বনমধ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহকে পৃথিবীর কেশের ভূষণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

মন্দ সমীর স্বনিলা—ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনের পর পুনরায় মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নিক্কণে—শ্রুতিমধুর ধ্বনিতে। মন্দিরা < মঞ্জীর—ক্ষুদ্র করতাল। সপ্তস্বরা—জলতরঙ্গ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। উথলিল—প্লাবিত করিল; উৎ + স্থল শব্দ হইতে নিষ্পন্ন।

দেখিলা সম্মুখে বলী ইত্যাদি—এই মায়া প্রলোভন চিত্রটিও উল্লিখিত কাব্যের দুইস্থলে (১৫শ সর্গ, ৫৮–৬৬ অনুচ্ছেদে এবং ১৮শ সর্গ, ২৬—৩৫ অনুচ্ছেদে) পাওয়া যায়।

অবগাহে দেহ—অধিকপদতা দোষ; কারণ অবগাহে অর্থ দেহ নিমজ্জিত করিয়া স্নান করে।

কৌমুদী নিশিতে যথা—সুন্দরীরা সরোবরে স্নান করিতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন জ্যোৎস্নারাশি রাত্রিকালে সরোবরের জলে নামিয়া আসিয়াছে।

দুকূল, কাঁচলি শোভে কূলে, ইত্যাদি—সুন্দরীরা কেহ কেহ সরোবরে অবতরণকালে তাহাদের বস্ত্রাদি তীরে খুলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ নগ্নদেহে স্নান করিতেছে। তাহাদের স্বর্ণবর্ণ দেহকান্তি স্বচ্ছ জলরাশির মধ্যে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মানস-সরোবরে এক ঝাঁক স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে।

কেহ তুলে পুষ্পরাশি; ইত্যাদি—অন্য মায়া-সুন্দরীগণ পুষ্পবনে পুষ্প চয়ন করিয়া তাহাদের অলকদাম কুসুমে ভূষিত করিতেছে;—যে মনোমুগ্ধকর অলকদাম পুরুষের পক্ষে কামের শৃঙ্খল স্বরূপ। দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত—হস্তিদন্তে নির্মিত। দ্বিরদ = দুইটি বৃহৎ দন্ত আছে যাহার—হস্তী।

কোলম্বক—বীণার কাষ্ঠাদিনির্মিত অঙ্গ বা ঠাট।

হৈম—হেম বা স্বর্ণনির্মিত। কবি কয়েকস্থলে এই অর্থে ব্যাকরণদুষ্ট 'হৈমময়' শব্দটি প্রয়োগ করিলেও এইস্থলে শব্দটির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন।

সঙ্গীত-রসের ধাম—বীণার তার হইতেই মধুর সঙ্গীত নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তারই সঙ্গীতের আবাসস্থল। সুখময়ী—আনন্দময়ী; 'কেহ' শব্দের বিশেষণ। পীবর—স্থূল, ঘন।

ক্কণিছে রশনা—মেখলা মধুর শব্দ করিতেছে। নৃত্যহেতু অঙ্গ সঞ্চালনে বুকের রত্নহার দোদুল্যমান, এবং নূপুরদ্বয় ও মেখলা ঝঙ্কৃত হইতেছে।

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে— কালসর্পের প্রাণবিনাশক দংশনে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নশ্বর শব্দের অর্থ নাশশীল, যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; যেমন 'নশ্বর জীবন'। মধুসূদন এই স্থলে এবং অন্য কয়েক স্থলেও নশ্বর 'বিনাশক' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা অবাচকতা দোষ।

যেমন— "বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতম প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।" (৬।৬)
"যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে," (৭।১২২)
"হত এ নশ্বর রণে" (৮।১২২)

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে ... জ্বলে পরাণ—কাল সর্পের দংশন মানুষের মৃত্যুর প্রসিদ্ধ কারণ। এখানে সুন্দরীগণের পৃষ্ঠবিলম্বিত মণিশোভিত বেণীসমূহ সর্পবৎ হইলেও তাহাদের দংশন-ক্ষমতা নাই; অথচ মানুষের প্রাণ জ্বলিতে থাকে বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি দেখাইবার চেষ্টা করিলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। সর্পদংশনরূপ প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতীতই মানুষের বিষদাহ-জ্বালা কেবল সর্পাকৃতি বেণীদর্শনের ফলেই ঘটে বলায় এস্থলে বিভাবনা অলঙ্কার।

হেরিলে ফণী পলায় তরাসে ... বাঁধিতে গলায়—কার্য-কারণে বৈষম্য প্রদর্শিত হইলে বিষম অলঙ্কার হয়। এখানে প্রথমে ফণি-দর্শনমাত্র লোক ভয়ে পলায়ন করে বলিয়া, 'এ ফণী' অর্থাৎ সুন্দরীগণের সর্পাকৃতি বেণী দেখিলে কোন লোক না তাহাকে গলায় বাঁধিতে চায়, বলা হইয়াছে। ফণিদর্শনে ভয়ে পলায়নের পরিবর্তে তাহাকে সযত্নে গলায় বেষ্টন অত্যন্ত অস্বাভাবিক কার্য। সুতরাং এখানে কার্য-কারণে বৈষম্য জনিত বিষম অলঙ্কার হইয়াছে।

মধুসখা—মধুর অর্থাৎ বসন্তের সখা কোকিল। সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী 'মধুসখ' পদই শুদ্ধ; কিন্তু বাঙ্গালায় এইরূপ প্রয়োগ প্রচলিত। জলযন্ত্র—ধারাযন্ত্র, ফোয়ারা। অরিন্দমে—শত্রুজয়ী লক্ষ্মণকে। গাইল—গানের মত মধুর স্বরে বলিল।

নহি নিশাচরী মোরা—রাক্ষসপুরীতে অবস্থান করিলেও আমরা রাক্ষস-কন্যা নহি।

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন উদ্যানে—দেবকন্যা বলিয়া আমরা সুচিরযৌবনা।

অধর-সরসে—অধররূপ সরোবরে। উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত—চিরযৌবনা বলিয়া।

আমা সবে—আমরা সকলে; 'মোরা সবে'। 'আমা সবে' কর্মকারকে প্রযুক্ত হয়, কর্তায় ইহা অপ্রচলিত।

কাটে জীবনের ফুল এ ভব মণ্ডলে—যাহারা পৃথিবীতে জীবনরূপ ফুলের দল ও বৃন্ত কাটিয়া তাহাকে অকালে নষ্ট করে।

যত = যাহারা (সর্বনাম) জানকী সতী—উদ্ধারিব ক্রিয়ার কর্ম। সুরাঙ্গনে—(সম্বোধনে) সুর + অঙ্গনা; দেববালা।

মাতৃ হেন মানি তোমা সবে—কারণ দেবীগণ সর্বদাই মানুষের নিকট মাতার ন্যায় পূজ্যা।

বিজন সে বন—পবিত্রাত্মা লক্ষ্মণ মায়াসুন্দরীগণের রূপে বিভ্রান্ত না হইয়া তাঁহাদিগকে মাতৃ-সম্বোধন করায় তাহারা স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়া বন জনশূন্য হইল। সদ্যোজীবী—ক্ষণস্থায়ী।

পীঠতলে—দেবীর বেদিকার বা পীড়ির নিম্নে। ঝাঁঝরী < ঝর্ঝরিকা—কাঁসর, ঘণ্টা। সুরভি—সুরভিত, সুবাসযুক্ত। বিশেষণ। ধূপ ধূপদানে পুড়ি, ইত্যাদি—ধূপদানে ধূপ পুড়িয়া সুরভিত পুষ্পগন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমগ্র স্থানটি সুগন্ধে পূর্ণ করিতেছে।

তুলিলা যতনে নীলোৎপল—রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র নীলপদ্ম দ্বারা দুর্গাদেবীর অর্চনা করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সর্গে লক্ষ্মণ কর্তৃক নীলোৎপল দ্বারা সিংহবাহিনী চণ্ডিকার অর্চনা সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসোক্ত ঘটনার ছায়ায় কল্পিত হইয়াছে।

সিংহবাহিনীরে—সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া চণ্ডীকে। এই কাব্যে অন্যত্র পার্বতী ও মায়া স্বতন্ত্র দেবীরূপে উক্ত হইলেও (২য় সর্গ,—৪৩৫—৪৩৭ পংক্তি) এখানে পার্বতী, চণ্ডী বা দুর্গা, এবং মায়া এক ও অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা। বলা বাহুল্য যে, এই কল্পনাই ভারতীয় পুরাণসম্মত। দ্বিতীয় সর্গের দৈব ষড়যন্ত্রজালের মধ্যে ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং এমন কি, নাম পর্যন্ত গুলাইয়া ফেলিয়াছেন!

সাষ্টাঙ্গে প্রণমিয়া—ভূমিতে লুণ্ঠিত দেহে প্রণাম করিয়া। দুই চরণ, দুই জানু, দুই হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং কপাল,—এই আটটি অঙ্গদ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক প্রণামকে 'সাষ্টাঙ্গে প্রণাম' বলে।

সাধ < শ্রদ্ধা—বাসনা, আকাঙ্ক্ষা। গরজিলা দূরে মেঘ ইত্যাদি—সহসা প্রচণ্ড দেবতেজের আবির্ভাবসূচক। মহামায়ে—মহামায়া চণ্ডিকাকে।

তেজঃ রাশি রাশি ইত্যাদি—অকস্মাৎ দেবীর শক্তির আবির্ভাবে প্রচণ্ড তেজঃ উৎপন্ন হইয়া ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎশিখার ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। লক্ষ্মণ সভয়ে দেখিলেন যে, চক্ষু

উন্মীলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুই দেখিতেছেন না;—সমস্ত মন্দির যেন গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

হাসিলা সতী—ভক্তের বিহ্বলতা দর্শন করিয়া। পলাইল তমঃ দূরে—ভক্তের প্রতি দেবীর প্রসন্ন করুণ হাস্যে অন্ধকার দূর হইল।

দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!—দেবীর কৃপায় লক্ষ্মণের চক্ষুর ধাঁধা ঘুচিয়া গেল এবং তিনি দেবীকে দর্শন করিবার উপযোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন।

নগর-মাঝে—রামায়ণে নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থল লঙ্কার প্রত্যন্ত দেশস্থ নির্জন গিরিগুহায় বলিয়া বর্ণিত।

নিকষে যথা অসি—কোষ মধ্যে রক্ষিত তরবারির ন্যায় অদৃশ্য। নিকষ শব্দের অর্থ স্বর্ণপরীক্ষায় ব্যবহৃত কষ্টিপাথর; এস্থলে কোষ বা তরবারির খাপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবাচকতা দোষ।

আবরিব মায়াজালে আমি দোঁহে—এই বাক্যটি এবং ইহার পূর্বে "আপনি আমি আসিয়াছি হেথা সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে"—এই বাক্যটি, এই স্থলে সুস্পষ্টরূপে চণ্ডী ও মহামায়ার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে। কূজনিল জাগি পাখীকুল ফুলবনে—ইত্যবসরে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত আসন্ন হওয়ায় মধুর স্বরে পাখীরা গাহিয়া উঠিল। আকাশ সম্ভবা বাণী—দৈববাণী। নীরবিলা সরস্বতী—দৈববাণী স্তব্ধ হইল। তথা—সেই সুখের আলয়ে। অনাবশ্যক প্রয়োগ। কুঞ্জবন-গীতে—কুঞ্জবনে অবস্থিত পক্ষিগণের প্রভাতী গানে।

যেমতি নলিনীর কানে অলি ইত্যাদি—ভ্রমর যেরূপ অস্ফুট মৃদুগুঞ্জনে পদ্মের নিকট প্রণয়ের অনির্বচনীয় মধুর ভাব প্রকাশ করে সেইরূপ মৃদু ও মধুর কণ্ঠে।

ডাকিছে কূজনে—কাকলী শব্দচ্ছলে আহ্বান করিতেছে।

হৈমবতী উষা তুমি রূপসি, তোমারে—উষার ন্যায় স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট তোমাকে। হেম হইতে নিষ্পন্ন হৈম শব্দ বিশেষণ বলিয়া তাহার পর পুনরায় 'বতু' প্রত্যয়যোগে বিশেষণ গঠন করা যায় না। হিমবানের কন্যা অর্থে হৈমবতী অবশ্য শুদ্ধ প্রয়োগ; কিন্তু এখানে সে অর্থ হয় না।

রূপসি—(সম্বোধনে ঈ-কারান্ত স্ত্রীবাচক শব্দে ই-কার) হে সুন্দরি। রূপ আছে যার অর্থে শ-প্রত্যয়যোগে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা = রূপবতী, সুন্দরী। 'সরসী', 'বেতসী,' 'আয়সী' প্রভৃতি অস্-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাদৃশ্যে রূপসী। মিল < মীল ধাতু—মেল; উন্মীলিত কর।

উঠ, চিরানন্দ মোর ইত্যাদি—প্রমীলার সুপ্তিভঙ্গ করিবার জন্য মেঘনাদের প্রণয়পূর্ণ উক্তির উপর অনুরূপ ক্ষেত্রে ঈভের প্রতি এ্যাডামের উক্তির ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। তুলনীয়—

"Then with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,—
Her hand oft touching, whispered thus :— Awake,
My fairest, my espoused, my latest found,
Heaven's last best gift, my ever new delight :
Awake, the morning shines." (Paradise Lost)

সূর্য্যকান্তি-মণি—সূর্যের কিরণসমূহকে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ স্ফটিক বা কাচ; আতশী কাচ। সূর্য্যকান্তি-মণি সম এ পরাণ, ইত্যাদি—যেমন সূর্যের অবস্থিতিতে তাহার কিরণ প্রতিফলনের জন্যই আতশী কাচের দীপ্তি সম্ভবপর, তেমনই তোমার সান্নিধ্য ও প্রভাবহেতুই আমার সকল তেজ ও গৌরব। তোমার অভাবে সূর্যহীন আতশী কাচের ন্যায় আমিও মলিন ও নিষ্প্রভ।

ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম—আমার সৌভাগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ। মহার্হ—মহার্ঘ, বহুমূল্য।

উঠি দেখ, শশিমুখি ... মঞ্জুকুঞ্জ বনে কুসুম—সাধারণতঃ নারীর সৌন্দর্য ও লাবণ্য জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে কুসুমকে উপমানরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে উপমেয় প্রমীলার সৌন্দর্যের আধিক্য

বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, নিদ্রিতাবস্থায় প্রমীলাকে অসতর্কভাবে পাইয়া কুসুমসমূহ তাহার কান্তি অপহরণ করিয়াই লাবণ্যময় হইয়া উঠিয়াছে। উপমানের নিষ্ফলতা প্রদর্শনহেতু এস্থলে প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে।

গোপিনী < গোপী—বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপকন্যাগণ। শরমে—লজ্জায়। ফারসী শব্দ।

চক্ষুঃদ্বয়—সন্ধির নিয়মানুসারে 'চক্ষুর্দ্বয়' শুদ্ধ প্রয়োগ হইলেও দুঃশ্রাব্যতা পরিহারের জন্য সন্ধি অস্বীকৃত। রাবণ-বধূ—রাবণের পুত্রবধূ প্রমীলা। বধূ অর্থে পত্নী এবং পুত্রবধূ উভয়ই বুঝায়।

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে ইত্যাদি—যেভাবে ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে মলিনমুখী খদ্যোতের বিশেষণ; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ কেন? ছন্দের অনুরোধে 'খদ্যোত' প্রয়োগ করিলেও কবির মনে 'খদ্যোতিকা' শব্দই বর্তমান ছিল বলিয়াই কি? ইহার অর্থ এই যে,— প্রভাতের আবির্ভাবের সহিত নিষ্প্রভ জোনাকিগুলি শিশিরসিক্ত সুগন্ধি ফুলগুলি হইতে উড়িয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়সূচক ছেদচিহ্নটি 'অরুণের-সাথে' কথাটির পরে না হইয়া 'মলিনমুখী' শব্দের পর হইলে, ব্যাখ্যা করিবার কোন অসুবিধা হয় না। সে স্থলে অর্থ হইবে,—মেঘনাদের সহিত শাশুড়ী মন্দোদরীর নিকটে গমনোদ্যতা লজ্জাবনতমুখী বধূ প্রমীলা শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইলে মনে হইল, যেন সমুজ্জ্বল অরুণরূপ নায়কের সহিত লজ্জাবনতমুখী ম্লান প্রভাত-তারারূপ নায়িকা আবির্ভূত হইয়াছে। অরুণোদয়ে প্রভাত-তারার অনুজ্জ্বলতাকে তাহার লজ্জাগ্রস্ত ভাবরূপে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি ফুলদলে—ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে সঞ্চিত অমৃতের ন্যায় সুগন্ধি ও সুস্বাদু শিশিরবিন্দু ত্যাগ করিয়া।

পঞ্চস্বরে < পঞ্চম স্বরে। তুলনীয়, "গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত," (৪র্থ সর্গ, ৪০৫)। অবাচকতা দোষ।

নমিল রক্ষক—পুরীরক্ষক; প্রহরী। যানবাহদলে—শিবিকাবহনকারীরা।

মন্দোদরী মহিষী—রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী ময়দানবের ঔরসে হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মায়াবী এবং দুন্দুভি নামক দানবদ্বয় ইঁহার ভ্রাতা।

অতুল জগতে—শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান রাজার প্রধানা মহিষীর প্রাসাদ বলিয়া।

ভ্রমিছে দুয়ারে প্রহরিণী ইত্যাদি—মন্দোদরীর প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া অন্তঃপুর-রক্ষিণী প্রহরিণীগণ সতর্কভাবে বিচরণ করিতেছে।

মনোহর স্বপনে যেমতি—বীণার ঝঙ্কার মধুর বটে, কিন্তু অর্ধতন্দ্রার মধ্যে শ্রুত হইলে উহা আরও কোমল, মধুর ও অনির্বচনীয় হইয়া উঠে। মন্দোদরীর প্রাসাদে যে বীণার মৃদু মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে, উহা স্বপ্নে শ্রুত বীণাধ্বনির মত মনোমুগ্ধকর। ত্রিজটা—রামায়ণে এই নামে সীতার প্রতি অনুকম্পাশীলা রাক্ষসীর উল্লেখ আছে। তেঁই < তেঞি < তেণ < তেন কারণেন—সেই হেতু। সৌদামিনী গতি—বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিত-গতিবিশিষ্টা।

হে কৃত্তিকে হৈমবতি—কার্তিকের গর্ভধারিণী মাতা হৈমবতী উমা, এবং ধাত্রী মাতা কৃত্তিকাগণ। এই স্থলে মাতৃত্ব যাঁহাতেই আরোপ করি না কেন, হয় নিরর্থকতা, নতুবা ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ দোষ ঘটে। হৈমবতীকে মাতা বলিলে কৃত্তিকা অর্থহীন; কারণ হৈমবতী ও কৃত্তিকা এক নহেন। অন্যদিকে কৃত্তিকাগণকে মাতা বলিয়া তাঁহাদের উজ্জ্বলতা হেতু হৈমবতী শব্দটিকে 'স্বর্ণকান্তিবিশিষ্টা' এই অর্থে গ্রহণ করা চলে বটে, এবং কবিও অন্যত্র এই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়, তথাপি সে স্থলেও শব্দটির প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট হইয়া উঠে। কবি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়— "হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে পালিয়াছিল।" (২।৩৪৬)

শক্তিধর—কার্তিক; শক্তি নামক নিক্ষেপণীয় অস্ত্র ধারণ করেন যিনি। সেনা সুলোচনা—সুনেত্রা 'সেনা', 'দেবসেনা', বা 'ষষ্ঠী' ইন্দ্রের কন্যা এবং কার্তিকের পত্নী বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত।

শক্তিধর তব কার্তিকেয় ... সেনা সুলোচনা---উপমেয় মেঘনাদ ও প্রমীলার সহিত কার্তিকেয় ও সেনা এই উপমানদ্বয়ের অভেদ কল্পনা করায় রূপক অলঙ্কার। রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ—বধূ প্রমীলা যাহার রূপের নিকট উজ্জ্বল রোহিণী নক্ষত্রও নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

পুত্র, যার রূপে শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে---পুত্র মেঘনাদের রূপ দর্শনে উজ্জ্বল চন্দ্র সত্য সত্যই নিজেকে কলঙ্কযুক্ত বলিয়া মনে করে। উপমেয় বধূ ও পুত্রকে উপমান রোহিণী ও চন্দ্রের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলায় এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে।

ভাগ্যবতী তুমি! ভুবন-বিজয়ী শূর ইত্যাদি –পুত্র মেঘনাদ শৌর্যে জগজ্জয়ী এবং বধূ প্রমীলা সৌন্দর্যে জগন্মোহিনী। এইরূপ অসামান্য পুত্র ও পুত্রবধূ লাভ অসীম ভাগ্যবল ব্যতীত হয় না।

হায় রে, মায়ের প্রাণ, ইত্যাদি—কবি মাতৃ-হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, পুষ্পসমূহ হইতে যেরূপ সুবাসের উৎপত্তি, শুক্তি হইতে যেরূপ মুক্তার উৎপত্তি, এবং খনি হইতে যেরূপ মণিসমূহের উদ্ভব, সেইরূপ হে মাতৃ-হৃদয়, তোমা হইতেই জগতে স্বার্থলেশ-শূন্য অমূল্য ভালবাসার উৎপত্তি হয়। কোন বস্তুতে চেতনা আরোপ করিয়া সংক্ষেপে সম্বোধন করিলে ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রে 'Apostrophe' অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত সমাসোক্তির সহিত ইহার সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়কে এক বলা চলে না। কারণ অলঙ্কারে শুধু চেতনা আরোপই হয় না চেতনা-বিশিষ্ট প্রাণীর গুণ ও কার্য আরোপ করা হয়। উদ্ধৃত অংশটিকে Apostrophe বা বাংলায় সম্বোধন অলঙ্কার বলা যাইতে পারে।

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী ইত্যাদি—পুত্র মেঘনাদ রূপে শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পুত্রবধূ প্রমীলা লাবণ্যে শারদীয়া জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় এবং রক্ষোরাজমহিষী মন্দোদরী সৌন্দর্যে ও মহিমায় নক্ষত্রখচিত মুকুটধারিণী নিশার ন্যায়। রাত্রিকালে যেমন বৃক্ষপত্রে শিশিরপাত হয়, সেইরূপ মন্দোদরীর গণ্ডস্থলও বাৎসল্যের অশ্রুতে ভূষিত হইল। এস্থলে প্রথমে মন্দোদরী ও নিশাকে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া নিশাকালে বর্তমান চন্দ্র, জ্যোৎস্না ও শিশিরসিক্ত পত্রের সহিত মেঘনাদ, প্রমীলা ও অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থল প্রভৃতি অঙ্গের অভেদত্ব আরোপ করার জন্য সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

আশীষ দাসেরে---একান্ত অনুগত পুত্রকে আশীর্বাদ কর। বিশেষ্যরূপে আশীর্বাদ বাচক আশীষ শব্দটি বাংলায় সুপ্রচলিত। সংস্কৃত শব্দ হইতেছে আশীঃ (আশীর্) এবং আশিস্। সুতরাং অর্ধ-তৎসম শব্দরূপে গ্রহণ করিলেও বানান 'আশিস' হওয়া উচিত।

শিশু ভাই বীরবাহু—মেঘনাদ অগ্রজ বলিয়া বীরবাহুকে শিশু অতএব দুর্বল বলিতেছে।

তাত—খুল্লতাত, পিতৃব্য। সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠার্থক বা সম্মানবাচক তাত শব্দ দ্বারা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে এবং জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিতেন। (তুলনীয়—"গচ্ছ তাত যথাসুখম্"—লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রা।) খেদাইব—তাড়াইয়া দিব, বিতাড়িত করিব। খেদা ধাতু < খিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন। খিন্ন অর্থাৎ ক্লিষ্ট বা পীড়িত করিয়া দূর করা। রাণী (রানী) < রঞ্‌ঞী < রাজ্ঞী।

বাছনি—বাছা, বাছ < বৎস + আদরে বা ক্ষুদ্রার্থে নি প্রত্যয়। পদ্যে ব্যবহৃত।

কেমনে বিদায় তোরে ... তুই পূর্ণশশী আমার---এস্থলে পুত্র মেঘনাদে পূর্ণশশী আরোপ হইয়াছে বলিয়াই মাতা মন্দোদরীর হৃদয়ে আকাশ আরোপ করা হইয়াছে। একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ যদি অন্য উপমেয়ে তদুপযুক্ত উপমানের আরোপের কারণ হয় তাহা হইলে পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার হয়।

মত্ত লোভমদে, ইত্যাদি—ক্ষুধিত হিংস্র ব্যাঘ্র যেভাবে নিজের শাবককে ভক্ষণ করে, রাজ্যলোভে

মত্ত হইয়া বিভীষণ সেইরূপই নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের ব্যবস্থা করিয়াছে। এস্থলে মন্দোদরীর বিলাপ হেক্টরের যুদ্ধযাত্রা কালে হেক্টর জননী হেকুবার শঙ্কা ও বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী—তুচ্ছ রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে মন্দোদরী এত ভয় করিতেছেন দেখিয়া, নিজের শক্তিসামর্থ্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান মেঘনাদ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন।

দুইবার পিতার আদেশে ইত্যাদি—মেঘনাদ রামলক্ষ্মণকে প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত ও নাগপাশে আবদ্ধ করেন। সেবার রামলক্ষ্মণ গরুড়ের সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হন। দ্বিতীয়বার মেঘনাদ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রামলক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় পতিত থাকেন। প্রথম সর্গেও মেঘনাদ রাবণকে বলিতেছেন :

"—দুইবার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!" (১৪৮–৫০)

দম্ভোলি-নিক্ষেপী সহস্রাক্ষ—বজ্র-নিক্ষেপকারী সহস্রনেত্রবিশিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র।

পাতালে নাগেন্দ্র—পাতালবাসী সর্পগণের রাজা বাসুকি।

মর্ত্যে নরেন্দ্র—পৃথিবীবাসী শ্রেষ্ঠ রাজগণ। নরেন্দ্র অর্থে নরেন্দ্রগণ বুঝিতে হইবে; কারণ দেবরাজ ইন্দ্র বা নাগরাজ বাসুকির ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতে কোন একজন মানুষ নরেন্দ্র নহেন।

জানেন তাত বিভীষণ ... মর্ত্যে নরেন্দ্র—একই 'জানেন' ক্রিয়াপদের সহিত 'বিভীষণ' 'যতদেবকুল-রথী', 'নাগেন্দ্র' এবং 'নরেন্দ্র' শব্দ সম্বদ্ধ হওয়ায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হইয়াছে।

কি ছার সে রাম—ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে যে পুত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে সেই বীর পুত্রের নিকট রামের ন্যায় শত্রু অতি তুচ্ছ এবং তাহাকে ভয় করা অনুচিত। 'সে' তুচ্ছতাজ্ঞাপক।

মায়াবী মানব, বাছা, ইত্যাদি—রাম সামান্য মানব হইলেও তাঁহার সহিত মেঘনাদের যুদ্ধের উপক্রমে মন্দোদরী কেন শঙ্কিত হইয়াছেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তুচ্ছ মানব হইলেও রাম হয় মায়াবলে শক্তিমান, নতুবা দেবতারা সকলেই তাহার সহায়। অন্যথায় রাম পরাজিত ও বন্দী হইয়াও পুনরায় মুক্ত হইতে পারিত না। যে ব্যক্তি মায়াবলে শক্তিমান, অথবা যে দৈববলে বলী, তাহার ন্যায় শত্রুর সঙ্গে পুত্রের সংগ্রামে মাতার মন বিচলিত না হইয়া পারে না।

এ সব আমি না পারি বুঝিতে—রামের মুক্তি অথবা পুনর্জীবন লাভের ব্যাপার এতই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যে, তাহার কোন প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ করা যায় না।

জলে ভাসে শিলা—সমুদ্রবন্ধনের ও রামের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত। নিবে অগ্নি আসার বরষে—অগ্নিবাণের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য অকারণে অসময়ে ধারাবর্ষণ হয়।

বিদাইব—বিদায় দিব। 'বিদায়' শব্দ হইতে নামধাতু, সুতরাং 'বিদায়িব' হওয়াই উচিত ছিল।

কুলক্ষণা সূর্পণখা— দুর্লক্ষণা সূর্পণখা; সেই রাম-রাবণ বিরোধের মূল বলিয়া মন্দোদরীর তিরস্কার। কৃত্তিবাসও বলিয়াছেন : "কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি লোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইবে বিধবা।।"

পূর্ব-কথা স্মরি—সূর্পণখা কর্তৃক রামের প্রেমভিক্ষা, তাহার লাঞ্ছনা এবং তজ্জনিত সীতাহরণ ও রাম-রাবণ সংঘর্ষ ইত্যাদি পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া।

অকারণে—কারণ ইহাতে বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না।

নগর তোরণে—লঙ্কানগরীর সিংহদ্বারে। আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?—ঘরে আগুন লাগিলে কে নিশ্চিন্ত ও অলসভাবে থাকিতে পারে?

হেন কুলে কালি দিব কি রাঘবে দিতে ইত্যাদি—যুদ্ধে অবিলম্বে রামকে পরাজিত না করিতে পারিলে, রাক্ষসকুলের গৌরব সমূলে নষ্ট হইবে এবং রাক্ষসগণ বীর হইয়াও যে শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছে,—এই কলঙ্ককাহিনী সর্বত্র ঘোষিত হইবে। বীরশ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ আমি যুদ্ধে গমন না করিয়া রাক্ষসকুলের এই অপযশ রটনার সুযোগ কি রামচন্দ্রকে দিব? অনুরূপ ক্ষেত্রে ইলিয়াড কাব্যে হেক্টরও স্বীয় পত্নী এ্যাণ্ডোমেকীকে বলিয়াছেন—

"How would the sons of Troy, in arms renown'd,
And Troy's proud dames, whose garment sweep the ground,
Attaint the lustre of my former name,
Should Hector basely quit the field of fame?" (Iliad—VI)

মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়—দানবরাজ ময় মন্দোদরী পিতা এবং মেঘনাদের মাতামহ।

রথী যত মাতুল— মন্দোদরীর ভ্রাতা মায়াবী ও দুন্দুভি নামক পরাক্রান্ত বীর দানব।

হাসিবে বিশ্ব--সমগ্র বিশ্ববাসী মেঘনাদের কাপুরুষোচিত নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবে। বিভাবরী—রাত্রি; অন্ধকারের আবরণে সূর্যের বিভা বা আলোককে আবৃত করে বলিয়া। রাক্ষস-দলে—রাক্ষসগণ সহ। পদ-রাজীব-যুগ—পাদপদ্মদ্বয়। থুইলি < স্থাপি—রাখিলি। প্রাদেশিক শব্দ। বহুলে—কৃষ্ণপক্ষে।

থাক মা, আমার সঙ্গে ... উজ্জ্বল ধরণী—কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের অভাবে নক্ষত্রের কিরণে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়। এখানে এই সাধারণ উক্তিটির সাহায্যে মন্দোদরী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ণচন্দ্রতুল্য পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তারার ন্যায় পুত্রবধূ প্রমীলা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে তাঁহার মনের বিষাদ দূর করিতে পারিবেন। সামান্যের দ্বারা বিশেষ ঘটনা সমর্থিত হওয়ায় এস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে।

শিবিকা ত্যজিয়া—প্রমীলার সহিত মেঘনাদ শিবিকারোহণে মাতার প্রাসাদে আসিয়াছিলেন।

কুসুম বিবৃত পথে—যজ্ঞশালার পুষ্পবাহকগণের পাত্র হইতে ঝরিয়া পড়া প্রচুর ফুলের দ্বারা চিহ্নিত পথ দিয়া। ৬ষ্ঠ সর্গে যজ্ঞাগারের বর্ণনায় আছে—"পুষ্প রাশি রাশি।" বিবৃত = ব্যক্ত, চিহ্নিত।

চির-পরিচিত, মরি, ইত্যাদি—প্রণয়ীর নিকট প্রণয়িনীর গমনভঙ্গি, পদধ্বনির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বারংবার সাগ্রহে দর্শন ও শ্রবণের ফলে এতই পরিচিত হইয়া উঠে যে, লোক না দেখিয়াও কেবল গমনের ভঙ্গি দর্শনে বা পদধ্বনি শুনিয়াই তাহার আগমন বুঝিতে পারা যায়।

হাসিলা বীরেন্দ্র—মন্দোদরীর সম্মুখে প্রমীলা কোন কথা বলিতে পারেন নাই বলিয়া এখন কৌশলে নিভৃতে দেখা করিতে আসিয়াছেন বুঝিয়া, মেঘনাদ ঈষৎ হাসিলেন। ইন্দীবরাননা—পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লমুখী।

ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ইত্যাদি—মন্দোদরীর আদেশে প্রমীলাকে তাঁহার নিকট থাকিয়া যাইতে হইল। নতুবা তিনিও স্বামীর সহিত নিকুম্ভিলায় যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। মন্দোদরীর পুত্রবধূকে নিজের নিকট রাখিবার অভিলাষও যেন দৈব বা Fate দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনা মেঘনাদের নিকটে উপস্থিত থাকিলে, দৈবাস্ত্র এবং মায়াদেবীর সক্রিয় সাহায্য লাভ করিয়াও লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিতেন কিনা সে সন্দেহ তৃতীয় সর্গে দেবীর সখী বিজয়ার মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে—

"কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগৎ-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে,

তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমন লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?" (৫৯২-৯৮)

এই প্রশ্নের উত্তরে দেবী প্রমীলার তেজঃ হরণের কথা বলিয়াছিলেন। উহার পরিবর্তে কৌশলে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিলে, এই সর্গে বর্ণিত ঘটনার সহিত তাহা অধিকতর সামঞ্জস্যযুক্ত হইত। শাশুড়ী—শ্বশ্রূ; স্বামীর মাতা। শ্বশ্রূ > শশ্‌উ > শাউ + স্বার্থে-ড়ী প্রত্যয়।

শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি ইত্যাদি—সূর্যের কিরণের প্রতিফলনেই চন্দ্রকলা উজ্জ্বল হইয়া উঠে বলিয়া শুনিয়াছি। আমার সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দও সেইরূপ তোমার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। তোমার অভাবে আমার নিকট জগৎ অন্ধকারময়। বিহনে < বিহীন—অভাবে।

মুকুতামণ্ডিত বুকে ইত্যাদি—প্রমীলার মুক্তাহারশোভিত বক্ষঃস্থলে মুক্তাহারস্থিত মুক্তাগুলির উপর চক্ষু আর এক সারি উজ্জ্বলতর মুক্তা বর্ষণ করিল;—অর্থাৎ প্রমীলার চক্ষু হইতে বিরহজনিত অশ্রু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। উপমেয় অশ্রুর অনুল্লেখহেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

শতদল-দলে কি ছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে—উপমান শতদল-দল এবং শিশিরবিন্দুর অপকর্ষ ঘটাইয়া উপমান বক্ষঃস্থল ও অশ্রুবিন্দুর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার।

শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী—চন্দ্রোদয়ের পূর্বে সর্বদা চন্দ্রের প্রণয়িনীস্বরূপ রোহিণীর আবির্ভাব হয়। সেইরূপ আমিও যে অবিলম্বে মাতার প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইব ইহা জ্ঞাপন করার জন্য আমার প্রণয়িনী তুমি পূর্বেই মাতার নিকট গমন কর। অপ্রস্তুত বিষয় চন্দ্র এবং রোহিণীর উদয়ের সাহায্যে প্রস্তুত বা প্রস্তাবিত বিষয়, প্রমীলার আবির্ভাবের অনতিবিলম্বে মেঘনাদের আবির্ভাব জ্ঞাপিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। পয়োবহ—মেঘ। শুদ্ধরূপ—পয়োবাহ।

আলোকাগারে কেন লো উদিছে পয়োবহ?—জ্যোতির আধার তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে স্নিগ্ধ আনন্দময় জ্যোতির পরিবর্তে কেন বিষাদরূপ মেঘের উদয় হইতেছে? উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান পয়োবহকেই উপমেয় বিষাদচ্ছায়ারূপে গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

ভ্রান্তিমদে মত্ত—প্রমীলাকে ঊষা বলিয়া ভুল করিয়া। তোমারে ভাবিয়া ঊষা—তোমার রূপের উজ্জ্বলতাহেতু।

ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি ... সত্বর গমনে—প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ যদি একবস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হয় এবং কবির কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। ভ্রম সাধারণ হইলে অলঙ্কার হয় না। এস্থলে প্রমীলার রূপের ঔজ্জ্বল্যহেতু নিশার প্রমীলাকে ঊষা ভ্রমে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার। ইহা ছাড়া অচেতন নিশার উপর সচেতন প্রাণীর ক্রিয়া পলায়ন আরোপ এস্থলে সমাসোক্তি অলঙ্কারও হইয়াছে। কুসুমেষু—পুষ্পশরধারী কামদেব। কুসুম + ইষু (শর)। ভাঙিতে শিবের ধ্যান—হর-পার্বতীর মিলন সাধনোদ্দেশ্যে।

কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন—কারণ সেই যাত্রাতেই হরকোপানলে সে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

কুলগ্নে করি যাত্রা ইত্যাদি—মদনের ন্যায় মেঘনাদও বিনাশের জন্য অশুভক্ষণে যজ্ঞগৃহের দিকে গমন করিল। প্রাক্তনের গতি হায়, কার সাধ্য রোধে?—পূর্বকৃত আচরণের ফলস্বরূপ ভাগ্য বা অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয়।

জানি আমি কেন তুই ইত্যাদি—স্বামীর ধীর গম্ভীর গমনভঙ্গি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া প্রমীলা যূথপতি হস্তীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার স্বামীর গমনভঙ্গি এতই মনোরম যে, তাহার

নিকট নিজের প্রশংসিত গমনভঙ্গিও অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া লজ্জায় ও অভিমানে গজরাজ মানব-চক্ষুর অগোচরে বিচরণ করিবে বলিয়াই যেন গভীর অরণ্যে বাস করিতেছে।

সরু মাঝা তোর রে কে বলে ইত্যাদি—যজ্ঞাগারের দিকে অগ্রসর স্বামীর দেহ-সৌষ্ঠব দূর হইতে দেখিয়া প্রমীলা সিংহকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, সিংহ তাহার ক্ষীণ কটির জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও, মেঘনাদের কটির সহিত তুলনায় তাহাও স্থূল বলিয়া মনে হয়; এবং সেইহেতু সিংহও লোকলোচনের অন্তরালে থাকিবার জন্যই বনবাসী হইয়াছে। উভয়ত্রই উপমান গজপতি এবং সিংহের ক্ষীণ কটি উপমেয়। মেঘনাদের গমনভঙ্গি ও ক্ষীণ কটিদেশের তুলনায় ধিকৃত এবং গজ ও সিংহ বনে নির্বাসিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে।

নাশিস বারণে তুই; এ বীরকেশরী ইত্যাদি—সিংহ নিজের শক্তিতে হস্তীকে বধ করে; কিন্তু মেঘনাদ দৈত্যগণের চিরশত্রু দেবরাজ ইন্দ্রকেই যুদ্ধে পরাজিত করে।

নগেন্দ্র নন্দিনি—(সম্বোধনে) পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা, দেবী পার্বতী।

রাখ এ বিগ্রহে—এই আসন্ন যুদ্ধে রক্ষা কর। মেঘনাদ ও প্রমীলার পূর্ববর্ণিত বীরত্ব ও আত্মনির্ভরতার সহিত এই কাতর প্রার্থনার সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। যিনি পূর্বে দম্ভ করিয়া বলিয়াছেন : "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

এবং ইহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণেই মেঘনাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"এ বীরকেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুলপতি।"

রাম লক্ষ্মণের সহিত স্বামীর আসন্ন যুদ্ধকালে তাঁহার এই শঙ্কা ও ব্যাকুলতা কেন? স্বামীর আসন্ন বিপদের ছায়াই কি তবে প্রমীলার অন্তরের অন্তস্তলে পতিত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক স্থৈর্য ও আত্মনির্ভরতা লুপ্ত করিয়াছিল?

কবচরূপে—বর্মরূপে। যে ব্রততী সদা, সতি, ইত্যাদি—যে লতিকা একান্তভাবে তোমার আশ্রিত তাহার জীবন মেঘনাদরূপ বনস্পতির উপরই নির্ভর করিতেছে। উপমান ব্রততী ও তরুরাজকেই উপমেয় প্রমীলা ও মেঘনাদরূপে গ্রহণ করায় লুপ্ত রূপক অলঙ্কার। কুঠার—বিনাশক অস্ত্র। তরুরাজ বলিয়াই কুঠার শব্দের প্রয়োগ। পরশে—স্পর্শ করে। স্পর্শ শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ; স্বরসম্প্রসারণ দ্বারা উৎপন্ন 'পরশ' কবিতায় প্রচলিত।

অন্তর্যামী < অন্তর্যামিনী—ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হয় নাই।

বহে যথা সমীরণ ইত্যাদি—বাতাস যেমন পুষ্পবন হইতে পুষ্পসৌরভ রাজপুরীতে বহন করিয়া আনে, সেইরূপ শব্দবহনকারী আকাশ প্রমীলার কাতর প্রার্থনা দেবীর নিকটে কৈলাসে বহন করিয়া চলিল। কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র—পাছে প্রমীলার ঐকান্তিক কাতর প্রার্থনা দেবীর কর্ণগোচর হইলে দেবী প্রমীলার প্রতি কৃপাবশতঃ দেবতাদেব মেঘনাদবধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন, এই আশঙ্কায় ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়িলেন।

তা দেখি, সহসা ইত্যাদি—দেবরাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া বায়ুদেব আকাশপথে কৈলাসাভিমুখে সঞ্চালিত প্রমীলার প্রার্থনা বাণী বায়ুবেগে অন্যদিকে প্রেরণ করিলেন। মুছিয়া আঁখি—মন্দোদরীর প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বক্ষণে অন্য কেহ তাঁহার ব্যাকুলতা বুঝিতে না পারে এইজন্য অশ্রু মুছিয়া।

উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ—লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ উভয়েরই আসন্ন যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ বা প্রস্তুতি পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া সর্গের নাম 'উদ্যোগ' রাখা হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যাজি সে উদ্যান ইত্যাদি—লঙ্কাপুরীর যে উদ্যানে 'চণ্ডীর দেউল' অবস্থিত, দেবীর নিকট বরলাভের পর বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেই উদ্যান ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি- কারণ রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। প্রভাতে মেঘনাদের যজ্ঞসমাপ্তির পূর্বেই নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে বলিয়া লক্ষ্মণের দ্রুত গতি।

হেরি মৃগরাজে বনে ইত্যাদি—বনের মধ্যে সিংহকে দেখিতে পাইলে ব্যাধ তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রাণঘাতী তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র আনিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ দ্রুতগতিতে অস্ত্র রক্ষা করিবার স্থানের দিকে ধাবিত হয়। প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে—'নশ্বর' শব্দকে 'প্রহরণ' অথবা 'সংগ্রামে' উভয় শব্দের বিশেষণ রূপেই গ্রহণ করা যায়। 'যুদ্ধে প্রাণবিনাশক অস্ত্র' অথবা 'প্রাণঘাতী যুদ্ধের অস্ত্র'। উভয়ক্ষেত্রেই 'নশ্বর' শব্দে অবাচকতা দোষ। নশ্বর শব্দের অর্থ 'নাশশীল'; কিন্তু কবি এস্থলে এবং অন্যত্রও নশ্বর শব্দটি 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

তুলনীয়— "মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে" (৫।২৭২)

"যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে,......................" (৭।২২)

এবং "আর যোধ যত
হত এ নশ্বর রণে।" (৮।১২২)

উতরিল—অব + তৃ > অবতর > ওতর > উতর > উর, উর। অবতীর্ণ হইল; উপস্থিত হইল।

পদযুগে নমি—রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিয়া। নমস্কারি—অভিবাদন করিয়া। লোকব্যবহারে বাঙ্গালা প্রণাম ও নমস্কার শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

চামুণ্ডে—চামুণ্ডা অর্থাৎ চণ্ডিকা দেবীকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডিকা ও চামুণ্ডা স্বতন্ত্র দেবী। চণ্ডমুণ্ডবধের সময়ে ক্রুদ্ধা চণ্ডিকার ললাটদেশ হইতে শিরোমালাধারিণী ভয়ঙ্করী কালীর উৎপত্তি হয়। তিনি চণ্ডকে ও মুণ্ডকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডিকা তাঁহার চামুণ্ডা নামকরণ করেন।

চন্দ্রচূড়ে—মস্তকে চন্দ্রকলাশোভিত মহাদেবকে।

ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি ইত্যাদি—যেমন সর্পদমনকারী উগ্র ঔষধ প্রয়োগে ভীষণ সর্প নির্বীর্যভাবে দূরে চলিয়া যায়, সেইরূপ বনরক্ষক মহাদেব তোমার পুণ্যবলে বিনা যুদ্ধে আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। কালাগ্নি—প্রলয়কালীন দ্বাদশ সূর্যের যুগপৎ আবির্ভাবজনিত ভীষণ অগ্নি। দাবাগ্নি—দাবে (অরণ্যে) প্রজ্বলিত অগ্নি; (মধ্যপদলোপী সমাস)। বায়ুসখা—অগ্নি; বায়ু সখা যাহার; (বহুব্রীহি সমাস); ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস (বায়ুর সখা) হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী 'বায়ুসখ' রূপ হইত। এবে—এখন; মায়াসিংহ ও মায়াঝটিকা দর্শনের পরে।

বিদাইনু—বিদায় করিলাম; 'বিদায়িনু' হওয়া উচিত ছিল। কবি 'বিদায়' শব্দ হইতে নামধাতুরূপে উভয় রূপই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। সরসে < সরঃ—সরোবরে। সরস্ + ৭মীতে 'এ'।

অবগাহি দেহ—দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিয়া। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান। সুতরাং 'অবগাহি দেহ' কথাটিতে অধিকপদতা দোষ। কবি অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন—

"কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ...." (২।৬২৫)

"অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে," (৪।৫৬২)

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে—লক্ষ্মণ কর্তৃক নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর অর্চনা বিষয়টি

কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক নীলপদ্মরাশি দ্বারা অকালে দুর্গাপূজা ঘটনাটি হইতে পরিকল্পিত। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া—হিন্দু পুরাণে মায়া, মহামায়া, চণ্ডিকা, দুর্গা প্রভৃতি এক আদ্যাশক্তিরই বিভিন্ন নাম। এস্থলেও মধুসূদন মায়াদেবী ও চণ্ডীদেবীকে এক ও অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে দেবীর প্রতি শিবের উক্তি—

"পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে।" (৪৩৫—৪৩৭)

ইহাতে মায়া ও শিবানীকে স্বতন্ত্র দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয় সর্গোক্ত দেব-দেবী-চরিত্রের পরিকল্পনায় গ্রীক পুরাণোক্ত দেব-দেবীগণের প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় আসিয়া পড়াতেই এইরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

সুপ্রসন্ন আজি, ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনাদ বধের ব্যবস্থা করার জন্য লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র, শচী, পার্বতী, কাম, রতি, মহাদেব, মায়াদেবী প্রভৃতি সকলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

দেব-অস্ত্র—দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত, ইন্দ্র কর্তৃক রাম-শিবিরে প্রেরিত অস্ত্রাদি।

বলি (সম্বোধনে)—হে শক্তিমান্!

শার্দ্দূলাক্রমে—ব্যাঘ্রের ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া।

পিধানে যথা অসি—কোষে অবস্থিত তরবারির ন্যায়; অপি + ধা + ন = পিধান। ভাগুরির মতে 'অব' এবং 'অপি' উপসর্গদ্বয়ের আদ্য 'অ' লুপ্ত হয়। যথা, পিধান, পিনদ্ধ, পিহিত, বগাহন ইত্যাদি।

পোহায় < প্রভাত—প্রভাত হয়। বিলম্ব না সহে—কারণ অধিক বিলম্বহেতু মেঘনাদ যজ্ঞসমাপ্তির সুযোগ পাইলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি—যমদূত স্বরূপ বিষধর কালসর্পের ন্যায় মেঘনাদকে দূর হইতে দেখিয়া।

দেব-নর ভস্ম যার বিষে—যাহার প্রচণ্ড শক্তিতে দেবতা হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলেই পর্যুদস্ত। মেঘনাদকে কালসর্প হইতে অভিন্ন কল্পনা করায় সঙ্গতিরক্ষার্থ পরাক্রমকে বিষ বলা হইয়াছে।

সে সর্পবিবরে—সেই ভীষণ কালসর্পস্বরূপ মেঘনাদের নিবাসস্থলে। উপমেয় মেঘনাদের সহিত উপমান সর্পের অভেদত্ব কল্পনায় রূপক অলঙ্কার।

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি—কারণ সীতাকে উদ্ধার করিতে হইলে রাবণবধ এবং রাবণবধের পূর্বে তাঁহার প্রধান সহায় মেঘনাদবধ প্রয়োজন। আবার মেঘনাদ এরূপ পরাক্রমশালী যে, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলে ভ্রাতার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং রাম খেদ করিয়া বলিতেছেন যে, লক্ষ্মণকে নিশ্চিত বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়া তিনি সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন না। লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের অত্যধিক প্রীতিহেতু রামায়ণেও রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ-মুখর দেখিতে পাওয়া যায়।

তুলনীয় : "দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।। (লঙ্কাকাণ্ড, ১০২।১৪)

এবং "রাজ্যধনে কার্য্য নাহি নাহি চাহি সীতে।" (কৃত্তিবাস—লঙ্কাকাণ্ড)

কিন্তু সেস্থলে লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত হওয়ায় রামের বিলাপের কারণ ছিল; আলোচ্য অংশে রামচন্দ্রের দৈব আনুকূল্যপ্রাপ্তিসত্ত্বেও অহেতুক বিলাপ কেবল মেঘনাদের দুর্ধর্ষত্ব জ্ঞাপনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে রামচরিত্র যে পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে, মেঘনাদের বীর্যবত্তা ঠিক সেই পরিমাণে

দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ; 'গ্রাম' সমূহার্থক শব্দ।

আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনক পুরে—রামায়ণে রামচন্দ্রের পক্ষে রাজপদবীবাচ্য ছিলেন কেবল কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব। তবে 'রাজেন্দ্রদলে' কথাটির সার্থকতা কি? মেঘনাদবধ কাব্য যে মূলতঃ "হেক্টর বধ" বা ইলিয়ড কাব্যের আওতায় রচিত হইয়াছে, উদ্ধৃত বাক্যটি তাহার অন্যতম প্রমাণ। গ্রীক পক্ষে বহুসংখ্যক রাজা ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আগামেম্ননের নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইলিয়ড্ কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত কাব্যের প্রভাবে পতিত কবির অসতর্ক লেখনী হইতে নিরর্থক 'রাজেন্দ্রদলে' শব্দটি নির্গত হইয়াছে। আর্দ্রিল মহীরে—পৃথিবীকে আর্দ্র বা সিক্ত করিল।

অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী—অন্য সর্ববিষয়ে দুর্ভাগ্য রামের অন্ধকারময় গৃহস্বরূপ নিরানন্দ জীবনে দীপবর্তিকার ন্যায় আনন্দদায়িনী সীতা। উপমান-উপমেয়ে অভেদ কল্পনাহেতু রূপক অলঙ্কার। তুলনীয়,

"কার ঘর আঁধারিলি নিবাইয়া এবে
প্রেমদীপ?......................" (৪।৪২১—২২)

কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে ইত্যাদি—রামের এই হতাশাব্যঞ্জক বিলাপের সাহায্যে গৌণভাবে মেঘনাদ-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী—মেঘনাদের সহিত তুলনায় খর্ব করিলেও, কবি এই কাব্যে লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি পৌরুষ-সম্পন্ন করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। সপ্তম সর্গে স্বয়ং রাবণ পর্য্যন্ত তাঁহার বীরত্ব দর্শনে প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই :

"বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস সুরথি,
তুই, ..." (৭।৭৩২-৩৫)

কেবল এই ষষ্ঠ সর্গেই কবি মেঘনাদের প্রতি অত্যধিক প্রীতি-পক্ষপাত দেখাইতে যাইয়া লক্ষ্মণকে অযথা মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া বসিয়াছেন।

শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী—ধার্মিক ব্যক্তিগণের প্রতি অনুকূলা গিরিরাজ কন্যা পার্বতী।

কাল মেঘ সম দেবক্রোধ ইত্যাদি—দেবগণ যে লঙ্কার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যাইতেছে যে, লঙ্কাপুরী স্বর্ণমণ্ডিতা হইলেও তাহার সুবর্ণময় দীপ্তিও দেবরোষরূপ কাল মেঘের ছায়ায় আবৃত হইয়াছে;—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা-সৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

দেবহাস্য উজলিছে ইত্যাদি—অন্যদিকে, দেবগণ যে রামপক্ষীয়গণের প্রতি সুপ্রসন্ন, তাহা বুঝা যাইতেছে রামচন্দ্রের সমুজ্জ্বল শিবিরসমূহ দর্শনে। এইগুলির উপর দেবগণের প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা প্রতিফলিত হওয়াতেই যেন ইহাদিগকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আদেশ—(অকারান্ত) আদেশ দাও।

এ অধর্ম্ম কার্য্য—দেবতাগণের অভিপ্রায়ের বিরোধী কর্ম।

কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে—পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গলঘট কেহ পদাঘাতে ভাঙ্গে না। তেমনই দেবানুকূল্য হস্তগত হইলেও মূঢ়ের ন্যায় রামচন্দ্রের অহেতুক ভীতিবশতঃ তাহা প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নহে। অপ্রস্তাবিত মঙ্গলঘট পদাঘাতে চূর্ণ করার অসমীচীনতা দ্বারা প্রস্তাবিত দেবানুকূল্যকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপিত হওয়ায় এস্থলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে।

কি সাধে—কোন অভিলাষে, কিসের প্রত্যাশায়; সাধ < শ্রদ্ধা।

কলুষ-দ্বেষিণী—পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণাপরায়ণা; পাপীর গৃহে লক্ষ্মী অবস্থান করেন না।

কমলিনী কভু ইত্যাদি—কাকু বা বাগ্‌ভঙ্গী অলঙ্কার। এখানে প্রশ্নের ভঙ্গী হইতেই

নিষেধাত্মক উত্তর "ফোটে না" এবং "হেরে না" লক্ষ হইতেছে। তুলনীয়, "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?" (৪।৮১)।

জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছন্ন। স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু—স্বপ্ন-দর্শনের পর বিভীষণ জাগিয়া উঠিয়া সমগ্র শিবির স্বর্গীয় সুগন্ধে পূর্ণ দেখিয়া বুঝিলেন যে, স্বপ্নটি তাঁহার মনের বিকার হইতে উৎপন্ন ও অলীক নহে। দেবী সত্যই শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার দেহ-সৌরভে শিবির পরিপূর্ণ হইয়াছে। স্বর্গীয় বাদিত্র দেবীর আবির্ভাবহেতু দিব্য বাদ্যধ্বনি।

শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে ইত্যাদি—স্বপ্নদর্শনের পর সুপ্তোত্থিত বিভীষণের প্রথম অনুভূতি হইল একটি স্বর্গীয় সৌরভের ঘ্রাণ এবং দ্বিতীয় অনুভূতি হইল আকাশে দিব্য বাদ্যধ্বনি শ্রবণ। এই দুইটি ব্যাপারের দ্বারা দেবীর আবির্ভাব যে স্বপ্নের অলীক কল্পনামাত্র নহে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি দেবীর আবির্ভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন,—শিবির-দ্বারে দেবীকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া।

গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে ইত্যাদি—বিভীষণ প্রবুদ্ধ হইয়া শিবিরের দ্বারপথে অপস্রিয়মাণা দেবীর দেহের পশ্চাদভাগই কেবল চকিতে দেখিতে পাইলেন। দেবীর গ্রীবাদেশে লম্বিত নানারত্নখচিত তাঁহার কবরীই কেবল বিভীষণের দৃষ্টিগোচর হইল।

ভাতিছে কেশে ... বিজলীর ছটা মেঘমালে—উপমান মেঘমালার মধ্যে স্ফুরিত বিজলীর ছটার অপকর্ষ ঘটাইয়া উপমেয় কেশরাশিমধ্যে অবস্থিত রত্নের উৎকর্ষ বর্ণনাহেতু ব্যতিরেক অলঙ্কার। আচম্বিতে—আচমকা, অকস্মাৎ। জগদম্বা—জগদ্‌বাসিগণের জননী লক্ষ্মীদেবী। জগদম্বা শব্দটি সাধারণতঃ জগন্মাতা দুর্গা বা চণ্ডী দেবীকেই বুঝায়। অবাচকতা দোষ।

স্মরিলে পূর্ব্বের কথা—ইতঃপূর্বে দুই দুইবার মেঘনাদের ভীষণ পরাক্রমের যে পরিচয় তিনি পাইয়াছেন তাহা মনে হইলে।

আকুল পরাণ কাঁদে—প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সুনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায়।

মন্থরার কুমন্ত্রণায় যবে চলিলা কৈকেয়ী মাতা—কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার পরামর্শক্রমেই কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেকের বর চাহিয়াছিলেন।

উচ্চে অবরোধে—রাজপ্রাসাদের উচ্চতলে অবস্থিত অন্তঃপুরে।

কত যে সাধিল সবে—বনে রামের অনুগমন না করিবার জন্য।

কি কুহকবলে—কোন মায়াবলে; কারণ অযোধ্যার সুখ-সম্পদ, মাতার স্নেহ এবং পত্নীর প্রেম সকলই লক্ষ্মণ উপেক্ষা করিয়া বনবাসের দুঃখ-কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন।

বাহুবলেন্দ্র—বাহুবলে বলবান ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব, 'বাহুবলীন্দ্র' শুদ্ধ প্রয়োগ। কবি অন্যত্র 'বলীন্দ্র' প্রয়োগও করিয়াছেন—"প্রবল পবনবলে বলীন্দ্র পাবনি" (৩।২০২)।

বিশারদ রণে—যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ; অঙ্গদের বিশেষণ।

ধূম্রাক্ষ সমরক্ষেত্রে ইত্যাদি—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর পক্ষে অমঙ্গলসূচক প্রজ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণদর্শন ধূম্রাক্ষ নামক বানর সেনানী। নীল—অগ্নির পুত্র বানর সেনানী।

নল—রামের অন্যতম বানর সেনানী,—বিশ্বকর্মার পুত্র এবং সমুদ্রবন্ধনের প্রধান শিল্পী।

কেশরী কেশরী ইত্যাদি—শত্রুর নিকট সিংহের ন্যায় শক্তিমান কেশরী নামক বানর সেনানী।

দেবাকৃতি দেববীর্য্য—রামের কপি-সৈন্যের মধ্যে অনেকেই দেবাংশসম্ভূত বলিয়া রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু কবি "দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী" এই বানরবাহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দিতে স্বীকার করেন নাই। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তিনি

বলিয়াছিলেন, "If the father of our Poetry had given Rama human companions. I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad." তিনি কপিসৈন্যকে 'rabble' বলিয়া অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এখানে তাহারা 'দেববীর্য' ও 'দেবাকৃতি' হইল কিরূপে? এখানেও মধুসূদনের শোভা-সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি-পিপাসু মন অজ্ঞাতসারেই 'ঘৃণিত' বানরগণকে লোকোত্তর সৌন্দর্যে ও মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আকাশ সম্ভবা সরস্বতী— আকাশে শ্রুত বাণী; দৈববাণী।

উচিত কি তব ইত্যাদি—দেবতাগণের প্রিয়পাত্র ও অনুগ্রহভাজন হইয়া দেবতাগণের বাক্যে অবিশ্বাস করা তোমার পক্ষে অনুচিত কর্ম। দেবতাগণ তোমাকে অস্ত্র প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এই সকল অস্ত্রের দ্বারা মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিবে। লক্ষ্মণকে স্বয়ং মহামায়া মেঘনাদবধের বর দিয়াছেন এবং বিভীষণকেও লক্ষ্মীদেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়া রক্ষোরাজরূপে বরণ করিয়াছেন। সুতরাং লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধের জন্য প্রেরণ করিবার যে আদেশ দেবতারা দিয়াছেন সেই আদেশ কেন লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছ?

দেখ চেয়ে শূন্যপানে—রামচন্দ্রের সংশয় দূর করিবার জন্য শূন্যদেশে একটি নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে উহার তাৎপর্য বুঝিতে বলা হইল।

অহি সহ যুঝিছে অম্বরে শিখী—আকাশে সর্পের সহিত ময়ূরের যুদ্ধ হইতেছে। এই অহি-শিখীর সংগ্রামরূপ নিমিত্ত দর্শন ইলিয়ড কাব্য হইতে গৃহীত। উক্ত কাব্যের দ্বাদশ সর্গে 'দুর্গ-প্রাকারের যুদ্ধ' কালে হেক্টর আকাশে ঈগল পক্ষীর সহিত সর্পের যুদ্ধরূপ দৈব ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঈগল পক্ষী সর্পভক্ষক হইলেও, এক্ষেত্রে চঞ্চুধৃত সর্পের দংশনে অস্থির হইয়া সে সর্পকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তখন পলিডেমস্ নামক বিজ্ঞ ব্যক্তি হেক্টরকে সাবধান হইবার পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন :

"Then hear my words, nor may my words be vain :
Seek not this day, the Grecian ships to gain.
For sure to warn us Jove his omen sent,
And thus my mind explains its clear event." (Iliad.—XII)

ভৈরব আরবে—ভীষণ শব্দে। রব, রাব, আরব ও আরাব সমার্থক শব্দ।

পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ইত্যাদি—ময়ূরের বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তৃত হইয়া মেঘের ন্যায় আকাশ আবৃত করিয়াছে। জ্বলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল—যুধ্যমান সর্পের মুখনিঃসৃত তীব্র বিষ প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় আকাশে দীপ্যমান। রণিছে (নামধাতু)—রণ করিতেছে।

ঘোষিল উথলিয়া জলদল—সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তটভূমি প্লাবিত করিয়া ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিল। অজাগর < অজগর—অতিকায় সর্প; অজ (ছাগ) গিলিয়া ফেলিতে সমর্থ বৃহৎ সর্প। অদ্ভুত ব্যাপার—ভক্ষ্য সর্প কর্তৃক ভক্ষক ময়ূরের বিনাশ। নহে ছায়াবাজি ইহা—এই দৃশ্যটি ছায়াবাজির ন্যায় অলীক নহে।

আশু যা ঘটিবে ইত্যাদি—এই মায়া দৃশ্যের সাহায্যে দেবতারা তোমাকে অবিলম্বে যাহা ঘটিবে তাহার আভাস দিলেন। ময়ূর অধিকতর বলশালী ও সর্পের ভক্ষক হইয়াও যেমন অপেক্ষাকৃত হীনবল সর্প কর্তৃক বিনষ্ট হইল, সেইরূপ অনতিবিলম্বে অপেক্ষাকৃত হীনবল লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে প্রবলতর মেঘনাদ নিহত হইবে। তবে—নিমিত্ত দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া। স্কন্দ তারকারি সদৃশ—তারকাসুরের বধকর্তা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়। কবচ—বর্ম। তারাময়—নক্ষত্রাকৃতি উজ্জ্বল রত্নসমূহে খচিত। সারসনে—কটিবন্ধে। ভাস্বর অসি—সমুজ্জ্বল তরবারি।

রবির পরিধি সম—প্রদীপ্ত সূর্যবিম্বের ন্যায়; কবি কথাটি ইংরেজি "Like the refulgent orb"-এর অনুবাদরূপে একাধিক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

দীপে—উজ্জ্বলভাবে অবস্থিত। ফলক—ঢাল, চর্ম। দ্বিরদ-রদ-নির্মিত—হস্তিদন্তে প্রস্তুত। ফলকের বিশেষণ। কাঞ্চনে জড়িত—স্বর্ণখচিত। ফলকের বিশেষণ। তাহার সঙ্গে—ফলক বা ঢালের সহিত। নিষঙ্গ—তূণীর; তূণ; শরাধার। ধরিলা সাপটি—দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিল। সর্পবৃত্ত > সাপট—সাপের মত জোরে পেঁচাইয়া ধরার ভঙ্গি। নড়িল > নড়িল—প্রাদেশিক রূপ।

তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে ইত্যাদি—প্রচণ্ড রণ-হুঙ্কারের মধ্যে যুদ্ধের শৃঙ্গসমূহ ধ্বনিত হইতে থাকিলে যুদ্ধাশ্ব যেরূপ চঞ্চল ও ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া বাহির হয়, সেইভাবে।

বিভীষণ বিভীষণ রণে—যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিভীষণ। রামায়ণে বিভীষণের রণনৈপুণ্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এস্থলে যমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই 'বিভীষণ রণে' বিভীষণের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তুলনীয়— "চিক্ষুর রক্ষ যক্ষপতি-সম;" (৬। ৩২৯)

এবং "রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে,................।" (৬। ৪৪৪—৪৫)

এস্থলেও কেবল অনুপ্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'যক্ষপতিসম' এবং 'যক্ষপতিত্রাস বলে' প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণে যক্ষপতি কুবেরের ধন-প্রসিদ্ধি আছে, রণ-প্রসিদ্ধি ততটা নাই।

আয়াস—পরিশ্রম, কষ্ট। অভাজনে—অপাত্র বা অযোগ্য ব্যক্তি আমাকে।

কিশোর—অল্পবয়স্ক; অপ্রবীণ। রামায়ণে রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে বয়সের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয়। এস্থলে কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহাভিব্যক্তি-হেতুই 'কিশোর' শব্দটি রামচন্দ্র কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে।

দুর্দ্দান্ত দানবে ... দুর্ম্মদ রাক্ষসে—বাক্যটি বৃত্ত্যনুপ্রাসের একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে 'দ' ৫ বার 'র্দ্দ' ৩ বার, 'ল' ৩ বার এবং 'ন্ত' ৩ বার উচ্চারিত হইয়াছে।

হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে—দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বসিয়া রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যের কারণ এই যে, ভক্তের কাতর প্রার্থনা দেবীকে বিচলিত না করিয়া পারিবে না, এবং তাহা হইলেই তাঁহার মেঘনাদবধের বাসনা পূর্ণ হইবে।

পবন অমনি চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে—দেবরাজের মনোভাব বুঝিয়া বায়ুদেব শব্দবহনকারী আকাশকে বেগবান করিবার উদ্দেশ্যে দ্রুত আলোড়িত করিলেন। পঞ্চম সর্গে প্রমীলার আরাধনাকালে পবনদেব বিপরীত কার্য করিয়াছিলেন। (৫।৬০১-৬০৬)

আশীষিলা—আশীর্বাদ করিলেন। 'আশিস' শুদ্ধতর রূপ, কিন্তু বাংলায় 'আশীষ'ও সুপ্রচলিত।

হাসি দেখা দিলা ঊষা উদয়-অচলে, আশা যথা ইত্যাদি—এই উপমাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এ স্থলে স্থূল ও বাস্তব ঊষাকে বুঝাইতে সূক্ষ্ম ও অবাস্তব আশাকে উপমানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শেলি এই জাতীয় উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে 'শেলীয় উপমা' (Shelleyan simile) বলা হয়। তুলনীয়—

"The champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream." (Indian Serenade)

এবং "Thou dost float and run,
Like an unbodied joy whose race is just begun." (Skylark)

ভাবতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে এরূপ উপমা প্রয়োগ সমর্থনীয় নহে।

মধুজীবী—মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে যাহারা; অলি শব্দের বিশেষণ।

ঊষার ললাটে ইত্যাদি—রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাগুলি মিলাইতে লাগিল

বটে, কিন্তু উষাদেবীর ললাটস্বরূপ আকাশে উজ্জ্বল ফোঁটার মত অত্যুজ্জ্বল প্রভাতী তারাটি একাই বহু তারকার স্থান অধিকার করিল; অধিকন্তু আকাশে বিলীয়মান তারাসমূহের অভাব পূরণ করিল, উষার কৃষ্ণকুন্তলের ন্যায় বনানীর মধ্যে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত অজস্র উজ্জ্বল ফুল।

ফুটিল কুন্তলে ফুল নব তারাবলী—উষাদেবীর কুন্তলস্বরূপ কাননের মধ্যে অভিনব তারাসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিল। কাননকে উষার কুন্তলের সহিত এবং কাননে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিকে তারকাসমূহের সহিত অভেদ কল্পনায় রূপক অলঙ্কার।

অমূল < অমূল্য—বহুমূল্য। রতনে—রত্নস্বরূপ লক্ষ্মণকে। জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে—লক্ষ্মণের শুভাশুভের উপর রামের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। মহেম্বাসে—মহাধনুর্ধর রামচন্দ্রকে। ইষুর (তীরের) আস (আসন) = ইষ্বাস (ধনুঃ); মহৎ ইষ্বাস যাহার —মহেষ্বাস; (বহুব্রীহি)।

হিমানীতে—(এইস্থলে) শীত ঋতুতে। হিমানী শব্দের আভিধানিক অর্থ হিমসংঘাত অর্থাৎ তুষার বা বরফের স্তূপ। অবাচকতা দোষ।

চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে—মায়াদেবীর কৃপায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়ামেঘের আবরণে আবৃত হইয়া অদৃশ্যভাবে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়ড কাব্যেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ট্রয়রাজ প্রায়াম দেবানুগ্রহে মার্কারি বা হার্মিস্-সহ অদৃশ্যভাবে গ্রীক্‌শিবিরে গমন করিয়াছিলেন।

কমলা—রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী—যিনি কমলা, তিনিই রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী; সুতরাং অধিকপদতা দোষ। রক্ষোবধূবেশে—রাক্ষসগণের মনে সন্দেহ না জন্মে, এইজন্য মায়া রাক্ষস নারীর বেশে লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম সর্গেও লক্ষ্মী মুরলার সহিত রাক্ষস নারীর বেশে রাজপথে সৈন্য সমাবেশ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন।

হাসিয়া সুধিলা রমা এবং উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী—লক্ষ্মী ও মায়া উভয়েই মেঘনাদবধের ষড়যন্ত্রে কে কতখানি লিপ্ত তাহা ভালভাবেই জানেন বলিয়া, লক্ষ্মীদেবী যেমন ঈষৎ হাসিয়া মায়াদেবীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়াদেবীও তেমনই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

নীলাম্বুসুতে—(সম্বোধনে) হে সমুদ্রকন্যে লক্ষ্মীদেবি!

কালানল সম তেজঃ তব ইত্যাদি—লঙ্কার রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ রাবণের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রদীপ্ত তেজঃ সহ্য করিয়া শত্রুভাবে কেহ লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

মিনতি—অনুনয়, ঐকান্তিক প্রার্থনা। আরবী মিন্নৎ + বিণ্ণত্তি < বিজ্ঞপ্তি শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন জোড়কলম শব্দ। তার—ত্রাণ কর, উদ্ধার কর।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি—লক্ষ্মীর বিষাদের কারণ দুর্জ্ঞেয়। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র, শচী, শিব, পার্বতী, মায়াদেবী প্রভৃতি সকল দেবদেবীর চরিত্রের উপরেই গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণের প্রভাব পড়িয়া তাঁহাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে সত্য,—কিন্তু রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে যতটা অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে, এতটা অন্য কাহারও চরিত্রে আসে নাই। মেঘনাদের প্রতি ইন্দ্রের, সুতরাং শচীরও, বিদ্বেষের হেতু রহিয়াছে। পার্বতী প্রথমে রাবণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন নাই; পরে ভক্ত রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন এবং শিবকেও বশীভূত করিয়া নিজের পক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে হরপার্বতীর অত্যুন্নত চরিত্র-মহিমা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহাদের কার্যকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর আচরণ আদ্যন্তই অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনিই প্রথম সর্গে মেঘনাদকে বীরবাহুবধের সংবাদ দিয়া লঙ্কায় রাবণের নিকট আনিয়াছেন। তাঁহার

উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল না তাহা—

"যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।" (১। ৬১০ - ১২)

উক্তি হইতেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় সর্গে তিনি স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া ইন্দ্রকে মেঘনাদের যুদ্ধে অবতরণের সংবাদ দিয়া তাঁহাকে শিবের সাহায্য লাভের জন্য কৈলাসে পাঠাইয়াছেন। তিনিই রাবণের তথা মেঘনাদের নিধনের জন্য সর্বাপেক্ষা সমুৎসুক; কারণ তাহা হইলেই তিনি বৈকুণ্ঠে ফিরিতে পারেন। অথচ, তিনিই এক্ষণে রাবণের দুঃখে একান্তভাবে বিষণ্ণা। লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রের মত এত বেশি অসঙ্গতি মেঘনাদবধ কাব্যে অন্য কোন চরিত্রে ঘটে নাই। বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্ববাসীর আরাধ্যা মায়াদেবী।

কিন্তু নিজদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি—লক্ষ্মীদেবী ভক্তের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন তাহার জন্য, আত্মসমর্থনার্থ রাবণের পাপের কথা উল্লেখ করিতেছেন। রাবণ পাপ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার সবংশে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা রামায়ণের রাবণের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য; কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণ সম্বন্ধে এ কথা সর্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কবি নিজের আদর্শ সৃষ্টি "grand fellow" রাবণের সহিত রামায়ণের কুক্রিয়াসক্ত রাবণ চরিত্রের মৌলিক বিরোধ যে সর্বত্র এড়াইতে পারেন নাই ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত।

প্রাক্তনের গতি—পূর্বকৃত কর্মফলরূপ অদৃষ্ট। লক্ষ্মীদেবী প্রথম সর্গেও প্রাক্তনের ফলের কথা বলিয়াছেন। মহাদেবও বলিয়াছেন :

"হায় দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?" (২। ৪৩৩-৩৪)

শিশির-আসারে—শিশিরের জলে। রঙ্গিণী—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া।

শুখাইল রম্ভাতরুরাজি—বৃক্ষের মধ্যে রম্ভাতরুই সর্বাপেক্ষা সরস। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তি আকর্ষণ করিয়া লওয়ায়,—অন্য সকল বৃক্ষলতা তা দূরের কথা,—লঙ্কার সরস কদলীবৃক্ষগুলি পর্যন্ত শুকাইয়া গেল এবং লঙ্কার সকল শোভা-সম্পদ এককালে অন্তর্হিত হইল। লঙ্কা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শ্রীভ্রষ্টা হইল। কুন্তলশোভন মণি—মস্তকস্থিত মণি। ফণিনীর সহিত অন্বয় করিয়া এস্থলে কুন্তলের আভিধানিক অর্থ 'কেশরাশি' গ্রহণ করা অসম্ভব।

বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা—লক্ষ্মীদেবীর তেজঃ সংবরণকালে যে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাহা বৃষ্টিপাত নহে,— লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রুবর্ষণ। এখানে উপমেয় বৃষ্টিপাতকে অপহ্নব বা অস্বীকার করিয়া উপমান অশ্রুপাতকে প্রাধান্য দেওয়ায় এখানে অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়াছে। এই অলঙ্কারে সাধারণতঃ উপমেয় ও উপমানকে দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে রাখিয়া নেতিবাচক শব্দ দ্বারা উপমেয়কে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কখনও কখনও উহাদের একই বাক্যের মধ্যে রাখিয়া ছল, ছদ্ম প্রভৃতি শব্দের সাহায্যেও উপমেয়কে অস্বীকার করিয়া উপমানের প্রাধান্য দান করা হয়।

কাঁপিলা বসুধা, আক্ষেপে, রে রক্ষোপুরি, ... তুই, স্বর্ণময়ি—অচেতন বস্তুকে চেতনাবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করিয়া আকস্মিক সম্বোধনকে ইংরেজি অলঙ্কারশাস্ত্রে Apostrophe অলঙ্কার বলে। এখানে ইংরেজি Apostrophe বা সম্বোধন অলঙ্কার অনুকৃত হইয়াছে। ভারতীয় সমাসোক্তি অলঙ্কারেও অচেতনের উপর চেতনার আরোপ হয় বটে, কিন্তু সেখানে অচেতনের উপর চেতনার আরোপ ছাড়াও সমান কার্য, বা সমান ধর্ম আরোপ করা হয়।

কুজ্ঝটিকাবৃত যেন দেব ত্বিষাম্পতি ইত্যাদি—মায়ামেঘের দ্বারা আবৃত থাকায় তেজস্বী লক্ষ্মণকে

কুয়াশায় আবৃত সূর্যের ন্যায়, অথবা ধূমায় আবৃত অগ্নির ন্যায় অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল।

বায়ুসখা—অগ্নি; বায়ু সখা যাহার (বহুব্রীহি)। মৃগবরে—সুন্দর হরিণকে; বর শব্দ এখানে বৈশিষ্ট্যসূচক। গুল্ম-আবরণে—ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে থাকিয়া। সুযোগপ্রয়াসী—সুবিধামত শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত। অবগাহকেরে—স্নানকার্যে রত ব্যক্তিকে।

যমচক্ররূপী নক্র—যমের চক্রস্বরূপ ভীষণ কুম্ভীর। যমের দণ্ড ও পাশ অস্ত্রই প্রসিদ্ধ। নক্র শব্দের সহিত অনুপ্রাস সৃষ্টির জন্য 'যমচক্র'। কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া—ভক্তের আসন্ন বিপদ হেতু।

উল্লাসে শুষিলা অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—লক্ষ্মীদেবীর অশ্রুবিন্দু অতি অমূল্য সম্পদ বলিয়া পৃথিবী হর্ষবশতঃ সেই অশ্রুবিন্দুসমূহকে শোষণ করিল।

শুষে শুক্তি যথা ইত্যাদি—স্বাতী নক্ষত্র আকাশে বর্তমান থাকার সময় যদি মেঘ জলবর্ষণ করে, তবে সেই বর্ষাবিন্দু শুক্তিসমূহ যেরূপ আগ্রহ-সহকারে শোষণ বা পান করে, সেইরূপে। স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিত মেঘের বৃষ্টিবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়া মুক্তার সৃষ্টি করে বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে। এস্থলে কাদম্বিনী অর্থাৎ মেঘমালায় চৈতন্য আরোপ করিয়া, চেতনাবিশিষ্ট মানবের ধর্ম অশ্রুমোচনের ভাব তাহার উপর আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে—সুন্দর ফুলরাশির মধ্যে গোপনে কালসর্পের প্রবেশরূপ অপ্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বারা, সুন্দর লঙ্কাপুরীতে গোপনে লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশরূপ প্রস্তাবিত বিষয় সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। চতুর। বল—রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি—এই চারিটি অঙ্গবিশিষ্ট সেনাদল। মাতঙ্গে নিষাদী—হস্তীর উপর গজারোহী সৈনিক।

তুরঙ্গমে সাদিবৃন্দ—অশ্বের উপর অশ্বারোহী সৈনিকগণ। কালানল-সম বিভা—অসংখ্য সৈন্যের অগণিত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মাদি হইতে নির্গত প্রচণ্ড দীপ্তি প্রলয়কালীন অগ্নির মত।

হেরিলা সভয়ে বলী—বীর হইলেও লক্ষ্মণ ভীষণ রাক্ষসবাহিনী দর্শনে মনে মনে ভীত হইলেন।

বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর—রাক্ষস সেনানীগণের নাম। চিক্ষুর রামায়ণে নাই। এই নামটি মার্কণ্ডের পুরাণ (চণ্ডী) হইতে গৃহীত। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল চিক্ষুর।

সর্ব্বভুক্‌রূপী—অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। প্রক্ষেবড়ন—লৌহময় বাণ, নারাচ অস্ত্র। স্যন্দন—রথ। মুর-অরি < মুরারি—মুর নামক অসুরবিনাশক বিষ্ণু। রিপুকুলকাল—শত্রুগণের পক্ষে যমস্বরূপ। বিশারদ রণে—যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। বীরমদে প্রমত্ত সতত প্রমত্ত—সর্বদা নিজের বীরত্বের গর্বে গর্বিত প্রমত্ত নামক রাক্ষস। দেউল < দেবকুল—দেবালয়, মন্দির।

যথা সুরপুরে—লঙ্কার নানা রত্নখচিত অস্ত্রাগার, নাট্যশালা প্রভৃতি স্বর্গের ঐ সকল গৃহের মতই সুন্দর ও সুসজ্জিত। লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে ইত্যাদি—অদৃশ্যভাবে লঙ্কার রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে লক্ষ্মণ চারিদিকে যে সামরিক প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখিলেন তাহা অবর্ণনীয়। লঙ্কার ঐশ্বর্য দেবতাগণের পক্ষে লোভের এবং দৈত্যগণের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র এবং সমুদ্রগর্ভে স্থিত অগণিত রত্ন যেমন গণনার বহির্ভূত, লঙ্কার ঐশ্বর্যও তদ্রূপ। ভাতে—প্রভা বিকিরণ করে। হেমকূট শৃঙ্গাবলী যথা বিভাময়ী—গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্বর্ণময় হেমকূট পর্বতের সু-উচ্চ স্বর্ণ-শৃঙ্গসমূহ যেরূপ দীপ্তিশালী, লঙ্কার স্বর্ণময় উন্নত প্রাসাদশীর্ষসমূহও তদ্রূপ।

হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ ইত্যাদি—লঙ্কার অট্টালিকাসমূহের দ্বার ও বাতায়নসমূহ শুভ্র হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত এবং স্বর্ণখচিত। প্রভাতে শুভ্র তুষারের উপর রক্তিম সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ মনোহর শোভা ধারণ করে, শুভ্র গজদন্তের উপর স্বর্ণের রক্তিম আভা সেইরূপ নেত্রমুগ্ধকর।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি—রাবণের অতুল ঐশ্বর্য ও পরাক্রম সত্ত্বেও তাহার বিনাশ যে অবধারিত ও আসন্ন এই কথা স্মরণ করিয়া।

সাগর-তরঙ্গ যথা—তুলনীয়,—"মিলি মিলি জাওব সাগর-লহরী সমানা।" (বিদ্যাপতি)

অমরতা লাভ, দেব, যশঃসুধা পানে—মেঘনাদের ন্যায় ত্রিভুবনবিজয়ীকে বধ করিয়া যে কীর্তি অর্জন করিবে, তাহার ফলে জগতে অমর অর্থাৎ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মৃগাক্ষী গঞ্জিনী- মৃগাক্ষীগণের অর্থাৎ বিশাললোচনা সুন্দরীগণের সৌন্দর্যগর্বহারিণী। সুহাসি—নয়নমুগ্ধকর হাস্য। আবসী আবৃত—লৌহময় বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত দেহ। ত্যজি ফুলশয্যা—রাত্রির কুসুমাস্তীর্ণ কোমল বিলাস শয্যা। ভৈরবে—ভৈরব বা ভয়ানক শব্দে। ক্রিয়াবিশেষণ। বাজিপাল—অশ্বরক্ষক। প্রমদে—মদে মত্ত হইয়া। শোভিছে পট্ট-আবরণে পিঠে ইত্যাদি—হস্তিসমূহের পৃষ্ঠদেশে রেশমি কাপড়ের আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের প্রান্তস্থিত ঝালরগুলি মুক্তাখচিত।

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে ইত্যাদি—প্রভাতে লঙ্কাপুরীর দেবালয়সমূহে প্রাতঃকালীন আরতির বাদ্যধ্বনি, দেবদোল উৎসব সম্পাদনকালে দেবগণকর্তৃক বাদিত স্বর্গীয় বাদ্যধ্বনির ন্যায় মনোহর।

দেবদোলোৎসব—ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা-পর্ব-উপলক্ষে দেবতারা প্রভাতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব সম্পন্ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি বাল্যে কবির মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার পরিচয় "দেবদোল" নামক চতুর্দশপদী কবিতায় পাওয়া যায়। ফুল-পরিমলে—'পরিমল' বাংলায় সাধারণ সৌরভ অর্থে বহুল প্রযুক্ত হইলেও, শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে মর্দিত বস্তু হইতে নির্গত সুগন্ধ। "মর্দনোত্থে পরিমলম্"—(অমরকোষ)। ভারী—ভারবাহক। প্রগল্‌ভে—প্রগল্‌ভভাবে; দম্ভের সহিত উচ্চকণ্ঠে। ক্রিয়াবিশেষণ।

দহিবে বিপক্ষ দলে শুষ্কতৃণে যথা দহে বহ্নি—তুলনীয় :

> "ক্ষণেন তৎ মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
> নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্।।" (চণ্ডী—২।৬৭)

রিপুদমী—শত্রুর নিগ্রহে সমর্থ মেঘনাদ।

দণ্ডি তাত বিভীষণে বাঁধিবে অধমে—শ্রেষ্ঠার্থক তাত শব্দের সহিত অধম শব্দের প্রয়োগ অসমর্থনীয়। তাত শব্দটিকে এখানে খুল্লতাত শব্দের সংকীর্ণ রূপ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

হাসি মনে মনে—রাক্ষসেরা তাঁহাদের দেখিতে না পাইয়া অসঙ্কোচে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিয়া কৌতুক বোধ করিয়া।

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে—এস্থলে মেঘনাদের যজ্ঞগৃহের যে বর্ণনা পাই তাহা নিঁখুতভাবে আর্যবংশীয় যে কোন ভক্তের পূজাগৃহের চিত্র। এখানে কুশাসন, ক্ষৌমবস্ত্র, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ঘণ্টা, এমন কি গঙ্গাজলে পূর্ণ কোষাকুষীর পর্যন্ত অভাব নাই।

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া—গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তুত কোষাকুষী দেবার্চনার চেয়ে পিতৃ-তর্পণ ও শ্রাদ্ধেই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত। গোষ্ঠগৃহে—গোশালায়, বাথানে। মায়াবলে—দ্বার ,রুদ্ধ থাকিলেও মায়াদেবীর কৃপায় দ্বার নিজ হইতে মুক্ত হইল এবং লক্ষ্মণের প্রবেশ করিতে বাধা ঘটিল না।

ধ্বনিল বাজি তূণীর ফলকে—পৃষ্ঠে আবদ্ধ তূণ ও ঢালের পরস্পর সংঘর্ষে শব্দ হইল।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর ইত্যাদি—সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীর মধ্যে সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে শত্রু লক্ষ্মণের আগমন কল্পনারও অতীত। সুতরাং দেবতার ন্যায় কান্তিযুক্ত লক্ষ্মণকে ধ্যানভঙ্গের পর সম্মুখে দেখিয়া, স্বভাবতঃ তাঁহাকে লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বরদান করিতে সমাগত নিজের ইষ্টদেব অগ্নি

নিশ্চয় করিয়া মেঘনাদ ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রসাদিতে—বরদানে তুষ্ট করিতে। রৌদ্র—রুদ্রের ন্যায় ভীষণ।

যথা পথে সহসা হেরিলে ইত্যাদি—নিশ্চিন্তভাবে পথে চলিতে চলিতে পথিক যদি হঠাৎ উদ্যতফণা ভীষণ কালসর্পের সম্মুখে পতিত হয়, তখন সে ত্রাসে যেরূপ গতিহীন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া মেঘনাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। শত্রুর পক্ষে দুর্গমতম নিকুম্ভিলায় আগমন অসম্ভব ব্যাপার। এই অসম্ভবও যখন সম্ভবপর হইয়াছে, তখন অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করার চেষ্টা বৃথা;—ইহাই মেঘনাদের ত্রাসের কারণ। পিণ্ড—লৌহাদি ধাতুর কঠিন তাল। মিহিরে—সূর্যকে। নিদাঘ—গ্রীষ্মঋতু।

সভয় হইল আজি ... নলের শরীরে—পর পর চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মেঘনাদের নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে মালাদৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে—পৌরাণিক প্রসঙ্গ (Allusion) অলঙ্কার। ধর্মাত্মা নলের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কলি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ক্ষতিসাধনের জন্য বহুদিন চেষ্টা করিয়াও কোন সুযোগ পায় নাই। অবশেষে একদিন ভ্রমবশতঃ নল অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যাহ্নিক করাতে সেই সুযোগে কলি তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী হইতে বিচ্ছিন্ন করে। মেঘনাদের মনেও এতকাল ভয় প্রবেশ করিবার কোন সুযোগ পায় নাই। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্মণের আবির্ভাবে বিনাশের কারণস্বরূপ ভয় কৌশলে তাহার মনে প্রবেশ করিল।

সত্য যদি তুমি রামানুজ—একান্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া লক্ষ্মণ নিজের পরিচয় দান সত্ত্বেও মেঘনাদের সংশয় ঘুচিতেছে না। শৃঙ্গধরসম—পর্বতের ন্যায়। চক্রাবর্তীরূপে—ঘূর্ণ্যমান চক্রসমূহের ন্যায় বাধা সৃষ্টি করিয়া।

কোন মায়াবলে—কারণ, দৈব ষড়যন্ত্র এবং মায়াদেবীর সাহায্যের কথা মেঘনাদের অজ্ঞাত।

মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে ইত্যাদি—তুমি লক্ষ্মণ সাধারণ মানুষকুলে তোমার জন্ম। সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা,—দেবকুলে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যেও এমন শক্তিমান কে আছে যে, লঙ্কার এই সকল বীর যোদ্ধাকে একাকী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই যজ্ঞগৃহে আসিতে পারে? প্রপঞ্চে—মায়ায়, ছলনায়।

নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ইত্যাদি—লক্ষ্মণ দেহধারী মনুষ্য, দেহহীন বায়বীয় পদার্থ নহে; কি করিয়া সে অর্গলবদ্ধ দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে? গৃহের দ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই আমার উপাস্য অগ্নিদেব, ভক্তের সহিত রহস্য করিবার জন্য শত্রু লক্ষ্মণের রূপে আবির্ভূত হইয়াছ।

নিঃশঙ্কা—শঙ্কাহীন; লঙ্কার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—যুদ্ধে সৈন্যগণকে আহ্বানকারী শৃঙ্গবাদকগণ। গ্রাম সমূহার্থক শব্দ। বিদাও—(নামধাতু) বিদায় দাও।

সৌমিত্রি কেশরী—কেশরী শব্দটি বহুস্থলে লক্ষ্মণের স্থির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও এই সর্গে মেঘনাদবধ ব্যাপারে তাঁহার চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এই বীরত্বসূচক বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া উঠিয়াছে।

কৃতান্ত আমি রে তোর ইত্যাদি—পরিচয় দিবার পরও মেঘনাদ তাঁহাকে নিজের উপাস্যদেবতা বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া, লক্ষ্মণ তাহাকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন যে, তিনি মেঘনাদের উপাস্য দেবতা নহেন,—তিনি তাহার যম। কাল পূর্ণ হইলে দৃঢ় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও সর্প উঠিয়া দংশন করিতে পারে। সেইরূপ তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া, দৃঢ়ভাবে রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেও আমার

প্রবেশ সম্ভবপর হইয়াছে। কঠিন নিশ্ছিদ্র মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সর্পের আবির্ভাব অসম্ভাব্য ব্যাপার হইলেও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এইরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয়,—এই অপ্রস্তাবিত সাধারণ ঘটনাটি দ্বারা, মেঘনাদের মৃত্যু অবধারিত বলিয়াই, অর্গলবদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে লক্ষ্মণের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে,—এই অনুক্ত বিশেষ ঘটনাটি সমর্থিত হইতেছে বলিয়া এ স্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। দেব-বলে বলী—অগ্নিদেবের কৃপায় শক্তিমান। দেবকুলে—ইন্দ্রাদি অন্য সকল দেবতাকে। মজিলি < মস্জ্ ধাতু—নিমগ্ন হইলি, ডুবিলি, অর্থাৎ বিপদে পড়িলি। উলঙ্গিলা—কোষমুক্ত করিল। অবনগ্ন > ওনঙ্গ > ওলঙ্গ > উলঙ্গ—আবরণশূন্য, নগ্ন। ভৈরবে—ভীষণ হুঙ্কারের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ।

আঁখি < অখ্খি < অক্ষি। অক্ষি শব্দে অনুনাসিক ধ্বনি না থাকিলেও প্রাকৃত 'অঙ্খি' শব্দে অনুনাসিকত্বহেতু বাংলা বানানে অনুনাসিক হইয়াছে।

শক্রকরে যথা ইরম্মদময় বজ্র—ইন্দ্রের করধৃত বজ্রাগ্নি পরিপূর্ণ বজ্রের ন্যায় লক্ষ্মণের হস্তস্থিত দৈব তরবারি প্রখর দীপ্তিতে চক্ষু ঝলসাইয়া ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হইল। মহাহবে—ভীষণ যুদ্ধে, মহা + আহব (যুদ্ধ)। আতিথেয়-সেবা—অতিথি সেবাপরায়ণ ব্যক্তির পরিচর্যা বা অভ্যর্থনা।

রক্ষোরিপু তুমি তবু ইত্যাদি—তুমি রাক্ষসগণের শত্রু হইলেও যখন রাক্ষসগৃহে পদার্পণ করিয়াছ, তখন অভ্যাগতের সম্মান তোমার প্রথম প্রাপ্য। জলদ-প্রতিম-স্বনে—মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে। আনায় মাঝারে—ফাঁদের বা জালের মধ্যে পতিত অবস্থায়।

অবোধ—বুদ্ধিহীন; শত্রুর নিকটে অস্ত্রসজ্জিত হইবার সময় প্রার্থনাহেতু।

ক্ষাত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব ইত্যাদি—মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ সংযত ও শিষ্ট চরিত্রের বৈপরীত্যহেতু লক্ষ্মণচরিত্র এই স্থলেই সর্বাপেক্ষা গ্লানিজনক হইয়া উঠিয়াছে।

"মারি অরি পারি যে কৌশলে।"

এই উক্তি ভারতীয় বীরত্বের আদর্শের সহিত একেবারেই সামঞ্জস্যযুক্ত নহে। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যে দুর্যোধনও এই জাতীয় কথা বলিয়াছে :

"ব্যাঘ্র সনে নখদন্তে নহিক সমান,—
তাই বলি ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ,
কোন নর লজ্জা পায়? যার যাহা বল,—
তাই তার কাছে পিতঃ! যুদ্ধের সম্বল।"

কিন্তু এইরূপ উক্তি ঈর্ষাপরায়ণ, খল দুর্যোধনের মুখেই মানায়; 'সৌমিত্রি কেশরীর' মুখে ইহা নিতান্তই অনুচিত ও বিসদৃশ হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের ৮৮-৯০ সর্গে মেঘনাদের সহিত সংগ্রামে লক্ষ্মণচরিত্র কিন্তু বীরত্বগৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

অভিমন্যু যথা হেরি সপ্ত শূরে—অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথ—এই সপ্তরথী একসঙ্গে আক্রমণ করিতে আসিলে, সে রথিগণের কাপুরুষোচিত আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপে তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিল, সেইরূপে।

কাকোদর—সর্প। কু অক (গমন, গতিভঙ্গি) কাক। কাক (বক্রগতিবিশিষ্ট) উদর যাহার। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে বলিয়া সর্পের নাম কাকোদর।

ধরিলা সত্বরে দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ—মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ রক্তাক্তদেহে ভূপতিত ও মূর্ছিত হইলে, তিনি তাহার হস্তস্থিত দৈব অসি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন।

নারিলা তুলিতে তাহায়—মায়ার প্রভাবে দৈব তরবারি এত ভারী হইয়া উঠিল যে, মেঘনাদ তাহা উত্তোলন করিতেই পারিলেন না।

যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া ইত্যাদি—হস্তী অত্যন্ত বলবান হইলেও সে যেমন শুণ্ডের সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদ লক্ষ্মণের পৃষ্ঠে আবদ্ধ তৃণটি কাড়িয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন।

মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!—মায়াদেবীর প্রভাবে জগতে একান্ত অসম্ভাব্য ঘটনাও সম্ভবপর হয়। চাহিয়া দুয়ার পানে অভিমানে মানী—আত্মশক্তিতে একান্ত নির্ভরশীল মেঘনাদ তাঁহার কোষার আঘাতে মূর্ছিত লক্ষ্মণের দেহস্থিত সামান্য কয়েকটি অস্ত্র প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুলিতে না পারিয়া এই প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার মধ্যে একটি দৈব ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, অন্য কেহ তাঁহার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিল কি না।

সচকিতে—ভয়ের বা ত্রাসের সহিত।

ধূমকেতু সম—ধূমকেতুর ন্যায় অমঙ্গলসূচক। ধূমকেতুর আবির্ভাবকে সকল দেশেই লোকে অমঙ্গল সূচক বলিয়া মনে করে। তুলনীয়—

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।" (কুমার, ২।৩২)
"ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।" (জয়দেব)
"And from his horrid hair
Shakes pestillence and war." (Paradise Lost, II)

এতক্ষণে ইত্যাদি—বিভীষণকে দ্বারপথে শূলহস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন যে, এতক্ষণে তিনি লক্ষ্মণের পুরপ্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

নিকষা—সুমালী রাক্ষসের কন্যা, বিশ্রবা ঋষির পত্নী এবং রাবণ ইত্যাদির মাতা নিকষা বা কৈকসী। শূলী শম্ভুনিভ—এই কাব্যে কুম্ভকর্ণের স্থির বিশেষণ।

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে—এতকাল লঙ্কা যে অতি তুচ্ছ শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আজ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বীর রাক্ষসগণের মাতৃভূমি লঙ্কার সেই কলঙ্ক দূর করিব। কাতরে—বিভীষণের রামানুগত্য স্বীকাররূপ অমর্যাদাকর বাক্যে মর্মাহত হইয়া।

স্থাণুর ললাটে—মহাদেবের কপালে বা মস্তকে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি ... কেবা সে অধম রাম?—এখানে মহাদেবের ললাটস্থিত চন্দ্র কখনও পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হয় না,—এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দ্বারা, মহৎ রাক্ষসকুলে জন্মিয়া বিভীষণের হীন মানব-বংশজাত রামের আনুগত্য যে অত্যন্ত অসঙ্গত ও লজ্জাজনক,—এই বিষয়টি সমর্থিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

স্বচ্ছ সরোবরে ... শৈবালদলের ধাম?—এস্থলেও দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

মৃগেন্দ্র কেশরী—মৃগেন্দ্র ও কেশরী উভয় শব্দের অর্থই সিংহ। এস্থলে মৃগেন্দ্র শব্দকে পশুরাজ অর্থে গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ এড়ানো যায়। তুলনীয়—

"কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।" (১।২০৬-২০৭)

ক্ষুদ্রমতি—হীনচেতাঃ, কাপুরুষ। সম্বোধে সংগ্রামে—যুদ্ধে আহ্বান করে।

কহ মহারথি, একি মহারথি-প্রথা—তুমি নিজে বীরবংশজাত একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা; সুতরাং লক্ষ্মণের আচরণ যে কতদূর নিন্দনীয় ও গ্লানিজনক তাহা তোমার বোঝা উচিত।

নাহি শিশু লঙ্কাপুরে—বীরভূমি লঙ্কার প্রবীণ বীরগণ ত দূরের কথা, এমন কি এখানকার বুদ্ধিহীন

শিশুরাও জানে যে, অস্ত্রহীন শত্রুকে আক্রমণ করা একান্ত কাপুরুষের কার্য। তাহারাও লক্ষ্মণের আচরণের কথা শুনিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবে!

হেন দুর্ব্বল মানবে—নিরস্ত্র শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র কোষার আঘাতে যে মূর্ছিত হইয়া পড়ে, এইরূপ শক্তিহীন লক্ষ্মণকে। প্রগল্ভে—ধৃষ্টতার সহিত, অনুচিত সাহসের সহিত।

নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য—দৈত্য-বংশের জামাতা বলিয়া কথিত ইন্দ্রদ্বেষী মেঘনাদের মুখে উক্তিটি খুব স্বাভাবিক হয় নাই। মহামন্ত্রবলে—সর্পবশীকরণের অব্যর্থ মন্ত্রের শক্তিতে। মলিনবদন লাজে—মেঘনাদ তাহার বংশগৌরবের উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দেওয়ায় লজ্জায় ম্লান মুখে।

লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া, উদ্দেশ করিয়া। নিজ কর্ম্মদোষে—সীতার অপহরণরূপ দুষ্কার্যের জন্য।

প্রলয়ে যেমতি বসুধা ইত্যাদি—প্রলয়কালে সকল পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়া যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, লঙ্কাও সেইরূপ এই পাপ প্লাবনে ডুবিয়া অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি—রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে আকাশে সুবৃহৎ মেঘের ক্রুদ্ধ গর্জন যেরূপ গম্ভীর শুনায়, সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে। কোপি—কুপিত হইয়া, কোপ বা ক্রোধবশে।

ধর্ম্মপথগামী ইত্যাদি—বাল্মীকি বিভীষণ-চরিত্র এইরূপেই কল্পনা করিয়াছেন।

কোন ধর্ম্মমতে, কহ দাসে শুনি ইত্যাদি—বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কার বাণীসমূহ রামায়ণ হইতে প্রায় অবিকল অনুবাদরূপে গৃহীত। তুলনীয়—

"ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্যং ন জাতি স্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ।। (লঙ্কা, ৮৭।১২)

রামায়ণ ও মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের ভর্ৎসনার ভাষা এক হইলেও, ভর্ৎসনার ভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রামায়ণে মেঘনাদ বিভীষণকে পরম শত্রু বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। এবং 'দুর্মতি' 'ধর্মদূষণ' প্রভৃতি পরুষ বাক্যে তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদ কিন্তু কখনও চরিত্রের সংযম হারান নাই। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেও, চরম উত্তেজনার মধ্যেও তিনি বিভীষণকে 'তাত', 'পিতৃব্য' প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন এবং সর্বদাই নিজেকে বিভীষণের 'দাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি পরজন ইত্যাদি—এটি কোন বিশেষ শাস্ত্রের বচন নহে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের রামায়ণোক্ত তিরস্কারের অনুবাদ। তুলনীয়—

"গুণবান বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোহপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ।।"(লঙ্কাকাণ্ড ৮৭।১৫)

পরঃ পরঃ সদা—ছন্দের সমতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে 'পর' শব্দ দুইটির অ-কারান্ত উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ বিসর্গের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এ শিক্ষা হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?—মহৎ রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ-মর্যাদা, জ্ঞাতি-প্রীতি, ভ্রাতৃ-ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণ কোন রাক্ষসই একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না। বিভীষণ রাক্ষস-বংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বজাতি-বাৎসল্য প্রভৃতি গুণকে অবহেলা করার শিক্ষা কোথায় পাইলেন?

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! ইত্যাদি—বিভীষণের অরাক্ষসোচিত নিন্দনীয় স্বভাবের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে মেঘনাদের হঠাৎ মনে পড়িল যে, রাক্ষসরাজ-সভা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি তিনি হীনমতিগতিবিশিষ্ট রামের সংসর্গে রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার চরিত্রের অবনতি অপরিহার্য; সুতরাং সংসর্গজ চরিত্রের হীনতা কোন ভর্ৎসনাতেই দূর হইবে না বলিয়া ভর্ৎসনা করা বৃথা।

রামায়ণেও মেঘনাদ বলিয়াছে :

"ক্ব চ স্বজন-সংবাসঃ ক্ব চ নীচ পরাশ্রয়ঃ।। (লঙ্কাকাণ্ড, ৮৭।১৪)

নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে চরিত্রের অবনতি ঘটে,---এই সাধারণ সত্যটির উল্লেখ দ্বারা, নীচ রামের সংস্পর্শে আগত বিভীষণের নীচত্ব-লাভরূপ বিশেষ ব্যাপারটি সমর্থিত হইতেছে বলিয়া এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে।

হেথায়---ইত্যবসরে; মেঘনাদ ও বিভীষণের বাদ-প্রতিবাদ কালের মধ্যে। সন্ধানি--(অসমাপিকা ক্রিয়া) সন্ধান অর্থাৎ ধনুতে শর যোজনা করিয়া। তিতিয়া---সিক্ত করিয়া, ভিজাইয়া। (পদ্যে প্রযুক্ত)

অধীর ব্যথায় রথী সাপটি সত্বরে ইত্যাদি---দুঃশাসন প্রভৃতি সপ্তরথি-কর্তৃক একযোগে আক্রান্ত হইয়া অস্ত্রহীন হইলে, অভিমন্যু আত্মরক্ষার জন্য ভগ্ন রথের বিভিন্ন অংশ, ভগ্ন ও অব্যবহার্য তরবারি, ছিন্নভিন্ন ঢাল এবং বিদীর্ণ বর্ম প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের সামনে পাইয়াছিলেন, তাহাই যেমন শত্রুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,---সেইরূপ লক্ষ্মণ কর্তৃক মুহুর্মুহুঃ নিক্ষিপ্ত শরে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ মেঘনাদও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, অস্ত্রের অভাবে পূজার উপচার শঙ্খ, ঘণ্টা, পুষ্পপাত্রাদি যাহা পাইলেন তাহাই তুলিয়া লইয়া, ক্রুদ্ধভাবে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মায়াময়ী মায়া বাহু প্রসরণে ইত্যাদি---মাতা যে ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রিত শিশুসন্তানের দেহ হইতে মশক তাড়াইয়া দেন, সেইরূপ লক্ষ্মণের প্রতি মেঘনাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বস্তুগুলিকে মায়াদেবী তাঁহার অদৃশ্য হস্ত সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্থ সর্গে মেনেলাসের প্রতি প্যাণ্ডরাস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর মিনার্ভা দেবী ব্যর্থ করেন। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :

'Pallas assists, and (weaken'd in its force)
Diverts the weapon from its destin'd course :
So from her babe, when slumber seals his eye,
The watchful mother wafts th' envenom'd fly.

(Iliad,—IV 160-163)

দেবদেবীগণ কর্তৃক শত্রুর আক্রমণ হইতে স্ব স্ব ভক্তকে রক্ষা করা ইলিয়ড কাব্যে একটি সাধারণ ব্যাপার। ৩য় সর্গে উক্ত হইয়াছে যে, পারিসের প্রতি মেনেলাসের নিক্ষিপ্ত শর আফ্রোদিতি বা ভেনাস্ ব্যর্থ করেন; এবং ২০শ সর্গে উক্ত হইয়াছে যে, হেক্টরের প্রতি একিলিসের নিক্ষিপ্ত বর্শা এপোলো ব্যর্থ করেন। সরোষে রাবণি ধাইলা লক্ষ্মণ পানে ইত্যাদি---আক্রমণকারী ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে সিংহ যেমন ভীষণ গর্জন করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, শস্ত্রনিক্ষেপকারী লক্ষ্মণের প্রতি নিজের নিক্ষিপ্ত সকল বস্তুই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে দেখিয়া, প্রচণ্ড আক্রোশে মেঘনাদ অবশেষে তাঁহার প্রতি সেই সিংহের মতই ভীমগর্জনে ধাবিত হইলেন।

মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে ইত্যাদি---লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত মেঘনাদ মায়াদেবীর কৌশলে নিজের চারিপাশে মহিষারূঢ় যমকে, শূলধারী রুদ্রকে এবং শঙ্খচক্র গদাধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে এবং স্বর্গীয় বিমানযানে অবস্থিত অন্যান্য দেবগণকে দেখিতে পাইলেন।

আসন্ন মৃত্যুকালে যমের দর্শনলাভ কিংবা অন্যান্য বিভীষিকা দর্শন অরিষ্ট লক্ষ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু শিবভক্ত রাক্ষসবীরের নিকট শিব অরিষ্টরূপে কেন আবির্ভূত হইবেন তাহা বুঝা যায় না। হয়ত, কবি শিবের প্রলয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তিকে অরিষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন।

শঙ্খ, চক্র, গদা চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ---বিষ্ণুর চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধৃত। এস্থলে পদ্ম কি ছন্দের অনুরোধেই পরিত্যক্ত হইয়াছে? চ্যুত সংস্কৃতি দোষ। নিষ্কল---বীর্যহীন, শক্তিহীন। 'কলাধর' অর্থাৎ চন্দ্রপক্ষে নিষ্কল শব্দের অর্থ কলারহিত অর্থাৎ জ্যোতিহীন।

ঝলসিলা ফলক আলোকে নয়ন—দৈব তরবারির অত্যুজ্জ্বল ফলকের দীপ্তিতে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। ফলক শব্দটি মধুসূদন অধিকাংশ স্থলে ঢাল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু এখানে 'অসি-ফলক' অর্থাৎ তরবারির ফলা বা পাত অর্থ হইবে।

হায়রে অন্ধ অরিন্দম বলী ইত্যাদি —শত্রুজয়ী শক্তিমান বীর মেঘনাদ দৈবাস্ত্রের প্রখর দীপ্তিতে অন্ধ হওয়ায় মৃত্যুকালে শত্রুর আঘাত এড়াইবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতে না পারিয়া রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পতিত হইলেন। দৈবের বিরুদ্ধে কোন শক্তিই দাঁড়াইতে পারে না, এই যে সত্যটি মেঘনাদবধ কাব্যে কবি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রজয়ী বীর মেঘনাদের অসহায় পশুবৎ নিধনের ভিতর দিয়া অতি করুণ ও চমৎকার ভাবে ইঙ্গিত হইয়াছে।

থর থরি কাঁপিলা বসুধা ইত্যাদি —ইন্দ্রপাত হইলে সমস্ত বিশ্বে একটা আলোড়ন ও বিক্ষোভ ঘটে; ইন্দ্রজিতের পতনে উহা আরও প্রচণ্ড হইবার কথা। কর্বুরপতি—রাক্ষসরাজ রাবণ।

সহসা পড়িল কনক মুকুট খসি—কারণ, তাহার শেষ অবলম্বন মেঘনাদের মৃত্যুতে তাহার বিনাশও আসন্ন। সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে —কারণ রাবণ শিবভক্ত ছিলেন। বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার। কারণ 'শ' (স) ও 'ঙ্ক' ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে।

বামেতর নয়ন— বাম ভিন্ন অন্যটি, অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বাম চক্ষু স্পন্দিত হওয়ায় অমঙ্গলের লক্ষণ।

আত্মবিস্মৃতিতে হায়, অকস্মাৎ সতী ইত্যাদি—প্রমীলা কপালে হাত দিতে যাইয়া অন্যমনস্কভাবে সাধবের চিহ্ন সিন্দূরের ফোঁটাটি স্বহস্তে মুছিয়া ফেলিলেন।

মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচম্বিতে—সন্তান যতদূরে যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার বিপদ মাতার নির্জ্জন মন জানিতে পারে। যজ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাতা মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের কক্ষে কোন কারণ ব্যতিরেকে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মধুপুরে < মথুরাপুরে। অসুরারি-রিপু—অসুরগণের শত্রু ইন্দ্র; তাঁহার শত্রু মেঘনাদ। পরুষ বচনে—তীব্র কঠোর বাক্যে। রাবণ-নন্দন আমি না ডরি শমনে! ইত্যাদি—বীর রাবণের পুত্র আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু দৈত্য-বিজয়ী ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তোর মত কাপুরুষ তুচ্ছ মানবের হস্তে যে আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল, মৃত্যুযন্ত্রণাপেক্ষাও এই ক্ষোভ আমার মনকে বেশী পীড়িত করিতেছে।

বারতা < বার্তা—সংবাদ। পশিবে সে দেশে রাজরোষ—গভীর সমুদ্র-গর্ভে জলের মধ্যে যাইয়া আত্ম-গোপন করিলেও রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধ সেখানেও তোকে অনুসরণ করিবে।

বাড়বাগ্নি-রাশি সম তেজে—বাড়বাগ্নি যেমন জলে নির্বাপিত হয় না, সেইরূপ রাবণের ক্রোধাগ্নিও সমুদ্রজলে নির্বাপিত হইবে না।

ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক ঊর্ব ঋষির মাতা লাঞ্ছিতা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া ঊর্ব নিজের তপস্যাগ্নিতে সৃষ্টি ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতৃগণ সৃষ্টি-ধ্বংস করিতে নিষেধ করিলে, ঊর্ব তপস্যার তেজঃ সমুদ্রে বিসর্জন করেন। সেই তপস্যাগ্নি বড়বা অর্থাৎ ঘোটকীর আকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্র-জলে বিচরণ করে বলিয়া তাহার নাম বড়বানল বা বাড়বাগ্নি।

দাবাগ্নি—দাবে (বনে) প্রজ্বলিত অগ্নি; অথবা দাবদাহক অগ্নি। মধ্যপদলোপী সমাস।

কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি!—ইষ্টপূজায় রত শত্রুর গৃহে গোপনে আগমন করিয়া, নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করার কলঙ্ক লক্ষ্মণের কখনও ঘুচিবে না।

চিরানন্দ—মেঘনাদের জীবনের স্থির আনন্দস্বরূপ! চিরানন্দ শব্দটিকে বিধেয় বিশেষ্য রূপে

প্রয়োগ করা হইয়াছে। লোহ—রক্ত।

লঙ্কার পঙ্কজরবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যসদৃশ। মেঘনাদের স্থির বিশেষণ রূপে কবি বহুবার কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দটির সমাসবাক্য গঠন স্বাভাবিক হয় নাই। "লঙ্কা-পঙ্কজের রবি" অথবা "লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি" শুদ্ধতর প্রয়োগ হইত। আসক্তি বা সম্বন্ধ অনুসারে প্রথমে লঙ্কার সহিত পঙ্কজের রূপক কর্মধারয় সমাস না করিয়া পঙ্কজের সহিত রবির সমাস সমর্থনীয় নহে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অর্থবোধ হইলে এরূপ সমাসের বিধি সংস্কৃত ব্যাকরণেও (সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ) আছে।

নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিংবা ত্বিষাম্পতি শান্তরশ্মি—প্রাণশূন্য হইলে বীর্য ও তেজঃপূর্ণ মেঘনাদের দেহ নির্বাপিত অগ্নির মত, অথবা প্রশমিততেজঃ অস্তায়মান সূর্যের মত ম্লান হইয়া গেল। তুলনীয়—"শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।" (লঙ্কাকাণ্ড, ৯১।৮৩)

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে—রামচন্দ্রের অনুগত হইলেও, বীর ভ্রাতৃপুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে বিভীষণ শোকার্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, তিনিই যে অস্ত্রাগারে যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া মেঘনাদের মৃত্যুসংঘটনে সাহায্য করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার প্রবল অনুতাপ হইল। রামায়ণেও বিভীষণ বলিয়াছেন যে, তিনি মেঘনাদকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেও সে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। "হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।" (লঙ্কাকাণ্ড—৯০।১৮)

সুপট্ট-শয়নশায়ী—পট্টবস্ত্রে প্রস্তুত অতি কোমল ও সুখস্পর্শ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত।

কি বিরাগে—কোন দুঃখে। সুরবালা-গ্লানি-রূপে দিতিসুতা যত কিঙ্করী—প্রমীলার সুন্দরী অনুচরীগণ, যাহাদের রূপ দেবকন্যাগণের রূপ-খ্যাতিকেও মলিন করিয়াছে।

খুলিব এখনি তব অনুরোধে দ্বার ইত্যাদি—বিপন্ন মেঘনাদের একান্ত কাকুতি-মিনতিতেও বিভীষণ দ্বার মুক্ত করেন নাই বলিয়া, বীর ভ্রাতৃপুত্রের মৃত্যুতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন যে, এখনই তিনি দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন; মেঘনাদ অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র আনিয়া শত্রু ধ্বংস করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক দূর করুন।

হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব ... পড়ি হে ভূতলে?—মধ্যাহ্নকালে সূর্য পরিপূর্ণ তেজঃ ও আলোক বিকিরণকালে কখনও অস্ত যান না; সেইরূপ পরিপূর্ণ যৌবন ও যশঃ ভোগ করিবার কালে অসময়ে মেঘনাদের জীবনান্ত হওয়াও উচিত নয়। এস্থলে মধ্যাহ্নকালীন প্রদীপ্ত সূর্য উপমান, পরিপূর্ণ যৌবনবিশিষ্ট তেজস্বী মেঘনাদ উপমেয় এবং উভয়ের সাধারণ ধর্ম অসময়ে অন্তর্ধান; দুইটি উক্তি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে প্রকাশিত এবং তুলনাবাচক যথা প্রভৃতি কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

রক্ষঃ-অনীকিনী—সুবৃহৎ রাক্ষস সেনাদল। অনীকিনী অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী ২১৮৭০ সৈন্য সংখ্যাবিশিষ্ট বৃহৎ সেনাদলের নাম। বাঙ্গালা ভাষায় সর্বত্রই অনীকিনী সাধারণ সৈন্যদল অর্থে প্রযুক্ত হয়। শোকী—শোকার্ত (অপ্রচলিত)। বৃথা খেদে—অর্থহীন বিলাপে; কারণ ইহাতে মেঘনাদ পুনর্জীবন লাভ করিবে না।

অপরাধ নহে তোমার—বিভীষণের মনের অনুতাপ ও গ্লানি দূর করিবার জন্য লক্ষ্মণ বলিতেছেন যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই মেঘনাদের মত পরাক্রমশালী বীর তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে; ইহাতে বিভীষণের কোন দায়িত্ব বা অপরাধ নাই।

চিন্তাকুল চিন্তামণি—লক্ষ্মণের নিকট ইষ্টদেবের ন্যায় আরাধ্য দুশ্চিন্তামগ্ন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় প্রেরণাকালে রামের মনের দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা সর্গের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

চিন্তামণি—অভীষ্টপূরণক্ষম মণি, ভগবান্। এস্থলে, লক্ষ্মণের নিকট ঈশ্বরতুল্য পূজনীয় রামচন্দ্র।

বাজিছে মঙ্গলবাদ্য ইত্যাদি—মেঘনাদের নিধন যে দেবগণের একান্ত অভিপ্রেত ছিল, এবং দিব্য বাদ্যধ্বনির দ্বারা তাঁহারা যে মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন, তৎপ্রতি ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিতেছেন। স্বপনে যেমনি মনোহর—স্বপ্নের মধ্যে শ্রুত মধুর ধ্বনিকে মধুরতর মনে হয়। ভীমা—ভীষণা ব্যাঘ্রী।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র ইত্যাদি- পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিশীথে গোপনে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবভ্রমে দ্রৌপদীর সুপ্ত পঞ্চপুত্রকে বধ করিয়া যেরূপ আনন্দ ও ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত দুর্যোধনের নিকটে দ্রুত প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেইভাবে।

মনোরথ গতি—মানুষের ইচ্ছা বা চিন্তার ন্যায় দ্রুত গতিতে; ইংরেজী 'Quick as thought'-এর অনুকরণে। হরষে তরাসে ব্যগ্র—শত্রুনিধনের জন্য হর্ষ এবং পাণ্ডবপক্ষীয়গণের হস্তে ধৃত হইবার সম্ভাবনায় ত্রাস। যথা—যে স্থলে, দ্বৈপায়ন হ্রদে।

দুর্যোধন যথা ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে—ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হইবার পর, দুর্যোধন পাণ্ডবগণের নিকট পরাজিত হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

করপুটে—যুক্তকরে, কৃতাঞ্জলি হইয়া। অবতংস—কর্ণ বা মস্তকের ভূষণ। শক্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ।

লভিনু সীতায় আজি ইত্যাদি—দুর্দান্ত মেঘনাদ নিহত হওয়ায় রাবণ অবিলম্বেই নিহত হইবে,—সুতরাং সীতারও উদ্ধার প্রত্যাসন্ন ও অবধারিত।

রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে—রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া তুমি রঘুকুলের প্রমূর্ত কল্যাণ-স্বরূপ। গ্রহরাজ দিননাথ যথা ইত্যাদি— গ্রহগণের মধ্যে যেরূপ সূর্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মিত্রগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। বৃষ্টিলা—(নামধাতু) বর্ষণ করিল; কবিতায় সাধারণ প্রয়োগে 'বর্ষিল'।

আতঙ্কে কনকলঙ্কা জাগিল সে রবে—মেঘনাদবধের পর লক্ষ্মণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রামচন্দ্রের সৈন্যগণ 'জয় সীতাপতি জয়' বলিয়া যে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, সেই শব্দে লঙ্কার অধিবাসিগণ ভীত সন্ত্রস্তভাবে জাগিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ অতি প্রত্যূষে নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে নিহত করেন, ইহাই কবির বাচ্য। কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার রাজপথের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে লঙ্কার অধিবাসীরা ইতিপূর্বেই বহুসংখ্যায় রাজপথে চলাচল করিতেছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। (৩৬০—৩৯৬ পংক্তি)। সুতরাং যাহারা বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে তাহারাই রামসৈন্যের জয়ধ্বনিতে চমকিত হইয়া জাগ্রত হইল, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সপ্তম সর্গের আরম্ভও হইয়াছে,—"উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে"—এই বর্ণনা দ্বারা।

বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ—এই সর্গটিতে মেঘনাদের নিধন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সর্গের নাম 'বধ' রাখা হইয়াছে।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে—মেঘনাদকে বধ করিয়া লক্ষ্মণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার পর সূর্যোদয় হইল।

পদ্মপর্ণে—পদ্মদলে, পদ্মের পাপড়ির উপর। পর্ণ শব্দের অর্থ পত্র; কিন্তু মধুসূদন এই কাব্যে সর্বত্রই পদ্মদল অর্থে পদ্মপর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়—

"নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন" (১।৩৩১)

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?" (৪।৮১)
"পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি" (৮।৬৪০)

পদ্মযোনি—কারণসলিলে শায়িত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা।

পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব ইত্যাদি—অরুণরাগে রঞ্জিত পূর্ব দিক্‌চক্রবালে লোহিতবর্ণ সূর্য উদিত হইলে মনে হইল, যেন ঈষৎ রক্তিম পদ্মদলের উপর শায়িত রক্তবর্ণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া প্রসন্নভাবে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উপমেয় সূর্য ও উপমান ব্রহ্মার মধ্যে সাদৃশ্যহেতু সংশয় প্রকাশ পাওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

উল্লাসে হাসিলা কুসুমকুন্তলা মহী—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্যই যেন পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত অন্ধকারমুক্ত পৃথিবী আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল।

মুক্তামালা গলে—রাত্রিকালে পতিত মুক্তাশ্রেণীবৎ শিশিরের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া। উপমেয় শিশিরের আদৌ উল্লেখ না করিয়া উপমান মুক্তামালাকেই শিশিরবিন্দুসমূহের শ্রেণী বলিয়া গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। উথলিল—প্লাবিত করিল। উৎ+স্থল শব্দ হইতে উৎপন্ন।

উথলিল সুস্বরলহরী নিকুঞ্জে—প্রভাতের আগমনে বনে বনে পাখী মধুরস্বরে ডাকিয়া উঠিল।

স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরে যেমন পদ্মসমূহ বিকশিত হইয়া উঠিল, তেমনই উদ্যানেও পদ্মের মত সূর্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষী সূর্যমুখী ফুল প্রস্ফুটিত হইল। পদ্মের মত সূর্যমুখী ফুলও দিনের বেলায় প্রস্ফুটিত ও রাত্রিকালে মুদিত হয় এবং সর্বদা সূর্যের অভিমুখীন থাকে বলিয়া, উভয়কে সূর্যের সমান প্রেমাস্পদ বলা হইয়াছে।

অবগাহে দেহ—দেহ নিমজ্জন করিয়া স্নান করে। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান; সুতরাং দেহ শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক। অধিকপদতা দোষ। বিনানিলা—বেণীরচনা করিল। বাংলা বিনা ধাতুর অর্থ বেণীরচনা করা; বিনা ধাতু হইতে বিনানো (বেণীরচনা) শব্দ এবং তাহা হইতে নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ বিনানিলা। চিকণ > চিক্কণ—উজ্জ্বল, সুন্দর।

চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে শরদে—প্রমীলার ঘনকৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে মুক্তানির্মিত উজ্জ্বল সীঁথি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের প্রান্তে প্রতিফলিত শুভ্র শারদ জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর দেখাইতেছিল।

শরদে—শরৎকালে; 'শরতে' সাধারণ প্রয়োগ। বেদনিল—বেদনা বা ব্যথা দিল; (নামধাতু নিষ্পন্ন রূপ)।

সম্ভাষি বিস্ময়ে—কারণ ইতিপূর্বে অলঙ্কার ধারণ করিবার সময়ে কখনও ব্যথা পান নাই।

বামেতর—বাম হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণ। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন অমঙ্গলসূচক।

স্বজনি—(সম্বোধনে ইকার)—সখী। স্বজন = বান্ধব, স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী।

এ কুদিনে—নানারূপ অমঙ্গলের সূচনাকারী আজিকার এই বিশেষ দিনটিতে।

কহিও জীবেশে ইত্যাদি—রণপ্রিয় বীর মেঘনাদ পাছে অনুরোধ রক্ষা না করেন, এই আশঙ্কায় প্রমীলা মেঘনাদকে বলিয়া পাঠাইতেছেন যে, ইহা তাঁহার সনির্বন্ধ কাতর অনুরোধ।

বীণাবাণী—মধুর-ভাষিণী; বীণাধ্বনির ন্যায় বাণী যাহার (বহুব্রীহি সমাস)।

দেবের মন্দিরে যথা ইত্যাদি—পঞ্চম সর্গের শেষাংশে মেঘনাদ যখন অতি প্রত্যূষে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও মন্দোদরী পুত্রের মঙ্গল কামনায় মন্দিরে শিবপূজা করিতেছিলেন। মেঘনাদ যজ্ঞশালায় গমন করিলে তিনি অসমাপ্ত পূজা সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় দেবালয়ে গিয়াছিলেন। বৃথা—কারণ ইতিপূর্বেই মেঘনাদ নিহত হইয়াছে।

বিরসবদন এবে কৈলাসসদনে গিরিশ—শিবের বিষণ্ণবদনে অবস্থানের কারণ কেবল পরমভক্ত

রাবণের চরম বিপদই নহে; ইন্দ্রের স্বার্থরক্ষার জন্য পার্বতীর অনুরোধে তিনিই যে ভক্তের বিপদ ঘটিতে সাহায্য করিয়াছেন,—এই চিন্তাও তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল।

ধূর্জটি—মহাদেব। ধূর (সংসারভার) বহন করেন বলিয়া, অথবা ধূম্রবর্ণ জটাজাল ধারণ করেন বলিয়া এই নাম। ধূর + জট + ই।

হৈমবতী—হিমালয় কন্যা পার্বতী, উমা। হিমবৎ + (অপত্যার্থে) ষ্ণ + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

পূর্ণ মনোরথ তব—দ্বিতীয় সর্গে দেবী মেঘনাদবধের অনুরোধ করিতে শিবের নিকটে গিয়াছিলেন। দেবীর অভিপ্রায় ছিল মেঘনাদের মৃত্যু সংঘটন; সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে।

চিরস্থায়ী হায়, সে বেদনা, ইত্যাদি—পুত্রশোকের বেদনা লোকের মনে চিরকাল সমভাবে বর্তমান থাকে। কালবশে সকল বস্তুরই বিলোপ ঘটে বটে, কিন্তু এ বেদনার উপশম হয় না।

তুষিনু বাসবে সাধ্বি, তব অনুরোধে—দেবীর অনুরোধে ইন্দ্রের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শিব মেঘনাদের অকালমৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'দৈব' বা দেবতার ইচ্ছাই মেঘনাদবধ কাব্যের সকল ঘটনার নিয়ামক। মেঘনাদবধে রামের স্বার্থের চেয়েও যেন ইন্দ্রের স্বার্থই বেশি ছিল বলিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহার ফলেই মেঘনাদবধ সংঘটিত হইয়াছে।

দাসীর ভকত প্রভু দাশরথি রথী ইত্যাদি—শিব এক্ষণে পুত্রশোকাতুর রাবণকে অনুগ্রহ করিতে চান শুনিয়া, দেবী তাঁহার ভক্ত রামচন্দ্রের অমঙ্গলের ভয়ে বিচলিত হইয়া বলিলেন যে, শিব আপন ভক্তের অনুকূল কোন কার্য করিতে যাইয়া দেবীর ভক্ত রামচন্দ্রের কোন অহিত না ঘটান,—ইহাই তাঁহার একান্ত প্রার্থনা। হাসিয়া—ভক্তবৎসলা দেবীর মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া।

বীরভদ্র—শিবানুচরবিশেষ। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দক্ষযজ্ঞনাশের সময় ক্রুদ্ধ শিবের ললাট (মতান্তরে, ছিন্ন জটা) হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়। সাষ্টাঙ্গে—ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া। গতজীব—মৃত।

বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী ইত্যাদি—লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়ার কৃপায় অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় যাইয়া মেঘনাদকে রুদ্ধদ্বার যজ্ঞগৃহের মধ্যে নিহত করিয়া আবার অদৃশ্যভাবেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দূতেরা মেঘনাদের রক্তাক্ত মৃতদেহই দেখিতেছে,—কিভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা কেহই জানে না।

দেব ভিন্ন রথি, কার সাধ্য ইত্যাদি—দেবতার ইচ্ছা বা দৈববশে সাধিত কার্যের গতি ও প্রকৃতি দেবতা ভিন্ন অপরের বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং মেঘনাদবধের রহস্য রাবণকে বুঝাইবার জন্য বীরভদ্রের ন্যায় দেবতার লঙ্কায় গমন প্রয়োজন। ভর, রুদ্রতেজে, ইত্যাদি—পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিবার উপযোগী শৈবতেজে রাবণের হৃদয় পূর্ণ কর।

ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে সভয়ে—ভীষণ তেজঃপুঞ্জ দেহধারী বীরভদ্র আকাশপথে কৈলাস হইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে, আকাশচারী সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি দেবযোনি তাহার উজ্জ্বল দেহচ্ছটা দেখিয়া ভীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ব্যোমচর—সিদ্ধ, যক্ষ প্রভৃতি গগনচারী দেবযোনি। ব্যোমচর অর্থে পক্ষীও বুঝায়। কিন্তু সূর্যের আবির্ভাবে চন্দ্র যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, বীরভদ্রের আকাশে আবির্ভাবে সূর্য নিজেই সেইরূপ ম্লান হইয়া গেল—পরে এই কথাটির দ্বারা বীরভদ্রের দেহের উজ্জ্বলতা যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে ব্যোমচর শব্দটিকে সাধারণ পক্ষী অর্থে গ্রহণ না করিয়া দেবযোনি অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত।

সুধাংশু নিরংশু যথা—চন্দ্র যেমন অংশুহীন বা কিরণহীন হয়। ভয়ঙ্করী—শূলছায়ার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ। ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে—বীরভদ্রের ভীষণ প্রদীপ্ত দেহের সম্মুখে

অবস্থিত বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত বিশাল শূলের ছায়া পৃথিবীর উপর পতিত হইল। অম্বুরাশিপতি---সমুদ্রপতি বরুণ। ভৈরব দূতে—শিবানুচর বীরভদ্রকে।

প্রফুল্ল, হায় কিংশুক যেমতি ইত্যাদি—মেঘনাদ জীবিতাবস্থায় অসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারী হইলেও, এক্ষণে রক্তাক্তদেহে ভূপাতিত হওয়ায় তাঁহাকে ঝটিকাবেগে ভূপাতিত পলাশ ফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল। প্রস্ফুটিত পলাশ ফুলের রক্তিমাভার সহিত মেঘনাদের রক্তপ্লাবিত দেহের সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে।

উতরিলা—অবতীর্ণ হইলেন; উপস্থিত হইলেন।

ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবসু সম—রাবণের সভায় প্রবেশ করিবার পূর্বে বীরভদ্র ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় নিজের প্রদীপ্ত দেহচ্ছটা সংবরণ করিয়া রাক্ষসদূতের বেশ ধারণ করিলেন।

প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে---শিবভক্ত রাবণ শিবানুচরের আশীর্বাদের পাত্র; কিন্তু তিনি আজ আসিয়াছেন রাক্ষসদূতের ছদ্মবেশে। সুতরাং তিনি রাবণকে প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে মস্তক নত করিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। করপুটে ---জোড়হাতে।

বিস্ময়ে—ইন্দ্রজয়ী বীরপুত্র যুদ্ধে গিয়াছে বলিয়া জয় যেখানে অবধারিত, সেখানে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিষণ্ণবদন দূতের আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া। সুধিলা—জিজ্ঞাসা করিলেন। 'শুধিলা' বানান বেশি প্রচলিত। বিরত সাধিতে স্বকর্ম্ম—দূতের কর্ম হইতেছে সংবাদ জ্ঞাপন; কিন্তু দূতবেশী বীরভদ্র বিষণ্ণবদনে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন।

মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি রাঘবের, ইত্যাদি- -আজ মেঘনাদের যুদ্ধোদ্যম দিবসে যদি কাহারও আশঙ্কা ও বিপদের সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা হইতেছে সামান্য মানুষ রামের। কিন্তু তুমি ত আর রামের দূত নও; তবে তোমার মুখ ম্লান কেন?

লঙ্কার পঙ্কজরবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কথাটি কবি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। 'লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি' অথবা 'লঙ্কা-পঙ্কজ-রবি' সমাস হিসাবে সার্থকতর প্রয়োগ হইত। কবি চতুর্দশপদী কবিতায় "কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ" এইরূপ সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন।

ব্যগ্রচিত্তে—দূতের মুখে অমঙ্গলবার্তার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া। বিরূপাক্ষ চর—শিবদূত বীরভদ্র। নশ্বর শরে—প্রাণবিনাশক বাণদ্বারা। কবি 'নশ্বর' শব্দটি বিনাশক বা ধ্বংসকারী অর্থে একাধিকবার প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়,—"নশ্বর দংশনে" (৫। ২৭২); "নশ্বর সংগ্রামে" (৬। ৬), "নশ্বর রণে" (৮।১২২)। অবাচকতা দোষ। হরি— সিংহ। বিউনিল—বীজন করিল, পাখা দিয়া বাতাস করিল। বিজনী > বিউনি হইতে নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ।

বারুদ—(তুর্কী শব্দ)—বন্দুক ইত্যাদির গুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যবহৃত বিস্ফোরক চূর্ণ।

অগ্নিকণা পরশে যেমতি বারুদ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে বারুদ যেভাবে প্রচণ্ড শক্তিসহকারে জ্বলিয়া উঠে, রুদ্রতেজে পূর্ণ হইয়া মূর্ছিত রাবণের সেইরূপ অবস্থা হইল।

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, রক্ষোনাথ ইত্যাদি—তুমি প্রখ্যাতনামা বীর, বীরের যোগ্য কার্য কর;—অর্থাৎ অন্যায় যুদ্ধে পুত্রের নিধনকর্তা শত্রুকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া, সেই কার্যের মধ্যে পুত্রশোক আপাততঃ বিস্মৃত হও। লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের মৃত্যুতে শোক করিবার লোকের অভাব হইবে না; রক্ষঃকুলনারীগণ শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সিক্ত করিবে।

পুত্রহানী < পুত্রহা—পুত্রবধকারী। (হানি + ইন = হানী অনাভিধানিক শব্দ)। কবি পুত্রহা শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন : "চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে।" (৭। ৬৫৮)

"তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু মিত্রোত্তম এবে!" (বীরাঙ্গনা—১১।২৪)

মহেষ্বাস—মহাবীর, মহাধনুর্ধর। ইষুর (শরের) আস (আসন) ইষ্বাস; মহৎ ইষ্বাস (ধনুঃ) যাহার মহেষ্বাস। আচম্বিতে—সহসা, অকস্মাৎ।

স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে ইত্যাদি—বীরভদ্র অন্তর্হিত হইবার পূর্বে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বরূপ ধারণ করায় দেবদেহসুলভ সুগন্ধে সভাস্থল পূর্ণ হইল। দ্বারপথে অপসৃয়মাণ বীরভদ্রের সমগ্র দেহ রাবণ দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার পৃষ্ঠে বিলম্বিত জটারাশি এবং তাঁহার হস্তধৃত ত্রিশূলের ছায়া রাবণ চকিতের জন্য দেখিতে পাইলেন। অনুরূপ বর্ণনা বিভীষণের লক্ষ্মীদেবীর দর্শনপ্রসঙ্গে পাওয়া যায় :

"গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি; মরি! (৬।১১০—১১১)

কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণমি—জটাজূট ও ত্রিশূলচ্ছায়া দর্শনে রাবণ স্বীয় উপাস্য শিবের আবির্ভাব হইয়াছিল ভাবিয়াছিলেন। এতদিনে—আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুর্গতির সময়ে।

এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব ইত্যাদি—শিব যে তাঁহার ভক্তের প্রতি অনুগ্রহশীল, রামের সহিত সংগ্রামে পদে পদে তুচ্ছ শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় রাবণ তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ সহায় মেঘনাদের মৃত্যু হইলে শিব তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কেন করিলেন, তাহা রাবণের বুদ্ধির অগোচর। রাজীব পদে—পদ্মবৎ কোমল ও সুন্দর চরণে। চতুরঙ্গে—(চতুঃ + অঙ্গে) গজ, রথ, অশ্ব ও পদাতি,—সৈন্যের এই চারিটি অঙ্গের সহিত; সমগ্র বাহিনীসমেত।

এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে— পুত্রশোকের দুঃসহ যন্ত্রণা যে কিছুতেই ভুলা যায় না 'যদি' এই সন্দেহবাচক শব্দ দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। দুন্দুভির ধ্বনি—ভেরীনিনাদ।

শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে ইত্যাদি—প্রলয়কালে তাণ্ডব-নৃত্যরত রুদ্র প্রলয়বিষাণ ধ্বনিত করিলে যেরূপ ভয়াবহ শব্দ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর, সেইরূপ ভয়াবহ শব্দে ভেরীসমূহ সভাস্থল পূর্ণ করিল। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রেও প্রলয়কালে শৃঙ্গ-ধ্বনির উল্লেখ আছে। এস্থলে রুদ্রের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে শৃঙ্গনিনাদক শব্দটি প্রয়োগ করিবার সময়ে কি সেই চিত্রটিই কবির মনে উদিত হইয়াছিল? যথা সে ভৈরবরবে কৈলাস শিখরে ইত্যাদি—এই চিত্রটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। তুলনীয়,

"মহারুদ্র তেজে মহাদেব সাজে।
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।।
... ...
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা।।
চলে ভৈরবী-ভৈরবে নন্দী-ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।।
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে।।"—ইত্যাদি।

চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ—রাক্ষস-সেনানীগণের এই নাম পাঁচটি চণ্ডী হইতে গৃহীত। মহিষাসুরের সেনানীরূপে ইহারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই নাম কয়টি এবং কিছু

পরেই রাক্ষস বাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলনা হইতে কবির মনের উপর মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া চামর, অমরত্রাস—দেবগণের পক্ষেও ভীতিস্থলস্বরূপ চামর নামক রাবণের প্রধান সেনানায়ক রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি বাহিনী লইয়া হুঙ্কার-ধ্বনি সহকারে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল।

উদগ্র, সমরে উগ্র—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তিশালী উদগ্র নামক রথারূঢ় সেনার অধিনায়ক।

গজবৃন্দ মাঝে বাস্কল, ইত্যাদি—মেঘসমূহের মধ্যবর্তী মেঘবাহন বজ্রাস্ত্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতাশালী গজারোহী সৈন্যের অধিনায়ক বাস্কল মেঘের ন্যায় বিশাল হস্তিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল। অশ্বপতি—অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক অসিলোমা। বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে—পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক বিড়ালাক্ষ পদাতিক বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইল।

উড়িল পতাকা, ধূমকেতুরাশি যেন ইত্যাদি—ধূমকেতুসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল অথচ ভয়োদ্রেককারী রাক্ষসদিগের যুদ্ধের পতাকাসমূহ আকাশে উড়িতে লাগিল। ধূমকেতুকে ভয়জনক বস্তু বলিয়া জয়দেবও দশাবতার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন—"ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।"

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী চণ্ডী—মার্কণ্ডের পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং মহিষাসুর-পীড়িত অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ একত্র মিলিত হইয়া চণ্ডিকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই চণ্ডিকাকে যেরূপ দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন,—চণ্ডিকার ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালিনী লঙ্কার রাক্ষসবাহিনীও সেইরূপ নানাপ্রকার ভীষণ অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল।

গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে, ইত্যাদি—চণ্ডিকার সহিত সর্ব্ববিষয়ে রাক্ষসবাহিনীর সমতা কল্পিত হইয়াছে। চণ্ডিকার বাহুতে ছিল মত্তহস্তীর বল,—রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে আছে শক্তিশালী গজসৈন্য; চণ্ডিকার চরণে ছিল অশ্বের ন্যায় দ্রুতগতি,— রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে আছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য; চণ্ডিকার মস্তকে ছিল রত্নশোভিত স্বর্ণমুকুট—রাক্ষসবাহিনীতে আছে মুকুটের আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্ণ-খচিত রথচূড়া; চণ্ডিকার ছিল রত্ন-খচিত বস্ত্রাঞ্চল,—রাক্ষসবাহিনীতে রহিয়াছে বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় রত্ন-খচিত পতাকাসমূহ; চণ্ডিকার সহিত ছিল সিংহনাদকারী তাঁহার বাহন সিংহ,—রাক্ষসবাহিনীতে রহিয়াছে সিংহ-গর্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদী ভেরী, তূরী প্রভৃতি রণবাদ্য; চণ্ডিকার ছিল শাণিত দন্ত পংক্তি,—রাক্ষসবাহিনীতে আছে শেল, শক্তি প্রভৃতি সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্রসমূহ; চণ্ডিকার ছিল অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত নয়নত্রয়,—রাক্ষসবাহিনীতেও রহিয়াছে অত্যুজ্জ্বল বর্মসমূহ হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড দীপ্তি। এস্থলে উপমেয় ও উপমানে সৌসাদৃশ্যহেতু অভেদ কল্পনায় প্রত্যেকটি অঙ্গে রূপক অলঙ্কার হওয়ায় সাঙ্গরূপক অলঙ্কারই কবির লক্ষ্য ছিল বটে; কিন্তু অঙ্গী উপমেয় রক্ষঃকুল-অনীকিনী এবং উপমান চণ্ডীর মধ্যে 'যথা' শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় সেখানে অভেদত্বের অভাবহেতু উপমা অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া এস্থলে অলঙ্কার সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে।

অনীকিনী—অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী বৃহত্তম সেনাদল। বাংলায় সাধারণতঃ সেনাদল অর্থেই ব্যবহৃত; প্রাচীন ভারতীয় সৈন্যের ক্ষুদ্রতম দলের নাম ছিল 'পত্তি' এবং ইহা ১টি রথ + ১টি হস্তী + ৩ অশ্ব + ৫ পদাতিক দ্বারা গঠিত হইত। ইহা হইতে ক্রমশঃ,

৩ পত্তিতে = ১ গুল্ম; ৩ পৃতনায় = ১ বাহিনী,
৩ গুল্মে = ১ গণ; ৩ বাহিনীতে = ১ চমূ;
৩ গণে = ১ পৃতনা; ৩ চমূতে = ১ অনীকিনী;
এবং ১০ অনীকিনীতে = ১ অক্ষৌহিণী পরিমাপিত হইত।

ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা—চর্মাচ্ছাদিত নানা আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। শেল < শল্য—নিক্ষেপণীয় শস্ত্রবিশেষ। শক্তি—শল্যজাতীয় শস্ত্রবিশেষ। জাটি (জাঠা)—লৌহদণ্ড। তোমর—শাবল জাতীয় লৌহময় অস্ত্র। ভোমর < ভ্রমর—তুরপুন-জাতীয় বিঁধিবার উপযোগী অস্ত্রবিশেষ। পট্টিশ—খড়্গজাতীয় প্রাচীন অস্ত্র। নারাচ—লৌহময় বাণ। কৌন্ত < কুন্ত—ভল্ল বা বল্লম। সাঁজোয়া < সংযোগিকা—বর্ম। অধীর ভূধরব্রজ, ভীমার গর্জ্জনে—চণ্ডীর ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালিনী রাক্ষস বাহিনীর ভীষণ গর্জনে লঙ্কার পর্বতগুলিও যেন প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে—সত্যযুগে দেবগণের দেহনিঃসৃত তেজঃ হইতে উৎপন্ন চণ্ডী ক্রুদ্ধা হইয়া যেরূপ রণহুঙ্কার দিয়াছিলেন, মনে হইল যেন এই ত্রেতা যুগেও তিনি রাক্ষস বাহিনীরূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ রণহুঙ্কার দিতেছেন। ঘন ঘনরূপে—গাঢ় মেঘের ন্যায়।

কালাগ্নি সম্ভবা—প্রলয়কালীন অগ্নি হইতে উৎপন্ন। 'বিভা' স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া তাহার বিশেষণ 'ভয়ঙ্করী' ও 'কালাগ্নি সম্ভবা' শব্দে স্ত্রী-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। লগিতে—লগ্ন অর্থাৎ ধ্বংস করিতে। (নামধাতু) কহিলা—সত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ—ভয়ে রক্তহীন পাণ্ডুর বদনে বিভীষণ উত্তর করিলেন। বাক্যটি যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে 'সত্রাসে' শব্দটিকে 'কহিলা' ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায় না। "কহিলা সত্রাসে", কথার পর ছেদচিহ্ন থাকিলে উহা করা যাইত। "সত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ" কথার পরিবর্তে "ত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ' শুদ্ধ প্রয়োগ হইত।

কাঁপিছে এ পুরী রক্ষোবীরপদভরে ... মাতি বীরমদে—এস্থলে ভূকম্পন, কালাগ্নি সম্ভবা বিভা, এবং সিন্ধুধ্বনি, এই তিনটি উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া রক্ষোবীরপদভর, স্বর্ণবর্ম-আভা, এবং রাক্ষস চমূর গর্জন,—এই তিনটি উপমেয় সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়ায়, প্রতি বাক্যেই একটি করিয়া নিশ্চয় অলঙ্কার হইয়াছে। 'নিশ্চয়ের' বিপরীত হইতেছে 'অপহ্নুতি'। পুত্রেন্দ্র শোকে—পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেঘনাদের শোকে। সৈন্যাধ্যক্ষ দলে—সেনাপতিগণকে, প্রধান প্রধান বীর সেনানায়কগণকে।

দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে—মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্রের জয়লাভের মূলে দৈব সাহায্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। আসন্ন সঙ্কটেও তাই দেবগণের উপর তিনি একান্ত নির্ভরশীল।

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবী—বিভীষণ গম্ভীর শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা সকলকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। নল, নীল দেবাকৃতি—যথাক্রমে বিশ্বকর্মা ও অগ্নিদেবের পুত্র বলিয়া দেবতার ন্যায় সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট নল ও নীল। রামের "অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী" বানরসৈন্যের প্রতি মধুসূদনের সহানুভূতির একান্ত অভাব থাকিলেও, তিনি এই কাব্যে সর্বত্রই তাহাদিগকে সুবেশ ও সুদর্শনরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কুত্রাপি লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানররূপে কল্পনা করেন নাই।

গবাক্ষ রক্তাক্ষ—আরক্তচক্ষু গবাক্ষ।

তোমরা সকলে ত্রিভুবনজয়ী রণে—সেনাপতিগণকে সাহস ও উৎসাহ দানার্থ প্রশংসাবচন। রামের সেনানীগণের মধ্যে বীর অনেকেই ছিলেন বটে, কিন্তু কেহই ত্রিভুবনজয়ী ছিলেন না।

একমাত্র রথী—মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণই লঙ্কার হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর।

কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, ইত্যাদি—তোমরা রঘুবংশের একান্ত বান্ধব; সুতরাং রাক্ষসের কৌশলে অপহৃতা ও রাক্ষস-পুরীতে অবরুদ্ধা রঘুকুলবধূ সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া আমার বংশের গৌরব, আমার নিজের সম্মান এবং আমার জীবন রক্ষা কর। স্নেহপণে—স্নেহরূপ মূল্যে, আন্তরিক ভালবাসা দিয়া।

স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে ইত্যাদি—তোমাদের আন্তরিক ভালবাসার গুণে আমি রামচন্দ্র ত ইতিপূর্বেই তোমাদের একান্ত বশীভূত হইয়াছি, এক্ষণে রঘুকুলবধূর উদ্ধার করিয়া দক্ষিণাপথ

কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী তোমরা রঘুকুলোদ্ভূত সকল ব্যক্তিকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর। দাক্ষিণ্য— অনুগ্রহ। সজল নয়নে—আসন্ন বিপদে নিজের অসহায়তার কথা স্মরণ করিয়া।

ভূঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে—কারণ রামই বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। বিকট ঠাট—ভীষণ বানর সেনাদল। দানব নিনাদে—দানবগণের রণহুঙ্কারের প্রত্যুত্তরে। আরাব—রাম পক্ষীয় ও রাক্ষস পক্ষীয় সেনাগণের সম্মিলিত গর্জন।

জীবকুল-কুলক্ষণ—প্রাণিগণের পক্ষে অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ।

শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—এই কাব্যে মেঘনাদের ও রাবণের ধ্বংসে রামচন্দ্রের স্বার্থ ও আগ্রহের চেয়ে ইন্দ্রেরই স্বার্থ ও আগ্রহ যেন অধিকতর; এবং ইন্দ্রের স্বার্থ ও আগ্রহের চেয়েও লক্ষ্মীদেবীর স্বার্থ ও আগ্রহ যেন আরও বেশি। সুতরাং মেঘনাদ ও রাবণ বধের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইঁহাকে বারংবার লঙ্কা হইতে স্বর্গে যাতায়াত করিতে দেখা যায়।

নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—কারণ প্রথমতঃ যে দৈব-ষড়যন্ত্রের ফলে মেঘনাদের মৃত্যু হইয়াছে এবং ইন্দ্র মেঘনাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মীদেবীই সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্ত্রী (২য় সর্গ)। দ্বিতীয়তঃ, নিজের তেজঃ সংবরণ করিয়া তিনি দেবমায়ায় অদৃশ্য লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পথ সুগম করিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ সর্গ)।

হাসি উত্তরিলা—মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী উভয়েরই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াও বটে,—আবার মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র যেভাবে সকল বিপদের অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা যে ইন্দ্রের ভুল ধারণা ইন্দ্র তাহা এখনও জানেন না বলিয়াও বটে,—লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিয়া রাবণের যুদ্ধোদ্যমের কথা বলিলেন।

রক্ষোবলদলে—রাক্ষস সেনাগণের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। প্রতিবিধানিতে—প্রতিশোধ লইতে। নামধাতু। আদিতেয়—অদিতির পুত্র, ইন্দ্র। শক্র—ইন্দ্র। জগদম্বে—(সম্বোধনে হে জগজ্জননি লক্ষ্মীদেবি! নিহতার্থতা দোষ; কারণ জগদম্বা শব্দে দুর্গাদেবীকেই বুঝায়। সমরিব—সমর বা যুদ্ধ করিব। নামধাতু। বিহনে < বিহীনে—ব্যতীত। বাসবীয়—বাসবের, ইন্দ্রের।

যতদূর চলে দেবদৃষ্টি—দেবতার দৃষ্টিশক্তি মানুষের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। সেই দেবদৃষ্টি দ্বারাও দেবসৈন্যের পরিমাপ সম্ভবপর নহে,—সৈন্যসংখ্যা এতই বিরাট। সাদী—অশ্বারোহী। নিষাদী—গজারোহী। শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি সেনানী—দেব সেনাপতি তারকাসুরের বধকর্তা কার্ত্তিক ময়ূরচিহ্নবিশিষ্ট রথে অবস্থিত ছিলেন।

বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী—গন্ধর্বপতি বীর চিত্ররথ নানাবর্ণে রঞ্জিত রথে অবস্থিত ছিলেন।

জ্বলিছে অম্বর যথা ইত্যাদি—দাবানলে বন দগ্ধ হইবার সময়ে যেমন সকল বন অগ্নিতেজে উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপ দেবগণের দ্যুতিমান দেহ ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি হইতে নির্গত তেজে সকল আকাশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অগ্নির সহিত যেমন ধূম থাকে, দেবসৈন্যের মধ্যেও সেইরূপ ধূমের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য হস্তী রহিয়াছে; এবং দাবানলের অগ্নিশিখাসমূহের ন্যায় দেবগণের অত্যুজ্জ্বল শূলাগ্রভাগসমূহ চক্ষু ধাঁধিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে।

চঞ্চলা যেন অচলা, শোভিছে পতাকা; ইত্যাদি—সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ বিশাল দেবসৈন্যের মধ্যে উজ্জ্বল পতাকাগুলি স্থিরবিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেবসৈন্যের অত্যুজ্জ্বল ঢালগুলি যেন সূর্যগোলকের চেয়েও উজ্জ্বলতর এবং তাহাদের পরিহিত বর্মগুলিও অত্যধিক ঔজ্জ্বল্যহেতু ঝলমল করিতেছে। প্রভঞ্জন আদি দিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—ইঁহারা যথাক্রমে পূর্ব, অগ্নিকোণ, দক্ষিণ, নৈর্ঋতকোণ, পশ্চিম, বায়ুকোণ, উত্তর, ঈশানকোণ,

ঊর্দ্ধদেশ ও অধোদেশের রক্ষক দিক্‌পাল বা দিক্‌পতি। শূন্য—অপূর্ণ, অঙ্গহীন। এ বিরহে—এই সকল দিক্‌পালের অভাবে।

নিজ নিজ রাজ্য আদি রক্ষিত দিকপালে আদেশিনু ইত্যাদি—দেবতা ও রাক্ষস উভয় পক্ষই অত্যন্ত প্রবল এবং উভয়ের সংঘাতে বিশ্বে একটা মহা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া জগৎ ধ্বংস হইতে পারে ভাবিয়া, দিক্‌পালগণকে স্ব স্ব অধিকার সতর্কভাবে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছি। দিক্‌পালগণের বিষয় উল্লেখকালে ইন্দ্র নিজেই যে পূর্বদিক্‌পাল ইহা হয়ত কবির স্মরণ ছিল না।

আশীষিয়া—ইন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এই আশীর্বাদ করিয়া। 'আশীষ' শব্দটি বাংলায় আশীর্বাদ অর্থে বহুল প্রচলিত। তৎসম 'আশীঃ' (আশীর্‌) ও 'আশিস্‌' শব্দের সাঙ্কর্যে ইহার উৎপত্তি। অর্ধতৎসম 'আশিস্‌' শুদ্ধতর রূপ। সুকেশিনী < সুকেশী, সুকেশা—নিবিড়কুন্তলা; ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীলিঙ্গে -ইনী প্রত্যয়।

সুবর্ণ ঘনবাহনে—স্বর্ণবর্ণমেঘে আরোহণ করিয়া।

পশি স্বমন্দিরে বিষাদে কমলাসনে ইত্যাদি—স্বর্গে যাইয়া দেবগণকে রাবণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতে বলিয়া, লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়াই লক্ষ্মীদেবী আবার ভক্ত রাবণের দুঃখে বিষাদে ম্লান মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন! ভক্তবৎসলা ভারতীয় দেবীচরিত্রের সহিত ক্রূরা, হিংসাপরায়ণা গ্রীক্ দেবীচরিত্রের সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব বলিয়াই মধুসূদন-কল্পিত দেবদেবীচরিত্র অধিকাংশস্থলে সামঞ্জস্যহীন, অস্বাভাবিক ও স্ববিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। হেমকূট—গন্ধর্বগণের আবাসস্থল বলিয়া কল্পিত পুরাণোল্লিখিত পর্বত বিশেষ। হেম (স্বর্ণ) কূট (শৃঙ্গ) যে পর্বতের।

হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে—রাক্ষসবীরগণ দেহের বিশালতায় এবং দেহবর্ণের উজ্জ্বলতায় হেমকূট পর্বতের স্বর্ণময় চূড়াসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল।

প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে; প্রতিশোধ লইতে। প্রতিবিধিৎসা (প্রতি + বি + ধা + সন্‌) শব্দের অর্থ প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা। সুতরাং ইহা হইতে নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের অর্থও হইবে প্রতিবিধানের ইচ্ছা করিতে। মধুসূদন ইচ্ছামত প্রতিবিধানিতে এবং প্রতিবিধিৎসিতে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ।

তুলনীয়— "আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে পুত্রবধ।" (২৮৫ পংক্তি)
এবং "প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে" (বীরাঙ্গনাকাব্য—১১। ৬)

বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া—সন্তানহীন জীবনে বিশাল রাজ্যশাসনের সুখ ও গৌরব বৃথা; কারণ উত্তরাধিকারীর অভাবে সে রাজ্যের কোনই স্থায়িত্ব নাই।

বন সুশোভন শাল ভূপতিত আজি—বনের শোভা ও গৌরববর্ধক বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় রাক্ষসবংশের শোভা ও গৌরবর্ধক মেঘনাদ আজ শত্রুহস্তে নিহত।

চূর্ণ তুঙ্গসম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে—সু-উচ্চ পর্বতের উপস্থিত উচ্চতম চূড়ার ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবংশের সর্বোত্তম বীর মেঘনাদ বিধ্বস্ত। গগন রতন শশী চিররাহুগ্রাসে—গগনের শোভা চন্দ্রের ন্যায় রাক্ষসকুলের শোভা মেঘনাদ চিরকালের জন্য অদৃশ্য।

উল্লিখিত তিনটি বাক্যেই উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানত্রয়কে উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অবরোধে—অন্তঃপুরে। ভৈরবে—ভৈরব রবে, ভীষণ স্বরে। নিভৃতে—নির্জন স্থানে, জনশূন্য যজ্ঞশালায়। দয়িতা—প্রিয়া, পত্নী।

কিন্তু দেব-নরে পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে বৃথা—বাহুবলে দেবগণকে ও বীর নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাক্ষসবংশের গৌরবর্ধনে যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছি, হতাবশিষ্ট একমাত্র

পুত্র বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারিশূন্য হওয়ায়, আমার সেই কীর্তি আজ আমার নিকট অর্থহীন।

নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে ইত্যাদি—বিধাতা সম্প্রতি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ তিনি আমার প্রতি বিরূপতম হইয়া আমার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

আলবাল—বৃক্ষে জলসেচনের জন্য বৃক্ষের তলদেশস্থ গোলাকার বেষ্টনী বা বাঁধ।

অকাল নিদাঘে—অসময়ে আবির্ভূত গ্রীষ্মে।

তেঁই শুকাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে—বিধাতা আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ বলিয়া আমার জীবনের পরিপূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্য অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনষ্ট হইল। দ্রবে—দ্রব অর্থাৎ গলিত করে; করুণায় কোমল করে। কপট-সমরী—যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘনকারী ভণ্ড যোদ্ধা।

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি ইত্যাদি—রাক্ষসবংশ বীরের বংশ; সেই বংশের গর্বস্থল বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মাতৃভূমির সম্মানরক্ষার্থ শত্রুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিবার পর, শত্রু নিধন না করিয়া কোন বীর রাক্ষসই জীবনের মায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

নির্ঘোষে—ভীষণ শব্দে। ক্রিয়াবিশেষণ। তিতিয়া—সিক্ত করিয়া, ভিজাইয়া। (পদ্যে প্রযুক্ত)।

নয়ন-আসারে—অশ্রুধারায়। "ধারাসম্পাত আসারঃ শীকরোহম্বুকণাঃ স্মৃতাঃ।"—(অমরকোষ)

নেতৃনিধি যত, রক্ষোযম—রাক্ষসগণের পক্ষে যমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ।

মন্দ্রিলা—মন্দ্র অর্থাৎ গর্জনধ্বনি করিল। ইরম্মদে—বজ্রাগ্নি দ্বারা। মধুসূদন কর্তৃক বহুলপ্রযুক্ত।

মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ইত্যাদি—এক পক্ষে রাবণের রাক্ষসসৈন্য এবং অপর পক্ষে ইন্দ্র ও রামের সম্মিলিত দেব ও নরসৈন্য যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া ভীষণ হুঙ্কারধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, পৃথিবীতে ভীষণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া অনবরতঃ বজ্রপাত ও বিদ্যুদ্‌বিকাশ হইতে লাগিল; সূর্য অন্ধকারে অদৃশ্য হইল; চারিদিক হইতে অত্যন্ত তপ্ত ঝটিকাপ্রবাহ ছুটিয়া আসিল; বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইল; সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া স্থলভাগ প্লাবিত করিল এবং মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হইয়া বৃক্ষ ও অট্টালিকা ধসিয়া পড়িতে লাগিল।

মহাভয়ে ভীতা মহী—আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনাহেতু অত্যন্ত ভীত হইয়া।

আরাধিলা দেবে—বিষ্ণুর আরাধনা বা স্তব করিলেন।

অধীনীরে < অধীনা—একান্তভাবে আশ্রিতা ও অনুগতা আমাকে। অশুদ্ধপ্রয়োগ।

তরাইলে—বিপদ্ উত্তীর্ণ করিলে; ত্রাণ করিলে। তৃ ধাতু হইতে বাংলা ণিজন্ত 'তরা' ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ। বহু মূর্তি ধরি—যুগে যুগে নানা অবতারে নানারূপে আবির্ভূত হইয়া।

কূর্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে ইত্যাদি— জয়দেবের বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্রে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি অবতারের উল্লেখ আছে। এস্থলে ত্রেতা যুগে রামের আবির্ভাবের পূর্বে আবির্ভূত ষড়বতারের মধ্যে প্রথম মৎস্য অবতার এবং ষষ্ঠ পরশুরাম অবতারকে বাদ দিয়া, মধ্যবর্তী চারিটি অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্যাবতারে ভূভার-হরণের পরিবর্তে বেদ-ধারণের উল্লেখ আছে বলিয়া এবং পরশুরামাবতার সমসাময়িক অবতার বলিয়া সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

তিষ্ঠাইলা—স্থাপন করিলে, প্রতিষ্ঠিত করিলে। সংস্কৃত স্থা (তিষ্ঠ) ধাতু > বাংলা তিষ্ঠ ধাতুর ণিজন্ত রূপ। তুলনীয়, "ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।"—জয়দেব। প্রলয় সলিলে মগ্ন পৃথিবীকে বিষ্ণু কূর্মরূপে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করেন। শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা সদৃশী—জয়দেবের "শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না"র অনুবাদমাত্র। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ব্রহ্মার বরে শক্তিমান হইয়া

পৃথিবীকে পাতালে লইয়া গেলে, বিষ্ণু বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, এবং স্বীয় দন্তের অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

নরসিংহবেশে বিনাশিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যে—বরাহ কর্তৃক ভ্রাতার নিধনের পর, হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকটে এই বর প্রার্থনা করে যে, সে জলে, স্থলে বা শূন্যদেশে; দিবসে অথবা রাত্রিতে; যে কোন স্থানে এবং যে কোন কালে; সর্বজীবের অবধ্য এবং সকল প্রকার অস্ত্রে অভেদ্য হইবে। এইরূপ বরলাভের পর সে নিজেকে অমর বিবেচনা করিয়া যথেচ্ছাচারী এবং ভ্রাতার শত্রু বিষ্ণুর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপুর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান হইবার অপরাধে হিরণ্যকশিপু পুত্রের উপর নানারূপ নির্যাতন চালাইতে থাকে। অবশেষে বিষ্ণু সাধারণ জীবের বহির্ভূত অর্ধ-নর ও অর্ধ-সিংহ 'নৃসিংহ মূর্তি' ধারণ করিয়া সাধারণ অস্ত্রের বহির্ভূত নিজের 'তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা', জল-স্থল-শূন্যের বহির্ভূত 'নিজের জানুর উপর' হিরণ্যকশিপুকে স্থাপন করিয়া, দিবা ও রাত্রির বহির্ভূত 'প্রদোষকালে' তাহাকে নিহত করেন।

খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব ইত্যাদি—হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ; প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। বলিও তপস্যাবলে মহাপরাক্রান্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। বলি দৈত্য হইলেও ধার্মিক ছিলেন বলিয়া, দেবগণ তাহাকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় না পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু কশ্যপ ঋষির গৃহে তাঁহার বামন অর্থাৎ খর্বাকৃতি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একবার বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বামন ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান প্রার্থনা করিলে বলি উহা দিতে স্বীকৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে বামন বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া দুইটি পদদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করিয়া তৃতীয় পাদের জন্য ভূমি চাহিলে, দানের গর্বে গর্বিত বলি তৃতীয় চরণ স্থাপনের জন্য নিজের মস্তক পাতিয়া দেন, এবং এইরূপে চিরকালের জন্য বামনাবতারের নিকট বন্দি হন।

এ বিপত্তিকালে—দেব-নর-রাক্ষস সংগ্রামের ভীষণ সংঘাতে সৃষ্টি ধ্বংস হইবার কালে।

মুরারি—মুর নামক দৈত্যের নিধনকর্তা বিষ্ণু।

জগন্মাতঃ—(সম্বোধনে) হে জীবধাত্রি ধরিত্রি! পূর্বে লক্ষ্মী অর্থে প্রযুক্ত জগদম্বা শব্দটির ন্যায় জগন্মাতা শব্দটিও 'যোগরূঢ় শব্দ'। এই স্থলেও নিহতার্থতা দোষ। কারণ জগন্মাতা শব্দটির দ্বারা দুর্গা, কালী প্রভৃতি আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্তিকেই বুঝায়। আয়াসে—(নামধাতু) আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ বা যন্ত্রণা দান করে। মদকল করিত্রয়—মদমত্ত হস্তীর ন্যায় রণমত্ত রাবণ, রামচন্দ্র ও ইন্দ্র এই তিন যুযুৎসু। কাল রণ—সৃষ্টিবিধ্বংসী যুদ্ধ। পীতাম্বর—পীতবসনধারী বিষ্ণু (সম্বোধনে)। চাহিলা রমেশ হাসি—পৃথিবীর এতটা বিচলিত হইবার হেতু সত্যই ঘটিয়াছে কিনা জানিবার জন্য বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া লঙ্কার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দলে অসংখ্য—অসংখ্য সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া। প্রতিঘ-অন্ধ—ক্রোধান্ধ; ক্রোধে বিবেচনাবুদ্ধি শূন্য।

চতুস্কন্ধরূপী—সৈন্যদের পরাক্রমের খ্যাতি, সৈন্যের কোলাহল, সৈন্যের পদোত্থিত ধূলি এবং প্রকৃত সৈন্যদল,—এই চারিটি স্কন্ধ বা দেহবিশিষ্ট বাহিনী।

চলিছে প্রতাপ অগ্রে জগৎ কাঁপায়ে ইত্যাদি—রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ী সৈন্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন : "প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।
যযৌ পশ্চাদ্ রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ।। (৪।৩০)

সৈন্যদল প্রকৃত প্রস্তাবে অভিযান করিবার পূর্বেই তাহার বীরত্বখ্যাতি লোকের কানে যাইয়া পৌঁছে; তাহার পর সৈন্যদল বহির্গত হইলে সমবেত সেনাগণের কোলাহল শোনা যায়; তাহার পরে

দূর হইতে দেখা যায় অসংখ্য সেনার পদোত্থিত ধূলির মেঘ এবং সর্বপশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হয় প্রকৃত সৈন্যদল। বহির্ভাগে—লঙ্কাপুরীর বাহিরে। বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি রঘুসৈন্য ইত্যাদি—প্রথমে লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিষ্ণু নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য দেখিতে পাইলেন। পরে লঙ্কাপুরীর বহির্দেশে বিষ্ণু রাক্ষসসৈন্যের প্রতীক্ষায় চঞ্চল রামের অসংখ্য সৈন্য দেখিতে পাইলেন। আসন্ন ঝড়ের পূর্বে সমুদ্রবক্ষে উত্থিত তরঙ্গসমূহের ন্যায়ই তাহারা চঞ্চল ও সংখ্যায় অগণিত।

পুণ্ডরীকাক্ষ— বিষ্ণু; পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) ন্যায় অক্ষি যাঁহার (বহুব্রীহি)।

পক্ষিরাজ যথা গরুড় ইত্যাদি—পক্ষিরাজ গরুড় দূরে নিজের ভক্ষ্যবস্তুস্বরূপ সর্পকে দেখিতে পাইলে যেরূপ ভীষণ পক্ষশব্দে আকাশ কম্পিত করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসে, সেইরূপ চিরশত্রু রাক্ষসগণকে দেখিয়া স্বর্গ হইতে ভীষণ রণহুঙ্কার করিয়া দেবসৈন্য লঙ্কার দিকে ধাবিত হইতেছিল।

হুঙ্কারে—হুঙ্কার ধ্বনির সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। জীবব্রজ—প্রাণিসমূহ। ব্রজ সমূহার্থক শব্দ। ছন্নমতি— বিকলচিত্ত, বিমূঢ়। ক্ষণকাল চিন্তি—কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার প্রভাবে ব্যাপারটি ঘটিতেছে এবং ইহার সম্ভাব্য পরিণতি কি তাহা জানিবার জন্য।

যোগীন্দ্র-মানস-হংস—শ্রেষ্ঠ যোগিগণের মনোরূপ সরোবরে বিরাজিত হংসস্বরূপ বিষ্ণু।

না হেরি উপায় কিছু—অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব এই ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন বলিয়া ইহা বিষ্ণুর অপ্রতিবিধেয়। হায় প্রভু, দুরন্ত সংহারী ত্রিশূলী ইত্যাদি—২য় সর্গে রতিও শিবকে 'দুরন্ত হিংসক শূলপাণি" বলিয়াছে! পুরাণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সত্ত্বগুণাশ্রিত, পালনকর্তা বিষ্ণুকে রজোগুণাশ্রিত এবং সংহারকর্তা মহাদেবকে তমোগুণাশ্রিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী ... উগরি বিষাগ্নি জীবে!—এস্থলে স্বতন্ত্র দুইটি বাক্যে উপমেয় ত্রিশূলী ও উপমান কালসর্পের সাধারণ ধর্ম সংহারকার্য এক বলা হইয়াছে অথচ তুলনাবাচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

সৌরি (শৌরী)—সূরি (শূরসেন) নামক যাদবের বংশে জাত বলিয়া কৃষ্ণের নামান্তর শৌরি বা সৌরি। পরবর্তিকালে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হওয়ায় কৃষ্ণ নামবাচক শব্দে বিষ্ণুকেও বুঝায়। কালসর্প সাধ, সৌরি, ইত্যাদি—কাল সর্পের বৃত্তিই হইল বিষ ঢালিয়া জীবের প্রাণসংহার করা; সেইরূপ তমোগুণাশ্রিত রুদ্রের বৃত্তিও হইতেছে জগতের সংহার,—সৃষ্টি অথবা পালন নহে।

বিশ্বম্ভর-—বিশ্বের ভরণ অর্থাৎ পালন-কর্তা বিষ্ণু। বিশ্ব + ভর + খচ্।

মিনতি—কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ + বিন্নতি < বিজ্ঞপ্তি শব্দের সহযোগে উৎপন্ন 'জোড়কলম' শব্দ। উত্তরিলা হাসি বিভু— পৃথিবীর আকুলতা এবং তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন।

সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি দেববীর্য্য ইত্যাদি—পৃথিবী কোন বিশেষ পক্ষাবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর নিকটে আসেন নাই;—তিনি আসিয়াছেন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাইতে। তিনটি দুর্ধর্ষ সমান বল পৃথিবীর উপর শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলে সেই দারুণ সংঘাতে পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবেন,— এই ছিল তাঁহার আশঙ্কা। বিষ্ণু পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি শিবের অভিপ্রেত রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণবধ রোধ করিতে না পারিলেও, দেবগণের শক্তি আকর্ষণ করিয়া দেববল হ্রাস করিবেন। ইহাতে তিনটি বলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ কম হইবে এবং রাবণও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রয়োগে লক্ষ্মণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই উপায়ে শিবের অভিপ্রায়ও পূর্ণ হইবে এবং পৃথিবীর উদ্দেশ্যও সফল হইবে।

গরুত্মান—গরুড়; গরুৎ (পক্ষ) + মতুব্। স্ত্রীলিঙ্গে গরুত্মতী; যথা "গরুত্মতী তরি" (৩য় সর্গ)

দেবতেজঃ হর আজি রণে ইত্যাদি—সূর্য যেভাবে সমুদ্রজল অদৃশ্যভাবে শোষণ করে, সেইরূপ আকাশে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর উড়িয়া দেবগণের শক্তি আকর্ষণ কর। বৈনতেয়—বিনতার পুত্র গরুড়।

কিম্বা তুমি, বৈনতেয় হরিলা যেমতি অমৃত—সপত্নী কদ্রুর দাসীত্ব হইতে মাতা বিনতাকে উদ্ধার করিবার জন্য গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করিয়াছিলেন।

যথা গৃহ মাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে ইত্যাদি—ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়া যদি সে আগুন অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তবে অগ্নিশিখা যেমন দরজা-জানলা প্রভৃতি অবকাশের ভিতর দিয়া বেগে বাহিরে ছুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার ন্যায় লঙ্কার অবরুদ্ধ রাক্ষস-সেনাগণ লঙ্কার চারিটি প্রধান দ্বারপথে বেগে নির্গত হইতে লাগিল।

মাতঙ্গবর ঐরাবত—ইন্দ্রের বাহন গজরাজ ঐরাবত সমুদ্র-মথনোদ্ভূত নিধিসমূহের অন্যতম।

দম্ভোলি-নিক্ষেপী সহস্রাক্ষ—বজ্রাস্ত্রধারী সহস্র-লোচনবিশিষ্ট ইন্দ্র।

দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা রবিকরে—দেবরাজ ইন্দ্র ভাস্বরদেহে ঐরাবত পৃষ্ঠে সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত সুমেরু-পর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

আইলা শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি সেনানী—তারকাসুরের নিধনকর্তা দেবসেনাপতি স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় ময়ূরলাঞ্ছিত পতাকাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন।

আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা—শত্রুপক্ষের রণবাদ্য বলিয়া দেব-সৈন্যের বাদ্যধ্বনি লঙ্কাবাসিগণ আতঙ্কের সহিত শ্রবণ করিল।

দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি—হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই দাস অর্থাৎ অধম রাম দেবগণের ভৃত্যস্বরূপ। তেঁই আজি-চরণ-পরশে ইত্যাদি—আমার পূর্বজন্মার্জিত অশেষ পুণ্যফলে আজ এই চরম বিপদের সময়ে আমিই যে কেবল দেবরাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম তাহা নহে, সেই পুণ্যফলে দেবতার চরণস্পর্শে সমগ্র পৃথিবীই আজ পবিত্র হইল।

উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে ইত্যাদি—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ১০৩ সর্গে রাবণবধের পূর্বে ইন্দ্র কর্তৃক রামচন্দ্রকে দেবরথ প্রেরণের কথা আছে। তুলনীয়—

"ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য চ রক্ষসঃ।
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ।। ৫
ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা তেষাং বচোঽমৃতম্।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।। ৬
রথেন মম ভূপৃষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
আহূয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ।। ৭

নিজ কর্ম্মদোষে মজে রক্ষঃকুলবিধি—মেঘনাদবধ কাব্যে নায়ক রাবণকে কবি নায়কোচিত নানা সদ্‌গুণে ভূষিত "grand fellow" করিয়া তুলিতে চাহিলেও, সীতাহরণরূপ তাহার অপকার্যটি একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। একথা সত্য যে, রামায়ণে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ যেরূপ নিন্দনীয় জঘন্য পাপকার্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, মেঘনাদবধে উহা তত বড় পাপকার্য বলিয়া দেখানো হয় নাই। ভগ্নীর অবমাননাকারী শত্রুকে দণ্ড দিবার জন্যই যেন মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ শত্রুর পত্নীকে নিজের পুরীতে আনিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিল। তুলনীয়—

"কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি

আনিনু এ হৈম গেহে?" (১।১০২-১০৪)

তথাপি অসহায়া সীতার মর্মান্তিক দুঃখের ফলেই যে রাবণের বিনাশ,—এই সত্যটিও কবি সুযোগ মত লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র, শচী, বিভীষণ, সরমা এমন কি—রাবণের উপাস্য দেবতা শিবের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাবণ অদৃষ্টদোষেই সবংশে ধ্বংস হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অদৃষ্ট বা প্রাক্তন তাহার নিজেরই সৃষ্ট।

লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে ইত্যাদি—পূর্বে সমুদ্রকে মথিত ও বিপর্যস্ত করিয়া দেবগণসহ আমি যেরূপ অমৃত আহরণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ সমুদ্রের মত লঙ্কাকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া এবং রাবণকে শাস্তি দান করিয়া দেবগণ আজ সীতাকে উদ্ধার করিয়া বীর রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন।

কতকাল অতল সলিলে ... রমা আঁধারি জগতে?—লক্ষ্মীকে দুর্বাসার অভিশাপহেতু কিছুকাল বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সমুদ্রগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মীস্বরূপা সীতাদেবীও রামচন্দ্রের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্ধকার সমুদ্রগর্ভের ন্যায় রাক্ষসপুরীর নিরানন্দ অশোক বনে অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্মীদেবীর পুনরুদ্ধারের মত সীতারও পুনরুদ্ধারের কাল আর দূরবর্তী নহে। এখানে উপমেয় অশোক বনে বন্দিনী সীতা এবং উপমান সমুদ্রতলে অবস্থিতা লক্ষ্মীদেবীর সাধারণ ধর্ম (পতির নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি) এক, অথচ পৃথক বাক্যে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং সাদৃশবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে। অম্বুরাশি সম কম্বু ইত্যাদি—চারিদিকে সহস্র সহস্র রণশঙ্খ সমুদ্রগর্জনের মত গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত হইল।

গগন ছাইয়া উড়িল কলম্বকুল ইত্যাদি—আকাশে বজ্রাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ তীরসমূহ দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল এবং শত্রুদের বর্ম ও ঢাল ভেদ করিয়া রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করিল।

নিকুঞ্জে যেমতি পত্র প্রভঞ্জন বলে—ঝড়ের বেগে বনের মধ্যে যেরূপ অজস্র পত্র খসিয়া পড়ে, সেইরূপ অসংখ্য হস্তী নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল। ভৈরবে—ভৈরব রবে; ভীষণ গর্জন ও আর্তনাদ দ্বারা। সৌরতেজঃ রথে—সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া।

বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে—হস্তীর শত্রু সিংহ হস্তীকে দেখিয়া যেভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সেইভাবে প্রধান-রাক্ষস-সেনাপতি চামর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

আহ্বানিল ভীমরবে সুগ্রীবে উদগ্র—যুদ্ধক্ষেত্রে সুগ্রীবকে দেখিয়া রাক্ষসরথিগণের সেনাপতি উদগ্র উচ্চৈঃস্বরে স্পর্ধার সহিত তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। শত জলস্রোতো নাদে—প্রখর স্রোতোবিশিষ্ট শত শত নদী প্রবাহের সম্মিলিত শব্দের ন্যায় বিকট শব্দে।

চালাইলা বেগে বাস্কল মাতঙ্গযূথে ইত্যাদি—রাক্ষস গজসৈন্যের সেনাপতি বাস্কল দূরে অঙ্গদকে দেখিতে পাইয়া দুর্দম হস্তিদলপতির ন্যায় সেইদিকে নিজের গজসৈন্যসহ ধাবিত হইল।

যুবরাজ—কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ।

অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে ইত্যাদি—অশ্বারোহী-রাক্ষস-সেনাদলের নায়ক অসিলোমা তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে বীরশ্রেষ্ঠ শরভ নামক রামপক্ষীয় সেনানায়ককে চতুর্দিক হইতে অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিল।

বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ। বীর ঋষভের (বৃষের) মত; উপমিত সমাস।

বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা সর্বনাশী) ইত্যাদি—রাক্ষস পদাতি-বাহিনীর নায়ক বিড়ালাক্ষ রুদ্রের ন্যায় সর্বসংহারক মূর্তিতে হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য রথে—পূর্বকথিত ইন্দ্রপ্রদত্ত রথে। শিখিধ্বজ—ময়ূর দ্বারা উপলক্ষিত, বা ময়ূরচিহ্নবিশিষ্ট রথারূঢ় কার্তিক।

শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি, ইত্যাদি—তারকাসুর-বিনাশক ময়ূরবাহন রূপবান কার্ত্তিক পৃথিবীতে নিজের সুন্দর রূপের প্রতিবিম্বস্বরূপ অনিন্দ্যসুন্দর লক্ষ্মণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

উড়িল চৌদিকে ঘনরূপে রেণুরাশি—অগণিত সৈন্যের পদক্ষেপে উত্থিত ধূলিপুঞ্জ চারিদিকে ধূলার মেঘের সৃষ্টি করিল। পুষ্পক—রাবণের আকাশ-যান; তিনি নিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করিয়া ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বিস্ফুলি।—বেগঘর্ষণজনিত রথচক্র হইতে নির্গত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ।

রতন-সম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া ইত্যাদি—প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই উষার আলো যেরূপ জগৎকে উদ্ভাসিত করে, পুষ্পকরথে আরূঢ় রাবণের নানারত্নশোভিত বেশভূষা হইতে নির্গত রত্নচ্ছটা, তাহার রথের সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত স্থান পূর্ব হইতেই সেইরূপ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল।

একচক্র রথে—সূর্যবিম্বকে সূর্যের রথের একমাত্র চক্র কল্পনা করা হয় বলিয়া সূর্যের রথকে 'একচক্র' বলে।

সূত—প্রাচীন ভারতের সম্প্রদায়বিশেষ; ইহাদের বৃত্তি ছিল সারথির কার্য।

ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা—কান্তিহীন সাধারণ মানবসৈন্যের মধ্যে প্রদীপ্ত-দেহ দেবগণ ধূমের মধ্যস্থিত উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান। অসুরারি দল—অসুরগণের চিরশত্রু দেবগণ।

আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র ইত্যাদি—রাবণ ইন্দ্রের প্রতি দারুণ ব্যঙ্গ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদ আর জীবিত নাই জানিয়া, ইন্দ্র আজ স্পর্ধাভরে লঙ্কায় আসিয়াছে। গভীরে—গম্ভীর কণ্ঠে। মনোরথ-গতি—মনোরথের অর্থাৎ ইচ্ছার বা চিন্তার ন্যায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট। তুলনীয়—

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ' মাসের পথ।
ছয়দিনে উতরিল অশ্ব মনোরথ।।" (ভারতচন্দ্র)

পালাইল পালায় < পলাইল, পলায়।

কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন, ইত্যাদি—বজ্রনির্ঘোষক ভীষণ মেঘ যখন বজ্রাগ্নি উদগীরণ করিতে করিতে আকাশে দেখা দেয়, তখন তাহার নিকট হইতে পশুপক্ষী যেরূপ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, পুত্রশোকে ক্রুদ্ধ বীর রাবণের আবির্ভাবে রঘুসৈন্যও সেইরূপ ছন্নমতি হইয়া যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। মুহূর্তে ভেদিলা ব্যূহ ইত্যাদি—প্রচণ্ড প্লাবনের প্রথম আঘাতেই বালির বাঁধ যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্ররচিত অপূর্ব ব্যূহ রাবণ তীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিয়া অনায়াসেই ভেদ করিলেন। গোষ্ঠ বৃতি—গোশালার বেড়া।

অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে, ইত্যাদি—রাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্বপ্রথমে আসিলেন দেবসেনাপতি কার্ত্তিক।

শিঞ্জিনী আকর্ষি—ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ শরনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া।

কৃতাঞ্জলিপুটে নমি শূরে ইত্যাদি—রাবণ শিব-শিবানীর ভক্ত বলিয়া, ইষ্টদেবতার পুত্র কার্ত্তিককে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, শিবভক্ত রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য শত্রুসৈন্যের মধ্যে কার্ত্তিককে দেখিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন নাই।

নরাধম রামে হেন আনুকূল্য দান ইত্যাদি—বীরশ্রেষ্ঠ দেবসেনাপতি হইয়া অন্যায় যুদ্ধের প্ররোচনা ও প্রশ্রয়দানকারী কাপুরুষ রামকে এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা তোমার পক্ষে অনুচিত ও অশোভন কার্য। বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে ইত্যাদি দেবসেনাপতি আমি, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। হে শক্তিমান রাবণ, প্রথমে তুমি শক্তিবলে আমাকে পরাজিত না করিলে লক্ষ্মণবধরূপ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে না।

শরজালে কাতরিয়া রণে শক্তিধরে—রুদ্রতেজে বলীয়ান রাবণ অতি তীক্ষ্ণ শরসমূহ বর্ষণ করিয়া শক্তি-অস্ত্রধারী কার্ত্তিককে ব্যথায় অধীর করিয়া তুলিলেন।

বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া কহিল, ইত্যাদি—কৈলাসে বসিয়া পৃথিবীতে লঙ্কা সমর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে রাবণহস্তে কার্ত্তিকের নিপীড়ন দেখিয়া, পার্বতী সখী বিজয়াকে খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আজ রাবণ রুদ্রতেজে পূর্ণ বলিয়াই যে বীরপুত্র কার্ত্তিকের এই দুর্গতি তাহা নয়, অপর পক্ষে বিষ্ণুর আদেশে গরুড় অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়া দেবশক্তি হরণ করিতেছে বলিয়াও কার্তিক যথাশক্তি রাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ। এই অসম যুদ্ধ হইতে কার্তিককে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দেবী বিজয়াকে দ্রুত পৃথিবীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

বাছার কোমল দেহে—দেবসেনাপতি হইলেও বাৎসল্যের দৃষ্টিতে কার্তিক দেবীর নিকট সুকোমলদেহ সন্তান ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। সদানন্দ—চিরানন্দময় শিব।

চলিলা আশু সৌরকররূপে ইত্যাদি—দেবীর আদেশে বিজয়া সূর্যকিরণের সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া কৈলাস হইতে নীল আকাশ পথে মর্ত্যে যাত্রা করিলেন।

ফিরাইলা রথে হাসি ইত্যাদি—অদৃশ্যা বিজয়ার নিকটে মাতার আদেশ শুনিয়া কার্ত্তিক ঈষৎ হাসিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাস্যের কারণ,—লোকে মনে করিবে যে, তিনি রাবণের শক্তিতে পরাজিত হইয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন; প্রকৃত কারণ কেহ জানিবে না।

সিংহনাদে কটক কাটিয়া অসঙ্খ্য—সেনাপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করায় বিজয়গর্জন সহকারে অসংখ্য সৈন্য বধ করিয়া। শত প্রসরণে—শত বেষ্টনে। ভস্মে—(নামধাতু) ভস্ম করে।

জলাঞ্জলি দিয়া লজ্জায়—কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন বীরের পক্ষে চরম লজ্জাজনক ব্যাপার।

আইলা রোষে দৈত্যকুল অরি ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনকে দেখিয়া কর্ণ যেরূপ আক্রোশের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ আক্রোশের সহিত দৈত্যকুলের চিরশত্রু ইন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

তোমর—শাবলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র। শর বৃষ্টি—শর বর্ষণ করিয়া। বৃষ্টি < বৃষ্টিয়া, বৃষ্টি শব্দ হইতে নামধাতুনিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ। গর্ব্বে—দম্ভের সহিত। বৈজয়ন্তে—ইন্দ্রের প্রাসাদ বৈজয়ন্তধামে। বলি—(সম্বোধনে) বলবান্ (ব্যঙ্গোক্তি)। কম্পবান < কম্পমান—কম্পিত, আকুল। অশুদ্ধপ্রয়োগ।

তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে—তোমার ষড়যন্ত্রের ফলে অন্যায় যুদ্ধে। ইন্দ্রাদির ষড়যন্ত্রের বিষয় রাবণ কি উপায়ে জানিয়াছেন, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। ষড়যন্ত্রে ইন্দ্রের যোগদানের কথা জানিলে, উহাতে রক্ষঃকুললক্ষ্মী, পার্বতী ও শিবের যোগদানের ও সমর্থনের কথাও জানিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইঁহাদের প্রতি রাবণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না।

অবধ্য তুমি, অমর; ইত্যাদি—অমৃতপানে অমরত্বলাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে নিহত করা যাইবে না; নতুবা যম যেরূপ মুহূর্তের মধ্যে জীবের প্রাণ হরণ করে, সেইরূপ মুহূর্তের মধ্যে তোমার প্রাণ হরণ করিয়া তোমাকে শাস্তি দিতাম। নারিবে < না + পারিবে। (পদ্যে ও প্রাদেশিক প্রয়োগে)। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে, ইত্যাদি—তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি বা না পারি, তুমি কিছুতেই আমার আক্রমণ হইতে লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে পারিবে না। লক্ষ্মণের প্রাণ লইবই, ইহা আমার স্থির প্রতিজ্ঞা। কুলিশী—কুলিশ অর্থাৎ বজ্রধারী ইন্দ্র। লাড়িতে < নাড়িতে (প্রাদেশিক রূপ)।

নারিলা লাড়িতে দম্ভোলি ইত্যাদি—ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিবার জন্য বজ্র ধারণ করামাত্র, শূন্যে

অবস্থিত গরুড় ইন্দ্রের শক্তি আকর্ষণ করায় ইন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং বজ্র উত্তোলন করিতেই পারিলেন না। প্রহারিলা ভীম-গদা গজরাজ-শিরে ইত্যাদি --ঝড় যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভীষণ বেগে পর্বতের চূড়ার উপর নিক্ষেপ করে, সেইরূপ রাবণ তাহার বিশাল গদাদ্বারা প্রচণ্ডবেগে ঐরাবতের বিশাল মস্তকে আঘাত করিলেন। নিরস্ত—নিবৃত্ত বা গতিশূন্য হইয়া।

হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে—রাবণ গদা হস্তে লম্ফ দিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া একটিমাত্র আঘাতে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে নিশ্চল করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া, আবার আসিয়া রথে আরোহণ করিলেন।

যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি ইত্যাদি—ইন্দ্রের সারথি মাতলি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের বিকল অবস্থা দেখিয়া নিমেষমধ্যে ইন্দ্রকে নূতন রথ আনিয়া দিলে,—রাবণের অদ্ভুত পরাক্রমের মূলে যে রাবণ-বৎসল শিবের অদৃশ্য হস্ত রহিয়াছে ইহা বুঝিয়া, অভিমান ভরে রাবণকে লক্ষ্মণের নিকটে যাইবার পথ ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের রণভঙ্গ কার্ত্তিকের রণভঙ্গের তুলনায় আরও বেশি অগৌরবজনক। কার্ত্তিক মাতার আদেশে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র ত্যাগ করিলেন প্রকৃত পরাজয় স্বীকার করিয়া।

যাও ফিরি তুমি শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ!—ইন্দ্রের পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের পর রামচন্দ্র 'ভীষণ সিংহনাদ করিয়া' রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন,—বুঝি তাঁহার কাপুরুষতার ও অপদার্থতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবার জন্যই! ইহার চেয়ে কবি রামকে শিবিরের এক কোণে ত্রাসে কম্পমান অবস্থায় চিত্রিত করিলেও রামের চরিত্রে বেশি গ্লানি স্পর্শ করিত না! ইন্দ্র ও কার্ত্তিক, এবং পরে হনুমান ও সুগ্রীব,—ইহারা প্রত্যেকেই সাধ্যমত রাবণের সঙ্গে যুঝিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্রই কেবল 'আর একদিন বেশি বাঁচিবার সুযোগ পাইয়া' বিনা বাক্যব্যয়ে নতমস্তকে রাবণের আদেশ পালন করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন! ষষ্ঠ সর্গে বীর মেঘনাদের সম্মুখে লক্ষ্মণ-চরিত্র যেরূপ হীনতা ও কাপুরুষতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, সপ্তম সর্গে বীর রাবণের সম্মুখে রামচরিত্রও ঠিক সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মেঘনাদের ও রাবণের বীরত্বগৌরব বর্ধিত করিতে যাইয়া কবি এই দুইটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্মণের ও রামের প্রতি অযথা ও অসঙ্গত আচরণ করিয়াছেন।

বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে শূরেন্দ্র---রামচন্দ্রের চরিত্রকে গ্লানিযুক্ত করিলেও কবি অন্ততঃ এই সর্গে লক্ষ্মণের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। মহাবীর লক্ষ্মণ বৃষপালের মধ্যে পতিত সিংহের ন্যায় মহাপরাক্রমে, কখনও বা রথে অবস্থান করিয়া এবং কখনও বা রথ হইতে নামিয়া, অসংখ্য শত্রুসৈন্য বধ করিতেছিলেন। বাজপতি—সুবৃহৎ বাজ বা শ্যেন পক্ষী। পুত্রহা—পুত্রঘাতক, পুত্রের নিধনকর্তা। পুত্র+হন্+ক্বিপ।

ধাইলা চৌদিকে হুহুঙ্কারে দেব নর ইত্যাদি—লক্ষ্মণের প্রতি রাবণকে ধাবমান দেখিয়া, লক্ষ্মণের রক্ষার শেষ চেষ্টা করিতে চারিদিক হইতে দেবসৈন্য ও রঘুসৈন্য ছুটিয়া আসিল; অন্যদিকে রাবণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিপুল সংখ্যায় রাক্ষসসৈন্যও সেইদিকে ধাবিত হইল,—অর্থাৎ সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিল।

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে ইত্যাদি—ইতঃপূর্বে রাক্ষস পদাতিক বাহিনীর নায়ক বিড়ালাক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধের কথা ৫৩৮-৩৯ পংক্তিতে বলা হইয়াছে। ইত্যবসরে বিড়ালাক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হনুমান লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিল।

রড়ে---দ্রুতবেগে দৌড়িয়া। (প্রাদেশিক)। চোক্ চোক্ < চোখা < চোক্ষ—তীক্ষ্ণ, ধারাল।

আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ইত্যাদি—রাবণের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ-শরে বিদ্ধ হইয়া বিপন্ন হনূমান পিতা বায়ুদেবকে স্মরণ করায়, সূর্য যেরূপ নিজের কিরণে কুমুদপ্রিয় চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলেন, সেইরূপ বায়ুদেবও নিজের শক্তি দিয়া হনুমানকে শক্তিমান করিয়া তুলিলেন। বিনাশি সংগ্রামে উদগ্রে বিগ্রহ প্রিয়—রাক্ষস রথিগণের নায়ক সংগ্রামপ্রিয় উদগ্রকে যুদ্ধে বধ করিয়া। ৫৩০-৩২ পংক্তিতে সুগ্রীবের সহিত উদগ্রের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে।

রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, বর্ব্বর ইত্যাদি—ভ্রাতা বালিকে কৌশলে বধ করিয়া যে-কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য লাভ করিয়াছিস, সেই রাজ্যসুখ ভোগ না করিয়া অনার্য তুই কুক্ষণে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এই স্বর্ণলঙ্কাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস।

ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ইত্যাদি—বালিবধের পর সুগ্রীব ভ্রাতৃবধূ সুন্দরী তারাকে নিজের মহিষী করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের মত লোকের উপযুক্ত স্থান হইতেছে স্ত্রীরূপে গৃহীত বিধবা ভ্রাতৃবধূর সান্নিধ্য,—যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের মধ্যে নহে।

বিধবাদশা কেন ঘটাইবি আবার তাহার ইত্যাদি—সুগ্রীবের প্রতি রাবণের অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি। বালির মৃত্যুর পর বালিপত্নী তারা দেবর সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করে। এখন রাবণের হস্তে সুগ্রীবের মৃত্যু হইলে তারা আবার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা হইবে তাহার চির-বৈধব্য; কারণ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, সুগ্রীবের এরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেহ নাই। ইংরেজি Sarcasm বা অতিদূষণ অলঙ্কারের অনুকরণ। পরদারা < পরদার—পরস্ত্রী। দার স্ত্রীবাচক শব্দ হইলেও পুংলিঙ্গ। পরদারালোভে সবংশে মজিলি, দুষ্ট—রাবণের ব্যঙ্গোক্তির প্রত্যুত্তরে সুগ্রীব বলিলেন যে, তিনি বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেশাচার অনুসারে; কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসীদের ইহাতে লজ্জার কোন হেতু নাই। কিন্তু রাবণের পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি তাহার লম্পটতারই পরিচায়ক। পরস্ত্রী সীতাকে হরণ করিবার পাপেই আজ পাপিষ্ঠ রাবণ সবংশে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।

নিক্ষেপিলা গিরিশৃঙ্গ—রামায়ণে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বানরগণ লম্ফ দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছে; পর্বত উৎপাটিত করিয়াছে; লাঙ্গুলাগ্নিতে লঙ্কা ভস্মীভূত করিয়াছে এবং অখণ্ড পর্বতশৃঙ্গ শত্রুর প্রতি শস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও মধুসূদন রাক্ষসগণের ন্যায় বানরগণকেও সাধারণ মানুষরূপেই কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কাব্যে দেবতা ভিন্ন অন্যান্য চরিত্রে এই সকল অবিশ্বাস্য অতিমানবীয় শক্তির প্রকাশ সাধারণতঃ দেখানো হয় নাই। এস্থলে সুগ্রীব কর্তৃক রাবণের প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপের উল্লেখ সম্ভবতঃ কবির মনের উপর রামায়ণীয় ঘটনার প্রভাবের ফল।

অনম্বর—আকাশ। ন (নাই) অম্বর (আবরণ) যাহার; আকাশ উন্মুক্ত বলিয়া অনম্বর। 'অম্বর' অর্থেও আকাশ; কিন্তু সেস্থলে ব্যুৎপত্তি স্বতন্ত্র। (অন্‌ব + অরণ)। মধুসূদন কয়েকস্থলে শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। জল যথা জাঙাল ভাঙ্গিলে কোলাহলে—বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ জলরাশি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ সশব্দে ছুটিয়া বাহির হয়, রাবণের ভীষণ আক্রমণে রামচন্দ্রের সৈন্যগণও সেইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। কোদণ্ড—ধনুঃ।

দেবদল তেজোহীন এবে পলাইলা ইত্যাদি—গরুড় কর্তৃক শক্তি আকর্ষিত হওয়ায় দেব সৈন্যগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং ঝড়ের মুখে যেমন ভস্মের সহিত অগ্নিকণা প্রবল বেগে ছুটিয়া চলে, প্রভাহীন দেহবিশিষ্ট রামের মানব সৈন্যের সহিত প্রভাময় দেহবিশিষ্ট দেবসৈন্যও রাবণের পরাক্রমে সেইরূপ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে—বীরজনোচিত উৎসাহহেতু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ। ধন্বী—ধনুর্ধর, ধানুকী; ধন্ব (ধনুঃ)

+ ইন্। এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, নরাধম?—আজিকার যুদ্ধে রাবণ পুত্রহন্তা লক্ষ্মণের সন্ধানই করিতেছিলেন। সেই একান্ত অভীপ্সিত ব্যক্তিকে এতক্ষণ পরে রাবণ নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া যেন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়হীন হইতে চান। কলত্র—পত্নী। স্ত্রীবাচক শব্দ হইলেও কলত্র সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ। গর্জিলা ভৈরবে—ভীষণরবে গর্জন করিল। চাপে—ধনুকে।

ভীম সিংহনাদে উত্তরিলা ইত্যাদি—রাবণের ক্রোধ ও আক্রোশপূর্ণ বাক্যের প্রত্যুত্তরে পরাক্রমশালী লক্ষ্মণও ভীষণ গর্জন করিয়া বলিলেন। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের প্রতি প্রীতিপক্ষপাতহেতু কবি লক্ষ্মণচরিত্রে যে কালিমা মাখাইয়াছেন, এই সর্গে তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে যত্নসহকারে প্রক্ষালিত ত করিয়াছেনই; অধিকন্তু রুদ্রতেজঃপূর্ণ যে-রাবণের পরাক্রমের নিকট ইন্দ্র ও কার্তিক পর্যন্ত অনায়াসে পরাজিত, সেই রাবণের প্রচণ্ড ক্রোধবহ্নির সম্মুখে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে লক্ষ্মণকে স্থাপন করিয়া, তাঁহার বীরত্বকে একটি অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। লক্ষ্মণের এই বীরত্বদর্শনে পরম শত্রু রাবণও বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাখানি < ব্যাখ্যান —প্রশংসা করি। বীরপণা < বীরত্বন—বীরত্ব। সংস্কৃতে -তন প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বাংলা -পণা (-পনা) প্রত্যয় যোগে গুণবাচক বিশেষ্যপদ গঠিত হয়।

শক্তি ধরাধিক শক্তি ধরিস সুরথি—মহাবীর তুই শক্তি-অস্ত্রধারী কার্তিকের চেয়ে বেশি শক্তিমান তাহা স্বীকার করিতেছি। কারণ কিছুক্ষণ পূর্বেই অপেক্ষাকৃত কম শক্তি প্রয়োগে কার্তিককে রাবণ পরাজিত করিয়াছেন। ভীষণ রিপুনাশিনী—শত্রু হননকারিণী ভয়ঙ্করী শক্তি অস্ত্র। শক্তি স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া তাহার বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয় করা হইয়াছে। রক্তস্রোতে আভাহীন এবে—লক্ষ্মণের দেহে নিবদ্ধ অত্যুজ্জ্বল দেবাস্ত্রসমূহ তাঁহার দেহনিঃসৃত রক্তে লিপ্ত হওয়ায় উজ্জ্বলতাহীন হইল। সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি—বিশালদেহ লক্ষ্মণের দেহনিঃসৃত রক্তের ধারাগুলি তাহার দেহের নানা স্থলে সর্পের ন্যায় দেহটিকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি যখন শক্তি দ্বারা আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন, তখন তাঁহাকে সর্পসমূহ দ্বারা বেষ্টিত পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল। তুলনীয়—"লক্ষ্মণং রুধিরাদিগ্ধং সপন্নগমিবাচলম্।" (লঙ্কাকাণ্ড—১০১। ৪০)।

ধাইলা ধরিতে শবে—মৃত শত্রুর শবের লাঞ্ছনা ইলিয়ড কাব্যেই আছে, রামায়ণে নাই। হেক্টরের নিধনের পর একিলিস্ তাহার শবদেহ রথের পিছনে জুড়িয়া ট্রয়নগরীর চতুষ্পার্শ্ব পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রচুর নিষ্ক্রয় দান করিয়া প্যারাম্ একিলিসের হস্ত হইতে পুত্রের দেহ উদ্ধার করেন। পশিলা পুরে রক্ষঃ অনিকিনী ইত্যাদি—রক্তবীজকে বধ করিয়া চামুণ্ডা যেমন রক্তাক্ত অধরে সহর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষসবাহিনীও রক্তাক্তদেহে বিজয়োল্লাসে লঙ্কাপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। ইতিপূর্বে ১৭৮—১৮৮ পংক্তিতে রাক্ষসবাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলনা করা হইয়াছে।

দেববল মিলি স্তুতিলা সতীরে যথা—দৈত্যবধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ যেরূপ দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, শক্তিশেলাহত হইয়া লক্ষ্মণের পতনের পর রাক্ষস স্তুতিপাঠকেরাও সেইরূপ রাক্ষসবাহিনীর বিজয় সংগীত দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিল।

হেথা পরাভূত যুদ্ধে ইত্যাদি—রাবণের সসৈন্যে সগৌরবে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তনকালে দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার পরাজিত দেবসৈন্যসহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ—শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পতন প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া এই সর্গের নাম "শক্তি নির্ভেদ"।

অষ্টম সর্গ

তমোহা—অন্ধকার-বিনাশক; তমঃ + হন্ + ক্বিপ্ = তমোহন্। মিহিরে—সূর্যবিম্বরূপ মস্তকের উজ্জ্বল ভূষণকে। দিনদেব—দিবসের অধিপতি দেবতা। দিনদেব ও মিহির দুইটিই সূর্যবাচক শব্দ। কবি এখানে জ্যোতিশ্ছটাসম্পন্ন সূর্যবিম্বকে মানবনেত্রে অদৃশ্য দিবসের অধিপতি দেবতার দৃশ্যমান রত্নমুকুটরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তুলনীয়—

"সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নি তরী

মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন সন্তরণ করি,..." (ভাষা ও ছন্দ: রবীন্দ্রনাথ)

রাজকাজ সাধি যথা বিরাম-মন্দিরে ইত্যাদি—সম্রাট্ সারাদিন রাজমুকুট মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য সমাপনের পর যেরূপ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া মুকুটখানি খুলিয়া রাখেন, সেইরূপ দিনের শেষে দিবসের অধিপতি দেবতা সারাদিনের কার্যের পর অস্তাচলের চূড়ায় সমুজ্জ্বল সূর্যবিম্বরূপ রত্ন-মুকুটখানি খুলিয়া রাখিলেন। উপমা অলঙ্কার। এস্থলে উপমান রাজেন্দ্র এবং উপমেয় দিনদেব দুইটি পৃথক বাক্যে থাকিয়া বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছে। তুলনীয়—

"এবে দিনমণি দেব, মৃদুমন্দগতি

অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণচক্ররথ,

বিশ্রামবিলাস-আশে মহীপতি যথা

সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে। (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ১।১৮০-১৮৩)

তারাদলে—তারাসমূহের সহিত। আইলা রজনী—বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবসের এবং মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শেলাঘাত-দিবসের রাত্রি আসিল। ভ্রাতৃলোহ—ভ্রাতার রক্ত।

নয়ন জল, অবিরল বহি ইত্যাদি—পর্বতের উপর দিয়া প্রবাহিত ঝর্ণার জল গিরিমাটির সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া নীচে আসিয়া পড়ে, রামচন্দ্রের অশ্রুধারাও সেইরূপ লক্ষ্মণের শোণিতাক্ত বিশাল দেহে পতিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রণহেতু লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ভূমিকে সিক্ত করিতেছে। এস্থলেও বস্তুপ্রতিবস্তু ভাবের উপমা অলঙ্কার। শূন্যমনাঃ—বিমনা, বিমর্ষ। নাথ—প্রভু রামচন্দ্র। রামকে মধুসূদন সাধারণ মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করিয়াছেন; কাজেই কৃত্তিবাসের অনুকরণে অবতারবাচক নাথ শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়াছে।

সুধম্বি—(সম্বোধনে) ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ। ধন্ব (ধনু) + ইন্ = ধন্বী; কিন্তু সমাসে সু ধন্ব যাহার = সুধন্বা। পৌলস্তেয়—পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র রাবণ। বীরবীর্য্যে সর্ব্বভূক্‌সম দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি?—প্রচণ্ড পরাক্রমহেতু অগ্নির ন্যায় সংগ্রামে অপ্রতিরোধনীয়। রঘুকুল-জয়কেতু—রঘুবংশের বিজয়পতাকাস্বরূপ; অর্থাৎ,—যুদ্ধে সর্বত্র বিজয়ী। শূন্যচক্র—চক্রহীন। বলি—(সম্বোধনে) হে শক্তিমান বীর। মিতা < মিত্র—বন্ধু। কর্ব্বুরোত্তম—রক্ষঃশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি, এ দুরন্ত রণে ইত্যাদি—রামচন্দ্র প্রথমে লক্ষ্মণের ভ্রাতার প্রতি অসীম ভক্তি ও ভ্রাতার আজ্ঞানুবর্তিতা, ভ্রাতৃবধূর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং অসাধারণ বীরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার যে ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর বিপদ উপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করা উচিত নয়, পরন্তু ভ্রাতার কাতর আহ্বানে তাঁহার ন্যায় একান্ত বশংবদ ভ্রাতার অবিলম্বে গাত্রোত্থান করাই উচিত,—ইহা বলিয়া বিলাপ করিয়া, পরিশেষে বলিতেছেন যে, এতকাল কঠিন সংগ্রামে রত থাকায় লক্ষ্মণের দারুণ ক্লান্তিবোধ একান্তই স্বাভাবিক। সেই ক্লান্তিবশেই যদি লক্ষ্মণ রামের আহ্বানে সাড়া দিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলে তাঁহারা ভাগ্যহীনা সীতাকে লঙ্কায় ত্যাগ করিয়া আবার বনেই ফিরিয়া যাইবেন। কৃত্তিবাসও রামের বিলাপে বলিয়াছেন—

"রাজ্যধনে কার্য্য নাই, নাহি চাই সীতে।" কেমনে দেখাব এ মুখ—তুলনীয়, "কথং বক্ষ্যামহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্।" (লঙ্কাকাণ্ড— ১০২।১৫)

আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি ইত্যাদি—ধর্মপরায়ণ হইয়া সর্বদা দেবগণের পূজা করিয়াছি বলিয়া দেবগণ কি আমাকে আজ এই দারুণ দুঃখ দিলেন? রামায়ণে রাম বিলাপ করিয়াছেন—

"কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি।
যেন মে ধার্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ।।" ঐ—১৮)

শিশির আসারে—শিশিরধারাবর্ষণে। "ধারাসম্পাত আসার)—" (অমরকোষ)

সরস—(অকারান্ত উচ্চারণ) সরস কর। (নাম ধাতু) নিদাঘার্ত্ত—গ্রীষ্মতাপে বিশুষ্ক। প্রসূনে—পুষ্পবৎ সুন্দর লক্ষ্মণকে। হে রজনি, দয়াময়ি তুমি ইত্যাদি—সমাগত রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া রাম কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রীষ্মতাপদগ্ধ ফুলগুলির দুর্দশা দেখিয়া দয়াময়ী রাত্রি শীতল শিশির বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় সরস ও সতেজ করিয়া তুলেন। পুষ্পের ন্যায় সুন্দর লক্ষ্মণও যেন তাঁহার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেন।

প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে—এস্থলে উপমেয় লক্ষ্মণের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান প্রসূনকেই উপমেয়রূপে কল্পনায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে ইত্যাদি—গভীর অরণ্যে স্তব্ধ রজনীতে বায়ু প্রবাহিত হইলে বৃহৎ বৃক্ষসমূহের শাখাপ্রশাখায় যেরূপ বিষাদময় মর্মরধ্বনি উত্থিত হয়, রামপক্ষীয় বীরগণও বিষাদে সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। শৈলসুতা—হিমালয়কন্যা পার্বতী। উৎস। প্রদেশে—ক্রোড়দেশে। উৎস। প্রদেশে ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে ইত্যাদি—মহাদেব শায়িত ছিলেন এবং পার্বতী পাশে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায়, প্রভাতে পদ্মের উপর যেরূপ শিশির বিন্দু পতিত হয়, দেবীর চক্ষু হইতে ভক্তের প্রতি অনুকম্পাজনিত অশ্রুবিন্দু স্খলিত হইয়া সেইরূপে মহাদেবের ক্রোড়দেশে ও চরণদ্বয়ে অজস্রভাবে পতিত হইতেছিল।

সকরুণে—কাতরভাবে। ক্রিয়াবিশেষণ। করুণার সহিত বর্তমান = সকরুণ; বিশেষণ।

কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে ইত্যাদি—পার্বতী অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া শিবকে অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন যে, পরমভক্ত রামের স্বার্থ রক্ষা করিতে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, এজগতে অতঃপর কেহ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিতে চাহিবে না। রামের স্বার্থ ছিল রাবণের আক্রমণ হইতে লক্ষ্মণকে রক্ষা করা। রাবণের পুত্রশোকে দয়ার্দ্র হইয়া শিব রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করায়, ইন্দ্রাদি-দেবগণের প্রত্যক্ষ সাহায্যসত্ত্বেও লক্ষ্মণকে রক্ষা করা যায় নাই। ভক্তের নিকটে ইহাতে দেবীর মর্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ভক্তবৎসলারূপে প্রসিদ্ধ দেবীর নাম কলঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে। তপোভঙ্গ দোষে দোষী—দ্বিতীয় সর্গোক্ত মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। ইন্দ্র ও শচীর অনুরোধে এবং মর্ত্যে রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় দেবী কামদেবের সাহায্যে অসময়ে তপোমগ্ন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মেঘনাদ বধের উপায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

কুক্ষণে আইলা ইন্দ্র আমার নিকটে! ইত্যাদি—দেবী শিবের প্রতি অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্র কুক্ষণে মেঘনাদবধকার্যে দেবীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে কৈলাসে আসিয়াছিলেন, এবং রামও কুক্ষণে দেবীর কৃপাভিক্ষা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। কারণ ইন্দ্র ও রামের জন্যই তিনি শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছেন, এবং সেই বিরাগের ফলেই শিব দেবীর একান্ত ভক্ত রামের অমঙ্গল সাধন করিয়া এবং ভক্তের নিকটে দেবীর মর্যাদা লাঘব করিয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। হাসি উত্তরিলা শম্ভু—ভক্তের বিপদে দেবীকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত দেখিয়া।

এ অল্প বিষয়ে—মেঘনাদবধ এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লক্ষ্মণের শক্তিশেলাহত হইয়া পতন, পৃথিবীতে মানুষের বিচারে যত বড় ঘটনাই হউক না কেন, এই সকল পার্থিব সুখদুঃখের ব্যাপার দেবাদিদেবের নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়। কৃতান্তনগরে—যমালয়ে, যমপুরীতে। প্রেতদেশে—মৃত্যুর পর প্রেতাত্মাদিগের বাসস্থান যমপুরীতে।

পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে ইত্যাদি—রামায়ণে বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছিলেন সুষেণ নামক বানর। মধুসূদন বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামর্শ দশরথ দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া কৌশলে নরকবর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

এ নিরানন্দ—এই আনন্দহীনতা; এই বিষাদ। নিরানন্দ [নির্ (নাই) আনন্দ যাহার] বিশেষণ; এখানে বিশেষ্যরূপে অশুদ্ধ প্রয়োগ। ১০২ পংক্তিতে শব্দটি বিশেষণ রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা—প্রজাসাধারণ রাজার প্রতীক রাজদণ্ডকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, প্রেতাত্মারা শিবের ত্রিশূলকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে।

কৈলাস সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে—গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর অনুকরণে ভারতীয় দেবদেবীচরিত্র কল্পনা করিতে যাইয়া কবি লক্ষ্মীদেবী ও মায়াদেবীকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবী পার্বতী হইতে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন; কারণ সেখানে শিব ইন্দ্রকে মায়ার নিকটে প্রেরণ করিতে পার্বতীকেই বলিয়াছেন। পঞ্চম সর্গে কিন্তু মায়া ও দেবী অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছেন; কারণ সেখানে লক্ষ্মণ চণ্ডিকার পূজা করিবার পর দেবী মহামায়া আবির্ভূত হইয়া লক্ষ্মণকে বর দান করিয়া বলিয়াছেন যে, শিবের আদেশে, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মেঘনাদবধকার্যে লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবেন। এখানে আবার দেবী মায়াকে স্মরণ করিতেছেন;—অর্থাৎ ইঁহারা উভয়ে স্বতন্ত্র দেবী। কেবল স্বতন্ত্র দেবীই নহেন,—মায়া যে পার্বতীর অধস্তন দেবী তাহাও মায়া কর্তৃক দেবীকে প্রণামের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং পার্বতী ও মায়াদেবীর চরিত্র কল্পনায় সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, শিব ও শিবানীকে (পার্বতীকে) জুপিটার ও জুনোর ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দেবদম্পতীরূপে গ্রহণ করিয়া, মায়া, চণ্ডী, সিংহবাহিনী, দুর্গা প্রভৃতিকে তাঁহাদের অধস্তন দেবীরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কল্পনার পথেও কবি বাদ সাধিয়াছেন,— "কৈলাসসদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে" এই কথাটির উল্লেখ করিয়া। হত এ নশ্বর রণে—এই প্রাণঘাতী লঙ্কাসমরে। নশ্বর অর্থে নাশশীল; কিন্তু কবি সর্বত্রই শব্দটিকে 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ।

ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে ইত্যাদি—মায়ার আকাশপথে যাত্রাকালে আকাশে ছায়াপথে অবস্থিত ছায়া মায়ার অত্যুজ্জ্বল রূপের ছটায় দূরে অপসৃত হইল। হাসিল তারাবলী, মণিকুল সৌরকরে যথা—ছায়াপথে ছায়া সশরীরে অবস্থিতি করে বলিয়াই যেন ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জকে অস্পষ্ট দেখায়। এক্ষণে মায়াদেবীর প্রভাময় দেহের আলোকে ছায়া সরিয়া যাওয়ায়, সূর্যকিরণস্পর্শে উজ্জ্বল মণিসমূহের ন্যায় অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র ছায়াপথে ফুটিয়া উঠিল।

পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা ইত্যাদি—সমুদ্রের জলে জাহাজ চলিবার সময়ে যেমন নিজের গতিপথে একটি উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়, সেইরূপ প্রদীপ্ত শিবশূল হস্তে আকাশপথে গমনকালে মায়াদেবীও নিজের গমনপথের পশ্চাতে ত্রিশূলনির্গত একটি জ্যোতির রেখা অঙ্কিত করিয়া লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। বস্তুপ্রতিবস্তুভাববিশিষ্ট উপমা অলঙ্কার। খমুখে—আকাশপথে।

পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে—দেবীর আবির্ভাবহেতু।

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী—অপরের অদৃশ্যভাবে রামের কানে কানে কথা বলিয়া তাঁহার আবির্ভাব জ্ঞাপন করিলেন। সিন্ধুতীর্থজলে—সমুদ্রের পবিত্র জলে।

সুলক্ষণ লক্ষ্মণ—প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ। কৃত্তিবাসও "সুলক্ষণ লক্ষ্মণ" এবং বাল্মীকি "লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ" বলিয়াছেন। সুড়ঙ্গ < সুরঙ্গ < গ্রীকশব্দ syrinx—ভূনিম্নস্থ গর্ত।

অবগাহি পূত স্রোতে দেহ—পবিত্র জলে দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিয়া। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ নিমজ্জন করিয়া স্নান; সুতরাং পরবর্তী দেহ শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক। অধিকপদতা দোষ। মহাভাগ—সৌভাগ্যশালী; দয়াদি সদ্‌বৃত্তিবিশিষ্ট।

তুষি দেব-পিতৃলোক-আদি তর্পণে—তর্পণ নানাবিধ;—দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, দিব্যপিতৃতর্পণ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদি। রাম দেবতাগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জল প্রদান করিলেন।

উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি ইত্যাদি—এতক্ষণ রাম মায়াদেবীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিলেও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। স্নান-তর্পণাদির পর শুচিভাবে শিবিরে ফিরিয়া তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেন এবং মায়াদেবীর উজ্জ্বল দেহের প্রভায় শিবির আলোকিত দেখিলেন। ভীষণ তনু—অতি শক্তিশালী দেহ। সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—কি ভয় তাহারে দেব সুপ্রসন্ন যারে—এস্থলে দেবতার প্রসাদরূপ কারণ দ্বারা রামের সাহসের সহিত সুড়ঙ্গপথে প্রবেশরূপ কার্য সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। পিতা আঙ্কাইসিসের প্রেতাত্মার সহিত সাক্ষাতের জন্য ভবিষ্যভাষিণী Sibyl-এর সহিত ঈনীয়সের সুড়ঙ্গ পথে নরকে যাত্রা ঈনীড্ কাব্যে ৬ষ্ঠ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। দান্তের নরক-যাত্রাকালে তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিলেন ভার্জিলের প্রেতাত্মা।

তিমির কাননপথে পথী চলে যথা ইত্যাদি—তুলনীয় :

"So travellers in a forest move
With but the uncertain moon above,
Beneath her niggard light." (Aeneid—Book VI, 435-37)

সহস্র শত সাগর উথলি রোষে কল্লোলিছে যেন—রাম যে কল্লোল শব্দ শুনিলেন, তাহা অসংখ্য সমুদ্র তরঙ্গে স্ফীত হইয়া এক সঙ্গে গর্জন করিতে থাকিলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হওয়া সম্ভবপর, সেইরূপ ভীষণ। এই সর্গে নরকবর্ণনায়, বৈতরণী, রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি কয়েকটি নাম ব্যতীত অধিকাংশ চিত্রই প্রধানতঃ ভার্জিলের ঈনীড্ কাব্যের ৬ষ্ঠ এবং স্থানে স্থানে দান্তের কাব্যের নরকখণ্ড হইতে গৃহীত। চিরনিশাবৃত—চির অন্ধকারময়।

রহি রহি উথলিছে বেগে তরঙ্গ, ইত্যাদি—প্রখর তাপে পাত্রস্থ দুগ্ধ যেরূপ টগবগ করিয়া ফুটিয়া উথলাইয়া উঠে, সেইরূপ বৈতরণীর স্রোতও থাকিয়া থাকিয়া আভ্যন্তরীণ প্রবল তাপে ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

নাহি শোভে দিনমণি ইত্যাদি—প্রেতপুরীর আকাশে সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কোন আলোক নাই; উহা ঘোর অন্ধকারময়। তুলনীয়, "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।। (মুণ্ডকোপনিষদ।২)

বাতগর্ভ— বায়ু দ্বারা পূর্ণ। পিনাক— শিবধনুঃ। ইষু—শর, তীর।

হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে—পৃথিবীতে বিগতায়ুঃ অসংখ্য প্রাণী, পাপী অথবা পুণ্যাত্মা-ভেদে বৈতরণীর উপরিস্থ সর্বদা পরিবর্তমান রূপধারী সেতুর দিকে বিলাপসহকারে অথবা উল্লাসের সহিত অগ্রসর হইতেছে। কামরূপী—ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণে সমর্থ।

যায় সেতুপথে—কারণ, অর্জিত পুণ্যের ফলে সেতু তাহাদের নিকট সুদর্শন ও সুখস্পর্শ।

সাঁতারিয়া নদী পার হয়—কারণ, পাপহেতু সেতু তাহাদের নিকট জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ভীষণ তপ্ত বলিয়া তাহারা সেতুসাহায্যে পার হইতে পারে না।

যমদূত পীড়য়ে পুলিনে—বৈতরণী-তীরে যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দেয়।

সুবর্ণ-দেউটী সম—স্বর্ণময় প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল। দেউটা < দীবঅট্টিআ < দীপবর্তিকা।

কুহকিনী—কুহক বা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে সমর্থা মায়াদেবী। দণ্ডপাণি—দণ্ডধারী। দণ্ড পাণিতে যাঁহার;—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস। আত্মময়—প্রাণবিশিষ্ট দেহিরূপে; জীবিতাবস্থায়।

আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ ইত্যাদি—মায়াদেবী ও রামচন্দ্রের যমালয়ে প্রবেশে বাধা দিতে উদ্যত যমদূত শিবের ত্রিশূলদর্শনে মায়াদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল যে, তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি তাহার নাই। ঊষার আগমনে আকাশ যেরূপ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়, দেবীর পাদস্পর্শের আশায় সেতু সেইরূপ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি ইত্যাদি—যমপুরীর সুদৃঢ় লৌহময় দ্বারের সম্মুখে চতুর্দিকে অসংখ্য অগ্নিচক্র ঘূর্ণ্যমান থাকিয়া প্রবেশ পথকে অধিকতর দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে।

হে প্রবেশি—হে প্রবেশকামী ব্যক্তি। প্রবেশ + ইন = প্রবেশী; অপ্রচলিত শব্দ।

ত্যাজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে—যমালয়ে মানুষের কোন বাসনা থাকে না। এই পংক্তিটি দান্তের "স্বর্গীয় মিলন" কাব্যের 'নরক' নামক অংশের ৩য় সর্গের "All hope abandon, ye who enter here." পংক্তির অনুবাদমাত্র। এই পথ দিয়া যায় পাপী ইত্যাদি—তুলনীয়,

> "Through me you pass into the city of woe :
> Through me you pass into eternal pain" (Hell—III. 1-2)

কভু শীতে কাঁপে ইত্যাদি—জ্বররোগের সকল লক্ষণ—কম্প, দাহ, মূর্ছা ইত্যাদি প্রমূর্ত জ্বররোগের মধ্যে রহিয়াছে। বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি—সমুদ্রে অবস্থিত বাড়বাগ্নি দ্বারা সমুদ্রজল যেরূপ উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ। উদরপরতা—ঔদরিকতা বা অতিভোজনস্পৃহারূপ ব্যাধি।

অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগরি দুর্মতি ইত্যাদি—অতিভোজনজনিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া ঔদরিকতাহেতু আবার দুই হাতে তাহা তুলিয়া খাইতেছে;—ভোজনের লালসায় ঘৃণাবোধ হারাইয়াছে।

প্রমত্তত্ব—সুরাপানজনিত মত্ততা বা মাতলামি রোগ।

সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা—মত্ততারূপ ব্যাধি নিজে যেরূপ বাহ্যানুভূতিহীন ও জ্ঞানশূন্য, সেইরূপ যাহাকে আক্রমণ করে তাহার জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে হরণ করে।

দহে হিয়া অহরহঃ কামানল তাপে—কামুকতা রোগ সম্পূর্ণ শক্তিহীন দেহ লইয়াও সর্বদা কামচর্চায় মগ্ন। কামাগ্নিতে তাহার মন সর্বদাই দগ্ধ হইতেছে; কিছুতেই কামবাসনা চরিতার্থ হইতেছে না। তার পাশে বসি যক্ষ্মা—কামুকতার ফলে উৎপন্ন ক্ষয়রোগ।

হাঁপায় হাঁপানি মহাপীড়া—হাঁপানি বা শ্বাসকৃচ্ছ্রতারূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হাঁপাইতেছে।

বিসূচিকা, গতজ্যোতি আঁখি ইত্যাদি—নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ, মুখ ও মলদ্বারপথে শ্বেত জলবৎ স্রাব ও বমন দ্বারা দেহের রক্তকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে।

শুভ্রজল-রয়-রূপে—শ্বেত জলস্রোতের আকারে। বিসূচিকারোগে শ্বেত জলবৎ ভেদ ও বমন হয়। অঙ্গগ্রহ—রোগজনিত দেহের আক্ষেপ বা খাঁচুনি। উন্মত্ততা—উন্মাদ রোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ। উগ্র কভু, [illegible]হুতি পাইলে ইত্যাদি—বায়ুজনিত উন্মাদ রোগ কখনও বা সদ্য আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রবল, কখনও বা একান্ত নিস্তেজ; কখনও বা সুবেশধারী, আবার কখনও বা রণরঙ্গিণী কালীমূর্তির ন্যায় সম্পূর্ণ নগ্ন; কখনও হাসিতেছে, আবার পরমুহূর্তেই কাঁদিতেছি; কখনও বা নানা উপায়ে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছে, আবার কখনও বা লালসাময়ী নারীর মূর্তি ধারণ করিয়া সম্ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে; কখনও বা অন্নের সহিত মল-মূত্রাদি মাখিয়া নির্বিচারে ভোজন

করিতেছে; কখনও বা রোগের প্রাবল্যহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, আবার কখনও বা নিস্তর। নদীস্রোতের মত ধীর শান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। উল্লিখিত বিপরীত লক্ষণসমূহ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে সুলভ।

মানুষের প্রাণ বিনাশক বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ আরোপ করিয়া এই সকল রোগকে কবি প্রমূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন এবং অতি উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বীভৎস রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

রণে—প্রাণবিনাশক মূর্তিমান যুদ্ধকে। সূতবেশে—সারথির বেশে।

রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে—কারণ ক্রোধ ও বিদ্বেষ হইতেই যুদ্ধের উৎপত্তি।

নরমুণ্ডমালা গলে, ইত্যাদি—প্রমূর্ত ক্রোধের গলায় নিহত নরগণের মুণ্ডমালা এবং তাহার সম্মুখে নিহত অগণিত মনুষ্যদেহ পতিত। লোলজিহ্—মুখবিবর হইতে জিহ্বা নির্গত হইয়াছে এইরূপে। উন্মীলিত আঁখি—চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত।

এই যে দেখিছ বিকট শমন দূত যত ইত্যাদি—মায়াদেবী রামচন্দ্রকে জ্বররোগ ঔদরিকতা, প্রমত্ততা, কামুকতা, যক্ষ্মা, হাঁপানি, বিসূচিকা, উন্মাদরোগ, রণদেবতা ও তাহার ক্রোধরিপুরূপ সারথি, হত্যাপ্রবৃত্তি এবং আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যমদূতগণের প্রমূর্ত রূপ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, ইহারা মানুষকে যমালয়ে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নানা রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা পৃথিবীতে বিচরণ করে।

কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে—মৃত্যুর পর জীবাত্মারা কিভাবে জীবাত্মার পারলৌকিক অবস্থানস্থল যমপুরীতে বাস করে। চৌরাশি < চতুরশীতি।

চৌরাশি নরককুণ্ড—কুম্ভীপাক, রৌরব, তপন, অবীচি, কালসূত্র, সংঘাত, অন্ধকূপ ইত্যাদি ৮৪, (মতান্তরে ৮৬) নরক। পৃথিবীতে মহাপাতক করিয়া প্রেতাত্মারা এই সকল নরকে পাপের শাস্তি ভোগ করে। পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী—বৈতরণী পার হইয়া এতক্ষণ রামচন্দ্র নরকের দক্ষিণ দ্বারদেশে নানা ব্যাধিরূপ যমদূতগণকে দেখিতেছিলেন; এইবার মায়ার সহিত তিনি যমপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

দাবদগ্ধে বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসন্ত ইত্যাদি—পুণ্যাত্মা ও সুন্দরদেহ রামচন্দ্র নিরানন্দ ভীষণ প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিলে মনে হইল, যেন দাবানলে দগ্ধ বনের মধ্যে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল; অথবা যেন মৃতদেহের উপর অমৃত বর্ষিত হইল। মালোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

জলরূপে বহিছে কল্লোলে কালাগ্নি—হ্রদের মধ্যে জলের পরিবর্তে তরলীকৃত অগ্নিস্রোত ভীষণ শব্দে প্রবাহিত। আত্মবর্গ—আত্মজনসমূহ, আত্মীয়গণ।

শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশ বাণী; অদৃশ্যকণ্ঠে উচ্চারিত দৈববাণী। সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে—বিশ্বে সকলেই জানে যে, বিধাতার সৃষ্টির বিধানই হইতেছে সুবিধি বা সুনিয়ম,—অর্থাৎ পুণ্যকর্ম এবং পবিত্রভাব। কৃমি (ক্রিমি)—কীট। বজ্রনখা < বজ্রনখ—তীক্ষ্ণনখরবিশিষ্ট।

ছায়াদেহে—প্রেতাত্মার রক্তমাংসে গঠিত স্থূলদেহ থাকে না,—থাকে ছায়াময় সূক্ষ্ম দেহ। এই সূক্ষ্ম ছায়াময় দেহ লইয়াই তাহারা স্থূলদেহে ভোগ্য নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে।

বিচারী যদ্যপি অবিচারে রত—বিচারকের পবিত্র আসনে বসিয়া যদি কেহ অবিচার করে।

না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে—তুলনীয়, "অবিরাম কাটে কীট, পাবক না নিবে।" (তিলোত্তমাসম্ভব—৩।৪২৩) অদূরে ক্রন্দনধ্বনি—কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষিপ্ত জীবাত্মাদিগের যন্ত্রণাজনিত আর্তনাদ। অন্ধতম কূপে কাঁদিছে আত্মহা পাপী—আত্মহত্যাকারী পাপিগণ অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ক্ষেমঙ্করি (সম্বোধনে)—হে মঙ্গলময়ি, কল্যাণদায়িনি। ক্ষেম (মঙ্গল) + কৃ + খ + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

হায়, মাতঃ, এ ভব মণ্ডলে ইত্যাদি—রামচন্দ্র নরকে পাপিগণের অসহনীয় শাস্তিভোগদর্শনে

ব্যথিতচিত্তে মায়াকে বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পাপের প্রলোভনে মানুষকে পড়িতেই হইবে; কারণ মানুষ দুর্বল ও অসহায়; পাপের প্রলোভন সর্বদা এড়াইয়া চলিবার শক্তি তাহার নাই। আবার পাপ করিলেই যখন পরলোকে এইরূপ নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা, তখন ইচ্ছা করিয়া কে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিবে?

নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভাবে ইত্যাদি—মানবদেহ ধারণ করিলেই পাপ করিতে হইবে, এবং পাপ করিলেই নরকভোগ করিতে হইবে, সুতরাং স্বেচ্ছায় কেহ মানবজন্ম প্রার্থনা করিবে না;—রামচন্দ্রের এই কথার উত্তরে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন বিষ নাই যাহার প্রতিষেধক ঔষধও নাই। তবে সেই ঔষধ যদি কেহ হেলায় গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। অর্থাৎ জগতে উৎকট পাপের সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর পুণ্যকর্মও আছে। যে জগতে সংযমের সাহায্যে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, দেবগণ তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন; ধর্মের অভেদ্য বর্মে সে পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে অপ্রস্তুত বিষয় বিষ ও তাহার প্রতিষেধক ঔষধের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় পাপ ও তাহার সহিত সংগ্রাম ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। রণে—যুদ্ধ করে; (নামধাতু)। কবচ—বর্ম।

কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—রৌরব নরককুণ্ড দর্শনের পর রামচন্দ্র মায়াদেবীর সহিত কিছু দূরে অবস্থিত এক শব্দশূন্য, বায়ুপ্রবাহশূন্য, আনন্দলেশশূন্য অসীম বনে প্রবেশ করিলেন। এই "বিলাপ-বনের" কল্পনা ভার্জিলের ঈনীড্ কাব্যে উল্লিখিত 'Mourning Fields'-এর অনুকরণে করা হইয়াছে। তুলনীয়—

"Next come, wide stretching here and there,
The Mourning Fields; such name they bear." (Aeneid—VI. 715-17)

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি ইত্যাদি—এই 'বিলাপ-বন' একেবারে আলোকশূন্য নহে। কিন্তু গাঢ় পত্রপুঞ্জের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে যে ম্লান নিষ্প্রভ আলোক আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে হাসির মতই অপ্রফুল্লতাজনক।

যে দিন হরিল পাপপ্রাণ যমদূত ইত্যাদি—পৃথিবীতে মৃত্যুদিবস হইতে আজ পর্যন্ত মানব-কণ্ঠস্বর শ্রবণের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

বরাঙ্গ—চারুদেহবিশিষ্ট; রথীর বিশেষণ। বর অঙ্গ যাহার,—বহুব্রীহি সমাস। পাটেশ্বরী—প্রধানা মহিষী, পাটরানী। পাট < পট্ট—সিংহাসন। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব। অভি+গমনার্থক অট ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। চমকি—অত্যন্ত বিস্ময়ে চমকিত হইয়া। মারীচ রক্ষে—স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাহরণে রাবণের সহায়ক মারীচ নামক রাক্ষসকে। মারীচ তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীর পুত্র ছিল। পৌলস্ত্য (পৌলস্তেয়)—পুলস্ত্যঋষির পৌত্র রাবণ। পৌলস্তেয় শব্দ পূর্বে প্রযুক্ত হইয়াছে। বঞ্চিনু তোমারে—তোমাকে প্রতারণা করিয়াছিলাম।

দূষণ সহ খর—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত রাবণের সেনাপতিদ্বয়। সূর্পণখার লাঞ্ছনার পর ইহারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার হস্তে নিহত হয়। রামায়ণে খর রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং দূষণ মাতৃস্বসার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি সমরে ইত্যাদি—খর ও দূষণ জীবিতাবস্থায় যুদ্ধকার্যে খর অর্থাৎ তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় শত্রুবিনাশক ছিল। খর ও তীক্ষ্ণ সমার্থক শব্দ; সুতরাং 'খর যথা তীক্ষ্ণতর' নিরর্থক প্রয়োগ।

পালাইল রড়ে ইত্যাদি—ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় প্রেতাত্মারা দ্রুতবেগে বা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। ধাবন বাচক 'রড়' প্রাদেশিক শব্দ এবং কবি কর্তৃক একাধিক স্থলে প্রযুক্ত। তুলনীয়—

"Dense as the leaves that from the treen

Float down when autumn first is keen." (Aeneid—VI. 449-500)

কতক্ষণে—'বিলাপ-বন' হইতে সম্মুখে কিছুক্ষণ অগ্রসর হইবার পরে। চিকণি—চিক্কণ অর্থাৎ মনোরম করিয়া; নানা কারুকার্য করিয়া। হীরামুক্তাফলে—হীরা ও মুক্তার দানা দিয়া রচিত রত্নহারে। কুড়িছে (কুরিছে)—নখ দ্বারা উৎপাটন করিতেছে। পাপচক্ষুঃ—সম্বোধন পদ।

কুন্তল প্রদেশে স্বনিছে ভীষণ সর্প—ভীষণাকৃতি যমদূতীগণের মস্তকে কেশরাশির পরিবর্তে ভীষণ সর্পসমূহ শব্দিত রহিয়াছে। চিত্রটি ঈনীড্ কাব্য হইতে গৃহীত।

বসন্তে যেমতি বনস্থলী—বসন্তকালে বনভূমি যেরূপ বিচিত্র ভূষায় সজ্জিত হয়, সেইরূপ এই সকল লালসাময়ী রমণীও পুরুষের মন মুগ্ধ করিবার জন্য নানারূপ বেশভূষায় সর্বদা দেহ সজ্জিত করিত। "আবার কহিলা মায়া,"—এই স্থান হইতে ৪৯৩ পংক্তি "এ পাপি-দলের এই পুরস্কার শেষে!" পর্যন্ত ৬৩ পংক্তি দ্বিতীয় সংস্করণের পরে সংযোজিত হইয়াছিল।

আর এক বামাদল সম্মোহন-রূপে—মনোমুগ্ধকর রূপবিশিষ্ট আর এক দল রমণী। সম্মোহনরূপে শব্দটিকে সমাসবদ্ধ করিয়া বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মোহন করিবার রূপ আছে যাহাদের এরূপ রমণীগণকে।

পরিমলময় ফুলে—সুগন্ধি কুসুমে। পরিমল বাংলায় সৌরভ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি বস্তুর পেষণ হইতে উৎপন্ন সুগন্ধ।

কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ নয়নে—তাহাদের হরিণের ন্যায় সুন্দর আয়ত চক্ষুতে সম্ভোগ লালসার তীব্র কটাক্ষ।

দেবরাজ কম্বুসম মণ্ডিত রতনে গ্রীবাদেশ—ইন্দ্রের করধৃত রত্নখচিত শঙ্খের মত রত্নহারশোভিত সুগঠিত গ্রীবাদেশ বা কণ্ঠদেশ। শঙ্খের আবর্তন বা বলনির সহিত সুন্দর গ্রীবার বলনির তুলনা কবিপ্রসিদ্ধি। তুলনীয়—

"দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে।।"

এবং "কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা।।" (বিদ্যাপতি)

কাঁচলি < কঞ্চুলিকা; স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরণ বস্ত্র; bodice.

সূক্ষ্ম স্বর্ণসূতার কাঁচলি আচ্ছাদন ছলে ইত্যাদি—স্বর্ণময় অতি সূক্ষ্ম কাঁচুলি দ্বারা স্তনযুগল আবৃত হওয়ায়, সেই সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া সুগঠিত স্তনদ্বয়ের উন্নত রেখাবলী দৃষ্টি অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়া কামুকের মনে সম্ভোগবাসনার উদ্রেক করে।

নীল পট্টবাসে (সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু ইত্যাদি—মানস সরোবরের নীলাভ স্বচ্ছজলে জলক্রীড়ারত সুন্দরী অপ্সরাদের নগ্ন দেহের কান্তি যেমন জলের মধ্যেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেইরূপ প্রেতপুরীর সুন্দরীগণের পরিধান অতি সূক্ষ্ম নীল রেশমি বস্ত্রের আবরণ উপেক্ষা করিয়াই যেন তাহাদের পরিপুষ্ট উরুর ঈষদ্রক্তিম সুগৌরবর্ণের আভা বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে।

রম্ভা-কান্তি—রামরম্ভা নামক সুডৌল কদলী বৃক্ষের আরক্ত আভা; সুগঠিত ও ঈষদ্রক্তিম গৌরবর্ণ উরুদ্বয়ের সহিত তুলিত। উলঙ্গ বরাঙ্গ—নগ্ন সুন্দর দেহ। উলঙ্গ < ওলঙ্গ < অবনগ্ন।

আনন্দে স্বর। সবে মন্দে মিলাইছে ইত্যাদি—বীণা, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি প্রেতসুন্দরীগণের নূপুর মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুর শিঞ্জনের সহিত চমৎকারভাবে মিশিয়া গিয়াছে। রূপস < রূপশ—রূপবান। অনাভিধানিক শব্দ; বাংলা রূপসী শব্দের পুংলিঙ্গে কল্পিত রূপ।

কৃত্তিকা-বল্লভ—কৃত্তিকাগণের প্রিয়পুত্রস্থানীয়। বল্লভ শব্দের অর্থ স্বামী, প্রণয়ী; এস্থলে পুত্রার্থে ব্যবহৃত। নিহতার্থতা দোষ। কবি অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন—

"কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী" (২।৪৯৪)

এবং "যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ মনে নাহি লাগে।" (তিলোত্তমাসম্ভব— ৩।২৬৫)

মনমথ < মন্মথ—রতির চির কামনার ধন কামদেব। কপটে—প্রেমহীন ছলনার সহিত।

শিঞ্জিনীর বোলে—অলঙ্কার-নিষ্পন্ন মধুর শব্দে। তপ্তশ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে ইত্যাদি—কামবিহ্বলা নারীগণের উত্তপ্ত ঘন নিশ্বাসবায়ু তাহাদের বক্ষঃস্থিত ফুলের মালার ফুলগুলির রেণু উড়াইয়া যে পুষ্পরেণুর ঝটিকা বা আঁধি সৃষ্টি করিল, তাহাতে পুরুষগণের বুদ্ধিরূপ সূর্য একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া গেল;—অর্থাৎ কামবশে তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইল। পুরুষদলে—পুরুষগণের মধ্যে। নাগর নাগরী—রসিক প্রণয়ী ও রসিকা প্রণয়িনী। নাগর শব্দের অর্থ আদিতে ছিল নগরবাসী; নগরবাসিগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর বিলাসী ও প্রেমচর্চাশীল হইত বলিয়া, পরবর্তিকালে নাগর শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়া প্রেমিক বা প্রণয়ী অর্থ আসিয়াছে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত। মারি হস্ত-পদাঘাতে—হাত ও পা দিয়া প্রহার করিয়া।

যুঝিল যেমতি কীচকের সহ ভীম ইত্যাদি—বিরাটের গৃহে সংবৎসরকাল পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজের শ্যালক কীচক দ্রৌপদীর অপমান করিলে, ভীম দ্রৌপদীর ন্যায় নারীবেশ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে নির্জনে কীচকের সম্মুখীন হন এবং ভীষণ যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। কীচকের সহিত নারীবেশধারী ভীমের ভীষণ যুদ্ধের ন্যায় প্রেতপুরীর এই সকল পুরুষ ও নারীরাও পরস্পরের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, ইত্যাদি—কামাসক্ত হইয়া ধর্মাধর্মজ্ঞান ও লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া।

ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে ইত্যাদি—ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়া নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি লালসাবশে আকৃষ্ট হইলে, সেই লালসাময় আকর্ষণের এইরূপ অশুভ পরিণামই ঘটিয়া থাকে। মরুভূমিতে মরীচিকা উত্তরোত্তর কেবল তৃষ্ণার বৃদ্ধিই করে; সেই তৃষ্ণা নিবারণ করিবার সাধ্য তাহার নাই। মাকাল ফলও তাহার সুপক্ব রক্তবর্ণের দ্বারা অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করে। লোকে ভাবে যে, এমন সুন্দর ফলটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুস্বাদু; কিন্তু খাইতে গেলেই তিক্ত স্বাদে বমনোদ্রেক হয়। এই উভয়ক্ষেত্রেই যেমন মানুষের তৃষ্ণার ও ক্ষুধার উপশম না হইয়া তাহা বাড়িয়াই চলে, কামলালসাপূর্ণ অবৈধ প্রেমের ফলেও সেইরূপ মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না;—কেবল মানসিক অশান্তিই বৃদ্ধি পায়।

এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী ইত্যাদি—হে সৌভাগ্যশালী রামচন্দ্র, নরকে কামুক-কামুকীর পরস্পরের হস্তে যে নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিলে, সেই নিগ্রহ যে উহারা মৃত্যুর পরে নরকে আসিয়াই ভোগ করে তাহা নয়; অনেকেই নরকে আসিবার পূর্বে পৃথিবীতে থাকিয়াই অবৈধ প্রণয়ের বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকে। রাজ-ঋষি—রাজর্ষি দশরথ; পিতার উদ্দেশে রামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ। পরমান্ন—পায়সান্ন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—চর্ব্ব্য—চর্বণ করিয়া খাইবার বস্তু, অন্ন, মৎস্য, মাংসাদি; চোষ্য—চুষিয়া খাইবার বস্তু, মোদকাদি; লেহ্য—লেহন করিয়া খাইবার বস্তু, দধি, ক্ষীরাদি; পেয়—পান করিবার বস্তু, সুগন্ধি মধুর পানীয়।

কামধুকে যথা কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী—কামধুক্ (কামদুহ্) শব্দের অর্থ কামধেনু এবং কামলতা শব্দের অর্থ কল্পলতা বা কল্পতরু। এস্থলে কামধুক শব্দটি কামধেনু অর্থে নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ সেই অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি কামধুক শব্দটি

সম্ভবতঃ কামী বা কামনাকারী অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। নিহতার্থতা দোষ। সম্ভাব্য অর্থ—হে মহাবীর রামচন্দ্র, কামীর নিকট কল্পতরু যেরূপ সদ্য ফলদায়ক;—তাহার নিকট লোকে যে কামনা ব্যক্ত করে, তৎক্ষণাৎ সে যেমন তাহা পূর্ণ করে,—সেইরূপ যমপুরীর পূর্বদ্বারে সতী সাধ্বীগণের মনোরম আবাসস্থলে প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রার্থনার পূরণ হয়।

নাহি কাজ যাই তথা—সতী সাধ্বীগণ যে স্থানে নিশ্চিন্তে সুখে বাস করিতেছেন, সেখানে যাইয়া তাঁহাদের বিশ্রামের ও প্রশান্তির বাধা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। বন্ধ্যা—ঊষর, অনুর্বর। প্রভু—রামচন্দ্র। রামায়ণীয় প্রভাবের নিদর্শন। তুলনীয়—"চেতন পাইয়া নাথ কহিল কাতরে" (১৮)।

তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন—উত্তপ্ত ঝটিকা সর্বসময়ে প্রবাহিত হইয়া মরুভূমির বক্ষে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অসংখ্য বালুকার ঢেউ সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে সবেগে ঠেলিয়া লইতেছে।

মহোরগবৃন্দ—প্রকাণ্ডদেহ সর্পগণ। অশেষ শরীরী শেষ যথা—অসীম দেহবিশিষ্ট শেষ নাগ বা বাসুকি নাগের মত। হলাহল—তীব্র দাহিকাশক্তিসম্পন্ন কালকূট বা বিষ।

হায়রে, কে কবে লভয়ে বিরাম ক্ষণ ইত্যাদি—এই ভীষণদর্শন, অনুর্বর, ঝটিকা-তাড়িত, আগ্নেয়-গিরিসমূহের অগ্ন্যুৎপাত-বিক্ষুব্ধ, ভয়াবহ-হ্রদপূর্ণ, প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে কোন বস্তুই স্থির নহে; সকলই অস্থির ও চঞ্চল।

দিয়া পাড়ি—পাড়ি দিলে। অসমকর্তৃপদ (তট ও কাণ্ডারী) বলিয়া 'পাড়ি দিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সাহায্যে পরবর্তী বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করা যায় না। জলারণ্যে—অরণ্যবৎ নির্জন সমুদ্রে। জনরব—মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। (অপ্রচলিত)। কনকপ্রসূনপূর্ণ—স্বর্ণপুষ্পময়। নব কুবলয়-ধাম—সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলসমূহের আশ্রয়স্থল। সঞ্জীবনীপুরী—যমপুরী। তুলনীয়—

"আমার সেবক ভ্রমে যদি লয়ে থাকে যমে
বড়াই করিব তার দূর।
দিয়া বহুতর ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ
পোড়াইব সঞ্জীবনীপুর।।" (কবিকঙ্কণ—ধনপতির উপাখ্যান)

এবং "ত্যজি সঞ্জীবনীপুর যাও নাথ কতদূর
বিষয় করিয়া সমাপনে।।" (ঐ)

এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি ইত্যাদি—যমপুরীর অন্তর্গত হইলেও, সম্মুখসমরে নিহত বীরগণের আবাসস্থল এই পবিত্র উত্তর দ্বারে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ প্রতিদিন এই স্থানের অধিবাসিগণের উপর বিধাতার সুপ্রসন্ন হাস্যস্বরূপ উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছে। উজ্জ্বলে—সমুজ্জ্বলভাবে। 'দীপে' ক্রিয়ার বিশেষণ। রঙ্গভূমিরূপে—উৎসবভূমির বা কৌতুকাদি প্রদর্শন করিবার স্থানের ন্যায় সুসজ্জিত। বীরগণের এই সুখময় আবাসস্থানের বর্ণনা ঈনীড্ কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের ১০৫৬-১০৯২ পংক্তিতে দ্রষ্টব্য।

চর্ম্মী—চর্ম বা ঢাল-খেলোয়াড়, ঢালী। শ্রোতাকুলে < শ্রোতৃকুলে—শ্রোতাদিগকে।

বীরকুল সংকীর্ত্তনে—বীরগণের যশোগাথা গান করিয়া।

সত্যযুগ-রণে সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত—শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুর, ত্রিপুরাসুর, বৃত্র, সুন্দ, উপসুন্দ প্রভৃতি দানবগণ সত্যযুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রথম তিনজন চণ্ডিকার হস্তে, ত্রিপুর মহাদেবের হস্তে, বৃত্র ইন্দ্রের হস্তে, এবং সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমা-লাভহেতু পরস্পর পরস্পরের হস্তে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তুলনীয়—

"Here dwell the chiefs from Teucer sprung.
Brave heroes, born when earth was young." (Aeneid—VI. 1074-75)

কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট— গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্বর্ণময় হেমকূট পর্বতের ন্যায় বিশাল ও উজ্জ্বল দেহধারী। তুলনীয়,—"হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে" (৭ম সর্গ। ৩৩০)।

দেবতেজোদ্ভবা—দেবতাগণের দেহনির্গত তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া চণ্ডিকামূর্তি ধারণ করে। দেবতেজঃ + উদ্ভবা,—সন্ধি সমর্থনীয় নহে।

তুরঙ্গমদমী—গতিবেগে অশ্বকে পরাভূতকারী; মহিষাসুরের বিশেষণ। ত্রিপুরারি অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে—ত্রিপুরের-অরি শিব, তাঁহার অরি বীর যোদ্ধা ত্রিপুর নামক অসুর। বাহুল্যোক্তির Periphrasis-এর দৃষ্টান্ত।

আনন্দে ভাসিছে ভ্রাতৃপ্রেমানন্দে পুনঃ—সুন্দ-উপসুন্দের সৌভ্রাত্র ছিল অসীম ও অবর্ণনীয়। সেইজন্য তাহারা অমরত্ব লাভের বিকল্পরূপে বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরের হস্তে ছাড়া অন্য কাহারও হস্তে তাহারা নিহত হইবে না। পরে তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও অসূয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, এবং তিলোত্তমাকে কে লাভ করিবে, ইহা লইয়া কলহ করিয়া উভয়ে উভয়ের হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পর প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে বীরগণের মধ্যে তাহারা পূর্বের ন্যায়ই ভ্রাতৃপ্রেমপূর্ণ হৃদয়ে একত্রে অবস্থান করিতেছে।

নরান্তক রণে (রণে নরান্তক)—যুদ্ধে অসংখ্য নরঘাতী নরান্তক নামক রাক্ষস।

অন্ত্যেষ্টি—অন্ত্য (অন্তিম, শেষ) + ইষ্টি (যজ্ঞ)—শব সৎকাররূপ মানুষের জীবনের চরম কৃত্য।

অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, নাহি গতি এ নগরে—মৃত্যুর পর দেহের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত কেহ যমপুরীতে প্রবেশের অধিকার পায় না। তুলনীয়—

For never man may travel o'er
That dark and dreadful flood, before
His bones are in the urn.—" (Aeneid—VI. 529-31)

সুবীর—বীরশ্রেষ্ঠ বালি। ঝল ঝলে—ঔজ্জ্বল্যে ঝল মল করিতেছে।

অন্যায় সমরে সংহারিলে মোরে তুমি—সুগ্রীব ও বালি যখন বাহুযুদ্ধে রত, সেই অবস্থায় সুগ্রীবের সাহায্যার্থ রাম দূর হইতে গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া বালিকে বধ করিয়াছেন বলিয়া বালির এই অনুযোগপূর্ণ সম্ভাষণ। বিমল রয়ে—নির্মল প্রবাহে।

সলজ্জায়—বালিকে সুগ্রীবের অনুরোধে বিনা কারণে অন্তরালে থাকিয়া বধ করিয়াছিলেন বলিয়া সলজ্জভাবে। অশুদ্ধ প্রয়োগ। পিরীতি < প্রীতি—আনন্দ, হর্ষ।

তোমা সকলে—তোমরা সকলে। কর্তৃকারকে 'তোমা সকলে' অযথা প্রয়োগ। তুলনীয়—

"বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল নাথ, আমাদের সাথে। (৫।২৯৪)

"খনির গর্ভে", উত্তরিলা বালি ... আভাহীন কেবা, কহ রঘুমণি?—এস্থলে খনিগর্ভস্থিত মণিসমূহ ঔজ্জ্বল্যে সকলে সমান না হইলেও কোনটিই অনুজ্জ্বল নয়,—এই অপ্রস্তাবিত বিষয়ের সাহায্যে, প্রেতপুরে আগত বীর যোদ্ধগণ সকলে সমসুখী না হইলেও,—কেহই অসুখী নহেন,—এই প্রস্তাবিত বিষয়টি জ্ঞাপিত হওয়ায় অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে।

পীযূষ সলিলা—অমৃতবৎ মধুর-সলিলবিশিষ্টা। দ্বিরদ-রদ-নির্মিত—হস্তিদন্তে প্রস্তুত।

পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি—পদ্মদলের ন্যায় আরক্তবর্ণবিশিষ্ট। মধুসূদন অন্যত্রও দল বা পাপড়ি অর্থে পর্ণ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়—

"নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন"(১।৩৩১)
"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?" (৪।৮১)

এবং "পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন" (৭।২)

চন্দ্রাতপে ভেদি সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে---উৎসবগৃহে গোলাপি চাঁদোয়া ভেদ করিয়া পতিত ঈষদ্‌রক্তিম সূর্যরশ্মির ন্যায়।

বাসন্ত--বসন্তকালীন। বিশেষণ। শুভে- কল্যাণীয়। তাত—সম্মান বা আদরবাচক সম্বোধন। হতজীব—মৃত; হত হইয়াছে জীব (জীবন) যাহার; বহুব্রীহি। মানা < আরবী শব্দ মন্‌অ--নিষেধ। রিপুদমি—(সম্বোধনে) হে শত্রুদমনকারি।

কোথায় হেমাঙ্গ গিরি উঠিছে আকাশে বৃক্ষচূড় ইত্যাদি—কোন স্থানে মহাদেবের জটাবিশিষ্ট মস্তকের ন্যায় চূড়াদেশে বৃক্ষাদিশোভিত স্বর্ণময় পর্বত আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

কপর্দ্দী--জটাজুটবিশিষ্ট মহাদেব। "কপর্দোঽস্য জটাজুটম্"। (অমরকোষ) 'জটাধারী কপর্দ্দী' অধিকপদতা দোষ। কলে---অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে। নীচদেশে---পর্বতের পাদদেশস্থ নিম্নভূমিতে। তাহে সরঃ খচিত কমলে—সেই সকল নিম্নভূমিতে পদ্মবনশোভিত সরোবরসমূহ রহিয়াছে। বিনতানন্দনাত্মজ --বিনতার পুত্র গরুড়ের আত্মজ অর্থাৎ পুত্র,---জটায়ু।

দেখ চেয়ে. ···বৃক্ষমূলে মরকতপত্রছত্র ইত্যাদি—জটায়ু রামচন্দ্রের দৃষ্টি অদূরবর্তী একটি স্বর্ণময় বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। বৃক্ষটির সমুন্নত মস্তকের উপর সবুজ মরকতমণির পত্রপুঞ্জ ছত্রের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে। তাহারই তলায় স্বর্ণাসনে রঘুবংশের আদিপুরুষ দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণার সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা জটায়ু রামকে দেখাইলেন।

বংশের নিদান তব—তোমার বংশের, অর্থাৎ রঘুবংশের আদি পুরুষ। দিলীপের পুত্র রঘু হইতে রঘুবংশের উৎপত্তি। ইক্ষ্বাকু— বৈবস্বত মনুর পুত্র এবং সূর্যবংশের আদি পুরুষ। মান্ধাতা-- সূর্যবংশীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা। নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি, যযাতির পিতা।

সাষ্টাঙ্গে নমিলা--দেহ ভূমিতে লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। দুই চরণ, দুই জানু, দুই হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং ললাট মৃত্তিকায় স্পর্শ করাইয়া প্রণামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বলে।

দম্পতীর পদতলে—দিলীপ ও সুদক্ষিণার পদতলে। জায়া ও পতি শব্দ দুইটির দ্বন্দ্ব সমাসে জায়াপতী, জম্পতী ও দম্পতী এই তিনটি রূপ হয়।

আনন্দ সলিলে ভাসিল হৃদয় মম---রামচন্দ্র বংশধর বলিয়া পরিচয়প্রাপ্তির পূর্বেই বাৎসল্যজনিত আনন্দে দিলীপের হৃদয় পূর্ণ হইল।

জুড়াল আঁখি মম হেরি তোমা---রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সুদক্ষিণারও অনুরূপ আনন্দ হইল।

দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি ইত্যাদি--তোমার দেবজনোচিত সুন্দর আকৃতি দেখিলে তোমাকে দেবতা বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু দেবতা হইলে আমাদের স্বামি-স্ত্রী উভয়কে তুমি প্রণাম করিবে কেন? কারণ মানুষ কোন অবস্থাতেই দেবতার নমস্য নহে। আর যদি দেবতা না হও, তবে এই দেবতার মত সুন্দর ও পবিত্র দেহে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছ?

ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে দিগ্বিজয়ী—রঘু দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। গরভে < গর্ভে—(স্বর-সম্প্রসারণ)। যতদিন চন্দ্র সূর্য উদয়ে আকাশে---তুলনীয়,— "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ"। উদয়ে---উদয় হয় (নামধাতু)। ধর্ম্মরাজে---যমদেবকে।

কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী—দশরথের অবিবেচনাপ্রসূত প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্র রাজ্যত্যাগী ও বনবাসী হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছেন বলিয়া. দশরথের মন সকল সময়েই ক্ষুব্ধ।

চলিলা একাকী (অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া)—প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে বীরগণের আবাসভূমিতে

বালিকে আসিতে দেখিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিতে বলিয়া মায়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বালি রামকে জটায়ুর নিকটে এবং জটায়ু তথা হইতে তাঁহাকে রাজর্ষিগণের আবাসস্থল পশ্চিম দ্বারে দিলীপ সুদক্ষিণার নিকটে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত মায়াদেবী অন্তরীক্ষে অদৃশ্যভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন। ফল, হায় ফল ছটা কে পারে বর্ণিতে?—যে গাছের শাখা স্বর্ণময় এবং পত্রাবলী মরকতমণি গঠিত, তাহার ফলের শোভা পার্থিব কোন রত্নের সাহায্যে ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রসারি—প্রসারিত বা বিস্তৃত করিয়া।

আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে এত দিনে—প্রিয়তম পুত্রের বহু প্রতীক্ষিত আগমনে দশরথের ব্যগ্রতাসূচক ভাব 'কি রে' প্রশ্নে ব্যক্ত হইয়াছে। তুলনীয়—

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ," কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম?" (৭।৭৬৯-৭৭০)

ঈনীড্ কাব্যেও প্রেতপুরে সমাগত পুত্র ঈনীয়স্‌কে দূর হইতে দেখিয়া আঙ্কাইসিস অনুরূপ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। তুলনীয়—

With eager act both hands he spread,
And bathed his cheeks with tears, and said:
"At last! and are you come at last!" (VI.—1137-39)

বিহনে < বিহীন—অভাবে, ব্যতীত। লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে, তোর শোকে ইত্যাদি—আমার প্রাণ নিশ্চয়ই লৌহবৎ কঠিন; নতুবা তোমার মত পুত্রকে বনে প্রেরণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু যতই কঠিন হউক, প্রচণ্ড উত্তাপে যেরূপ লৌহও গলিয়া যায়, সেইরূপ তোমার বিচ্ছেদ-শোকের প্রচণ্ডতায় আমার কঠিন প্রাণও গলিত হইয়াছিল; আমি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলাম।

নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে ইত্যাদি—তুমি ধর্মপথগামী, সুতরাং তোমার অদৃষ্টে দুঃখভোগ ঘটিত না; আমার কুকর্মের ফলেই নিষ্ঠুর বিধাতা তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখভোগ লিখিয়াছেন।

সুগন্ধমাদন গিরি—ওষধি-সমন্বিত গন্ধমাদন পর্বত; ছন্দের অনুরোধে মাত্রাবৃদ্ধির জন্য 'সু' প্রয়োগ। হেমলতা—স্বর্ণকান্তি লতা। আশুগতি-পুত্র—বায়ুপুত্র, পবনদেবের পুত্র, হনুমান। আশুগতি গতি— বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন। সময়ে—উপযুক্ত সময়ে, যথাকালে।

পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা ইত্যাদি—দশরথ রামকে ভ্রাতৃশোকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, হনুমৎকর্তৃক আনীত বিশল্যকরণী ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিবে, যথাকালে রাবণ নিহত হইবে এবং সীতা পুনরায় কুলবধূরূপে রঘুকুলের অন্তঃপুর উজ্জ্বল করিবেন সত্য; কিন্তু অবিমিশ্র সুখভোগ রামের অদৃষ্টে নাই। ধূপ যেমন ধূপদানিতে পুড়িয়া সুগন্ধে দেশ আমোদিত করে, সেইরূপ অশেষপ্রকার দুঃখযন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াই রামচন্দ্র যশঃ অর্জন করিবেন এবং সেই যশে সারা ভারত পূর্ণ হইবে। স্বপাপে—স্ত্রৈণতারূপ পাপের ফলে।

অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে—পৃথিবীতে এখন রাত্রি মাত্র অর্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে।

নারিলা স্পর্শিতে পদ—সূক্ষ্মদেহধারী বলিয়া। তুলনীয়—

"Thrice strove the son his sire to clasp;
Thrice the vain phantom mocked his grasp." (Aeneid—VI. 1161-62)

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ—রঘুপুত্র অজের পুত্র দশরথ। দশরথাঙ্গজে—দশরথ পুত্র রামকে।

ভূতপূর্ব্ব দেহ—পৃথিবীতে পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ রক্তমাংসে গঠিত স্থূল দেহ।

প্রণমি বিস্ময়ে পদে—ছায়াময় সূক্ষ্ম শরীর অবিকল স্থূল জড়দেহের মতই দর্শনীয় কিন্তু স্পর্শনীয় নহে জানিয়া, বিস্মিতভাবে পিতার চরণোদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া।

প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ--অষ্টম সর্গে প্রধানতঃ প্রেতপুরীর বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এই সর্গের নাম প্রেতপুরী।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী—বীরবাহু-বধের পরদিবসের এবং মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেলাঘাত দিবসের রাত্রি প্রভাত হইল। এই কাব্যে বর্ণিত সকল ঘটনা তিনদিন ও দুই রাত্রির মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। গ্রীক অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত কালের ঐক্য (Unity of time) রক্ষা করিবার দিকে কবির দৃষ্টি ছিল। নাদিল বিকট ঠাট— বিশল্যকরণী-প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় রামচন্দ্রের বিরাট সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

বিস্ময়ে—পূর্বদিবসে লক্ষ্মণের মৃত্যু হওয়ায়, শোকের পরিবর্তে রামসৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণে।

সুধিলা সারণে লক্ষি— মন্ত্রী সারণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ—হে জ্ঞানী মন্ত্রিবর। কি হেতু নিনাদে বৈরিবৃন্দ ইত্যাদি—রাত্রিকালে যে শত্রুরা শোকে বিমর্ষ ও নিস্তব্ধ ছিল, এখন প্রভাতে তাহারা কিজন্য জয়ধ্বনি করিতেছে? তাই বা করিল— সম্ভাব্যতাজ্ঞাপক 'বা'।

অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল—মৃতের পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দেবগণ রামের সহায়। হয় ত দেবগণের অনুগ্রহে এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভবপর হইয়াছে। মায়াতেজে—মায়াবলে। বাঁচিল যে দুইবার মরি—তুলনীয়—

"—দুইবার আমি হারানু রাঘবে,
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

রামায়ণে মেঘনাদ তিনবার যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে সে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। দ্বিতীয়বারে তাহার মায়াযুদ্ধের প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাম-লক্ষ্মণ মৃতবৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া তাহাকে প্রতারিত করেন। তৃতীয়বারে সে রামচন্দ্রকে শোকাকুল করার জন্য তাঁহার সম্মুখে কৃত্রিম সীতাকে বধ করিয়াছিল।

কর পুটি— করদ্বয় পুটের অর্থাৎ কোষের আকার করিয়া; যুক্তকরে। সাধারণ প্রয়োগ 'করপুটে'।

দেবাত্মা—দেবতা আত্মা বা অধিষ্ঠাত্রী যাহার। কালিদাস হিমালয়কে "দেবতাত্মা" বলিয়াছেন। গন্ধমাদন হিমালয়েরই শাখা বিশেষ। আপনি আসি গত নিশাকালে—হনুমান ঔষধ আনিতে যাইয়া ঔষধ চিনিতে না পারায় আস্ত গন্ধমাদন পর্বতটিই লঙ্কায় বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। সারণ, বা যে রাক্ষস প্রহরীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, পর্বতশৃঙ্গ বুঝি আপনা হইতেই লঙ্কায় আসিয়াছে। হিমান্তে—শীত ঋতুর অবসানে।

দাক্ষিণাত্য যত— দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী রামের সেনাগণ। রামায়ণ-বর্ণিত বানরগণের অতিমানবীয় শক্তিসামর্থ্য কবির মনঃপূত ছিল না। শক্তিসামর্থ্য থাকিলেও তাহারা যে বানরই ছিল, ইহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "I despise Rama and his rabble." এই কাব্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল প্রভৃতির প্রসঙ্গে কবি সর্বত্রই সযত্নে তাহাদের

বানরত্ব পরিহার করিয়া তাহাদের উপর যথাসম্ভব মানবীয় ভাব আরোপের চেষ্টা করিয়াছেন।

বিমুখি অমর মরে ইত্যাদি—সপ্তম সর্গে রাবণ, কার্ত্তিকেয় ও ইন্দ্র দেবদ্বয়কে এবং রামচন্দ্র, হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি নরগণকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্মণকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি—যমের ধর্ম হইল নিজের অধিকারে পাইয়া কাহাকেও পরিত্যাগ না করা; মরিলে কেহই আর বাঁচিয়া উঠে না। রাবণ বলিতেছেন যে, তাঁহার অদৃষ্টদোষেই লক্ষ্মণের ক্ষেত্রে যমও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

গ্রাসিলে কুরঙ্গে ... ছাড়ে কিহে কভু তাহায়?—এস্থলে সিংহগ্রস্ত কুরঙ্গের সহিত যমগ্রস্ত মানবের সাদৃশ্য দুইটি পৃথক বাক্যে তুলনাবাচক যথাদি শব্দ ব্যতীত ব্যক্ত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

কুমার বাসবজয়ী—ইন্দ্রজয়ী পুত্র।

দ্বিতীয় জগতে শক্তিধর—রূপে এবং পরাক্রমে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়।

তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে সপ্তদিন ইত্যাদি—রাবণের এই যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা ইলিয়ড কাব্যোক্ত ঘটনার অনুরূপ। হেক্টরের মৃত্যুর পর ট্রয়রাজ প্রায়াম গ্রীক্-শিবিরে যাইয়া নিষ্ক্রয়দানে মৃত পুত্রের দেহ একিলিসের নিকট হইতে উদ্ধার করেন এবং পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একাদশ দিন যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা করেন। সৎক্রিয়া—শব-সৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি—কল্যাণময় বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন; অদৃষ্ট তোমার প্রসন্ন। দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে—অদৃষ্ট-বৈগুণ্যহেতুই রাবণের দুর্গতি। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই অদৃষ্টবাদ (Fate)। অদৃষ্টগুণেই রাজ্যচ্যুত, বনবাসী ও সহায়সম্পদহীন হইয়াও রামচন্দ্র পদে পদে জয়ী, এবং অদৃষ্টদোষেই স্বয়ং ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত বীর, এবং বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রগণের পিতা হইয়াও রাবণ পদে পদে রামের হস্তে পরাজিত। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ভাগ্যবিড়ম্বিত রাবণ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস-কল্পিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র।

পর মনোরথ—শত্রুর অভিলাষ। পর = শত্রু। দ্বার—অবরুদ্ধ লঙ্কার সিংহদ্বার। চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে—অনবরত গর্জনশব্দে মুখরিত সমুদ্রতীরে অবস্থিত রামের শিবিরে।

যথা তরু হিমানীবিহনে নবরস ইত্যাদি—নবজীবন লাভের পর লক্ষ্মণ হইয়াছেন শীত ঋতুর পর নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় সতেজ; অথবা পূর্ণিমায় নির্মেঘ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল; অথবা রাত্রির অবসানে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল। মালোপমা অলঙ্কার।

হিমানী—হিম ঋতু বা শীতঋতু অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু হিমানী—হিম + ঈপ (সংহতি অর্থে) শব্দের অর্থ তুষার বা বরফ। অবাচকতা দোষ।

নেতৃ যত—নেতা যত। ঋকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচন রূপটিই বাংলা প্রাতিপদিকরূপে গৃহীত। অন্য তৎসম শব্দের সহিত সমাস হইলেই সাধারণতঃ সমস্ত পদটিতে তৎসম প্রাতিপদিক রূপ গৃহীত হয়; অথবা সমগ্র সমস্ত পদটিকেই তৎসম শব্দরূপে গ্রহণ করা হয়। নেতৃ > নেতা; নেতৃগণের, কিন্তু নেতাদিগের। দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল রথী—সেনাদলের নেতৃস্থানীয় সুগ্রীবাদি পরিবেষ্টিত রামচন্দ্রকে দেবরথিগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াই মনে হইতেছিল। বীর্যবত্তা ও দেহসৌন্দর্যের আধিক্যরূপ সাদৃশ্যহেতু উপমেয় রাম ও সুগ্রীবাদিকে উপমান দেবসমূহ ও ইন্দ্র বলিয়া সংশয় প্রকাশে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

বার্তাবহ—সংবাদ প্রদানকারী দূত। যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে ইত্যাদি—সূর্যের প্রখর কিরণে বনের মধ্যে যে বনস্পতি দগ্ধ হইতে থাকে, সূর্য রাহুগ্রাসে পতিত হইলে সমস্ত জগতের সহিত সেই বনস্পতিও সূর্যের দুঃখে ম্লান বা অন্ধকারময় হইয়া উঠে।

পরমারি মম, হে সারণ, ... সেও হে সে কালে— শত্রু রাবণের বিপদে রামচন্দ্রের সহানুভূতি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য পৃথক বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যথা ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। অপর পর - মিত্র ও শত্রু।

ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত জনে—শব-সৎকার কার্য্যও ধর্মকর্ম বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। কহিলা উত্তরি —উত্তর প্রদানচ্ছলে বলিলেন। উচিত এ কর্ম তব— তোমার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষের পক্ষে শত্রুরও ধর্মকর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন সমুচিত কর্ম। মিনতি —কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ ও সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন বিন্নতি শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন 'জোড়কলম শব্দ'। ভেটিলে —সাক্ষাৎ করিলে; অভি + অট (গমনার্থক) হইতে উৎপন্ন। নির্ব্বন্ধ—স্থির বিধান।

যে বিধি, হে মহাবাহু সৃজিলা পবনে ইত্যাদি— সারণ প্রথমে রাবণ ও রামচন্দ্র উভয়েই যে শ্রেষ্ঠ এবং উভয়েই যে অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন, এই কথার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অসামান্য চরিত্রসম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি পরস্পরের শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন! কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার মনে পড়িল যে, বৃহতের সহিত বৃহতের, শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের বিরোধ জগতে দুর্লভ নহে। যে বিধাতার বিধানে শক্তিমান পবন ও শক্তিমান সমুদ্র, বলশালী সিংহ ও বলশালী হস্তী, এবং পক্ষিরাজ গরুড় ও সর্পরাজ বাসুকি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, তাঁহার বিধানেই রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ ও নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পরস্পরের শত্রু হইয়াছেন। ইহার জন্য রাবণ বা রাম কেহই দোষী নহেন। এস্থলেও তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে শক্তিমান রাবণের সহিত শক্তিমান রামের বিরোধ ব্যক্ত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। অধিকন্তু, 'সৃজিলা' ক্রিয়াপদের সাহায্যে তিনটি পৃথক্ বাক্য অন্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কারও হইয়াছে।

দোষিব—(নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ) সাধারণ প্রয়োগে 'দূষিব'। প্রসাদ পাইয়া—প্রার্থনাপূরণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া। নেতাবৃন্দে —শুদ্ধরূপ নেতৃবৃন্দে' ৬৮ পংক্তিতে 'নেতৃ যত' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। কুতুহলে—মনের আনন্দে। হাহাকারে— হাহাকার শব্দে বিলাপ করে (নামধাতু)। গম্ভীর নিক্কণে— গম্ভীর শব্দে। নিক্কণ শব্দের অর্থ অলঙ্কার বা বীণাদি যন্ত্রের মধুর ঝঙ্কার। রণ-বাদ্যের গুরু গম্ভীর নির্ঘোষ অর্থে অপপ্রযুক্ত।

এ দু দিন— বীরবাহুর মৃত্যু হইতে মেঘনাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত দুইদিন ধরিয়া। কিন্তু প্রথম দিনের শোকের কারণ সীতার নিকট অজ্ঞাত থাকার কথা নহে, কারণ সেইদিনই রাত্রিকালে অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কে জিনিল? কে হারিল?—অশোকবনে বন্দিনী সীতা সারাদিন যুদ্ধের ভীষণ গর্জন শুনিয়াছেন এবং দিনের শেষে রাক্ষসগণের লঙ্কায় প্রত্যাগমন ও তাহাদের জয়ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। রাক্ষসেরা মোটের উপর জয়ী হইয়াছে ইহা তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিলেও, এই যুদ্ধে কোন পক্ষের কে কে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়াছে এবং কাহারাই বা শত্রুহস্তে প্রাণ দিয়াছে ইহাই তিনি বিশদভাবে জানিতে চান। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয় হইলেও রাম লক্ষ্মণ নিরাপদে আছেন কিনা,—ইহাই সীতার জিজ্ঞাস্য। এস্থলে 'কে' অর্থে 'কোন পক্ষ' না বুঝিয়া 'কে কে' বা 'কাহারা' বুঝিতে হইবে। কারণ রাক্ষসপক্ষই যে জয়ী হইয়াছে তাহা সীতা তাহাদের জয়ধ্বনি শ্রবণে বুঝিয়াছিলেন।

না মানে প্রবোধ—নিশ্চিতভাবে না জানিতে পারা পর্যন্ত রাম লক্ষ্মণের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সংশয়হেতু মন সান্ত্বনা মানিতে চাহে না।

বিকটা ত্রিজটা, ইত্যাদি— রামায়ণে ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসী কিন্তু সীতার অনুরাগিণী ও শুভানুধ্যায়িনী ছিল এবং ত্রিজটার আদর্শেই সরমা-চরিত্র কল্পিত হইয়াছে।

আইলা কাটিতে মোরে—রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে ক্রোধান্ধ রাবণই সীতাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং পরে মন্ত্রী সুপার্শ্বের বাক্যে নিবৃত্ত হইয়াছিল। কবি তাঁহার কাব্যের নায়ক রাবণের উপর এই কলঙ্কটি চাপাইতে চান নাই।

হতজীব—মৃত, হত জীব (জীবন) যাহার; বহুব্রীহি।

বধিলা বাসবজিতে অজেয় জগতে—সরমা সীতার প্রশ্নের প্রথমাংশেরই অংশতঃ উত্তর দিলেন; সীতার উদ্বেগের প্রধান কারণ যে রণ-নিনাদ ও রাক্ষসগণের জয়ধ্বনি তাহার উত্তর দিলেন না।

সুবচনী < শুভচণ্ডী—মঙ্গলদায়িনী দেবী চণ্ডিকার রূপবিশেষ; অর্থান্তরে,—প্রিয়ংবদা, সুসংবাদদায়িনী। শাশুড়ী—শ্বশ্রূ। শ্বশ্রূ > শশ্‌শু > শাশু + ড়ী (স্বার্থে)। সুবচনী—এস্থলে সুবচনী পূর্ববর্তী শব্দটির মত শ্লেষাত্মক নহে। প্রেতক্রিয়াহেতু—পারলৌকিক কর্মানুষ্ঠানের জন্য।

হরকোপানলে হে দেবি, কন্দর্প যবে ইত্যাদি —ক্রুদ্ধ শিবের নেত্রাগ্নিতে প্রিয়দর্শন কাম ভস্মীভূত হইলে কামপত্নী সুন্দরী রতি তাঁহার অনুমৃতা হন নাই। তবে এখন কামের মতই রূপবান মেঘনাদের মৃত্যুতে রতির ন্যায় রূপবতী প্রমীলাই বা সহমরণে যাইতে উদ্যত কেন,—ইহাই সরমার জিজ্ঞাস্য। সুলক্ষণে—(সম্বোধনে) হে শুভলক্ষণবিশিষ্টা সরমা।

বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে—প্রচণ্ড বাহুবলহেতু শত্রুপক্ষের নিকট ভয়াবহ।

হ্যাদে < হের দেখ—মনোযোগাকর্ষক যৌগিক অব্যয় শব্দ; দেখ দেখ।

স্বর্ণ ব্রততী—স্বর্ণলতারূপ উজ্জ্বলবর্ণা ও কোমলাঙ্গী সীতাকে।

কে ছিঁড়ি আনিল হেথা ... বঞ্চিয়া রসালরাজে—উপমেয় সীতা ও রামচন্দ্রকে উপমান স্বর্ণব্রততী ও রসালরাজ (বিশাল আম্রবৃক্ষ) রূপে কল্পনায় লুপ্তরূপক অলঙ্কার।

রাঘব-মানসপদ্ম—রামচন্দ্রের মনোরূপ সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মস্বরূপ সীতাকে। রূপক অলঙ্কার। খুলিল পশ্চিম-দ্বার—কারণ লঙ্কার পশ্চিমাংশেই সমুদ্রতীরে শ্মশান-ভূমি অবস্থিত।

এখানে মেঘনাদের শবযাত্রার যে বর্ণনা পাই, তাহার সহিত লঙ্কাকাণ্ডের ১১৩ সর্গে বর্ণিত রাবণের শব-সৎকারের কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইলিয়ড্ কাব্যের ২৩ ও ২৪ সর্গে বর্ণিত পাত্রক্লসের এবং হেক্টরের শব-সৎকার বর্ণনার সাদৃশ্যই বেশি।

কৌষিক পতাকা—কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন রেশম দ্বারা প্রস্তুত নিশান।

কাতারে কাতারে < কতার (আরবী)—শ্রেণীবদ্ধভাবে, দলে দলে।

রবিকরতেজে শোভে—সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত পরবর্তী পাঁচটি শব্দেরই অন্বয় করিতে হইবে। সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় পতাকার স্বর্ণদণ্ডগুলি, মস্তকে অবস্থিত উষ্ণীষসংলগ্ন মণিমুক্তাসমূহ, কটিবন্ধে আবদ্ধ তরবারির খাপগুলি, সৈন্যগণের করধৃত দীর্ঘ শূলসকল এবং শোকতপ্ত রাক্ষসগণের চক্ষু হইতে নির্গত অশ্রুবিন্দুগুলি ঝলমল করিতেছিল। একই ক্রিয়াপদ 'শোভে' দ্বারা বিভিন্ন শব্দ অন্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার। কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী—কৃষ্ণবর্ণ-অশ্বারূঢ়া প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনী। তৃতীয় সর্গে ইহার কথা বলা হইয়াছে।

মলিন বদন মরি, শশিকলাভাবে নিশা যথা—তৃতীয় সর্গে প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনীকে তেজস্বিতায়, সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে ভরপুর দেখা যায়, কিন্তু এখন শোকে তাহার মুখ চন্দ্রহীন রাত্রির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। বড়বা—সাধারণ অর্থ ঘোটকী; এস্থলে প্রমীলার ঘোটকীর নাম।

শূন্যপৃষ্ঠ ইত্যাদি—বড়বার পৃষ্ঠে প্রমীলা এখন আর আরোহিণী নহেন বলিয়া বড়বা পুষ্পহীন পুষ্পবৃন্তের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে। বামাব্রজ—রাক্ষসপুরীর নারীগণ। শবযাত্রায় নারী ও পুরুষেরা

দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রমীলার অশ্বসমেত তাহার অনুচরীগণ শবযাত্রার যে অংশে ছিল, সেই অংশেই লঙ্কার রাক্ষস-নারীরা সকলে সমবেত হইয়াছিল।

সারসন স্মরি, হায় রে, সে সরু কটি! ... গিরিশৃঙ্গ-সম—এস্থলে সচেতন সারসন (মেখলা) এবং কবচ (বর্ম) উভয়ের উপর চেতনার আরোপ করিয়া চেতনাশীল মানবের ধর্ম স্মরণকার্য ও দুঃখানুভূতি আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। গায়কী—শুদ্ধরূপ গায়িকা।

পেশল উরস হানি—কোমল ও সুন্দর বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া। উরস < উরস্, আশিস > আশিস্ শব্দের ন্যায়। রথবর—মেঘনাদের বিশাল রথখানি।

রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা চক্রে; ইত্যাদি—তুলনীয়—

"মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলী ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী;" (১। ৬৯৪—৯৫)

কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, ইত্যাদি—প্রমীলাশূন্য 'বড়বার' ন্যায় মেঘনাদশূন্য সুন্দর রথখানিও আজ বিসর্জনের পর প্রতিমাহীন প্রতিমার কাঠামোর মত অসুন্দর দেখাইতেছে। মহাক্ষোভে—প্রচণ্ড ক্ষোভের সহিত। গীতী—চারণ জাতীয় কবি, স্তুতি-পাঠক (গীত + ইন্); অপ্রচলিত শব্দ।

লড়ি < নড়ি—আলোড়িত বা কম্পিত হইয়া। প্রাদেশিক রূপ।

জলবহ—জলবহনকারী ভারী, ভিস্তি। জল বহন করে এই অর্থে জল + বহ + ঘণ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দ 'জলবাহ' হওয়া উচিত। 'জলবাহ' যোগরূঢ়ত্বহেতু মেঘকেই বুঝায়। তুলনীয়, পয়োবহ < পয়োবাহ (৫। ৫৬৫)। দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে পদভর—পদক্ষেপ করিলেই যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা উপরে উঠিতে চাহে সেগুলিকে জলবর্ষণে শমিত করিয়া।

মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী—অতুলনীয় সৌন্দর্যশালী মেঘনাদের সহিত সহমরণযাত্রিণী রূপবতী প্রমীলাকে দেখিয়া সৌন্দর্যসাদৃশ্যহেতু মনে হইতেছে, যেন পৃথিবীতে কামদেব মৃত হওয়ায় রতি তাঁহার সহিত সহমরণে যাইতেছেন। যথা প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ ব্যতীত দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে অবস্থিত সাধারণধর্মবিশিষ্ট উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

কোথা মরি, সে সুচারু হাসি, ইত্যাদি—কবি পঙ্কজিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, পদ্মের উপর সূর্যকিরণসম্পাতে যে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে, প্রমীলার মুখে সর্বদা সেইরূপ যে আনন্দময় হাসি ফুটিয়া উঠিত, আজ তাহা কোথায়? ইংরেজি Apostrophe অলঙ্কারের অনুকরণে সৃষ্ট 'সম্বোধন' অলঙ্কার। ব্রতী—ব্রতিনী, নিযুক্তা।

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি ইত্যাদি—প্রমীলা নির্বাক ও নিশ্চল; দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহার আত্মা তাঁহার সুন্দর দেহটি ছাড়িয়া পতির আত্মার উদ্দেশে ইতিমধ্যেই প্রস্থান করিয়াছে।

স্বয়ম্বরা বধূ ধনী—সুন্দরী প্রমীলা মেঘনাদের বীরত্বে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে—মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা পড়িয়া অনার্য রাক্ষসগণের সহিত আর্যগণের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির কোন পার্থক্যই ছিল না বলিয়া মনে হইবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রপাঠরত পুরোহিত, পবিত্র গঙ্গোদক ইহার কোনটিরই অভাব নাই।

হবির্বহ—অগ্নি। অগ্নি যজ্ঞে আহুত হবিঃ (ঘৃত) উদ্দিষ্ট দেবগণের নিকট বহন করেন বলিয়া এই নাম। হোত্রী—হোত্র অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিত। মহামন্ত্র—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের গম্ভীরভাবব্যঞ্জক মন্ত্র। কেশর—পুষ্পের সুগন্ধি পরাগ বা রেণু। পূত অম্বোরাশি গাঙ্গেয়—গঙ্গার পবিত্র জলরাশি। কাড়া—ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তুম্বকী—লাউয়ের খোলের উপর চর্মাচ্ছাদিত

বাদ্যযন্ত্র। তুম্বক = অলাবু, লাউ। ঝাঁঝরী < ঝর্ঝরী—কাঁসর, ঝাঁজ। হুলাহুলি—উলুধ্বনি।

হায়রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে—সতী প্রমীলার সহমরণব্রত শাস্ত্রানুসারে একটি মাঙ্গলিক পবিত্র কর্ম বলিয়া সধবা রাক্ষসনারীরা মাঙ্গল্যসূচক উলুধ্বনি করিতেছে। কিন্তু আদিতে ব্যাপারটি হইতেছে,—মেঘনাদের শব সৎকারের জন্য শোকাবহ শবযাত্রা। সুতরাং রাক্ষসগণের চরম অমঙ্গলের দিনে মাঙ্গলিক উলুধ্বনি শোনা যাইতেছে।

বিশদ বস্ত্র—শ্বেত বস্ত্র। ভারতীয় প্রথায় শুভ্র বস্ত্রই অশৌচকালে পরা হয়। বিশদ উত্তরী— শুভ্র উত্তরীয় বা চাদর। ধুতুরা < ধুস্তুর, ধুস্তূর—শিব পূজায় প্রশস্ত দীর্ঘ শ্বেত বর্ণের পুষ্পবিশেষ।

ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে—মহিমাব্যঞ্জক বিশালদেহধারী রাবণ অশৌচকালে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া শুভ্র উত্তরীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার গলদেশ হইতে লম্বিত শুভ্র উত্তরীয়খানিকে মহাদেবের কণ্ঠস্থিত ধুতুরা ফুলের মালার ন্যায় দেখাইতেছিল। দূরে—সম্মানজনক ব্যবধান রক্ষা করিয়া। অধিকারী যত রক্ষঃশ্রেষ্ঠ—রাবণের রাজসভার উচ্চপদাধিকারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ।

প্রভু—রামচন্দ্র। ৬২ পংক্তিস্থ নাথ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দশ শত রথী সঙ্গে—সহস্র বীর সৈনিকের সহিত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সাবধানে যাও হে সুরথি—রাম অঙ্গদকে সতর্কভাবে থাকিতে বলিলেন, যাহাতে বৈরিতা নিবন্ধন রামের সৈনিকেরা রাক্ষসগণের এই দুর্দিনে কোনরূপ বিবাদ না বাধায়।

লক্ষ্মণ শূরে হেরি পাছে রোষে ইত্যাদি—রামচন্দ্র অঙ্গদকে বলিলেন যে, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তিনি লক্ষ্মণকেই প্রেরণ করিতেন এবং তাহাই শোভন হইত; কিন্তু পাছে লক্ষ্মণই তাহার দুঃখের কারণ মনে করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করে, এইজন্য তিনি পুত্রস্থানীয় অঙ্গদকেই প্রেরণ করিতেছেন।

রাজচূড়ামণি পিতা তব বিমুখিলা ইত্যাদি—রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূর্বে রাবণ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া যখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াছিলেন, তখন কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালিকে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যা-উপাসনায় রত অবস্থায় আক্রমণ করিতে গেলে, বালি রাবণকে নিজের কক্ষমধ্যে জাপটাইয়া ধরিয়া সেই অবস্থাতেই চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া অবশেষে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন।

শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে—হে ভদ্র ব্যবহারসম্পন্ন অঙ্গদ, তোমার পিতা বালির হস্তে একদা যে রাবণ বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল, সেই রাবণকে আজ তুমি তোমার ভদ্র ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট কর। সাগরমুখে—সমুদ্রের দিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থলে। বরাঙ্গনা—সুন্দরী।

অনন্তযৌবনা—কারণ দেবীগণের যৌবন সুচিরস্থায়ী।

শিখিধ্বজে—শিখী অর্থাৎ ময়ূর হইয়াছে ধ্বজা যে রথের; ময়ূরলাঞ্ছিত পতাকাবিশিষ্ট রথে।

শিখিধ্বজ—শিখী (ময়ূর) ধ্বজ (চিহ্ন, উপলক্ষণ) যে দেবতার; ময়ূর দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা, কার্ত্তিক। উভয়ত্রই বহুব্রীহি সমাস। সেনানী—দেব-সেনাপতি। চিত্ররথে—নানাবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র রথে। চিত্ররথ রথী—গন্ধর্বপতি বীর চিত্ররথ। ইঁহারই সাহায্যে ইন্দ্র রামের নিকটে দৈবাস্ত্রসমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃগে বায়ুকুলরাজ—বেদে মরুৎ সাতজন; পুরাণে ইহা সপ্তগুণিত হইয়া ঊনপঞ্চাশ হইয়াছে। মরুৎ বা বায়ুগণের বাহন হরিণ।

পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি—অলকাপুরীর অধীশ্বর যক্ষরাজ কুবের পুষ্পক রথে আগমন করিলেন। পৌরাণিক প্রসিদ্ধি অনুসারে, এবং ইতিপূর্বে কবির বর্ণনানুসারেও, রাবণের জীবিতাবস্থায় কুবেরের পক্ষে পুষ্পকে আগমন অসম্ভব ব্যাপার। পুষ্পকরথের অধিকারী প্রকৃতপক্ষে কুবেরই ছিলেন বটে, কিন্তু রাবণ কুবেরের নিকট হইতে উহা বলপূর্বক হরণ করেন। তুলনীয়,—

স্বনয়নে দেখেছ, সরমা
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া (৪। ৪১১—১২)
এবং "বাহিরিল রক্ষোরাজ পুষ্পক আরোহী:" (৮। ৫৪৮)

মলিন তপন তেজে—সূর্যের সহিত একই সময়ে আকাশে আবির্ভূত হইবার জন্য চন্দ্র ম্লানতা লাভ করিয়াছেন। সুহাসী—স্মিত হাস্যে, প্রসন্ন মুখে। সুহাস + ইন্। অশ্বিনীকুমারযুগ—স্বর্গের ভিষক্ যমজ দেবদ্বয়। দেব-ঋষি—দেবর্ষি নারদ।

মন্দাকিনী পূতজলে—গঙ্গার পবিত্র ধারা স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, মর্ত্যে ভাগীরথী নামে এবং পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিত। স্বর্গে প্রবাহিত মন্দাকিনীর জল পবিত্রতম বলিয়া তাহা দিয়াই মেঘনাদের শবদেহ স্নাত হইয়াছিল। পরাই—পরাইয়া। —ইয়া বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপ। থুইল < স্থাপিল—রাখিল। প্রাদেশিক রূপ। অবগাহি দেহ—কবি কর্তৃক বহুবার ব্যবহৃত অধিকপদতা দোষযুক্ত প্রয়োগ। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহনিমজ্জনপূর্বক স্নান: সুতরাং অবগাহি 'দেহ' অনাবশ্যক।

মহাতীর্থ —শ্মশানরূপ পবিত্রস্থানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে। কবি পূর্বেও অষ্টম সর্গে রামের সমুদ্রে স্নান প্রসঙ্গে মহাতীর্থ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সে স্থলে তীর্থকে মহৎ শব্দে বিশেষিত করার অন্য হেতু থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে 'মহাতীর্থ' এবং পূর্বে উল্লিখিত 'মহামন্ত্র' শব্দদ্বয় প্রয়োগের বিশেষ হেতু আছে বলিয়া মনে হয়। যাত্রা, পথ ও নিদ্রা-বাচক শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যু বুঝায়। তীর্থ ও মন্ত্র শব্দদ্বয়ের পূর্বে মহৎ বিশেষণ প্রয়োগ কি উহার সাদৃশ্যেই হইয়াছে?

জীবলীলা—দেহধারী জীবরূপে সকল কর্মের অনুষ্ঠান। জীবলীলাস্থলে —জীবের ক্রীড়াভূমিরূপ এই পৃথিবীতে।

ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে—প্রমীলার অনুচরীগণ লঙ্কার অধিবাসিনী রাক্ষসকন্যা ছিল না; তাহারা সকলেই ছিল দানবকন্যা এবং প্রমীলার বিবাহের পর প্রমীলার সহিত সখী ও অনুচরীরূপে লঙ্কায় আসিয়াছিল। সুতরাং প্রমীলার মৃত্যুর পর তাহাদের প্রবাস-জীবনযাপন অনাবশ্যক।

বাসন্তি—(সম্বোধনে) দানবকন্যাগণের মধ্যে প্রধানা এবং প্রমীলার সখীস্থানীয়া।

হায়রে, বহিল সহসা নয়নজল—সখীদের নিকট বিদায় গ্রহণকালে,—এমন কি, পিতার প্রসঙ্গ উত্থাপনকালেও প্রমীলা ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু মাতার কথা মনে হইতে তিনি আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না।

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন) ইত্যাদি—প্রমীলা স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত সহমরণে আসিয়াছেন; সুতরাং যে চিতায় তাঁহার প্রিয়তম শায়িত, তাহা তাঁহার নিকট ফুলের শয্যার ন্যায়ই কোমল ও সুখাবহ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই তিনি চিতায় আরোহণ করিয়া আনন্দিত মনে পতির পদতলে উপবেশন করিলেন। বেদী—বেদজ্ঞ পুরোহিত; বেদ + ইন্। (অপ্রচলিত)। তুলনীয়—"ষোল শত ঘর বেদী"—(শূন্যপুরাণ)।

দিল রক্ষোবালা যথাবিধি—রাক্ষস-নারীগণ প্রচলিত রীতি-অনুসারে নানাবিধ উপচার চিতার উপর স্থাপন করিল।

পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে ইত্যাদি—রাক্ষসগণ প্রচুর পরিমাণে পশু বধ করিয়া তাহাদের দেহগুলিতে ঘৃত মাখাইয়া চিতার চারিপাশে স্থাপন করিল। রামায়ণ, ইলিয়ড্ ও ঈনীড্ কাব্যেও শবসৎকারকালে মৃতের উদ্দেশে ঘৃতাক্ত পশুমাংস প্রদানের উল্লেখ আছে। তুলনীয়—

"তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ

পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন। (রাবণ-সংকার—লঙ্কাকাণ্ড ঃ ১১৩। ১১৭)
"High on the top the manly corpse they lay.
And Well-fed sheep and sable oxen slay .
Achilles cover'd with their fat the dead.
And the Pil'd victims round the body spread"

(Patroclus' Cremation : Iliad—XXIII)

এবং "While streaming oil and offered spice
Blaze up with flesh of sacrifice". (Misenus' Cremation Aeneid—VI)

যথা মহানবমীর দিনে ইত্যাদি—শারদীয়া দুর্গাপূজার তৃতীয় দিবসে দুর্গাদেবীর সম্মুখে সর্বাধিক সংখ্যায় ছাগ-মহিষ প্রভৃতি পশু বলি দেওয়া হয়।

শাক্ত ভক্তগৃহে—শক্তি অর্থাৎ দুর্গার বা কালীর উপাসকগণের গৃহে।

অন্তিমে—জীবনের অন্তিমকালে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে।

করিব মহাযাত্রা—যমালয়ে যাত্রা করিব; মৃত্যুমুখে পতিত হইব। শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ অর্থগৌরব সাধিত হয় বটে; কিন্তু শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ, যাত্রা, পথ ও নিদ্রা এই নয়টি শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে অর্থ গৌরবের পরিবর্তে অর্থলাঘব অথবা অর্থকদর্যতা ঘটে। মহাশঙ্খ = নরকপাল; মহাতৈল = নরমেদ; মহামাংস = নরমাংস; মহাবৈদ্য = গোবৈদ্য; কুচিকিৎসক। মহাজ্যোতিষী = জ্যোতিষে অনভিজ্ঞব্যক্তি; মহাব্রাহ্মণ = নিকৃষ্ট অগ্রদানী ব্রাহ্মণ; মহাযাত্রা = যমপুরে যাত্রা; মহাপথ = যমপুরের পথ; মহানিদ্রা = কালনিদ্রা। ভাঁড়াইলা < ভণ্ড—বঞ্চনা করিলেন।

পূর্বজন্মফলে—(পূর্বজন্মকর্মফলে)—জন্মান্তরে কৃত অন্যায় কর্মের ফলে। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র, বিভীষণ, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি রাবণ-বিরোধিগণ মধ্যে মধ্যে রাবণের অত্যাচার ও পাপকর্মের উল্লেখ করিলেও, এই কাব্যে নিজের অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার জন্য রাবণ সর্বদাই আপনার পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের কথাই বলিয়াছেন। শত্রু রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করিয়া আনিলেও, রাবণ যেন ইহাকে কতকটা বৈরিনির্যাতনের উপায় বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং ইহাকে কোন নৈতিক অপরাধমূলক কার্য বলিয়া মনে করেন নাই। "পাবকশিখারূপিণী' সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন করার জন্য তাঁহার বিলাপের মধ্যেও কোথাও 'মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি' এরূপ অনুতাপের সুর ফুটিয়া উঠে নাই। মধুসূদন-কল্পিত রাবণ-চরিত্রের আলোচনাকালে এই কথাটি স্মরণ রাখা অত্যাবশক। ইহার পরেই আবার রাবণের বিলাপে পাওয়া যায়—

"হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

রাবণের এই সকল বিলাপোক্তিকে আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিয়া মনে না করিলে, এইগুলির সহিত তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবিসৃষ্ট রাবণকে দেখিতে হইবে। রামায়ণের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠ 'পাষণ্ড' রাবণ-চরিত্রের এইরূপ অভিনব পরিকল্পনা করিতে যাইয়া কবি অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, এরং রামায়ণোক্ত রাবণ চরিত্রের সহিত তাঁহার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রের বিরোধ সর্বত্র এড়াইতেও পারেন নাই সত্য; তথাপি তৎসৃষ্ট রাবণকে বুঝিতে হইলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই সহানুভূতির সহিত রাবণকে দেখিতে হইবে।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে—রাবণ মর্মজ্বালায় ইষ্টদেব শিবের উদ্দেশ্যে অভিমানপূর্ণ বাক্য

ব্যক্ত করায় শিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ—অধীর শিবের আলোড়িত জটাজালে অবস্থিত সর্পসমূহ জটাজাল কম্পনে ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিল।

জ্বলিল অনল ভালে—শিব ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করায় ললাটস্থ অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। ত্রিপথগা—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিতা শিবের জটাজালের মধ্যে অবস্থিতা গঙ্গা।

কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে ইত্যাদি—ধ্বংসের দেবতা রুদ্র প্রমত্ত হইয়া উঠায় তাঁহার অবস্থান ভূমি কৈলাসপর্বত এবং তাহার সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

নাশ (অকারান্ত উচ্চারণ)—বিনাশ কর। নগরাজবালে—(সম্বোধনে) হে পর্বতরাজ হিমালয় কন্যা পার্বতি! ক্ষেমঙ্করি (সম্বোধনে-ইকার) হে মঙ্গলদায়িনি! পবিত্রি—পবিত্র করিয়া। সর্ব্বশুচি—অগ্নিদেব, যাঁহার স্পর্শে সকল বস্তু পবিত্র হয়। এ সুধামে—এই মনোরম কৈলাসপর্বতে। ইরম্মদরূপে বজ্রাগ্নির রূপ ধারণ করিয়া। সহসা জ্বলিল চিতা—পুরোহিতগণবাহিত অগ্নিসংযোগের পূর্বেই বজ্রাগ্নিস্পর্শে চিতা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল।

সচকিতে সবে দেখিলা আগ্নেয় রথ—অপ্রত্যাশিতভাবে চিতা হঠাৎ বেগে জ্বলিয়া উঠায় সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেদিকে চাহিতেই একখানি অগ্নিময় রথের আবির্ভাব লক্ষ্য করিল।

অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে—নরদেহ ত্যাগ করিয়া দেবদেহ লাভ করায় দেবসুলভ চিরযৌবনশোভায় দেহ শোভিত হইল।

বরষিলা পুষ্পাসার—অজস্রভাবে ও প্রবলভাবে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে—চিতার প্রজ্বলন্ত শিখা পবিত্র দুগ্ধবর্ষণে নির্বাপিত করা হইল। ইলিয়াড কাব্যে পাত্রক্লুসের এবং হেক্টরের চিতাগ্নি মদ্য দ্বারা নির্বাপণের উল্লেখ আছে।

দুগ্ধধারে নিবাইল ইত্যাদির সহিত তুলনীয়—

"Again the mournful crowds surround the pyre
And quench with wine the yet remaining fire:
The snowy bones his friends and brothers place
(With tears collected) in a golden vase:
The golden vase in purple palls they roll'd,
Of softest texture, and inwrought with gold,
Last o'er the urn the sacred earth they spread,
And raised the tomb,—memorial of the dead. (Iliad—XXIV)

স্বর্ণপাটিকেলে—স্বর্ণময় ইষ্টক দ্বারা।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে ইত্যাদি—বিজয়া দশমীতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিয়া লোকে যেরূপ শূন্যমনে বিষণ্ণভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করে, রাক্ষসগণও সেইরূপ শোকাকুল মনে, অশ্রুসিক্ত নয়নে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তুলনীয়—

"All Troy then moved to Priam's court again,—
A solemn, silent, melancholy train" (Iliad—XXIV)

সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে—যুদ্ধবিরতির পূর্ণ সাতদিন কাল সমুদয় লঙ্কাবাসিগণ তাহাদের শেষ আশাভরসাস্থল মেঘনাদের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিল।

সংক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ—মেঘনাদের শবসৎকার বর্ণনাই এই সর্গের মুখ্য বিষয় বলিয়া ইহার নাম সংক্রিয়া। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অতি ঋজু ও পরিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাবীকালে, কবিকুলসম্ভব কেহ না কেহ এই ছন্দের উৎকৃষ্টতা সাধন করিতে পারেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতাবলী সমধিক সরল, স্বচ্ছ, কোমল এবং তরল ভাষায় গ্রন্থন করিতে পারেন; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রণালী উদ্ভাবনের যশঃ আর কাহারই নয়। এবং উৎকৃষ্টতর দ্বিতীয় প্রণালী বোধ হয় আর নাই। হয়ত কেহ মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু মাত্রা-বৃদ্ধি দ্বারা অলাভ ভিন্ন লাভ নাই—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে। বোধ হয়, লেখকের ন্যায় অনেকে মনে মনে করেন যে, এই বিপুল যশঃ তাহাদের কপালে ঘটিল না। যাহা হউক, যখন আবিষ্ক্রিয়াটী সুসম্পন্ন হইয়াছে তখন সকলেরই কর্ত্তব্য যে, একবাক্য হইয়া সেই ভাগ্যবন্ত পুরুষের ধন্যবাদ করেন, যিনি কবিতাস্রোতঃ নির্গমণের এই নূতন খাদ খনন করিয়াছেন। হে মেঘনাদবধ গ্রন্থকার, এই "নূতন মালা" চিরকালের নিমিত্ত তোমার গলদেশে শোভা প্রতিপাদন করিবে। এইক্ষণে এই কাব্য সম্বন্ধে, দুই চারি কথা না বলিলে ভাল দেখায় না।

গ্রন্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি কাব্য লিখিয়াছেন,—"তিলোত্তমাসম্ভব", "মেঘনাদবধ" এবং "বীরাঙ্গনা"। ইহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিবেচনা করিলে "মেঘনাদ", এবং ভাষার সারল্য ও তারল্য গণনা করিলে "বীরাঙ্গনা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ভাষার কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ অপেক্ষাকৃত সুলভ। অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি ও অনভ্যাসে হ্রাস হয়। ইহার প্রচুর প্রমাণ এই তিনখানি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তিলোত্তমা প্রথম উদ্যম, মেঘনাদ দ্বিতীয় উদ্যম ও বীরাঙ্গনা তৃতীয় উদ্যম, সুতরাং উত্তরোত্তর ভাষার সারল্যাদি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যে সকল গুণকে কবিতা-কৌলীন্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন, সে সকল মেঘনাদবধ কাব্যে যত আছে, গ্রন্থকারের রচিত অপর কোন গ্রন্থে তত নাই। আর এই গ্রন্থে তাহার কবিত্বশক্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি যে প্রকার স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় তেমন তদ্রচিত আর কোন কাব্য পাঠে হয় না। দত্তজের কবিত্বশক্তির দুই প্রধান লক্ষণ—তেজস্বিতা এবং উদ্ভাবকতা। তাঁহার কাব্যোদ্যানে কুহকিনী কল্পনাদেবীকে কত প্রকার সম্মোহিনী বেশে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। কখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্পহরণ করিতেছেন, কখন স্বকীয় নিকুঞ্জ হইতে নব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। কখন ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার বেশে লঙ্কা প্রবেশ করিতেছেন, আবার কখন মায়াবেশে শ্রীরামচন্দ্রের পথদর্শিনী হইয়া ধর্ম্মরাজ-ভবনে গমন করিতেছেন। আর উৎপ্রেক্ষা ছলে কতই যে অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন তাহার আর সীমা নাই। পুনশ্চ, দেবী আবার মহাতেজস্বিনী। সর্ব্বদাই বীরভাবান্বিতা—সর্ব্বদাই বীররসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া। ভারতের কল্পনার ন্যায় ইহার জন্মমৃত্যুস্থল রাজভবন ও বন্ধুবান্ধব দুই ক্ষুদ্র প্রাণী নায়ক নায়িকা নয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, দেব, নর, রক্ষ মধ্যে যত কিছু বীর্য্যশালী আছে সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত হইয়াছে, অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিল্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সহিত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব? অনেকে এরূপ তুলনা করেন, তাহাতেই এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক তাহার শত যোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। তত্রাচ অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। সত্য বটে, ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্য্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধ হয়, আর জন্মিবে

এইটি মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, রচনার স্থান ও কাল : খিদিরপুর, ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল।

না। তেমন মধুমাখা কথা. বুঝি, আর কেহ কখন গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না। কিন্তু কল্পনাদি শ্রেষ্ঠতর গুণ তাঁহাতে যৎসামান্য ছিল। মন যাহাতে পৃথিবীর সীমা ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিতে পায়, যাহা কেহ কখন দেখে নাই শুনে নাই অথচ দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে, এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া তাহার বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই তিনি অপ্রমেয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্ব্বল ছিল যে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া তিনি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল মানসিংহ। এই গ্রন্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির আয়াস সদৃশ---ইহাতে কথার মিল ছাড়া কবিতার অন্য কোন লক্ষণ নাই। অন্নদামঙ্গল মন্দ নয় বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি বিদ্যাসুন্দর না লিখিতেন তবে আজি অন্নদামঙ্গলের এত আদর কোথায় থাকিত? ফলতঃ ভারত অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন বটে। রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্য প্রকৃতিতে দৃষ্টি তাঁহার বিলক্ষণরূপ ছিল, কিন্তু তিনি মধ্যবিৎ কবি ছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই। তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে নয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রত্যেকেই স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আপনাকে নানা রসাভিজ্ঞ দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর লেখা পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং পতন দশার এখনও কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। বুঝি বা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব শক্তি তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে আর ত তার কথাই ছিল না—তাঁহার লেখার বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটী বলিতে হয়। নিদেন এক্ষণে কবিতাপ্রিয় গৌড়বাসিদের কবিতা পাঠের ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসুন্দর যেরূপ, মেঘনাদও সেইরূপ আদরের সহিত পাঠ করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটী খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটী, কোন্ পদটী উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এ সকল গুণ নাই---এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাস কালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু, যে কথাটী না হইলে নয়, সেই কথাটী প্রয়োগ করা আছে, সুতরাং সেসকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। ...কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বল্কলবেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?*

পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষাগুলি সর্ব্বত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থল বিশেষে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ান হইয়াছে। যাহা হউক সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্ত্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে বঙ্গব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ স্বদেশীয় বিজ্ঞ ও কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট নিবেদন এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়া

* কিছুদিন পরেই হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারংবার আলোচনা করিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত।"—নগেন্দ্রনাথ সোম

মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পরও যদি নিন্দা করেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু ব্যঞ্জন চাকার মত চাকিয়া যেন নিন্দা না করেন। আর ইটিও যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে, যে পুস্তক পাঠ করিয়া দুই চারি কথা বলা ও পুস্তক রচনা করার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যখানি সবিস্তরে সমালোচনা করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অনাটন জন্য সেই বাসনা অঙ্কুরেতেই রহিল।

খিদিরপুর, তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল।

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে এ কথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয় তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না, সুমধুর কবিতারস পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয় ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই তাহাকে গদ্য কহে। এবং পদ্য রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদ সংযুক্ত পদ্য।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ, কারণ গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতা রসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়;—ইহার দৃষ্টান্তস্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ, এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই।

ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন এদেশে এমন হিন্দু সন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,— যাহাতে দেব, দানব, মানব মণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি!

অত্যুক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয় তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি;—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকিব পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্ত প্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহার সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে! কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয় তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি

প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতর্জ্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এইমাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে মেঘনাদবধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নর্তকীদিগেরই নৃত্য হয় কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বৰ্দ্ধন জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতা জনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়—বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম, এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্র উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা যথা "স্তম্ভিলা" "শান্তিলা" "ধ্বনিলা" "মর্ম্মরিছে" "দ্বন্দ্বিয়া," "সুবর্ণি" ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!——"
"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;——"
"হেন কালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে।——"
"রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।——"
"দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত;——"

এই সকল স্থলে "গায়ক," "শিবিরে," "বীরেন্দ্র," "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত; কিন্তু, এরূপ দোষাশ্রিত

হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলত ঃ

"গাঁথিব নূতন মালা——
রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই "নূতন মালা" চিরকালের জন্য যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না।—সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে, ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দ পূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা—

——"হেরিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করি।"—১
"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২
"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"—৩
"শুনি গুণ গুণ ধ্বনি তোর এ কাননে
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে।"—৪
"এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে;"—৫ ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্মিতগুার আড়ম্বর কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন; কারণ বিরাম যতি অনুসারে পদ বিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয় তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্ব্বত্রেই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দ্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং

কখন বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা—২
নারী-দেশে; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;—৪
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি;—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টংকারি:—৭
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে!—ঝক্ ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কুঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!—৯
মন্দুরায় হেসে অশ্ব; ঊর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝন ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী,—১২
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি,—১৩
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে!—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি--১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।--১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে ১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮], ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে "আসি" "উতরিলা" "নারীদেশে" এবং "রুষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "দূরে" "শৃঙ্গে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাসপতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয় তত দিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে গুটিকত কথা বলিতেই হয়।

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগড়দাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা সদর-

দেওয়ানি আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহাঁরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজি ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬/১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহাঁর পিতা ইহাঁকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্স কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; জগদীশ্বর করুন ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় উন্নতি সাধন, ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন। ❑

—

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সংস্করণে এই ভূমিকাটি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ১৩ আশ্বিন, ১২৭৪ সাল, ভবানীপুর থেকে।

মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

বঙ্গীয় নরনারীর চিরপ্রিয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আখ্যানবস্তুই মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শ; কিন্তু রামায়ণের সেই সুপ্রসিদ্ধ ও হিন্দুনরনারীর সুবিদিত ঘটনা ব্যতীত কাব্যের অন্তর্গত অন্যান্য ঘটনাবলী ও চরিত্র কবিকল্পিত এবং নানাদেশীয় মহাকবি-কল্পনার ছায়ায় রচিত। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অন্তর্গত যুদ্ধকাণ্ড বর্ণিত একটী মধ্যবর্ত্তী ঘটনা হইতে কাব্যের সূত্রপাত হইয়াছে। সীতাপহারী রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত হিন্দুর আরাধ্য সীতাপতি রামচন্দ্রের যুদ্ধ ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রাক্ষসরাজপুত্র মেঘনাদের বধ এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, প্রতিভাবান কবি এরূপ সুকৌশলে রামায়ণের সমগ্র গল্পাংশ অতি সংক্ষেপে কাব্যান্তর্গত পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন এবং স্বগত চিন্তা প্রসঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন যে, যাঁহারা রামায়ণের কাহিনী আদৌ অবগত নহেন তাঁহারাও ইহা মূল রামায়ণের সংক্ষিপ্তসারবৎ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

আখ্যান বস্তু : মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণনানুসারে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, স্বজাতিবাৎসল্যে, দেশহিতার্থে আত্মবলিদানে, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে, পূজার্চ্চনা ও তপোনিষ্ঠায় এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, ধন, মান ও প্রতাপে রাক্ষসগণ আর্য্য হিন্দু বলিয়াই বোধ হয় এবং মনে হয়, মদ্যমাংসাদি যেমন ভারতীয় তান্ত্রিকসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, লঙ্কার তমোগুণপ্রধান রাক্ষসকুলে তাহার ভূরি প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য ও বন্য অসভ্যজাতির মধ্যে আমমাংসভোজী, দুর্নীতিপরায়ণ; পশুপ্রকৃতি আজিও যেমন দেখা যায়, সেইরূপ দৃঢ়কায়, আমমাংসভোজী, রণনিপুণ, অসভ্য নৃশংসগণ লঙ্কার আদিম অধিবাসী ছিল; তাহারা রাক্ষসরাজ রাবণের দুর্দ্ধর্ষ প্রধান সৈন্যদল পুষ্ট করিয়াছিল এবং লঙ্কার রক্ষাকার্য্যে প্রধানতঃ তাহারাই নিযুক্ত ছিল। রামায়ণে রাবণের প্রধান সৈন্য লঙ্কাপুরে রক্তমাংসভোজী দশ সহস্র কোটী বলিয়া উক্ত হইয়াছে (ল—৬১)। যেমন 'সূর্য' 'চন্দ্র' প্রভৃতি বংশ ভারতে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ রক্ষঃ বা রাক্ষস লঙ্কার রাজবংশীদিগের বল-পরিচায়ক শব্দ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মান্ধতা একই জাতির মধ্যে ভিন্নধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্মান্ধতা, স্বার্থান্ধতা, হিংসা প্রতিপক্ষের প্রতিকূল ভাবই পোষণ করে। শত্রুতার ক্ষেত্রে বিপক্ষের দোষ এবং অযশস্কর আচার ব্যবহার অতিরঞ্জিত করতঃ তাহাদিগকে অন্যের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করাই মানবের স্বাভাবিক। ইহা কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল মানবজাতিতে দেখা যায়। গ্রীক আদিকবি হোমর সমধর্ম্মী ট্রোজানদিগের সর্ব্বমান্য ও সর্ব্বগুণান্বিত, দেবোপম, মহাবীর হেক্টরকেও প্রতিনায়ক এখিলিজের সম্মুখে কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ ভারতে ভণ্ড, নাস্তিক, তস্কর ও রাক্ষস বলিয়া উক্ত, উৎপীড়িত এবং ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ খৃষ্ট তাঁহার স্বজাতিবর্গের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন। গ্রীককবির ন্যায় মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, যখনি দেবগণ, ঋষিগণ এবং ভারতীয় রাজবংশীয় ও পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সহিত রাক্ষসকুলের কোনরূপ সংঘর্ষ হইয়াছে, তখনই রাক্ষস শব্দ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যুগাবতার রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও তৎপক্ষীয়দিগের গৌরববৃদ্ধিজন্য রাক্ষসপক্ষীয়গণ অতি বিকৃতাকার, অতিকায়, ভীমকর্ম্মা নরখাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কল্পনার অতিরঞ্জনে এবং ভয়ানক ও অদ্ভুতাদি রসের প্লাবনে রক্ষোবংশীয়দিগের প্রকৃত চরিত্র ও রূপ আবৃত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যখন কোন সংঘর্ষ নাই—শত্রুতাচরণ নাই—কেবল অন্তরাল হইতে তাহাদের অন্তঃপুরের বিষয়ব্যাপার দেখিয়া, তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতিগত জীবন গোপনে লক্ষ্য

করিয়া তাহাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হইতেছে তখন আর সে ভাব লক্ষিত হয় না। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বহুদর্শী এবং তীক্ষ্ণধী হনূমান অন্যের অলক্ষিতে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বিভব, রাজপরিবারের ও প্রজাবর্গের দৈনিক জীবন, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, বাক্যালাপ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন; তাহারা :

"যজ্ঞ হেতু সোমরস করে আয়োজন।"
"দেবতারা অবিরত পূজিত তথায়।"
"সেইসব নিশাচর অতি ধনবান।"

যে সকল গুপ্তচর নানা ভেক ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে তাহারা

অতি স্থূল, অতি কৃশ কোন জন নয়।
অতি দীর্ঘ, অতি হ্রস্ব নহেক নিশ্চয়।।
অতি গৌর, অতি কৃষ্ণ বর্ণ নহে কার।
সবার মূরতি মহা শকতি আধার।।
সে সব চরের মধ্যে কেহ বহুরূপ।
সুরূপ সুতেজ আর কেহ বা বিরূপ।।
দেখিলেন তিনি, যত নিশাচরগণ।
বিশেষ আস্তিক মিষ্টভাষী বিচক্ষণ।।
মধুর সুশ্রাব্য নাম তাদের সবার।
প্রধান তাহারা সবে জগত মাঝার।।
তাহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার।
করিয়াছে বেশভূষা সৌন্দর্য্য-আধার।।
যদিও তাদের মাঝে কেহ বা বিরূপ।
কিন্তু বেশ-সৌষ্ঠবেতে হয়েছে সুরূপ।।

তারা সবে গুণবান্ গুণ অনুসারে।
কার্য্য অনুষ্ঠান করে বিশেষ প্রকারে।।
তাহাদের পরিণীতা বনিতা সকল।
বিশুদ্ধস্বভাবা পতিপ্রাণা অবিরল।।
সে রমণীগণ চারু বসন-ভূষণে।
তারকার মত দীপ্তি পায় অনুক্ষণে।।
লজ্জাশীলা তারা অতি * * *
* * * * স্বামীর সেবায়।
নিযুক্ত নিয়ত * * * *
কেহ স্বর্ণবর্ণ কেহ শশাঙ্ক সোসর।
* * * * * * *
সকলের মুখপদ্ম যেন শশী রাকা।
সকলেরি পক্ষশোভী অক্ষি কিছু বাঁকা।।

রাক্ষসদিগের রূপগুণ ত এইরূপ। এদিকে মহর্ষির বর্ণনা অনুসারে রাবণ রূপে অতুলনীয় ছিলেন, যথা :

রাজর্ষি ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস।
ইহাদের কন্যাগণ রূপেতে সরস।।
রাবণের রূপে মজি' সে সব রমণী।
উপস্থিত হইয়াছে আপনা আপনি।।
তাহাদের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত।
সবাই রাবণ রূপে হয়েছে মোহিত।।"

(সুন্দরাকাণ্ড)

বিভীষণ রামকে বলেন —"দশানন বেদবেদাঙ্গ-পারগ, মহাতপা ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা।" রাবণ শৈব ছিলেন। তিনি স্বর্ণের শিবলিঙ্গ স্বয়ং পূজা করিতেন (উত্তরকাণ্ড ৩১)। হনূমান রামকে বলেন—"রাবণ দোষী বটে কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর। তিনি সর্ব্বদা স্বচক্ষে নিজ রাজ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।"—(ল : ৩)। তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য্যের কথা বলাই বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত রাবণের রূপ ও গুণের প্রমাণ মহর্ষির কাব্যে প্রচুর পাওয়া যায়। মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাই ত্রিভুবনবিজয়ী রাক্ষসরাজকে কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রজাবৎসল রাজা, অনুরক্ত পতি, স্নেহময় পিতা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, স্বধর্ম্মনিরত নৈষ্ঠিক হিন্দু, ইষ্টদেবে পরম ভক্তিপরায়ণ এবং কুলপতি, স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ও ক্ষত্রিয় বীরের সকল গুণে মণ্ডিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে পুরাণ-প্রসিদ্ধির অপলাপ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ মহা মহা বীরপুরুষ। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কিষ্কিন্ধ্যার সমতল প্রদেশ ও ঋষ্যমূক পর্ব্বতের অধিবাসী। মহর্ষির রামায়ণ মতে —

"কিষ্কিন্ধ্যা-নিবাসী সবে মহাবলবান।
দেবগম বীর্য্যে জনম সবার।
পরম সুন্দর, সবার আকার,
কামরূপধারী তেজে তপন সমান।"—(সু-২৮)

লঙ্কার সমাজ সভ্যতম মানবজাতির অত্যুন্নত আদর্শে গঠিত এবং বেদবিহিত ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং পাঠককে রামায়ণোক্ত বিকটাকার, নরখাদক নিশাচরদিগের সহিত লাঙ্গুলবিশিষ্ট লোমশ পশুসমভিব্যাহারী বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের যুদ্ধকাহিনী পাঠের আশা ত্যাগ করিয়া সুসভ্য রক্ষোবংশীয় ও রঘুবংশীয় নৃপতিদ্বয়ের যুদ্ধসম্বন্ধীয় কাব্যপাঠের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কাব্যের ভিতর দিয়া কবিকে বুঝিতে ও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় লইতে হইবে। স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল, ইহলোক এবং পরলোকের ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমানের সংবাদপ্রাপ্তির জন্য কৌতূহলের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে; কখন কৈলাস পর্ব্বতের তুষারধবল যোগাসন-চূড়ায় হরপার্ব্বতীর কথোপকথন শুনিয়া আসিতে হইবে; কখন বৈজয়ন্তে ইন্দ্রসভায় শচীসহ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিতে হইবে; কখন স্বর্ণলঙ্কার মণিময় রাজসভায়, ধরায় অমরাবতী-নিন্দিত প্রমীলার প্রমোদভবন, কখন উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সমুদ্রতটবর্ত্তী স্বর্ণলঙ্কা-অবরোধকারী বানরসৈন্য সমাবৃত রণক্ষেত্র এবং শত্রুশিবির ভেদ করিয়া বীরাঙ্গনা প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ, কখন সাগরগর্ভে মুক্তাময়ী বরুণালয়-বাসিনী বারুণীর কেশ-রচনা, এবং কখন পাতালের সুড়ঙ্গ দ্বার দিয়া পৃথিবীর শেষসীমায় উপস্থিত হইয়া সশরীরে প্রেতপুরীর চিরবিস্ময়কর দৃশ্যাদি কল্পনার পুষ্পকরথে বসিয়া কবির সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে। একদিকে রণোন্মত্ত সৈন্যবৃন্দের হুঙ্কার, আক্রমণকারী বীরগণের বজ্ররব, তূর্য্যধ্বনি, দুন্দুভির রণবাদ্য এবং অস্ত্রের ঝন্ঝনা; অপরদিকে বামাকণ্ঠ, নূপুরশিঞ্জন এবং সপ্ততন্ত্রীর মধুর নিক্কণ; একদিকে প্রমোদমত্ত নাগরিকগণের অট্টহাস্য এবং মহানগরীর উৎসবকোলাহল, অপরদিকে পতিবিরহবিধুরা বন্দিনী জনকনন্দিনীর দীর্ঘনিশ্বাস এবং পুত্রহারা জননী ও পতিহারা কামিনীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে হইবে। একদিকে পুত্রহন্তার দণ্ডবিধানোন্মুখ শত্রুর ঔদ্ধত্য এবং উদ্দীপনা, অপরদিকে আশাভরসাহীন অনুতপ্ত জনকের অবসাদ এবং বৈরাগ্যভাব লক্ষ্য করিতে হইবে। এক কথায় কাব্যের রস, ভাব, ভাষা, বর্ণনাকৌশল, অলঙ্কার, কবিত্বের সৌন্দর্য্য কবির কল্পনা অনুধাবন করিবার জন্য মনশ্চক্ষু ও হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে ইহবে; তবেই এই কাব্যপাঠে পাঠকের তৃপ্তিলাভ হইবে।

কাব্য : কিন্তু এই কাব্য পাঠ করিবার পূর্ব্বে কাব্য কাহাকে বলে,—কবি যে সকল কাব্যকুবেরদিগের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত "বিবিধ ভূষণে" মাতৃভাষা ও তাঁহার কাব্যখানিকে "সাজাইয়া" গিয়াছেন তৎসমুদয়ের তথ্যানুসন্ধানে আনন্দ আছে। কেবল দুরূহ শব্দের প্রতিশব্দ এবং জটিল বাক্যের অর্থবোধ হইলেই যথেষ্ট হয় না। কবির সহিত কবি-কল্পিত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া, তিনি কি কি উপাদানে ও কোন্ কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এরূপ চিত্তদ্রাবকের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব লইতে হইবে। সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে বিঘ্ন জন্মে বটে, কিন্তু ইহা জড়-সৌন্দর্য্য পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে; যে সৌন্দর্য্য হৃদয় মন পূর্ণ করিয়া কল্পনার চক্ষে উদ্‌ভাসিত হয়, বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার মাধুর্য্য নষ্ট না হইয়া বরং স্থায়ী হয়। কেহ কেহ মেঘনাদবধ কাব্যকে উচ্চশ্রেণীর কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, অনেকে ইহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। অনির্ব্বচনীয় আনন্দজনক রচনা লোকের হৃদয় ও মনের মধ্যে শোক, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, ভয়, ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের তরঙ্গ আনাইয়া দেয়, যাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠক আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন বর্ণিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সমস্ত বিষয় ব্যাপার মানস-নেত্রে দর্শন

করিতে থাকে। এমন কি, কবির চরিত্র-রচনা-কৌশলগুণে আত্মবিস্মৃত পাঠক যে রচনার মধ্য দিয়া নায়ক-নায়িকাদির হৃদয় ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্তরের ভাব ও ভাবসমূহের ঘাত প্রতিঘাত পর্য্যন্ত যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী হয়, সেইরূপ ভাবসম্বলিত রসাল প্রবন্ধের নাম কাব্য। পণ্ডিতগণ কাব্যকে কবির কীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। এই অর্থে আলোচ্য গ্রন্থ উচ্চশ্রেণীর কাব্য এবং ইহা কবি মধুসূদনের অমর কীর্ত্তি।

মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য : প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করেন—মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। কোন পুরাণান্তর্গত প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত, ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতা, কোন সৎকুলজাত যশস্বী ক্ষত্রিয় নৃপতি, অথবা চন্দ্রসূর্য্যবংশের ন্যায় কোন উচ্চরাজবংশচরিত অবলম্বনে ছন্দে রচিত কাব্য মহাকাব্য পদবাচ্য। ইহাতে স্বভাবের শোভা, শৈল সাগর, নগর প্রান্তর, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত; রাজা বা সেনাপতিদিগের মন্ত্রণা, সৈন্য চালনা ও যুদ্ধ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বিরহ ও মিলন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ও উৎসব, পার্ব্বণ, ঋতুবর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে সমুদয় অথবা কোন কোন বিষয় মূল আখ্যান বস্তুর সহিত গ্রথিত হয়। গ্রন্থ আট সর্গের অন্যূন সংখ্যায় বিভক্ত হয়; সর্গগুলি নাতি দীর্ঘ ও নাতি হ্রস্ব হয়, কবি স্বীয় ইষ্টদেবতার স্তুতি-বন্দনা বা সাধারণের মঙ্গল কামনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করেন। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্ত্তী সর্গের বর্ণিত বিষয়ের আভাষ প্রদত্ত হয় এবং সর্গগুলি একরূপ ছন্দে অথবা বিবিধ ছন্দে রচিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক সর্গের শেষ কয়েকটি পংক্তি ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। কোন সর্গে বর্ণিত বিষয়ের প্রধানতম বিষয়-বোধক নামে সেই সর্গের নামকরণ হয়। মহাকাব্যে বীর, করুণ, আদ্য ও শান্ত এই চারিটীর কোন একটী রসের প্রাধান্য থাকে এবং অন্য তিনটী স্থায়ী এবং হাস্য রৌদ্র, ভয়ানকাদি রস অপ্রধান ও অস্থায়িভাবে বিদ্যমান থাকে। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়ক নায়িকার নামে মহাকাব্যের নামকরণ হয়। প্রতিনায়কের গুণের উৎকর্ষ যত অধিক হয় নায়কের পক্ষে ততই গৌরবজনক হয়। মহাকাব্যের সকল লক্ষণাক্রান্ত নহে এমন অনতিদীর্ঘ কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে। খণ্ডকাব্যে আট সর্গের অধিক থাকে না। ইহা সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মত। কিন্তু প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ যাহাকে এপিক বলেন, তাহাকে মহাকাব্য বলিলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শে আমরা পার্থক্য দেখিতে পাই।

এপিক্ : গ্রীক পণ্ডিত বলেন—একটা খুব অসাধারণ এবং মহোচ্চ ও গুরু-গম্ভীর বিষয় না হইলে যে এপিক্ লেখা যাইতে পারে না তাহা নহে। দৃশ্যকাব্যোচিত আখ্যানবস্তু এবং নাটকীয় চরিত্রগণ লইয়া এপিকের আরম্ভ। এপিকের লেখক গল্পাংশের জন্য যে প্রতিপদে ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহাও নয়।

এসম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীন। পৌরাণিক আখ্যান, জনশ্রুতি এবং লৌকিক সংস্কার অনেক সময় এপিক্ রচনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয় বটে, কিন্তু কবি সে সমুদয় এককালে উপেক্ষা করিতে পারেন না; কারণ, এপিকের গল্প ও চরিত্রগণ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হওয়াই চাই। পক্ষান্তরে ইতিহাসের সহিত এপিকের সম্বন্ধ সত্যমূলক হইলেও কবি তাহাতে স্বীয় কল্পনা যদৃচ্ছা মিশ্রিত করিয়া সমগ্র আখ্যানভাগ আপনার মনের মত করিয়া লিখিতে পারেন। এপিকের চরিত্রগণ ঐতিহাসিক হইয়াও ইতিহাস-বর্ণিত কার্য্যকলাপের একটীও না করিতে পারেন, এমন কি তাঁহাদের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিসমূহের উল্লেখ পর্য্যন্ত না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ও এমন মহোচ্চ গুণাবলী থাকা চাই যাহার সহিত লৌকিক সংস্কার জড়িত থাকে। সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক, যাহা ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ বর্ণনা এপিকের লক্ষণ নহে, কিন্তু ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যাহা অভূতপূর্ব্ব, চিরবিস্ময়কর, চিরগৌরবময় ও হৃদয়োন্মাদক বলিয়া কবির প্রতীতি জন্মে; যাহা কবিকে প্রকৃতই

মাতাইয়া তুলে এবং তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত করে। কবি সেই ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকেন, তাঁহার চর্ম্মচক্ষু মুদিত হইয়া অন্তরের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত হয়, তিনি স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের কত অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হন এবং এপিকের পৃষ্ঠে তাহার কল্পনার ছবি আঁকিয়া থাকেন। তিনি ঘটনাবলীতে ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন না, কিন্তু তিনি কল্পনার রঙ্গমঞ্চে যাহা যাহা অভিনীত হইতে দেখেন সেই সকলকে উপকরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রস-ভাবাত্মক একখানি অভিনব দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। কবির কল্পনা এবং চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির উপর এপিকের উৎকর্ষ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মহাপণ্ডিত এরিষ্টট্‌ল্ গল্পাংশকে বাদ দিয়া কাব্যান্তর্গত চরিত্রগুলিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, চরিত্রগুলির যদি নাটকীয় অভিনয় না থাকে তাহা হইলে এপিক্ কেবল ইতিহাস কিম্বা অদ্ভুত উপন্যাস-মাত্রে পরিণত হয়। তাঁহার মতে হোমরই একমাত্র কবি জন্মিয়াছিলেন, যিনি এপিকের মধ্যে কতটুকু গল্পচ্ছলে বলা উচিত তাহার মাত্রা বুঝিতেন। কখন যে কবির কথায় গল্প করিয়া বলিতে হইবে, আর কখন যে কাব্যান্তর্গত পাত্রপাত্রীগণকে তাহাদের নিজেদের কথা নিজেদের মুখ দিয়া বলাইতে হইবে তাহা হোমর* বিলক্ষণ জানিতেন। অন্যান্য কবিরা যথায় দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায়ই চরিত্রগুলিকে নেপথ্যে রাখিয়া আদ্যোপান্ত গল্প বলার মত বলিয়া যান, হোমর তথায় অধিক গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া প্রথম হইতেই পাত্রপাত্রীগণকে অভিনয় দ্বারা আপনাপন চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আসর ছাড়িয়া দেন। গ্রীক পণ্ডিতের কথায়—"Homer is the only poet who knows the right proportion of epic narrative; when to narrate and when to let the characters speak for themselves. Other poets for the most part tell their story straight on, with scanty passages of drama and far between Homer with little prelude leaves the stage to his personages, men and women, all with characters of their own."—Aristotle's Poet—*1460-a-5* quoted and translated by Mr. W. P. Ker in his *Epic and Romance,* Sec. II, page 20.

মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্য কিনা : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ স্থূলভাবে আলোচিত হইল। বলা বাহুল্য, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি রচনা সম্বন্ধে প্রতীচ্য আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যকে অনেকে মহাকাব্য বলিতে চান না। আমাদের মতে ইহা মহাকাব্যের সকল লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও ইহাকে আমরা এপিকের লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাই এবং এপিক্ যদি মহাকাব্য হয় তাহা হইলে মেঘনাদবধ কাব্য নিঃসন্দেহে মহাকাব্য। কবি স্বয়ং "গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত" এই বাক্যে তাহার আভাসও দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যকে অনেকে আবার মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা কবির মৌলিক রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। মৌলিক রচনা কাহাকে বলে প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাউক। কোন অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ নূতন নূতন ভাব ও কল্পনা সম্বলিত কাব্য লিখলেই কি তাহাকে মৌলিক বলা যায় এবং পূর্ব্ব কবিদিগের আদর্শ, বিষয়, ভাব এবং কল্পনা, কোথাও একটী উপমা, কোথাও একটী নাম, কাব্যান্তর হইতে গ্রহণ করিয়া কাব্য লিখিলে তাহাকে মৌলিক বলা যায় না? মহাকবি ভবভূতিতে কালিদাসের প্রতিবিম্ব এবং উভয়েই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়, কিন্তু কালিদাস ও ভবভূতির মৌলিকতা সম্বন্ধে কি কেহ সন্দিহান হইবেন? মহাকবি মিল্টনের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে এইরূপ অনেকের ধারণা বড় অনুকূল ছিল না। কারণ মিল্টন পাঠ করিতে করিতে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের অনেককেই মধ্যে

* ইহা মহাকবি বাল্মীকিরও জানা ছিল। রামায়ণে তাহার নিদর্শন আছে। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার রামায়ণের টীকায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মধ্যে মনে পড়ে এবং তাঁহাদের ভাব ও কল্পনার প্রতিবিম্ব দেখা যায়—তাঁহাদের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু বহুদিনের আলোচনা ও সমালোচনার পর সে সংস্কার গত হইয়াছে এবং মিল্টনের মৌলিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; মৌলিকতার প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে এবং অন্ধ অনুকরণেরও একটা সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই মৃত্তিকা, সেই কাষ্ঠ, সেই ইষ্টক, সেই প্রস্তর এবং একই উপকরণ লইয়া একই উদ্দেশ্যে কেহ মন্দির, কেহ মস্‌জিদ্‌, কেহ টোপ, কেহ প্যাগোডা, কেহ পিরামিড, কেহ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিল। একে অন্যের ছায়াপাতও হইল; একে অন্যের আদর্শ গ্রহণ করিল কিন্তু কেহই মৌলিকতার গৌরব-মুকুট লাভে বঞ্চিত হইল না। মিশরীয় স্থাপত্যে হিন্দু-স্থাপত্যের ছায়াপাত লক্ষিত হয়। বৌদ্ধ মিশরীয় স্থাপত্যের সহিত চৈনীয়ের আদান প্রদান অনুমিত হয়। রোমক স্থাপত্যে গ্রীক আদর্শ গৃহীত হয় কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ, মিশরীয়, চৈনীয়, গ্রীক, গথিক, পারস্য এবং মোগল প্রভৃতি স্থাপত্য স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিতেছে কি না তাহাই দ্রষ্টব্য। সহস্রের মধ্যে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে কি না, প্রত্যেক স্থপতির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় কি না তাহাই বিবেচ্য। স্থাপত্যশিল্পেও যেমন চিত্রশিল্পেও তদ্রূপ এবং আর সকল শিল্পসম্বন্ধে যে কথা—সাহিত্য-শিল্পেও সেই কথা।

পূর্ব্বকবিগণকে আদর্শ করিলে মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না কিন্তু তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণে কৃতিত্ব নাই। তাঁহাদের কল্পনা ও ভাবাদির অপহরণে অপযশ আছে। পুরাতনকে যিনি নূতন করিয়া গড়িতে পারেন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একত্র করিয়া যিনি তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, সামান্য বিষয় লইয়া যিনি বিরাটের সৃষ্টি করিতে পারেন, যিনি নবীন আশায়, নূতন ভাষায়, নবোৎসাহে ও অভিনব কৌশলে জাতীয় জীবনে নবপ্রবাহ সঞ্চার করিতে পারেন, জগতের মহাকবিগণের সঙ্গে স্বীয় প্রতিভা এবং মৌলিকত্বের গৌরবমুকুট ধারণ করিবার তাঁহার অধিকার আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের নানাস্থানে পূর্ব্বকবিগণের এবং নানাদেশের মহাকাব্যের ভাব, কল্পনা ও বিষয়ের ছায়াপাত আছে। কবি স্বয়ং কাব্যারম্ভে এবং চতুর্থ সর্গের নান্দীতে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি একস্থানে তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন—"You will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter on mount Ida; I only hope I have given the episode as thorough a Hindu air as possible." কখন তিনি লিখিতেছেন—"I fancy the versification more melodious and Virgilian." একস্থানে লিখিতেছেন—"Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father Dasarath like another Æneas." আবার কোথাও আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"If the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghnada. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity." ইত্যাদি নানাস্থানে তিনি আপনার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

এইরূপে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিবার কালে জগতের মহা-মহা কবিগণ পুনঃপুনঃ পাঠকের স্মৃতিপথে আবির্ভূত হন। কাব্যের ১ম সর্গে কৃত্তিবাস, মিল্টন, হোমর এবং ভার্জ্জিল; ২য় সর্গে হোমর এবং কালিদাস; ৩য় সর্গে কাশীরাম দাস, ট্যাসো, ভার্জ্জিল ও হোমর; ৪র্থ সর্গে বাল্মীকি ও ভবভূতি; ৫ম সর্গে কাশীরাম দাস, ট্যাসো, মিল্টন ও হোমর; ৬ষ্ঠ সর্গে হোমর; ৭ম সর্গে বাল্মীকি ও হোমর; ৮ম সর্গে ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্টন, ব্যাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এবং ৯ম ও শেষ সর্গে হোমরকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার মনে পড়ে। তিনি যখন বলেন "দেবকুলপ্রিয়," "দম্ভোলি-নিক্ষেপী" তখন হোমরের "favoured of the gods," "cloud-compelling Jove" মনে পড়ে। তাঁহার "অভ্রভেদী গিরিচূড়া" "heaven-kissing hill' এবং "অন্তরিত" (পরাক্রম) মিল্টনের "inly" স্মরণ করাইয়া

দেয়। প্রেতপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন দেখি "কুন্তল প্রদেশে স্বনিছে ভীষণ সর্প" তখন ভার্জ্জিলের "snake-locks" এবং ট্যাসোর "hissing snakes for ornamental hair" স্মরণ হয়। কাব্যের ১ম সর্গে যখন পড়ি "পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে?" (দেবী কমলার উদ্দেশে উক্ত) তখন ইহা ভার্জ্জিলের "Can such deep hate find place in breasts divine?" অথবা মিল্টনের "In heavenly spirits could such perversion dwell?" প্রভৃতির ভাবানুকরণ বলিয়া মনে হয়। মধুসূদনের "অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি" কালিদাসের "অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ" বাক্যের পুনরাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তিনি যখন বলেন "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" তখন মহাকবি কালিদাসের "ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাংচ্ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি" (অভিঃ শকুঃ—১।৪২) বাক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। কাব্যের ২য় সর্গে যখন দেখি "ফুল-কুল-সখী ঊষা যখন খুলিবে পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া" তখন মিল্টন, স্পেন্সর, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত অনুরূপ ভাবদ্যোতক বাক্য ও পদাবলি মনে হয়। মিল্টন লিখিয়াছেন—

"Now morn, her rosy steps in the Eastern clime
Advancing, sowed the earth with orient pearl."

স্পেন্সর্ পদ্মহস্তা ফুল-কুল-সখী ঊষাকে "rosy-fingered morn" বলিয়াছেন। হোমরের ইহা প্রিয় বর্ণনা ("rhodo-daktulos eos"—গ্রীক ভাষায় গোলাপের নাম 'rhodon')। মধুসূদন বাণীবন্দনায় বলিয়াছেন "ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে"—মিল্টন বলিয়াছেন—yet once more............ I come to pluck your berries" ইত্যাদি। তাঁহার কাব্যে "স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা", হোমরের "A more than earthly fragrance shed" স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইরূপে বহু ভাব, বহু পদ এবং বহুল পদসমুচ্চয় বিবিধ কবির কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কবি তাঁহার পত্রাবলির নানা স্থানে এরূপ ঋণ স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মূল আখ্যানবস্তু কৃত্তিবাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাল্মীকির রামচন্দ্র, রাবণ, মেঘনাদাদি পাত্রগণ, সীতা, সরমা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা প্রমুখ পাত্রীগণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমানাদি বানরগণ লইয়াই পাত্রপাত্রীগণের সমাবেশ করিয়াছেন। মূল রামায়ণের নায়ক নায়িকা, প্রতিনায়ক ও নায়কসহায়গণই মেঘনাদবধ কাব্যের নায়কাদি। কবি কালিদাসের হরপার্ব্বতী, হোমরের জুপিটার এবং জুনো, কৃত্তিবাসের চিত্রাঙ্গদা ও বীরবাহু, কাশীরাম দাসের প্রমীলা, মিল্টনের কোমস বর্ণিত স্যাব্রিণার আদর্শানুযায়ী বারুণী, ভবভূতির মুরলা এবং হিন্দু ও গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণকেই আদর্শ করিয়াছেন। তিনি ট্যাসোর প্রমোদ উদ্যান, দান্তে, ভার্জ্জিল, মিল্টন ও ব্যাসদেবের প্রেতপুরী, হোমরের রণক্ষেত্র ও শ্মশানভূমির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পৌরাণিক স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের ঐশ্বর্য্য একত্র করিয়াছেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক দেশবিদেশের "কবি-চিত্ত-ফুলবন-মধু" লইয়া অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার মৌলিকত্ব এবং প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ, তাঁহার রামরাবণাদি বাল্মীকির নহে, তাঁহার হরপার্ব্বতী কালিদাসের নহে, হোমরেরও নহে, তাঁহার প্রমীলা কাশীরাম দাসের নহে, রঙ্গলালেরও নহে বা ট্যাসোরও নহে; তাঁহার চিত্রাঙ্গদা কৃত্তিবাসের নহে, তাঁহার মেঘনাদ না বাল্মীকির—না হোমরের; তাঁহার সীতা না বাল্মীকির—না ভবভূতির। তাঁহার মুরলা না ভবভূতির—না মিল্টনের, কিন্তু বস্তুতঃ যে কাব্যের জন্য তিনি বহু কবির নিকট ঋণী তাহা আর কোন কবিরই নহে—তাহা মধুসূদনের নিজস্ব—তাহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। বঙ্গভাষায় মেঘনাদবধ কাব্য মৌলিক সৃষ্টি। পণ্ডিত Stopford Brooke যেমন মহাকবি মিল্টনের মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"Milton was a scholar, and in his writings we continually find echoes of what we

fancy we have heard before. But the alchemy of his genius turns the ore of his predecessors into pure gold: he borrows but to improve and give it back as his own. It little matters where this and that came from; the Poem, as we have it is Milton's in every line, in thought, in style, in build, in imaginative and moral power." মিল্টন-ভক্ত বঙ্গীয় কবি মধুসূদন সম্বন্ধেও কি ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে না? স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়গণ এক সময়ে কবিকুলগুরুকুলের "চিত্ত-ফুল-বন মধু" আহরণকারী কবি মধুসূদনের মৌলিকতা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন--"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape." এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে--"As a linguist and a scholar he had scarcely any equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days among his contemporaries who could equal him in his knowledge of the European languages, and in the literature, both ancient and modern, of European countries." এবং শুদ্ধ য়ুরোপীয় সাহিত্যে নহে, তিনি সংস্কৃত, পারস্য, হিব্রু, তেলুগু, তামিল প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাতেও অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

কাব্যের দোষ গুণ : কিন্তু তাঁহার য়ুরোপীয় মহাকবিগণের প্রতি একান্ত ভক্তিই এই উৎকৃষ্ট কাব্যখানিকে নির্দোষ করিতে পারে নাই। এই পক্ষপাতই তাঁহার কাব্যের উৎকর্ষ বিধানের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি গ্রীক কবি হোমরের অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রধান দেবচরিত্রগুলিকে নিতান্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি প্রতিনায়ক লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের চরিত্রে আদ্যন্ত সুসঙ্গতি রাখিতে পারেন নাই। সপ্তম সর্গে লক্ষ্মণের চরিত্র লক্ষ্মণোচিত হইলেও ষষ্ঠ সর্গে তাঁহাকে এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গে রামচন্দ্রকে ভীরু, কোমল-প্রকৃতি, আত্মশক্তিতে আস্থাহীন,সাহসহীন, অতিরিক্ত মমতাশীল, রমণীজনোচিত দুর্ব্বলতার আধার এবং অক্ষত্রিয়ের ন্যায় চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। যেখানে য়ুরোপীয় আদর্শ গৃহীত হয় নাই তথায় রামচন্দ্রই কবির হস্তে বিনয়ী, শিষ্টাচারী, উদার, বন্ধু ও ভ্রাতৃবৎসল, পিতৃভক্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, দেবভক্ত, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুরও দুঃখে সহানুভূতিপরায়ণ ও ক্ষমাশীল প্রকাশ পাইয়াছেন। তথাপি সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে রামলক্ষ্মণ ও হরপার্ব্বতী চরিত্র সম্পূর্ণ সংস্কার-বিরুদ্ধ হইয়াছে। ইহা যে কবির প্রতিভাহীনতার পরিচায়ক তাহা নহে কিন্তু ইহা তাঁহার স্বধর্ম্ম ও জাতীয় সংস্কার-বর্জ্জন জনিত ত্রুটি বলা যাইতে পারে। হিন্দুর অবতার রামচন্দ্র ও তৎপক্ষীয়গণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অভাব ছিল। রামভক্ত বাল্মীকি যেমন রাক্ষসদ্বেষী ছিলেন, গ্রীকভক্ত হোমর যেমন ট্রোজান-বিদ্বেষী ছিলেন, অহিন্দু মধুসূদন তদ্রূপ রাবণভক্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অলঙ্কার শাস্ত্রে যে সকল দোষের উল্লেখ আছে মেঘনাদবধ কাব্যে তাহার অধিকাংশই পাওয়া যায়। ইহার নানা স্থানে ছন্দঃপতন, অযথা যতি-বিন্যাস, দুরান্বয়, শ্রুতিকটুতা, অস্পষ্টার্থ, কষ্টকল্পনা, অনুচিত ও অনুপযুক্ত উপমা ও বাক্য প্রয়োগ, ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও প্রয়োগের উচ্ছৃঙ্খলতা, সংস্কারবিরুদ্ধ চরিত্রাদির সমাবেশ, পাপীর প্রতি কবির সহানুভূতি এবং সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা হেতু সর্ব্বজনানুরাগ পক্ষে ও জাতীয় কাব্য হিসাবে ইহার ন্যূনতা এবং দেবচরিত্রে নীচমানবসুলভ সংকীর্ণ-প্রকৃতি ও পশুভাবের স্ফূর্তি হেতু ইহার উৎকর্ষহীনতা পরিলক্ষিত হয়। কবি স্বয়ং যে তাহা জানিতেন না তাহা নহে। তিনি তাঁহার কাব্যের নানা ত্রুটি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghnada."

"People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghnada is with the Rakshasas. And that is the real truth."

"The great Jotindra has only said that he is sorry, poor Lakshman is repre-

sented as killing Indrajit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not?" এইরূপে আত্মদোষ যেমন স্বীকার করিয়াছেন, কবি তৎসঙ্গে কোন কোন স্থলে কৈফিয়ৎও দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —

"You know that a man's style is the reflection of his mind."

"If the language be not ungrammatical, if the thought be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism, Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism?"

"It is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit."

"I may borrow a neck-tie, or even a waistcoat, but not the whole suit !"

"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own, in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki . I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write as a Greek would have done." ইত্যাদি।

মেঘনাদবধ কাব্যের সকল দোষ সত্ত্বেও ইহার গুণগ্রাহীর সংখ্যাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অর্দ্ধশতাব্দীর অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনার মধ্য দিয়া বঙ্গীয় কাব্যজগতে ইহার শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ইহাই বিশেষত্ব। এই কাব্যের অনুকূল সমালোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। কোন কোন সমালোচকের মতে রাবণের রণক্ষেত্র ও সাগরদর্শন, চিত্রাঙ্গদার সভাপ্রবেশ, মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যান ত্যাগ, প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, অশোক কাননে সীতা-সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের চণ্ডীপূজা, রাবণের যুদ্ধযাত্রা, রাবণের সহিত লক্ষ্মণের বাগ্‌যুদ্ধ, রামের প্রেতপুরী দর্শন, বিপক্ষ দূতের সহিত রামচন্দ্রের সদয় ব্যবহার, প্রমীলার চিতারোহণ রাবণের বিলাপ প্রভৃতি দৃশ্য এবং বর্ণনা অতিশয় মনোরম ও চমৎকারজনক। কেহ কেহ ইহার কোন কোন সর্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তৃতীয়, চতুর্থ এবং কেহ সপ্তম সর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ' Literature of Bengal" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The reader who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe with which few poets can inspire him, and will cordialy pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare." এইরূপ বহু প্রশংসাজনক সমালোচনা ও অনুকূল মত উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে মহাপুরুষের হৃদয় ও মনোবৃত্তি সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাৎলাভে যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, সাধারণ যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং যে ভাষায় বলিয়া থাকেন, যিনি তাহা হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন এবং স্বতন্ত্র ভাষায় বলিতেন, সেই সর্ব্বজন-পূজিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমরা তাহাই উদ্ধার করিয়া এস্থলে ক্ষান্ত হইব। তিনি বলিয়াছেন;—"ঐ একটা অদ্ভুত genius তোমাদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত কাব্য তোদের বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাইই; ভারতবর্ষেও এমন একখানা কাব্য ইদানীং দুর্লভ।" "তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। বলি—আগে ভাল করে দেখ্ না, লোকটা কি বল্‌ছে। তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল, তখনি লোক তার পিছু লাগ্‌লো। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হোল! তা যত পারিস্

লেখ্ না, তাতে কি! সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনো হিমাচলের ন্যায় আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব critics-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে। মাইকেল যে নূতন ছন্দে, যে ওজস্বিনী ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন তা সাধারণে কি বুঝবে?''*

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠকগণ ইহার উৎকৃষ্টাংশ, শ্রেষ্ঠকল্পনা ও ভাব সম্বন্ধে নানা মত পোষণ করেন। কেহ বলেন প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ, কেহ বলেন সীতাকর্তৃক পঞ্চবটীবন বর্ণন, কেহ বলেন দেশোদ্ধারার্থ মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যান ত্যাগ এবং কাহারও মতে শ্মশান দৃশ্য সর্বোৎকৃষ্ট। পরমহংসদেব [স্বামী বিবেকানন্দ] ইহার উৎকৃষ্টাংশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

''যখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকমুহ্যমানা, রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, রাবণ পুত্রশোক ভুলিয়া মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে যাইতে কৃতসংকল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র সব ভুলিয়া—যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠকল্পনা!'' ''যা হবার হোক্‌গে, আমার কর্তব্য আমি ভুলব না—এতে দুনিয়া থাকে আর যাক্—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।'' (উদ্বোধন, ১৩১৫)

মেঘনাদবধ কাব্যে নীতি : অনেকে বলেন, পাপীর সহিত কবির সহানুভূতিবশতঃ কাব্য নৈতিক শক্তিহীন এবং জাতীয় সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকারের অযোগ্য হইয়াছে। নীতির দিক দিয়া দেখিলে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে আমরা এই মতের পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমরা স্থানাভাবে ইহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া সুদ্ধ ১ম সর্গের ১২৭-১২৯, ২৭০-২৭৪, ৪০১-৪০৫, ৬৮৩-৬৮৮

---

* জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস পরিবেশিত এই তথ্য ঠিক নয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মধ্যে এই আলোচনা হয়েছিল। দ্র. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃ ২১১-২১২; ১৩৬৯। সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করছি :

পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন,—ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইয়ুরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

স্বামিজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বল্‌ছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগ্‌ল। এই 'মেঘনাদবধ কাব্য'—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না 'ছুঁচোবধ কাব্য' লেখা হ'ল! তা যত পারিস্ লেখ্ না, তাতে কি? সেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' এখনও হিমাচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব critic-দের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,—''যা নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধ কাব্য-খানা নিয়ে আয়।'' শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' লইয়া আসিলে, বলিলেন,—''পড়্ দিকি—কেমন পড়্‌তে জানিস?''

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিক্‌টা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া, প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''বল্ দিকি—এই কাব্যের কোন্ অংশটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট?''

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে, মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! 'যা হ'বার হ'ক্ গে, আমার কর্ত্তব্য আমি ভুল্‌ব না, এতে দুনিয়া থাক্ আর যাক্'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজিও শিষ্যের হৃদয়ে জলন্ত জাগরূক রহিয়াছে।

পংক্তি; ২য় সর্গের ৬১৬-৬১৯ পংক্তি, ৩য় সর্গের ৩৫১, ৪৫৬ ও ৪৬৪ পংক্তি; ৪র্থ সর্গের ৬২৯ ৬৩০ পংক্তি, ৫ম সর্গের ২২১-২২২, ৫১৪-৫২২ পংক্তি, ৬ষ্ঠ সর্গের ৯২-৯৬, ৪৬৬, ৫৬২-৫৬৭, ৫৭২-৫৭৮, ৫৮৩-৫৯১ পংক্তি; ৭ম সর্গের ২৮৯-২৯০, ৫০৯-৫১০ পংক্তি এবং ৯ম সর্গের ৪৯, ৭৬, ৯১-৯৭, ১০১-১০২, ১০৭ ও ৩৬১ পংক্তির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাপীর প্রতি কবির সহানুভূতি থাকিলেও তিনি পাপের প্রশ্রয় কোথাও দেন নাই। বরং সমগ্র কাব্যে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে পাপের পরিণাম সর্ব্বনাশকর- ধন, মান, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বাহুবল কিছুই পাপীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না—পাপীর পতন অবশ্যম্ভাবী।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরস প্রধান : নীতির এই দিকটী অধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে গিয়া কবি কাব্যখানিকে করুণরস প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। যদিও ইহাতে বীররসের স্থায়িভাব, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ও আলম্বন বিভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তথাপি করুণরসেই ইহার আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং এই রসের স্থায়িভাব শোকই অধিক প্রকট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবির পরদুঃখকাতরতা এবং সহৃদয়তাই ইহার মূল। ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দনে বিষাদের কবি মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়বীণা সেই যে কাঁদিয়া উঠিল দেব-যক্ষ রক্ষোনর সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদ তাহার করুণরাগিণীকে অতিক্রম করিতে পারিল না। মহর্ষির পদাঙ্কানুসরণকারী কবি মধুসূদনের হৃদয়বীণাও তেমনি ভগ্নহৃদয় রাক্ষসরাজ এবং পুত্রশোকাতুরা গন্ধর্ব্ব-নন্দিনীর কাতর ক্রন্দনে এমন কাঁদিয়া উঠিল যে, কবি "বীররসে" ভাসিয়া "মহাগীত" গাহিবার সংকল্প করিয়াও কাব্যখানির আদ্যোপান্ত করুণরসের প্লাবনেই ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার দাম্ভোলিগম্ভীর নাদ, অম্বুরাশি রব, জীমূতমন্দ্র, বীরেন্দ্রবৃন্দের হুহুঙ্কার প্রভঞ্জনস্বন্ এবং কোদণ্ড-টঙ্কার ছাপিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা-দুন্দুভি আদি রণবাদ্যের ভিতর দিয়া শানাইয়েরই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের করুণরাগিণী উত্থিত হইল।

কবির জীবনী ও তাঁহার কাব্য : কবি যে স্বর্ণলঙ্কার মণিময় সভায় "শোকের ঝড়" প্রবাহিত করিয়া দৃশ্যপট উত্তোলন করিয়াছিলেন অশ্রুনীরে তাহার যবনিকা পতন হইবার পর "সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে।" কেন যে এরূপ হইল সে রহস্যের মূল কবির আত্মজীবনীতেই নিহিত। যাঁহারা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. মহোদয়ের লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন "মেঘনাদবধ কাব্য" কবির বিষাদময় জীবন ও তাঁহার অনুতাপ-দগ্ধ-হৃদয়ের একখানি আলোকচিত্র। কবি এমনিই উপাদানে তাঁহার রাক্ষস-রাজকে গঠন করিয়াছেন যে সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে লঙ্কাপতি রাবণকে বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু বিলাসের শিশু, অতৃপ্ত-আশা, অনুতপ্ত প্রাণ কবিকেই দেখা যায়। রাবণের আক্ষেপের মধ্যে কবিকে এবং কবির আত্মবিলাপের মধ্যে রাবণকে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। যথা—

কবির আত্মবিলাপ	রাবণের আত্মবিলাপ
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,	"* * * * হায় রে, কেমনে
তাই ভাবি মনে?	সহি এ যাতনা আমি? * * * *"
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,	
ফিরাব কেমনে?	"* * * * * হায় শূর্পণখা,
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন;—	কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না;—একি দায়!	কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দুর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলমলে!
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী?
নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে;
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু আশার।
প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি; এবে রে পরাণ কাঁদে।
বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল কন্টকগণে,
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে?
যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?
মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্দু জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন?
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!"

এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক শিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
"তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি: আমি কহিতে অক্ষম."

"* * * * রণ রঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে।"

"* * * * যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;
রণক্ষেত্র যাত্রী আমি; কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি! চিরকাল পাব;
বৃথা রাজ্য সুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। * * * * * * *"
"ছিল আশা মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে!
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
* * * * * *
* * * বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,-
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিবিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? * * *

এইরূপ, কবির আত্মজীবনের অন্যান্য দিক তাঁহার কাব্যবর্ণিত চরিত্রগণের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘনাদবধ কাব্য যেরূপ বিষাদের কাহিনী কবির জীবনও তাহাই, কিন্তু ইহাই তাঁহাকে চিরযশস্বী করিয়াছে। সুতরাং, কবিকল্পিত প্রেতপুরীর পুণ্যক্ষেত্রবাসী দশরথের কথায় আমরাও কবির উদ্দেশে বলিতে পারি—

"পুড়ি ধূপ-দানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পুরিবে ভারত ভূমি, যশস্বি! সুযশে!" ❑

এলাহাবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯১০ খৃস্টাব্দে রচিত

মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা

দীননাথ সান্যাল

জন্ম ২৫শে জানুয়ারী, ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দ শনিবার।

মৃত্যু ২৯শে জুন, ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ, রবিবার।

মধুসূদনের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে একটা কথা হৃদয়ে স্থায়িভাব ধারণ করে এই যে, তিনি আজীবন সাহিত্য-সেবী ছিলেন। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ় বয়সে, কি সুখে, কি দুঃখে এমন কি, যখন অর্থাভাবে অন্নাভাব পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তখনও এবং যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখনও, সাহিত্যের চর্চ্চা ও সেবা তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। বাল্যে পাঠশালায় বালক সুলভ অমনোযোগ তাঁহার ছিল না। বাড়ীতে জননীর কাছে শিখিয়া তিনি রামায়ণ ও মহাভারত আবৃত্তি করিয়া পড়িতেন এবং বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে শুনাইতেন। কলিকাতায় হিন্দু স্কুলে পড়িবার সময়ে ইংরাজি সাহিত্যে তিনি সহপাঠীদের অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী হইয়াছিলেন। পরন্তু, ইংরাজিতে সুপাঠ্য কবিতাও সহজেই রচনা করিতে পারিতেন। এইকালে তিনি পারসীক ভাষাও শিখিয়াছিলেন এবং সুন্দর সুন্দর 'গজল' গাহিয়া সহপাঠীদের শুনাইতেন। কালে, তিনি যে একজন বড় কবি হইবেন, ইহা তিনি পাঠদ্দশাতেই নিজের অন্তরে বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সহপাঠীদের কাছেও মধ্যে-মধ্যে সে ভাব প্রকাশ করিতেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা-সম্বন্ধে তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে ক্রমে-ক্রমে অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভা তিনি আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পান নাই। হিন্দু স্কুলে তিনি উর্দ্ধতম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই স্কুলে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন এবং ইহার কিছুদিন পরেই ১৯ বৎসর বয়সে (১৮৪৩ খ্রীঃ-অব্দে) অকস্মাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন লালসা প্রবল থাকায়, ইহার পরে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পিতার অর্থ-সাহায্যে বিসপ্‌স্-কলেজে অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত, তিনি গ্রীক্, লাতিন্ ও সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করেন।

১৮৪৮ খ্রীঃ-অব্দে ২৪ বৎসর বয়সে তিনি জীবিকা-উপার্জ্জনার্থ মাদ্রাজে গিয়া, সেখানে ফিরিঙ্গী-বালকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। তাহা ছাড়া, সেখানকার বিবিধ ইংরাজি পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু অর্থের সহিত সুখ্যাতি ও অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিতা তাঁহার মজ্জাগত। মাদ্রাজে থাকিতে-থাকিতে তিনি পৃথ্বীরাজ অবলম্বনে The Captive Lady-নামে এক কাব্য-পুস্তক এবং তৎসঙ্গে The Visions of the Past নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। মাদ্রাজে শিক্ষিত সমাজে এবং ইংরাজদিগের মধ্যেও তাঁহার Captive Lady-র সবিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মুসলমান সম্রাট্ আল্‌টামাসের দুহিতা রিজিয়াকে নায়িকা করিয়া "Rizia" নামে ইংরাজিতে একখানি নাট্য-কবিতা রচনা করেন। ইহার পাণ্ডুলিপি এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু গ্রন্থখানি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সময়ে তিনি রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্ নাম্নী এক ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিবাহ তাঁহার পক্ষে সুখের হয় নাই। কিছুকাল পরে রেবেকার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কন্যা হেনিরিয়েটাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীই আজীবন মধুসূদনের সুখে, দুঃখে সমভাগিনী ছিলেন।

মাদ্রাজে অবস্থান-কালে উল্লিখিত সাহিত্য চর্চ্চা ছাড়া, তিনি কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা-চর্চ্চা করিতেন, তাহা তাঁহার তৎকাল লিখিত এক পত্রে বর্ণিত আছে :

"Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here, is my routine:—6-8 Hebrew, 8-12 School, 12-2 Greek, 3-9 Teligu and Sanscrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?"

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষাকে উজ্জ্বল করিবার বাসনা তাঁহার মনে এই সময় হইতেই ধূমায়িত হইতেছিল। প্রবাসে থাকিয়া চর্চ্চা অভাবে তিনি বাঙ্গালা ভুলিয়া যাইতেছিলেন বলিয়া, কলিকাতায় তাঁহার এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌কে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। ইহাই ভবিষ্যতের মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনাদি কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মাদ্রাজে তিনি সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কাল ছিলেন। এই প্রবাস-কালে প্রথমে তাঁহার মাতা এবং তৎপরে তাঁহার পিতা ইহালোক ত্যাগ করেন। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, তাহা বেদখল হইবার উপক্রম হইলে, বন্ধুর উপদেশে ১৮৫৬ খ্রীঃ-অব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। বেশী কিছু সম্পত্তি লাভ হইতে পারে, এইজন্য মধুসূদন প্রথমে আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; শুধু বন্ধুর সদুপদেশে বঙ্গের মধুকে ... বঙ্গে আসিতে হইয়াছিল। লোক দৃষ্টিতে ইহা সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আসা হইলেও, ভবিষ্যৎ ঘটনায় বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে বঙ্গ-মাতার শুভ হস্ত বিদ্যমান ছিল। এইরূপ সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই জগতে বৃহৎ-বৃহৎ কার্য্য সাধিত হয়।

কলিকাতায় আসিয়া অর্থাভাবে তাঁহাকে সামান্য চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কলিকাতা পুলিশ আদালতে প্রথমে কেরাণী, পরে 'দভাষী' হইয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকিলেন। ইংরাজি সংবাদ-পত্রাদিতে লিখিয়াও কিছু-কিছু অর্থাগম হইত। এই সময়ে ইংরাজ-মহলে নাট্যাভিনয় দেখিয়া কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা নাট্যাভিনয়ের অনুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী নাটক কোথায়? বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল বটে; কিন্তু শিক্ষিতেরা তাহাতে প্রীত হইতে পারেন নাই। বাঙ্গলা-অভাবে মধ্যে মধ্যে ইংরাজি-নাটকাভিনয় করিয়া, তাঁহারা অভিনয়-পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। ক্রমে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব'-আদি নাটক প্রকাশিত হইলে, তাহাই মধ্যে-মধ্যে অভিনীত হইত। পরে, শুভদিনে, শুভযোগে, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে ও ব্যয়ে বেলগেছিয়া-ভবনে স্থায়ী নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদের অনুরোধে পণ্ডিত রামনারায়ণ শ্রীহর্ষদেব-প্রণীত সংস্কৃত রত্নাবলী নাটিকা অবলম্বনে রত্নাবলী নামে একখানি নাটক লিখিলেন এবং উচ্চপদস্থ ইংরাজ শ্রোতাদিগের জন্য উহার ইংরাজি অনুবাদের ভার মধুসূদনের উপর অর্পিত হইল। বলা বাহুল্য, তিনি এ কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ ইংরাজি লিখিবার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতার জন্য ইংরাজদিগের কাছেও প্রভূত প্রশংসা পাইয়াছিলেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ অধুনা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক, লক্ষ্য করুন, কেমন ঘটনা পরম্পরা দ্বারা বঙ্গ-মাতা মধুসূদনকে স্বীয় ক্রোড়ে টানিতেছিলেন!

মহাসমারোহে অভিনয় হইয়া গেল। বিস্তর অর্থব্যয় হইল। এই উপলক্ষে একদিন মধুসূদন তাঁহার বন্ধু গৌরদাসকে বলিলেন যে, রাজারা একখানি অকিঞ্চিৎকর নাটকের অভিনয়ের জন্য এত অর্থ-ব্যয় করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তদুত্তরে গৌরদাস বলিলেন—তা বটে; কিন্তু ভাল নাটক কোথায়?—তখন যেন সরস্বতীই মধুসূদনের মুখ দিয়া বলাইলেন—ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।—বাঙ্গলায় অনভিজ্ঞ, ইংরাজি-ভক্ত, মাইকেল মধুসূদনের মুখে এই কথা শুনিয়া, গৌরদাসবাবু হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহার কয়েকদিন পরেই মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপির খানিকটা গৌরদাস-বাবুর হস্তে দিলেন। রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ-সূত্রে পাইকপাড়ার রাজাদের সহিত

এবং মহারাজা (তখন বাবু) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই মাইকেলের বাঙ্গলা-নাট্য-রচনা দেখিয়া বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হইলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত এবং পর বৎসরে সবিশেষ সমারোহে বেলগেছিয়া নাট্য-শালায় অভিনীত হয়। রাজাদের অনুরোধে মধুসূদন ইহার ইংরাজি অনুবাদও করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ গ্রন্থও অধুনা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় সাহিত্য সেবায় সুমধুর আস্বাদন পাইয়া, মধুসূদন এখন হইতে এই কার্য্যে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

ইহার পরে তিনি দুইখানি প্রহসন রচনা করেন--"একেই কি বলে সভ্যতা?" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"। দুইখানিই আজ পর্য্যন্ত প্রহসনের রাজা।

ইহার পরেই মধুসূদন গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' নামক আর একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে তিনি ইংরাজির অনুকরণে পদ্যাংশে অমিত্রচ্ছন্দ প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন।

যেমন গৌরদাসের সহিত কথোপকথন হইতে শর্ম্মিষ্ঠাদি নাটকের উৎপত্তি, তেমনই একদিন যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাঙ্গলা-নাটক সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেই তিলোত্তমাদি অমিত্রচ্ছন্দোময় কাব্যের উৎপত্তি। মধুসূদন বলিয়াছিলেন যে, যতদিন বাঙ্গলা-ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন উত্তম নাটক-সৃষ্টি অসম্ভব। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন, বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন অসম্ভব, এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, মধুসূদন বলেন যে, সংস্কৃত জননীর দুহিতার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি তিলোত্তমাসম্ভবের ১ম ও ২য় সর্গ লিখিয়া যতীন্দ্রমোহনকে দেখাইলেন। তখন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা (তখন বাবু) রাজেন্দ্রলাল, উভয়েই এক বাক্যে মধুসূদনের সফলতা স্বীকার করিলেন। তাহার পরে, তিনি আরও দুই সর্গ লিখিয়া, কাব্যখানি শেষ করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উহার পাণ্ডুলিপি মহারাজার হস্তে অর্পণ করেন। প্রথমে মহারাজার ব্যয়েই উহা মুদ্রিত হয়। মহারাজা উহার পাণ্ডুলিপি অমূল্য রত্নের ন্যায় সযত্নে বহুকাল রক্ষা করিয়া, অবশেষে মহারাণী-ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-শালায় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন ইহার ইংরাজি অনুবাদও করিতে আরম্ভ হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশের পরে বাঙ্গলায় এক অশ্রুতপূর্ব্ব তুমুল কল্লোল কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। যাঁহাদের কাছে পয়ার, ত্রিপদী আদিই কবিতার নামান্তর ছিল, তাঁহারা অমিত্রচ্ছন্দে বাঙ্গলা কাব্য দেখিয়া কতই না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এমন-কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় গুণগ্রাহী লোকও প্রথম-প্রথম ঐ দল ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পরে, মেঘনাদবধ প্রকাশিত হইলে, তিনি উহার একান্ত পক্ষপাতীই হইয়াছিলেন। লোকের বিপদে যেমন মধুসূদন, মধুসূদনের বিপদে তেমনই বিদ্যাসাগর---ইহা কেবল তাঁহার ঐ গুণগ্রাহিতার ফল। অবশ্য কতক গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ প্রথম হইতেই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের ও কবিত্বের গুণ ও রস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ইত্যাদি মহোদয়গণ প্রধান। তিলোত্তমাসম্ভবের উৎসর্গ-পত্র দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল, প্রথম প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের অনাদর হইবে; কিন্তু সে অনাদর স্থায়ী হইবে না; ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে অমিত্রচ্ছন্দের আদর বাড়িবেই বাড়িবে। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিলোত্তমাসম্ভবের পরে অবিলম্বে তিনি মেঘনাদবধে হস্তক্ষেপ করেন। তখন মধুসূদনের প্রতিভাগ্নি পূর্ণ তেজে দীপ্যমান। সুতরাং অল্পকাল-মধ্যেই তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথম ভাগ এবং পর-বৎসরেই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যেই আবার, কৃষ্ণ বিরহ-

বিধুরা রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম অবলম্বনে ব্রজাঙ্গনা নামে ক্ষুদ্র একখানি গীতি-কবিতা-পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে, তিনি সুভদ্রা-উপাখ্যান নামে অমিত্রচ্ছন্দোময় একখানি নাটক রচনা করেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী হইবে না বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তাহা আর প্রকাশিত হয় নাই। মাদ্রাজে থাকিতে তিনি Rizia-নামে যে একখানি নাট্য-কবিতা ইংরাজিতে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ কারণে তাহাও আর হয় নাই। ইহার পরিবর্তে, তিনি নটকুল-শিরোমণি কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের উপদেশে রাজপুতানার ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কৃষ্ণকুমারী নামে একখানি বিয়োগান্ত নাটক লেখেন। বঙ্গ-সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটকের মধ্যে ইহাই প্রথম।

এই সময়েই তিনি ইতালীর কবি Ovid-এর Heroic Epistles-নামক কবিতা-পুস্তকের আদর্শে বীরাঙ্গনা-কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানি অমিত্রচ্ছন্দে রচিত। ছন্দে, ভাষায় ও কবিত্বে ইহা মধুসূদন-বৃক্ষের পরিণত ও অমৃতময় ফল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল মধুসূদন অবিশ্রান্ত-ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন;—ইহার ফলে তিনখানি নাটক, দুইখানি প্রহসন এবং চারিখানি কাব্য। সকলগুলিই আবার বাঙ্গলা-সাহিত্যে যুগান্তর-প্রবর্ত্তক!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়েই মধুসূদনের প্রতিভাগ্নি পূর্ণতেজে দীপ্যমান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মধুসূদন এই সময়েই ইউরোপ-যাত্রা সংকল্প করিলেন। আরও কত গীতি-কাব্য, কত নাটক, বীরাঙ্গনার আরও কয়েকখানি পত্রিকা—নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বোধ হয়, তিনি ইউরোপে না গিয়া, এদেশে থাকিলে তত অর্থাভাব-ক্লিষ্ট হইতেন না;—মনের সুখে সাহিত্য-সেবা করিতে পারিতেন। ইউরোপে গিয়া অর্থ-ক্লেশে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল; —কেবলমাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী তাঁহার প্রতিভাগ্নির শেষ শিখা। সাহিত্য-চর্চ্চার মধ্যাহ্নে মধুসূদনের ইউরোপ-গমন, কি তাঁহার নিজের পক্ষে, কি তাঁহার দেশের পক্ষে,—কোন পক্ষেই শুভজনক হয় নাই। যাহা হউক, যাইবার সময়ে তিনি বঙ্গ-মাতাকে ভুলেন নাই। যে সুললিত "মিনতি"-গীতি গাহিয়া তিনি বঙ্গ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আজ আমাদের তাঁহার মহাযাত্রাই মনে হয় এবং চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠে; তাঁহার কামনা সফল হইয়াছে;—বঙ্গ-মাতার "মনঃ-কোকনদ" "মধুহীন" না হইয়া বরং মধু-পূর্ণই হইয়া আছে এবং থাকিবে।

তিনি যে শুধু ব্যারিষ্টার হইবার জন্যই বিলাত গিয়াছিলেন, তাহা নহে। সেখানে ইউরোপের উৎকৃষ্ট ভাষা-সকল ভাল করিয়া শিক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং এইজন্যই তিনি ইংলণ্ডে না থাকিয়া সপরিবারে ফ্রান্স-দেশে ভার্সেলি নগরে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। ইউরোপ-প্রবাসকালে তিনি যেরূপ আর্থিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়। অনেক সময়ে সপরিবারে অনাহার-ভীতি বা দেনার দায়ে জেলে যাইবার আশঙ্কা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তবু কিন্তু আমরা এমন দুর্দ্দিনেও সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই। সেই সময়ে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে আছে—

"Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe."

সাহিত্য-চর্চ্চায় এই যে আগ্রহ ও আনন্দ, ইহা অপূর্ব্ব! মধুসূদন এই আনন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্তু ইহা শুধু যে নিজের আনন্দের জন্য, তাহা নহে। নানা দেশের নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়া মাতৃ-ভাষাকে উজ্জ্বল করিবেন, ইহাই তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর গৌরদাসকে তিনি যাহা

লিখিয়াছিলেন, সে কথা এখনও আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য :

"I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz Italian, German and French languages—which are well worth knowing for their literary wealth You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state--intellectual of course Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue Do you think England, or France, or Germany, or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the nobel ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue That is his legitimate sphere--his proper element European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe, but when we speak to the world, let us speak in our own language Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue Here is a bit of 'lecture' for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays! I assure you, they are nothing of the sort. I should swarn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language"

এই 'লেকচার'টি এখনও এদেশের "শিক্ষিত"দিগকে শুনাইবার দরকার আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম। মধুসূদন যখন ফ্রান্সে কষ্টে দিনাতিপাত করিয়াও একাধিক ইউরোপীয় ভাষা শিখিতেছিলেন, তখনও সেই সুদূর প্রবাসে বসিয়া তিনি জননী জন্মভূমিকে ভুলেন নাই। বাল্যের সেই বটগাছ, কপোতাক্ষ নদ, শ্যামা পক্ষী—সেই বিজয়া দশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, দেব-দোল- সেই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ—সকলই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সেই সব এবং আরও নানাবিধ মনোভাব একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভার্সেল্ নগরে বসিয়া ইতালীয় কবি Petrarca-র আদর্শে উহা লিখিত। ইহাই বাঙ্গলায় Sonnet-জাতীয় কবিতার প্রথম পুস্তক।

ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার যশঃ-সৌরভ বঙ্গময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন "মেঘনাদবধ" বি.এ. পরীক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক; নর্ম্যাল স্কুলেও উহা পাঠ্য; পদ্যপাঠে পড়িয়া পল্লী-বালকও "পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুল পতি" মুখস্থ করিতেছে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মধুসূদন ছয় বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টারী কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও প্রতিভা-সম্পন্ন লোকের যেরূপ আয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। আয় যাহা হইত, তাহা নূতন ব্যারিষ্টারের পক্ষে কমও নহে। কিন্তু তাঁহার অমিতব্যয়িতা দোষে সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে কেবল দুঃখ-কষ্টই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে হাইকোর্টে চাকরি লইতে হইয়াছিল। তিনি ইউরোপে থাকিতেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার কবিপ্রতিভা নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে "The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again."—(১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত পত্র)। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতেও ইহার ইঙ্গিত আছে।

তবু তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় সুখ পাইতেন বলিয়াই, মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লিখিতেন। ইউরোপ-

প্রবাস-কালে সীতার বনবাস অবলম্বনে Queen Seeta-নামক একখানি কাব্য ইংরাজিতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলায় সিংহল-বিজয়, পাণ্ডব-বিজয়, সুভদ্রা-হরণ ও দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর কাব্যাকারে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ছন্দ ও ভাষা তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বুঝিয়া, তিনি উহার অনেক স্থল পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও করিতে পারেন নাই। বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় ভাগ লিখিবার ইচ্ছা প্রথম হইতেই ছিল; কিন্তু নির্ব্বাণ অগ্নি কোন কাজেই আসিল না!

কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টারি কার্য্যে তিনি তেমন সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না; অর্থ-কষ্ট দিন-দিন বাড়িতে লাগিল;— তখন, কখনও চিত্ত-বিনোদনার্থ, কখনও বা সামান্য অর্থোপার্জ্জনার্থ, মধ্যে-মধ্যে সাহিত্যের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহার ফলে, কতকগুলি নীতি-মূলক কবিতা (রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা ইত্যাদি) হেক্টর-বধ ও মায়া কানন নাটক-দ্বয়। দারিদ্র্যের সহিত রোগ দেখা দিল। "মায়া-কানন" মৃত্যু-শয্যায় লিখিত বলিলেও চলে। 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকও আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই।

আরম্ভেই বলিয়াছি যে, মধুসূদন আজীবন সাহিত্য-সেবী ছিলেন। বাল্যে জননীর ক্রোড়ে তিনি রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া আনন্দ পাইতেন। তৎপরে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই তিনি সাহিত্য-চর্চ্চাকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম করিয়াছেন—মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত হয়েন নাই। বাঙ্গলা-সাহিত্য-সেবায় তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"—হয় শরীর-পাতন, না হয় কার্য্য-সাধন, ইহাই তিনি সাহিত্য সেবার মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত সকল গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রে যে একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন মুদ্রিত থাকিত, তাহা ঐ মন্ত্রের দ্যোতক। একদিকে হস্তী, প্রাচ্যের দ্যোতক; আর একদিকে সিংহ, প্রতীচ্যের দ্যোতক। উভয়ের মধ্যে (কাব্য-প্রতিভা) রবি নিম্নের (বঙ্গ-সাহিত্য) শতদলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক প্রায় সকল সংস্করণেই এই সাঙ্কেতিক চিহ্নটি পরিত্যক্ত হইতেছে। মধুসূদনের গ্রন্থের সহিত উহা চিরমুদ্রিত থাকা উচিত;—কারণ, উহাই তাঁহার সাহিত্য-সেবার মূলমন্ত্রের সঙ্কেত।

যাহা হউক, রোগে, অর্থাভাবে, ঋণ-দায়ে প্রপীড়িত হইয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, মধুসূদন বন্ধুদের পরামর্শে কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার তত্ত্বাবধানে মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রীকে রাখিয়া, নিজে কলিকাতা General Hospital-য়ে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার শেষাবস্থা। সেখানে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার ইহলোকের সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়া গেল। ইহার ৩ দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয়ই তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ সমাধি-স্তম্ভ করিবেন, এই ভাবিয়াই মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দে একটি ছোট সমাধি-লিপি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, হা হতভাগ্য দেশ! এত বড় কবির জন্য একটি সামান্য সমাধি-স্তম্ভ করিতে ১৫ বৎসর লাগিল! তাহাও আবার, ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র—সকল শ্রেণীর লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া! যাহা হউক, ১৫ বৎসর পরে কোনরূপে কলঙ্ক-মোচন হইল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে কবির স্বরচিত সমাধি-লিপি তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা সেক্সপিয়ারের সমাধি-লিপির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, উহার আরম্ভ-ভাগ তাহারই অনুকরণে। সেক্সপিয়ারের সমাধি-লিপিতে আছে—

"Stay, passenger, why goest thou by so fast?
Read, if thou canst, whom envious death hath plast
Within this monument, Shakespeare."—ইত্যাদি

মধুসূদনের সমাধি-লিপি—

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কবির এ আহ্বান গৌড়জনের কর্ণে বৃথা হয় নাই। সমাধি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরে প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু দিনে বৃষ্টি-বাদলের বাধা না মানিয়া শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাধি-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া, কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্য

ইহা প্রথম প্রথম দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইত। ১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গের শেষ পর্য্যন্ত ১ম খণ্ড; ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম সর্গ, ২য় খণ্ড। ১২৬৭ সাল ২২শে পৌষে ইহার প্রথম খণ্ড এবং ১২৬৮ সালের প্রারম্ভে ২য় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৬৯ সালে ২৫শে ভাদ্র ১ম খণ্ডের এবং কয়েকমাস পরে ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। প্রথমবারে ইহার প্রচ্ছদ-পত্রে কালিদাসের "রঘুবংশম্" হইতে নিম্নলিখিত দুই পংক্তি উদ্ধৃত ছিল---

"—কৃতবাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ
মণৌ ব্রজসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

কিন্তু তার পরে, দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ইহার পরিবর্তে মধুসূদনের সাহিত্য-সেবার মূলমন্ত্র (শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্") সম্বলিত একটি সাঙ্কেতিক চিত্র উহার স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। এত কাল ধরিয়া উহা মধুসূদনের সকল গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা শোভিত করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা অনেক প্রকাশকগণ উহা বর্জন করিতেছেন।

প্রথম বারে গ্রন্থারম্ভে নিম্নলিখিত "মঙ্গলাচরণ" ছিল—

মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ-ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং স্বদেশীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয় এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি! স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য-বিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এদেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক। কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসর কালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে; বীর কেশরী মেঘনাদ, সুর সুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

কলিকাতা
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণেও এই "মঙ্গলাচরণ" ছিল (২৫শে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল)। পরে, কবি কোন ব্যক্তি-গত কারণে তাঁহার এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে ঐ মঙ্গলাচরণটি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। উহাতে দুইটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তিলোত্তমাসম্ভব-প্রকাশে প্রথমে অনেকে অমিত্রচ্ছন্দকে যতটা অনাদরের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই অল্পকাল মধ্যেই সেই ভাবের সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আর লক্ষ্য করিবার বিষয়, স্বধর্ম্ম-ত্যাগী হইলেও, মধুসূদনের হিন্দুচিত বিনয়ের অভাব ছিল না;—তিনি নিজেকে "দাস" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে কবি বহুস্থল এবং তৃতীয় সংস্করণে আবার বহুস্থল পরিবর্ত্তিত এবং অষ্টম সর্গে ৪৩১ পংক্তি হইতে ৪৯৩ পংক্তি পর্য্যন্ত নূতন রচনা সংযোজিত করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব্ব-পাঠগুলির সহিত সংশোধিত পাঠ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বাক্য-বিন্যাসের উপরে অমিত্রচ্ছন্দের সুর ও সুশ্রাব্যতা কতটা নির্ভর করে।

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে যে সংক্ষিপ্ত টীকা মূলের সহিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তৎকালের উদীয়মান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

এই কাব্যের যে কত সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। কবির জীবদ্দশায় প্রায় প্রতি-বৎসরে ইহার নূতন সংস্করণ বাহির হইত। তাঁহার মৃত্যুর পরে গ্রন্থ-স্বত্ব নিলামে বিক্রীত হইয়া গেলে, ক্রেতা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বহুকাল ধরিয়া অনেক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে স্বত্ব-কালের অবসানে, বহুলোকে ইহার বহুবিধ সংস্করণ বাহির করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হইলে সমাদর ও অনাদর, দুই-ই হইয়াছিল। কিন্তু অনাদর ক্রমে কম হইয়া আসিতেছিল। মেঘনাদবধ প্রকাশে সে অনাদর প্রায় দূর হইয়া গেল। চারিদিকে মধুসূদনের কাব্য-যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যে বৎসরে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর বৎসরে উহা বি. এ. পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। নর্ম্ম্যাল স্কুলেও উহা পাঠ্য হইয়াছিল। যে মধুসূদন একদিন তাঁহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতা-পদ-প্রার্থী হইয়া পরীক্ষায় 'পৃথিবী' লিখিতে "প্রথিবী" লিখিয়াছিলেন, সুতরাং কৃতকার্য্য হয়েন নাই, ভূদেব বাবুই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কিছুকাল পরেই ভূদেব বাবুকে নর্ম্ম্যাল স্কুলে সেই মধুসূদন-প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্য পড়াইতে হইয়াছিল। বালকদিগের জন্য পদ্যপাঠ-তৃতীয় ভাগে ইহার ৪র্থ সর্গের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়া বঙ্গ-বিদ্যালয়-সমূহে পঠিত হইত। এই কাব্যের প্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং কলিকাতার তাৎকালিক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ এমনই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের উদ্যোগে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"য় সকলে সমবেত-ভাবে মধুসূদনকে অভিনন্দন ও মূল্যবান উপহার দিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে হইতেই এরূপ সমাদর, সকল কবির ভাগ্যে ঘটে না। ... ...

বাঙ্গলা-সাহিত্যে যে যুগ এখন চলিতেছে, মধুসূদনই সেই যুগের প্রবর্ত্তক; তাঁহার কাব্য, নাটক ও প্রহসন, সকলগুলিই যুগ-প্রবর্ত্তক। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় যে সাহিত্য বিদ্যমান ছিল, সে সকলই ধর্ম্ম-সাহিত্য। এমন কি, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরও অন্নদামঙ্গলের অংশ মাত্র। বিশুদ্ধ সাহিত্য (Pure literature) বাঙ্গলা-সাহিত্যে ছিল না। সংস্কৃতে ইহার অভাব নাই; প্রতীচ্য দেশেও তাই;—কিন্তু বাঙ্গালায় ছিল না। মধুসূদনই বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং মেঘনাদবধকে সেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে হইবে। ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিত যেমন রাম-চরিত হইলেও ধর্ম্ম-সাহিত্য নহে, মেঘনাদ-বধও তেমনি রামায়ণ-ঘটিত কথা লইয়া রচিত হইলেও, ধর্ম্ম-সাহিত্যের চক্ষে আলোচ্য নহে; উহা নব্য বঙ্গে বিশুদ্ধ-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান জয় পতাকা।

যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন মধুসূদনের সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল-মন্ত্র ছিল, মেঘনাদবধে তাহা

ঘনিষ্ঠভাবে ও চমৎকাররূপে অভিব্যক্ত। ইহার মূল উপাদান বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত; ঘটনা-পরম্পরার সংঘটন হোমরের ইলিয়াড কাব্যের অনুকরণে; ইহার ভাষায় মিল্টনের গম্ভীর ও উদাত্ত স্বর শ্রুত হয় এবং ইহার অলঙ্কার-পারিপাট্য সংস্কৃত কাব্যাদির আদর্শে। তাহা ছাড়া, স্থলে-স্থলে যেমন বাল্মীকি-ব্যাস, কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীদাসাদির পদাঙ্ক লক্ষিত হয়, তেমনি স্থলে স্থলে আবার, Homer, Virgil, Dante, Tasso, Shakespeare, Milton ইত্যাদিকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিকই, তাঁহার উদ্দাম কল্পনা "মধুকরী"র ন্যায় নানা "কবির চিত্ত ফুল-বন মধু" লইয়া এই অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করিয়াছে।

এই কাব্যখানিকে মহাকাব্যই বলিতে হইবে। ইংরাজিতে Epic বলিলে যদি আমাদের ভাষায় "মহাকাব্য" বলিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলেও ইহা মহাকাব্য; আর সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে বিচার করিলেও ইহা মহাকাব্য। রামায়ণের বিশ্ব-বিশ্রুত লঙ্কা যুদ্ধ যে কাব্যের আখ্যান বস্তু; সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যার ক্ষত্রিয়-রাজবংশোদ্ভব, অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এক পক্ষ এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-বিজয়ী প্রবল পরাক্রান্ত রক্ষোরাজ রাবণ ও কুমার ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ অপর পক্ষ; অষ্টাধিক সর্গ ব্যাপিয়া বীর-রস যে কাব্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান এবং তাহার সহিত করুণ, রৌদ্রাদি রস যে কাব্যে চমৎকার-রূপে অভিব্যক্ত;— সে কাব্যকে মহাকাব্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সংস্কৃত-সাহিত্যে কুমারসম্ভব, নৈষধীয় চরিত, শিশুপাল বধাদির ন্যায় বাঙ্গলা-সাহিত্যে মেঘনাদবধও মহাকাব্য। তবে, কবি নিজে ইহাকে "মহাকাব্য" বলিয়া অভিহিত করেন নাই, ইহা তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়-গুণে।

ছন্দ ও ভাষা

কি জড়-জগৎ, কি জীব-জগৎ, সর্ব্বত্রই ক্রিয়া ছন্দোময়ী। মানুষের ভাবোচ্ছ্বাসও ছন্দে প্রকাশিত হয়। নিতান্ত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও বিজয়োল্লাস, যাহা তাহাদের একমাত্র উল্লাসের বিষয়,—তাহাও ছন্দোময় নৃত্যে ও স্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সভ্য জাতিদের মধ্যেও সকল প্রকার ভাবের অভিব্যক্তিতেই, বিশেষতঃ করুণ স্বরে ক্রন্দনে, কিম্বা ক্রোধ-ভরে তর্জ্জন-গর্জ্জনে, একটা ছন্দ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এরূপ হইবারই কথা। ক্রিয়াশীল শক্তির সহিত ক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতেই ছন্দের উৎপত্তি।* সৌরজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের মনোভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ঐ নিয়মে ছন্দের উৎপত্তি। মানুষের মনে প্রবল ভাব-স্রোত যখন কার্য্যে বা কথায় প্রকাশিত হয়, তখন তাহা ছন্দোনিয়মিত নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বাধিত হইয়া, ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ভাবের অভিব্যক্তিতে ছন্দ অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলিয়াই সুন্দর। সৌন্দর্য্য-জনক বলিয়া "ছন্দস" অর্থে দীপ্তি পাওয়া। ছন্দোবদ্ধ রচনা ভাবকে উজ্জ্বল করে। মাত্রা-বিশিষ্ট রচনাই কবিতা এবং বিশেষ-বিশেষ মাত্রা, বিশেষ-বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত। সঙ্গীতে ও নৃত্যে যাহা "তাল," কবিতায় তাহাই ছন্দ। তাল যেমন সঙ্গীতের ও নৃত্যের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক, ছন্দও তেমনই কবিতার উৎকর্ষক; এমন কি, সুলেখকের হাতে ভাবময়ী গদ্য-রচনাতেও একটা ছন্দ লক্ষিত হয় এবং সেইরূপ গদ্যই কবিতার স্বাদ-বিশিষ্ট ও সুমিষ্ট।

সঙ্গীতাদিতে যেমন মাত্রাই তাল-নির্দ্দেশক, কবিতাতে তেমনই মাত্রাই ছন্দোনির্দ্দেশক। মাত্রা-ভেদে তাল যেমন নানাবিধ, মাত্রা-ভেদে কবিতায় ছন্দও তেমনি নানাবিধ। সংস্কৃত কবিতায় মাত্রা উচ্চারণ-গত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে মাত্রা-ভেদ এবং মাত্রার বিশেষ-বিশেষ সমাবেশ, বিশেষ-

* "Rhythm results wherever there is a conflict of forces not in equilibrium"—HERBERT SPENCER

বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কৃতে, চরণে-চরণে শেষাক্ষরের মিল বা অমিলের সহিত ছন্দের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ, সংস্কৃত কবিতা "মিত্রাক্ষর" নহে; অথচ ছন্দোগুণে চমৎকার শ্রবণ-সুখকর।

বাঙ্গলায় হ্রস্ব-দীর্ঘ কেবল অক্ষর-গত; উচ্চারণ-গত নয়। সুতরাং বাঙ্গলায় ছন্দও অক্ষর মাত্রিক। উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার সহিত বাঙ্গলায় প্রায় কোন ছন্দেরই কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল "তোটক" অক্ষর মাত্রিক হইলেও, সংস্কৃতানুযায়ী হ্রস্ব দীর্ঘ-মাত্রানুসারে নিয়মিত এবং আরও দুই একটি বাঙ্গলা-ছন্দে অক্ষর-মাত্রার সহিত উচ্চারণ-মাত্রাও লক্ষিত হয়। তাহা হইলেও, সাধারণতঃ বাঙ্গলায় ছন্দকে অক্ষর-মাত্রিকই বলিতে হইবে।

দুই প্রকারে বাঙ্গলায় এই অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের শ্রুতি-মাধুর্য্য সাধন করা হইয়াছে; যতি-স্থাপন করিয়া এবং চরণের শেষে বা যতির শেষে অক্ষরের "মিত্র"তা অর্থাৎ মিল করিয়া। ফলে, বাঙ্গলায় কবিতামাত্রেই মিতাক্ষর, মিত্রাক্ষর এবং নিয়মিত যতি অর্থাৎ বিরাম বিশিষ্ট। অক্ষরের সংখ্যা-ভেদে ও যতি-ভেদে নানাবিধ ছন্দের সৃষ্টি; কিন্তু সর্ব্বত্রই মিত্রাক্ষর।

মিত্রাক্ষর-বিশিষ্ট নানারূপ ছন্দ থাকিলেও, বাঙ্গলায় চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ারেরই আধিপত্য ছিল। বড়-বড় কাব্যে ক্বচিৎ রস-বিশেষে ত্রিপদী-আদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটান হইত মাত্র। সুতরাং বঙ্গের কাব্য-ভূমি পয়ার-প্লাবিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পয়ারের প্রসার যখন সকল কাব্য-গ্রন্থেই এত বেশী, তখন তাহার নিগূঢ় কারণ অবশ্যই আছে এবং তাহা এই যে, চতুর্দ্দশাক্ষরী মাত্রা ঠিক যেন আমাদের সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মাপে গঠিত। উহা পড়িতে সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে খর্ব্ব করিতে হয় না, দীর্ঘ করিতেও হয় না; অর্থাৎ উহার তাল দ্রুতও নহে, বিলম্বিতও নহে;—উহা সহজ ও স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, ত্রিপদী, চতুষ্পদী অপেক্ষা ইহাতে মিত্রাক্ষরের জটিলতাও কম;—দুই চরণে মাত্র। এইজন্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল বাঙ্গলা কাব্যাদিতেই পয়ারের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হইয়া থাকে।

আদর্শ মিত্রাক্ষর পয়ার রচনা করিতে হইলে, ছন্দ-সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—চৌদ্দ অক্ষরে চরণ, চরণ-দ্বয়ের শেষাংশের উচ্চারণে মিল এবং অষ্টমাক্ষরে যতি অর্থাৎ স্বল্প বিরাম। এই যতি সুশ্রাব্য হইতে হইলে, স্বাভাবিক অর্থাৎ শব্দের শেষে হওয়া উচিত। সুতরাং মিত্রাক্ষর পয়ারে কবির ভাব চারি প্রকার বন্ধনে বন্দী। জেলের কয়েদী, হাতে হাত-কড়ী, পায়ে বেড়ী লইয়া যেরূপ-ভাবে চলে, তাহাতে একটা ছন্দ নাই, বলি না; তাহাতেও সুন্দর ছন্দ আছে, সত্য; কিন্তু সে ছন্দ স্বাধীন ব্যক্তির চলা-ফেরার ছন্দ নহে; তাহা আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। মিত্রাক্ষর পয়ারে কবিতাও তদ্রূপ,—নির্দ্দিষ্ট অক্ষর গণিয়া পা ফেলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে থামিয়া-থামিয়া, চরণে-চরণে মিল রাখিয়া, একটা সুন্দর ছন্দে চলে বটে;—কিন্তু আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক বলিয়াই সুদীর্ঘ পয়ার সজীবতার বৈচিত্র্য-হীন একটা একঘেয়ে ব্যাপার। ছোট-খাট কবিতায় ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ কবিতায় নিদ্রাকর্ষক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "পাখী সব করে রব" ইত্যাদি আদর্শ পয়ার এবং অল্প-স্বল্প বলিয়া মিষ্ট লাগে। কিন্তু অল্প-স্বল্প না হইয়া, যদি উহা ক্রমাগত চলিত, তাহা হইলে উহার আদর্শত্ব রক্ষা করা সহজ হইত না এবং বৈচিত্র্য-হীনতায় উহার মিষ্টত্বেরও হ্রাস হইত। বস্তুতঃ, ভাবকে, ভাষাকে নানাবিধ নিয়মে চালাইতে হইলে, সর্ব্বত্র নিয়ম রক্ষা করা সুকঠিন। যে কোন কাব্য হইতে দীর্ঘ-ব্যাপী পয়ার পড়িলেই দেখা যায়,—কোথাও ভ্রষ্ট-মাত্রা, কোথাও ভ্রষ্ট-যতি, কোথাও মধ্যম মিল বা অধম মিল, নয় ত গোঁজা-মিল। অষ্টমাক্ষরে অথচ একটি শব্দ-শেষে যতিটি হওয়া সব সময়ে সহজ নয়। কাজেই অনেক স্থলে ভ্রষ্ট-যতি-যুক্ত পয়ার, ছন্দ বজায় রাখিয়া পড়িতে গেলে, "তুমি অন্ন

দাকা শীতে" হইয়া দাঁড়ায়।* সুতরাং ছোট কবিতায় মিত্রাক্ষর ভাল লাগিলেও দীর্ঘ ব্যাপী রচনায় উহা নানা রকমে ছন্দ-সৌন্দর্য্য হয় এবং শব্দ সম্পন্ন কবির হাতে তাহা না হইলেও, আড়ষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কয়েক ছত্র অমিত্রাক্ষর কবিতাকে পয়ারে পরিবর্ত্তিত করিলেই, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে কবিতা যে কিরূপ আড়ষ্ট-ভাবাপন্ন হয়, তাহা বুঝা যাইবে

সম্মুখ-সমরে পড়ি বীরবাহু বীর।
অকালেতে যবে গেলা যমের মন্দির।।
কহ, দেবী অমৃতভাষিণী সরস্বতি।
কোন্ রক্ষোবীরবরে করি সেনাপতি।।
রাক্ষসাধিপতি পুনঃ পাঠাইলা রণে।
অমর ব্রহ্মার বরে হেন পুত্র-ধনে।।
কহ, কি কৌশলে তারে মরিয়া লক্ষ্মণ।
নিঃশঙ্কিলা দেবেন্দ্রের সশঙ্কিত মন।।
বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দ মতি।
আবার ডাকিছে তোমা, হে মাতঃ ভারতি।।
বাল্মীকি মুনিরে দয়া করিলা যেমতি।
রসনায় বসি তার, পদ্মাসন পাতি।।
যবে ক্রৌঞ্চ-বধূ সহ তমসার তীরে।
ত্যজিলা পরাণ ক্রৌঞ্চ নিষাদের তীরে।।
তেমতি দাসের প্রতি দয়া কর, সতি।
তব পদাম্বুজ-যুগে এ মম মিনতি।।

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভের কয়েক পংক্তির সহিত উহার ভাব ও ভাষা প্রায় এক হইলেও, মিত্রাক্ষরের বন্ধনে উহা আড়ষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। এইরূপ আড়ষ্ট ভাব দীর্ঘ ব্যাপী হইলেই, একঘেয়েত্ব অনিবার্য্য।**

কবিতাকে এই নিগড়-দায় হইতে মুক্তি দিবার জন্যই মধুসূদন বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। সকল দেশের উৎকৃষ্ট কাব্যাদির সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় থাকিলেও, মহাকাব্য-রচনায় ছন্দে ও শব্দ-গাম্ভীর্য্যে ইংলণ্ডীয় কবি মিল্‌টনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি মিল্‌টনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে ও শব্দগাম্ভীর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গলায় ঐ নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, অসামান্য ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, তিনি এ কার্য্য এমন করিয়া সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, আজিও এ ক্ষেত্রে তিনি একেশ্বর ও অদ্বিতীয়।

এখন দেখা যাউক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের বিশেষত্ব কিসে? - -শুধু বীর বা রৌদ্র রসাদিতে নহে, করুণাদি সকল রসেই উহা যেমন সুন্দর শ্রবণ-সুখকর, তেমনই রসোৎকর্ষক হইয়াছে কেন? উহাতে মিত্রাক্ষরের মিলের মাধুর্য্য নাই, নিয়মিত যতির ছন্দ-সৌন্দর্য্য নাই, তবুও উহা ভাবোদ্দীপক ও সুমিষ্ট কেন?

প্রথমতঃ, মধুসূদন যতির খাতিরে কোথাও বাক্যের সঙ্কোচ করেন নাই। তাঁহার কবিতায় দুই

* "তুমি অন্নদা কাশীতে।"

** রাজেন্দ্র লাল মিত্রও বলিয়াছেন—"the jingling monotony of the-পয়ার।" "সোমপ্রকাশ"-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও বলিয়াছেন —"অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতিতে যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে।"—(সোমপ্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ, ১২৬৭ সাল)

চরণেই ভাবটি শেষ করিবার চেষ্টামাত্রও লক্ষিত হয় না। তাহাতে তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি কোথাও কোনরূপ বাধা পায় নাই। তাঁহার ভাব ও বাক্য যতির বশে নহে; যতিই তাঁহার ভাব ও বাক্যের বশে। সুতরাং যেখানে ভাব শেষ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার যতি। একটা কৃত্রিম বন্ধনে ভাব ও ভাষাকে না বাঁধিয়া, ভাব ও ভাষাকে স্বাধীন ভাবে চলিতে দেওয়ায়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কবিতায় একঘেয়েত্বের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। প্রতি পদেই যতির বৈচিত্র্য। কবি তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই ছন্দ-সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—"I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 1oth, 11th and 12th and so on." এখানে "naturally" কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাবটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই যতি হওয়াই "স্বাভাবিক"। পয়ারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে যতি-স্থাপনের নিয়মে কবিতায় একটা সুন্দর ছন্দ থাকিলেও, অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়ে। ভাবের প্রকাশে স্বাভাবিকতাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব। এই স্বাধীন ছন্দে পদে-পদে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া দীর্ঘ কবিতাতেও একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষিত হয় না এবং শুনিতে কর্ণও ক্লান্ত হয় না। সৈন্যগণ যখন শ্রেণিবদ্ধ হইয়া, নিয়মিত-পরিসর-বদ্ধ হইয়া, নিয়মিত তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, তখন কিয়ৎক্ষণ দেখিতে সুন্দর লাগে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈচিত্র্য-হীনতা বশতঃ তাহা বেশী ক্ষণ ধরিয়া দেখিতে হইলে চক্ষুর ক্লান্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মেলায় যখন লোক-রাশি স্বাধীন-ভাবে চলা-ফেরা করে,—কেহ দ্রুত-ভাবে, কেহ ধীরে, কেহ হাত নাড়িয়া, কেহ ঘাড় বাঁকাইয়া—নানা লোকে নানা রকমে চলা-ফেরা করে—লোক-রাশির এইরূপ বন্ধন-হীন স্বাধীন গতাগতি অনেকক্ষণ দেখিলেও ক্লান্তি-বোধ হয় না। কারণ, ইহাদের চলা-ফেরা স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতায় একটা চমৎকার সৌন্দর্য্য আছে, যাহা কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়াকর্ষক। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের এই স্বাভাবিকতাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। এই স্বাভাবিকতা গুণেই ইহা বীর, রৌদ্র, ভয়নকাদি রসেও যেমন সেই-সেই রসের উৎকর্ষক হইয়াছে, আবার করুণেও এই স্বাভাবিকতা-গুণেই উহা তেমনই মর্ম্ম-স্পর্শী হইয়া আদর্শ করুণ-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিক, আদর্শ অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা স্বাভাবিকতায় ভাবাত্মক গদ্যের ন্যায়, অথচ সঙ্গীতের স্বাদ-বিশিষ্ট।

কবি নিজে, যিনি কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, সকল দেশের সুকাব্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, এবং সঙ্গীতের আস্বাদও যাঁহাকে মুগ্ধ করিত, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

(Bengali Blank Verse) "if well recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English prose, retaining at the same time a sweet musical impression."

মিত্রাক্ষর কবিতায় ক্রম-পরিণতির দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, একঘেয়েত্ব নিবারণের নিমিত্ত, শুধু মিত্রাক্ষরতা-মাত্র রক্ষা করিয়া কত রকম বিচিত্র যতিতে, বিচিত্র গতিতে স্বাধীনতা খুঁজিয়া চলিয়াছে! তাহাতে অক্ষর-মাত্রার কোন নিয়ম নাই; যতিরও কোন নিয়ম নাই। কেবল চরণের শেষে মিল আছে; তাহারও কোন নিয়ম নাই। কাণের সুরে বাঁধা, অথচ ছন্দোময়ী কবিতা; শুনিতেও বেশ মিষ্ট;—ছোট-ছোট গীতি-কবিতায় একঘেয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই;—বেশ লাগে। ইংরাজি গীতি-কবিতাতে এইরূপ বিচিত্র ছন্দের বহুল প্রচলন হইয়াছে;—দেখাদেখি, আমাদের গীতি-কবিতাতেও এইরূপ অনিয়মিত মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরাজির অনুকরণে আর একপ্রকার মিত্রাক্ষর পয়ার প্রচলিত হইয়াছে,—তাহা কতকটা অমিত্রাক্ষরের স্বাদ-বিশিষ্ট অথচ মিত্রাক্ষর। তাহা চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ারেরই মত; কিন্তু যতি অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় ভাবানুযায়ী। সুতরাং, তাহা আবৃত্তি করিতে, ঠিক অমিত্রচ্ছন্দের স্বাদ পাওয়া যায়; অথচ মিত্রাক্ষর। বলা বাহুল্য, এরূপ কবিতার

আবৃত্তি-কালে উহার মিল কাণে তত লাগে না। সুতরাং, উহার মিত্রাক্ষরতা তত সার্থক নহে; অথচ এই মিলের জন্য কবিকে কিছু-না-কিছু বন্ধনে পড়িতে হয়। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দের গতি স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতার দিকে এবং সেই স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের মিল ও যতির মাধুর্য্যের বিনিময়ে অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা ভাব-ব্যঞ্জনার হিসাবে সমূহ লাভ, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কবিতার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, তাঁহার অদ্বিতীয় শব্দ-সম্পদে! উৎসাহ, রাগ, ভয়, বিস্ময়াদি মনোভাব যেমন বিশেষ-বিশেষ দৈহিক আড়ম্বরের সহিত প্রকাশিত হয়, কবিতাতে তাহা প্রতিফলিত করিতে হইলে, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুতাদি রসের প্রকাশে তেমনই তদুচিত বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন। সকল কবিই ইহা বুঝেন। কিন্তু মধুসূদন এ বিষয়ে যেমন মনোযোগী, এমন আর কেহই নহেন। ভারতচন্দ্র কতকগুলি শব্দানুকারী বাক্যের দ্বারা ও দ্রুতগামী ছন্দে "দক্ষ যজ্ঞ নাশ" স্বল্পের মধ্যেই সারিয়াছেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে আর একটা যজ্ঞ নাশ করিতে হইত, তাহা হইলে শব্দানুকারী বাক্যে কুলাইত কি না, সন্দেহ। মেঘনাদবধ কাব্যে কবিকে নানা স্থানে বীর, রৌদ্রাদি রসের অবতারণা করিতে হইয়াছে; তাহাতে আবার ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। কাজেই তাঁহাকে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা রসের বিকাশ করিতে হইয়াছে। শব্দ দ্বারাই যখন কবিকে উৎসাহ, রাগ, ভয়, বিস্ময়াদি ভাব-সকলকে কবিতায় প্রতিফলিত করিতে হয়, তখন রসোপযোগী শব্দ চয়ন করাই ত কাব্য-শিল্পীর প্রকৃষ্ট পন্থা। মধুসূদন তাহাই করিয়াছেন—

"—সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূত-মন্দ্রে : সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীর-মদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারি-স্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) রাবণ-যূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিবাজী, বক্র-গ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্।" ইত্যাদি —

এখানে শব্দ-গুণে বীরোচিত আয়োজনের এই বর্ণনাটিতে উৎসাহ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।

"বাহিরিল অগ্নি-বর্ণ রথগ্রাম বেগে,
স্বর্ণ-ধ্বজ : ধূম-বর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম; চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূত-বৃন্দ-মাঝারে যেমতি
জীমূত-বাহন বজ্রী, ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী,
অশ্ব-পতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে,
মহা ভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে।"

এখানে বাক্যাড়ম্বরে যুদ্ধায়োজনের শব্দময় আড়ম্বরটি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের

উৎসাহময় উদ্যোগটি শুধু যে বায়স্কোপের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে সজীব-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নহে; উহার আনুষঙ্গিক শব্দাড়ম্বরটিও এই শব্দ-চিত্রে যেন সজীবতা লাভ করিয়াছে;—মনে হয় যেন উদ্যোগাড়ম্বরের শব্দটিও কাণে শুনিতেছি। ইহাই ত বাক্যে রস-সৃষ্টি;—ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে মনে যে ভাব হইত, চক্ষু যাহা দেখিত, কর্ণ যাহা শুনিত—বাক্যে তাহাই প্রতিফলিত করা। শব্দাড়ম্বর-ব্যতীত এমন আড়ম্বরময় উদ্যোগের কাব্যোচিত বর্ণনা, এমন শব্দ-চিত্র, আর কিরূপ হইতে পারে? সরল ভাষা তরল ভাবেরই উপযোগী; গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, ভাষাও গাম্ভীর্য্যময় হওয়াই সঙ্গত। শব্দ একটা নির্জীব কাঠের পুতুল নহে, অবহেলার সামগ্রী নহে। উহারও একটা নিজস্ব শক্তি, গুণ ও তদুচিত মর্য্যাদা আছে। নিপুণ শিল্পী সেই শব্দ-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া রসোৎকর্ষ সাধন করেন। "গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী" আর "খুব জোরে যেমন মেঘ ডাকে", "দম্ভোলী-নিক্ষেপ" আর "বাজ ফেলা", কাব্য-শিল্পে সর্ব্বত্র সমশক্তি-সম্পন্ন নহে। ভাবটি যদি অস্পষ্ট গোছের না হয়, আর বাক্যটি যদি নিতান্ত দুর্ব্বোধ না হয়, তাহা হইলে বাক্যাড়ম্বরে ভাবকে কখনই আচ্ছন্ন করিতে পারে না। আবার, ভাব যেখানে স্পষ্ট নয়, সেখানে সহজ বাক্যও গাঢ় কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া থাকে। "কুসুম-স্তবক" বলিলেই যে তাহার রূপ, রস, গন্ধ,—সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর "ফুলের তোড়া" বলিলেই যে সব ফুটিয়া উঠিল, ইহা কখনই হইতে পারে না। দুই-ই সমার্থবাচক হইলেও, রস-সৃষ্টিতে উহাদের পৃথক-পৃথক স্থান। কোনটিই অবহেলার জিনিস নয়; অথচ সকল স্থলেই দুইটি নির্ব্বিচারে ব্যবহৃত হইবারও নহে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অমিত্রচ্ছন্দ যথাবিধি আবৃত্তি করিতে না পারায়, প্রথম-প্রথম এক শ্রেণীর লোক যেমন এই কাব্যের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তেমনই আবার আর এক শ্রেণীর লোক ইহার বাক্যাড়ম্বরে ভীত হইয়া এই কাব্যখানিকে ঐরূপ বাক্যাড়ম্বরের জন্যই নিন্দা করিয়াছেন; এবং এখনও সেরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। রস-বোধ না থাকিলে, কাব্য-পাঠে ঐরূপ বিড়ম্বনা হইবারই কথা। ভিন্ন-ভিন্ন রসের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। কোথা করুণ-রসের গলদশ্রু লোচন, শিথিলাবনত অঙ্গ ও ক্ষীণ স্বর। আর কোথা রৌদ্ররসের বজ্র-মুষ্টি, রোষ-কষায়িত নেত্র, দীর্ঘায়ত দেহ ও ভীম নাদ! বাক্যমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি কি একই প্রকার বাক্য দ্বারা এই দুইটি বিভিন্ন প্রকারের ভাবকে মূর্ত্তিমন্ত করিতে পারেন? কাজেই, উপযোগী শব্দের দ্বারাই শব্দচিত্রে বিভিন্ন রস ফুটাইতে হয়। বীর রৌদ্রাদিতে তদুচিত সংশ্রব শব্দের দ্বারাই সেই-সেই রসের স্বাভাবিক আড়ম্বরময়ী মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বাক্যে রস-মূর্ত্তি-গঠনে ইহাই স্বাভাবিকতা এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট। অলঙ্কার-শাস্ত্র-মতে বীর-রৌদ্রাদিতে শব্দের "দুঃশ্রবত্ব" গুণ বলিয়া গণ্য।

"রৌদ্রাদৌ তু রসেহত্যন্তং দুঃশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ।"—(সাহিত্যদর্পণ)।

টীকা—"আদি শব্দাৎ বীর বীভৎসয়োর্গ্রহণম্।"

বীর, রৌদ্র, অদ্ভুতাদি রসে কবি রসোপযোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার কবিতা এমন ওজোগুণান্বিত হইয়াছে এবং অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতায় ঐ ওজোগুণ যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হইতে পারিয়াছে।

আবার দেখুন, যে রসে শব্দাড়ম্বর অশোভন, শব্দাড়ম্বর যে রসকে নষ্ট করে, সেই করুণ ও শান্ত রসে কবির ভাষা কেমন আড়ম্বর-হীন ও রসোপযোগী। সীতা ও সরমার কথোপকথনের ভাষা কি সরল, সহজ ও স্বাভাবিক! বীর-রসে যিনি লিখিয়াছেন—"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী", তিনিই আবার করুণ-রসে লিখিয়াছেন—"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে ছিনু সুখে।" শোকে যখন শব্দাড়ম্বর থাকে না, তখন করুণ-রসের কবিতায় তাহা থাকিলে সাজিবে কেন? ইহাই

স্বাভাবিকতা; এবং স্বাভাবিকতাই কাব্য-কলার হিসাবে সুন্দর। "লো সহচরি, এতদিনে আজি ফুরাইল জীব লীলা জীব-লীলা-স্থলে আমার!" ইহা শোক-প্রকাশের সহজ ভাষা;—অশ্রুধারার সহিত বাহির হইয়াছে; এবং পাঠককেও অশ্রু-ধারায় সিক্ত করিয়া তুলে। ছন্দের স্বাধীনতার সহিত শব্দ-সম্পদ না থাকিলে, ভাব-ব্যঞ্জনার এমন সুন্দর স্বাভাবিকতা থাকিত না, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতার সহিত এই অসামান্য শব্দ-সম্পদ যেমন বীর, রৌদ্রাদিতে ওজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনই করুণ-রসে সহজ ও সরল বাক্যের প্রয়োগ প্রসাদ-গুণের সহায় হইয়াছে। এই রসোপযোগী বাক্য-প্রয়োগেই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক মনোহারিত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একশ্রেণীর বিজ্ঞ সমালোচকেরা এ কাব্যে রস-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই জলের মত প্রাঞ্জল ভাষা নাই বলিয়া দোষ ধরেন এবং অধিকতর দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃত-অলঙ্কার শাস্ত্রজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত-সমালোচকও বাঙ্গলা কাব্যে বীর-রৌদ্রাদি রস-ব্যঞ্জনায় "পাখী সব করে রব"-এর মত ভাষা চাহেন।

মধুসূদনের শব্দ-সম্পদের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তিনি যে শুধু সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার হইতে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া কাব্য-রসের পুষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে; ইংরাজির অনুকরণেও তিনি অনেক পদ গঠন করিয়া কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। Hope of Troy-এর আদর্শে "রাক্ষস-ভরসা" সুন্দর! এইরূপ "রাঘব-বাঞ্ছা", "কেশব-বাসনা", "অমর-ত্রাস" ইত্যাদি। আবার উপযুক্ত স্থলে তিনি সংস্কৃতের অনুকরণে দীর্ঘ-সমাস-ঘটিত পদও ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; অথচ সুপাঠকের মুখে তাহা অনেক স্থলেই শ্রবণ-সুখকরই হইয়াছে। "কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী", "দ্বিদ-রদ-নির্ম্মিত" পড়িতে কাব্য-পাঠকের রদ-ভঙ্গ হইবার কথা নহে, কাব্য-শ্রোতার কাণেও মন্দ শুনাইবার কথা নহে। ইহা ছাড়া, তিনি বিস্তর ক্রিয়াপদ গঠন করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি কবিতায় ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। ইংরাজিতে বিস্তর বিশেষ্য-বিশেষণ পদ হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন দেখা যায়। ইহাতে শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মধুসূদনও ঐরূপ বিস্তর ক্রিয়াপদ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন;—তাহাতে কথার সংক্ষেপ হওয়ায় কবিতায় ব্যবহারের উপযোগী হইযাছে। এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাঙ্গলা-কাব্যে যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। প্রাচীন কাব্যাদিতে কোন কোন স্থলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। "নির্ম্মিল", "নিবারিবে", "নিবার", "জিজ্ঞাসয়ে"—এ সব ত আছেই; তাহা ছাড়া "মোহিলা", "বুড়াইলে",—এমন কি, "কুলুপিল" ভারতচন্দ্র ব্যবহার করিয়াছেন। মধুসূদন এই আদর্শে বিস্তর ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নূতন বলিয়া "স্তুতিলা", "স্বনিলা", "নির্ঘোষিলা" ইত্যাদি প্রথম-প্রথম যত কাণে লাগিত, এখন অভ্যাস-গুণে তত লাগে না। "কূজন করিল" স্থলে "কূজনিল", "প্রভাত হইল" স্থলে "প্রভাতিল", প্রফুল্ল হইল স্থলে "প্রফুল্লিল", "ছট্‌ফট্ করিয়া" স্থলে "ছট্‌ফটি", "তাপিত হইয়া" স্থলে "তাপি", "শান্ত হইল" স্থলে "শান্তিল", "নির্বীর করিবে" স্থলে "নির্ব্বীরিবে"—এ সবের দ্বারা কাব্যোচিত শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই হইয়াছে। বার-বার "করিল", "হইল" বা "করিয়া", "হইয়া" কবিতায় ভাল শুনাইত না। "ত্রাসো বসুধার ভার" কবিতার ভাষায় শুনিতে সুন্দর। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের ভাষায় ইহাও এক বিশেষত্ব।

তৃতীয়তঃ—মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক বিশেষত্ব বাক্য-বিন্যাসে। গদ্যে বাক্য-বিন্যাস অনেক স্থলেই ব্যাকরণানুযায়ী; ব্যাকরণ সেখানে যে কারকের স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সাধারণতঃ সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া লিখিলেই সুন্দর গদ্য রচনা হয়। কিন্তু কবিতা ভাবের ভাষা। ভাব যে ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই সেই ভাবের স্বাভাবিক ভাষা। এখানে ব্যাকরণের নির্দ্দেশ খাটে না। সকল প্রকার কবিতাতেই সেইজন্য বাক্য-বিন্যাস ভাবানুযায়ী; এমন কি, প্রবল ভাবকে ফুটাইতে

গদ্যেও অনেক সময়ে ব্যাকরণের নির্দ্দেশ না মানিয়া, ভাবের ভাষাতেই ভাবকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে মিলের খাতিরে এবং দুই চরণে ভাব শেষ করিতে গিয়া ভাবের ভাষা অনেক স্থলেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং বাক্য-বিন্যাসও সব সময়ে ভাবানুযায়ী না হইয়া স্বাভাবিকতা হারায়। বন্ধন থাকিলেই ইহা অবশ্যম্ভাবী। যে কোন কবির মিত্রাক্ষরচ্ছন্দী কবিতায় ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সে সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই—দুই চরণে ভাবের শেষ করিতেই হইবে, তাহা নহে—এবং চরণে-চরণে মিল রাখিতে হইবে, তাহাও নহে। সুতরাং ভাব সেই ভাবোচিত স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসের সহিত ফুটিয়া উঠিতে পাইয়াছে। বাক্য-বিন্যাসের এই স্বাভাবিকতা-গুণে মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সকল রসই সুখাস্বাদ্য। এই বাক্য-বিন্যাসের গুণেই তাঁহার বীর-রসে প্রাণ উদ্দীপিত হয়, রৌদ্র-রসে রৌদ্র-মূর্ত্তি যেন চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, ভয়ানকে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে এবং করুণে অশ্রুর উৎস ফুটিয়া যায়।

"————হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে,
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।"

এখানে বাক্য-বিন্যাস কি স্বাভাবিক! মিলের বন্ধন নাই, যতির খাতির নাই; লোকে ভাবের ভাষায় যাহার পরে যে কথাটি বলে, সেইরূপ স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসে ভগ্নদূত কহিতেছে। বাক্যের এই স্বাভাবিক বিন্যাস মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের চমৎকারিত্বের এক নিগূঢ় রহস্য। আবার দেখুন—

রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী;—
"কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি'
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার্ হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃকুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম; মেঘনাদ স্বামী;—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"

এখানে রোষের ভাষায় বাক্য-বিন্যাস চমৎকার স্বাভাবিক হইয়াছে;—রাগে যে কথাটির পরে যে কথাটি হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক তাহাই হইয়াছে। ছন্দের স্বাধীনতা না থকিলে, সুকবির পক্ষেও সব সময়ে এইরূপ রসানুযায়ী বাক্য-সমাবেশের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সুকঠিন। আরও দেখুন—

"সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

এখানে, প্রথমেই "সবিস্ময়ে" পাঠককে সচকিত করিয়া, শেষে "ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি" বলায় ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তিটি যেন পাঠকের মনে স্থায়িভাব ধারণ করিয়া অদ্ভুত রসটিকে গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। "ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে" বলিলে, রসের পাক একটু কাঁচা থাকিয়া যাইত। কবি প্রথমে একস্থলে লিখিয়াছিলেন—

"শুনিলা চমকি' বীর ঘোর সিংহ-নাদ।"

পরে ২য় সংস্করণে উহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন;—

"ঘোর সিংহ-নাদ বীর শুনিলা চমকি'।"

বাক্য-সমাবেশের গুণে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অধিকতর বিস্ময়-ভাব-ব্যঞ্জক, ইহা রসজ্ঞ পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। অমিত্রচ্ছন্দে কবি অবাধ বলিয়া রসোৎকর্ষক বাক্য-সমাবেশে তাঁহার এমন স্বাধীনতা।

করুণ-রসের অভিব্যক্তিতেও বাক্য বিন্যাসের ঐরূপ সুন্দর স্বাভাবিকতা বিদ্যমান। সেইজন্য মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ করুণ-রসেও চমৎকার রসোৎকর্ষক হইয়াছে।

"রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম?"—ইত্যাদি।

ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় না যে, কবির ছন্দোবদ্ধ রচনা পড়িতেছি;—মনে হয়, যেন সত্য-সত্যই লক্ষ্মণের জন্য কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সুভ্রাতৃবৎসল রাম শোক-প্রকাশ করিতেছেন;—বাক্যের সমাবেশ এমনই স্বাভাবিক! এই স্বাভাবিকত্বেই ইহার মনোহারিত্ব।

"—লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীব-লীলা-স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্য-দেশে!
কহিও পিতার পদে এসব বারতা,
বাসন্তি!"

করুণ-রসের এই অভিভাষণে বাক্য-বিন্যাসের স্বাভাবিকতাই ইহার সৌন্দর্য্য-রহস্য। অধিক উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই বাক্য-বিন্যাসের এইরূপ মনোহারিত্ব জাজ্জ্বল্যমান।

চতুর্থতঃ—মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক বিশেষত্ব, সংযতভাবে অনুপ্রাস ব্যবহারে। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর এক মধুসূদন, দাশরথি এবং অন্যান্য কবিগণ অনুপ্রাসের এত ছড়াছড়ি করিয়া গিয়াছিলেন যে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দের কবিতায় সংযত-ভাবে অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া পাঠকের কাণে মিত্রাক্ষরের মিলের অভাবটি সুন্দর-রূপে পূরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"I have used mor 'অনুপ্রাস' and 'যমক' than I like; but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with blank verse."

কোন-কোন স্থলে একটু দীর্ঘ অনুপ্রাস আছে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস, ঠিক যেন অলঙ্কারে "ডায়মন্"-কাটার মত সর্ব্বত্র ঝক্-ঝক্ করিতেছে এবং তাহাতে কবিতাও উজ্জ্বল হইয়াছে।

"বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি"

"—কহিলা জনকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি

সরমারে—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি সখি।"
"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে"

এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাসে কবিতার আস্বাদ ঠিক সুপাচকের হাতে মিষ্ট দেওয়া ব্যঞ্জনের আস্বাদের মত। মিষ্ট দেওয়া হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয় না, অথচ আস্বাদের উৎকর্ষ হয়। ইহাতে মিত্রাক্ষরের মিষ্টত্বের স্থান সুন্দর পূরণ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল গুণগুলি একত্র হইয়া মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতাকে সুস্বাদু, সুশ্রাব্য ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। রসানুযায়ী শব্দ-প্রয়োগে ও স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসে উহা সজীবতাময়; ভাবানুযায়ী যতিতে উহা স্বাভাবিক অথচ সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট; এবং সংযত অনুপ্রাসে উহা সুমিষ্ট ও মনোহর।

ছন্দের মনোহারিতা আবৃত্তিতে। ছেদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্থলে-স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং সর্ব্বত্রই চরণের শেষে (যদি পূর্ণচ্ছেদ না থাকে) একটা টান রাখিয়া এই ছন্দের আবৃত্তি অভ্যাস করিতে হয়। আবৃত্তি রীতিমত হইলেই বুঝা যায়, ইহা রসের কিরূপ উৎকর্ষক। তখন এবং তখনই উপলব্ধি হয় যে, অমিত্রচ্ছন্দ বাস্তবিকই "noblest measure in the language".

অলঙ্কার

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্য পুরুষ-রূপে কল্পিত। শব্দ ও অর্থ তাহার দেহ। ঐ দেহের নানাবিধ ভূষণগুলি "অলঙ্কার" নামে অভিহিত। "কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োহবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাস্য কটক-কুণ্ডলাদিবৎ।" শব্দ ও অর্থ কাব্য-পুরুষের শরীর; রস আত্মা; গুণ শৌর্য্যাদির ন্যায়; দোষ কাণত্ব-খঞ্জত্বাদির ন্যায়; রীতি অবয়ব-সংস্থানবৎ এবং অলঙ্কার বলয়-কুণ্ডলাদিবৎ। বাস্তবিক, দেহের শোভাবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত যেমন নানাবিধ ভূষণের ব্যবহার, তেমনি বাক্যের শব্দার্থের চমৎকারিত্বের এবং ভাব ও রসের সৃষ্টি ও পুষ্টির নিমিত্ত নানাবিধ রচনা চাতুর্য্যের সৃষ্টি। দৈহিক ভূষণের ন্যায় সাহিত্যেও সেগুলি "অলঙ্কার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেমন ভাষাকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি ঐ সকল রচনাভঙ্গিকে শ্রেণিবদ্ধ ও নিয়মিত করিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে, বিশেষতঃ সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বিবিধ-প্রকারের রচনা-চাতুর্য্য যত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, তত বোধ হয়, আর কোনও সাহিত্যেই নয়, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং, সংস্কৃত-সাহিত্য অবলম্বনে এমন সুবিপুল অলঙ্কার-শাস্ত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ভাবকে ফুটাইবার ও রসের পুষ্টির নিমিত্ত যত প্রকার ভঙ্গি আছে বা হইতে পারে, সকলই যেন তাহাতে স্থান পাইয়াছে। এমন কি, বিশেষ-বিশেষ দোষগুলিও বিশেষ-বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। এই জন্য, সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবেশ করিতে গেলে যেমন প্রথমেই ব্যাকরণ উত্তমরূপে জানিতে হয়, সেইরূপ সংস্কৃত-কাব্য পড়িবার পূর্ব্বে পাঠার্থীকে ব্যাকরণের সহিত অলঙ্কার-শাস্ত্রও পড়িতে হয়। বাঙ্গলা-কাব্যে, সংস্কৃতের মত, অলঙ্কারের বাহুল্য না থাকিলেও, প্রধান-প্রধান অলঙ্কারগুলির ব্যবহার উৎকৃষ্ট কাব্যগুলিতে নিতান্ত অপ্রচুর নহে। বিশেষতঃ, মধুসূদনের কাব্যগুলিতে বহুবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ সুপ্রচুরই বলিতে হয় এবং অনেক স্থলেই তিনি সংস্কৃতের আদর্শে অলঙ্কারগুলির পারিপাট্য-সাধনে অন্যান্য কবিদিগের অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী। তাঁহার ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সকল স্থলেই অলঙ্কার-

শাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষ না হইলেও, অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। একেবারে অলঙ্কার-দোষ-বর্জ্জিত কাব্য সংস্কৃতেও বিরল, বাঙ্গলা কাব্যের ত কথাই নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃতে কোন কবিই নিস্তার পান না। মহাকবি কালিদাসও নিস্তার পান নাই। এমত স্থলে, মধুসূদনের এ কাব্যেও যে স্থানে-স্থানে অলঙ্কার-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, দোষ থাকিলেও এমন একখানি অলঙ্কার-বহুল কাব্য বুঝিতে গেলে, অলঙ্কার-সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। সেই জন্য আমি নিম্নে ঐ কাব্যে ব্যবহৃত প্রধান-প্রধান অলঙ্কারগুলির উল্লেখ ও তাহাদের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া উদাহৃত করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ সেই-সেই নির্দ্দেশানুসারে কাব্যের কোথায় কি অলঙ্কার, নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। প্রত্যেক স্থলে আমার উল্লেখ করা অপেক্ষা, তাঁহাদের নিজেদের অনুসন্ধানই বাঞ্ছনীয়।

শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর; সুতরাং অলঙ্কারও দ্বিবিধ;— শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার :

যাহা দ্বারা শব্দের চমৎকারিত্ব সাধিত হয়, তাহাই শব্দালঙ্কার; যথা অনুপ্রাস, যমকাদি। এ কাব্যে অনুপ্রাস ভিন্ন অন্য শব্দালঙ্কার নাই; কেবল কোথাও-কোথাও "কাকু" দৃষ্ট হয় মাত্র।

অনুপ্রাস।। বাক্যের মধ্যে একই ব্যঞ্জনবর্ণের বারম্বার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। শব্দের চমৎকারিত্ব সাধন করে বলিয়া ইহা শব্দালঙ্কার। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে পঞ্চবিধ অনুপ্রাস উল্লিখিত হইয়াছে— ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস। এ কাব্যে প্রথম দুই প্রকার অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে।

ছেকানুপ্রাস।। শব্দের ব্যঞ্জন-সমূহ যথাযথ পুনরুচ্চারিত হইলে ছেকানুপ্রাস হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ও দাশরথির পাঁচালীতে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ কাব্যে কচিৎ দুই এক স্থলে দেখা যায়; যথা—

"দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি
দেব-দলে নিস্তারিণি; নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে।"

এখানে, "নিস্তার" শব্দের ব্যঞ্জন-সমূহ তিনবার এবং "মর্দ্দি" শব্দের ব্যঞ্জন-দ্বয় দুইবার পর্য্যায়-ক্রমে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাসের মিশ্রণও আছে।

"বাহিরিল বেগে
বারী হ'তে (বারি-স্রোতঃসম পরাক্রমে
দূর্ব্বার) বারণ-যূথ;"

এখানে, 'ব' ও 'র' যথাক্রমে পুনঃ-পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে।

বৃত্ত্যনুপ্রাস।। পর্য্যায়-ক্রমেই হউক, আর অপর্য্যায়-ক্রমেই হউক, একরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের বারম্বার উল্লেখকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে। বাঙ্গলায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর প্রচলন। এ কাব্যেও তাহাই। উপরি-উক্ত উদাহরণে দ, ন, স্ত, ম, র্দ্দ, এই কয়েকটির পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হইয়াছে। গদ্যে, পদ্যে, সর্ব্ববিধ রচনাতেই ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং সংযত-ভাবে ব্যবহৃত হইলে, অনুপ্রাস-বিশিষ্ট রচনা সবিশেষ সমাদৃতই হইয়া থাকে। এ কাব্যে প্রায় ছত্রে-ছত্রে এই অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা সংযত-ভাবে ব্যবহৃত:—

"একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে

কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে।"
"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে"
"দেউল-দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা
শত-শত হেন যোধ হত এ সমরে।"
"ভবেশ-ভাবিনী ভাবিলা কি ভাবে আজি
ভেটিব ভবেশে।"
"ভয়ে ভগোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে"
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে, নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ"

কয়েক স্থলে ঐরূপ দীর্ঘ অনুপ্রাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস এ কাব্যের সর্ব্বত্র বিরাজমান; তাহাতে এই কাব্যের শব্দ-সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইয়াছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস তত জোরে কাণে লাগে না; অথচ বাক্যের শ্রুতি-মাধুর্য্যে মন মুগ্ধ হয়—

"শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!"

এখানে, অনুপ্রাসগুলি কেমন মোলায়েমভাবে শব্দ-চমৎকারিত্ব সাধন করিয়াছে!

যেখানে কঠিন-কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে অনুপ্রাস দিয়া তাহার শ্রুতি-কঠোরতা যতদূর সম্ভব দূর করা হইয়াছে; পূর্ব্বোদ্ধৃত "দুর্দ্দান্ত দানবে দলি" ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোথাও সুবিন্যস্ত অনুপ্রাসে বর্ণিতব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করিয়াছে—

"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী"—

পড়িতে পাঠকের কাণে কাদম্বিনী-নাদটি যেন ধ্বনিত হইয়া উঠে।

কাকু।। স্বরভঙ্গি দ্বারা কাব্যার্থ প্রকাশ করা; যথা—

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?"—

কেহই পদ্মের পর্ণ ('পাঁপড়ি') ছিঁড়িয়া পদ্মের শোভা নষ্ট করে না; তবে সীতা-পদ্মের অলঙ্কার-রূপ পর্ণ রাবণ কেন ছিঁড়িল? ইহাই এখানে "কে ছেঁড়ে" এই স্বরভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?"

এখানে, অশোক-কানন-রূপ সমল সলিলে কি কভু সীতা-কমলের কমল-শ্রী ফোটে?—ইহাই স্বরভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঐরূপ—

"——হুতাশন তেজে
গলে লৌহ, বারিধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রুবিন্দু মানে কি, লো, কঠিন যে হিয়া?"

অর্থালঙ্কার :

যাহা দ্বারা অর্থের চমৎকারিত্ব, ভাবের পরিস্ফুটন ও রসের পুষ্টি হয়, তাহাই অর্থালঙ্কার; যথা উপমা, রূপকাদি। অর্থালঙ্কার বহুবিধ এবং এ কাব্যে প্রায় সকল প্রকার অর্থালঙ্কারগুলিরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উপমা।। (উপ+মা অর্থাৎ মাপারই মত) কোন বিষয়ে সমান ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুইটি পদার্থের সাদৃশ্য

প্রদর্শন করাকে উপমা বলে। সুতরাং উপমার দুই অঙ্গ;—উপমেয় ও উপমান। যাহার উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমেয় এবং যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমান। উপমায় যথা, ন্যায়, সম, সমান ইত্যাদি তুলনা-বাচক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

অলঙ্কারের মধ্যে উপমাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত। রূপক, উৎপ্রেক্ষাদি অন্যান্য প্রধান অলঙ্কারগুলি উপমারই একপ্রকার রূপান্তর মাত্র। এ কাব্যে এবং সকল কাব্যেই সেই জন্য উপমারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এ কাব্যে উপমা ত প্রায় ছত্রে ছত্রে বলিলেও চলে।

পূর্ণোপমা।। যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, সেখানে পূর্ণোপমা;—

"নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুদ্মতী তরী
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা
অকূল সাগর-জলে চলে একাকিনী।"

এখানে, উপমার বিষয়ীভূত সমস্ত উপাদানগুলি—উপমান, উপমেয় ও উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এবং 'যথা' শব্দ—স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত হল।

মধুসূদন সংস্কৃতের আদর্শে উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গতা, এমন কি, কোথাও-কোথাও সম বচনতাও রক্ষা করিতে যত্নশীল;—

"চমকিলা বীর-বৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে।"

এখানে, উপমেয় "বামা"র সহিত উপমান "অগ্নিশিখা"র সমলিঙ্গতা সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গতা, মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকস্থলেই দৃষ্ট হয়।

"পশিলা বীরেন্দ্র-বৃন্দ, বীরবাহু-সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।"

এখানে, "যূথনাথ" ও "বীরবাহু" এবং "গজযূথ" ও "বীরেন্দ্র-বৃন্দ", উভয় স্থলেই উপমান-উপমেয়ের সম-বচনতা রক্ষিত হইয়াছে।

লুপ্তোপমা।। যেখানে উপমান, উপমেয়, উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এবং উপমা-দ্যোতক যথাদি শব্দ, ইহাদের কোন-একটি বা দুইটি লুপ্ত থাকে, সেখানে লুপ্তোপমা হয়।

"না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি।"

এখানে, পক্ষী ফাঁদে পা দিলে, ব্যাধ যেমন আনন্দে তাহাকে ধরিয়া ফেলে,—এই ভাবটি লুপ্ত আছে বুঝিতে হইবে।

"কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি দুর্ম্মতি?
কার্ ঘর আঁধারিলি নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ?"—

এখানে, উপমার দ্যোতক যথাদি শব্দের প্রয়োগ নাই; অথচ দীপ নিবাইয়া ঘর আঁধার করার সহিত গৃহস্থের প্রেম-দীপ কুলবধূকে হরণ করার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

মালোপমা।। (মালা+উপমা অর্থাৎ উপমা-মালা) প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত একাধিক উপমা; যথা—

"সিংহপৃষ্ঠে, যথা
মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী;
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে;"

অন্যত্র -

"মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।"

এক উপমেয়ের সহিত একাধিক লুপ্তোপমা থাকিলে, তাহাকে লুপ্ত মালোপমা বলা যাইতে পারে; যথা—

"—হায় সখি জানিতাম যদি
ফুলরাশি-মাঝে দুষ্ট কালসর্প-বেশে
বিমল সলিলে বিষ,"

প্রতিবস্তূপমা।। যথাদি উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, সাধারণ ধর্ম্ম এক, এমন দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্য কথন। যথাদির প্রয়োগ থাকিলে উপমা এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হইলে প্রতিবস্তূপমা হইয়া থাকে; যথা—

"যে রমণী পতি-পরায়ণা,
সহচরী-সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার।"—

এখানে, পতিপরায়ণা রমণী ও চক্রবাকীর সাধারণ ধর্ম্ম এক এবং একাকী পতি-পাশে গমনে উভয়ের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে; অথচ যথাদি উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ নাই।

"চারিদিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে, ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?"

এখানে, মেঘনাদের বিরহে প্রমীলা, মধুর বিরহে বনস্থলীর ন্যায়, তাপিতা এবং সখীগণও, ফুলকুলের ন্যায় বিরস-বদন। সুতরাং উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এক দেখান হইয়াছে; অথচ যথাদি শব্দের প্রয়োগ নাই।

রূপক।। উপমান ও উপমেয়ে অভেদ-কল্পনা। ইহা উপমার রূপান্তর হইলেও, কবি-কল্পনার হিসাবে ইহা উপমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"পাবক-শিখা-রূপিণী জানকী"—

এখানে, "জানকী" ও "পাবক-শিখা" অভিন্ন-রূপে কল্পিত হইয়াছে।

"আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব?"—

এখানে, সীতার পক্ষে রামের পা-দুখানি আশা-রূপ সরোবরে রাজীব-স্বরূপ। "আশা" ও

"সরোবর" এবং "সে পা-দুখানি" ও "রাজীব" অভিন্ন-রূপে কল্পিত।

"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে"

এখানে, লঙ্কা ও পঙ্কজ, মেঘনাদ ও রবি এবং মৃত্যু ও অস্তাচলে গমন, কবি-কল্পনায় অভিন্ন।

সাঙ্গ-রূপক।। প্রস্তাবিত রূপকের উপমেয় ও উপমান অবলম্বন করিয়া যখন উভয়পক্ষেই উহাদের অন্যান্য অঙ্গও রূপকে কল্পিত হয়, তখন তাহাকে সাঙ্গ-রূপক বলে; যথা

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্ত-কেশ মেঘমালা; ঘন
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার-রব।"

এখানে, প্রথমে শোক ও ঝড়কে অভিন্ন-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার পর, ঝড়ের অঙ্গ-স্বরূপ বিদ্যুৎ, মেঘ, প্রবল বায়ু, বারি-বর্ষণ ও মেঘ-গর্জ্জন, যথাক্রমে বামাকুল, মুক্তকেশ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রুবারিধারা ও হাহাকার-রবের সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়া, একপক্ষে সাঙ্গ-উপমেয় ও পক্ষান্তরে সাঙ্গ-উপমান, একত্র সুন্দর সাঙ্গ-রূপক হইয়াছে।

এইরূপ কয়েকটি সাঙ্গ-রূপক এই কাব্যের স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। এখানে গুটিকতক উদ্ধৃত করিলাম—

"মেঘ-বর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্র-চাপ-রূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"

এখানে, উপমেয়-পক্ষে রথ, চক্র, ধ্বজা ও তুরঙ্গম, উপমান-পক্ষে যথাক্রমে মেঘ, বিজলী, ইন্দ্র চাপ ও আশুগতির (বায়ুর) সহিত অভিন্ন-রূপে কল্পিত।

অন্যত্র— "শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ কৌমুদী" ইত্যাদি।

"লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজ তেজঃ ভুজে! আশুগতি পদে" ইত্যাদি।

অলঙ্কারের মধ্যে সাঙ্গ-রূপক পরম উপাদেয়। বাঙ্গলা-সাহিত্যে ইহা কমই দেখা যায়। এই কাব্যে কয়েকস্থলে চমৎকার সাঙ্গ-রূপক দেখিতে পাই। সেগুলি সংস্কৃত আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

মালা-রূপক।। একই উপমেয় বস্তুকে একাধিক ভিন্ন-ভিন্ন উপমান দ্বারা রূপকিত করিলে মালা-রূপক হয়; যথা—

"মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!"

এখানে, লঙ্কায় সরমা সীতাব পক্ষে, "মরুভূমে প্রবাহিণী", "সুশীতল ছায়া" ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা।। ইহা রূপকেরই ঈষৎ রূপান্তর। "যেন", "বুঝি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে উপমেয়কে উপমান বলিয়া উৎকট সংশয় বা বিতর্ক। যথা—

"ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি,
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!"—

এখানে, উপমেয় "ছত্রধর"কে ছত্রধর-রূপী "কাম" (মদন) বলিয়া বিতর্ক।

"যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ;"

এখানে, উপমেয় "তরু"কে মনস্তাপিত ব্যক্তি বলিয়া বিতর্ক।

সাঙ্গ-রূপকের মত উৎপ্রেক্ষাতেও উপমান ও উপমেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুন্দর উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে; যথা—

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাস-শিখর
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে-স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপু!"

এখানে, মাধবের সহিত কৈলাসের উৎপ্রেক্ষা এবং তদঙ্গীভূত শিখি-পুচ্ছ-চূড়া ইত্যাদির সহিত ভব-ভবনাদির উৎপ্রেক্ষা। এক টীকাকার এখানে "উপমা" বলিলেন কিরূপে? স্থানান্তরে তিনি উৎপ্রেক্ষার লক্ষণ ত ঠিকই আওড়াইয়াছেন। তবে এখানে এমন স্থূলে ভুল করিলেন কেন?

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।। যেখানে "যেন", "বুঝি" ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা বাচক শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, সেখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়। কিন্তু যেখানে উহা উহ্য থাকে, সেখানে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। যথা, উপরি-উক্ত উদাহরণে "সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর"। এখানে "যেন" উহ্য বুঝিতে হয় বলিয়া প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইয়াছে। মালা-রূপকের মত, একই উপমেয় বস্তুকে ভিন্ন-ভিন্ন উপমান দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত করিলে মালোৎপ্রেক্ষা হয়; যথা—

"———দেখিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি; কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে।"

এখানেও ঐ টীকাকার "মালোপমা" বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

অতিশয়োক্তি।। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ; যথা—

"হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল-পঞ্চবটী-বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে?"

এখানে, উপমেয় রামের উল্লেখ না করিয়া, যেন কালকূটে ভরা ভুজগকেই শূর্পণখা পঞ্চবটী বনে দেখিয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

"দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!"—

এখানে সীতার বাক্যই উপমেয়। কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া, "সুধা-বরিষণে" তৃষা তুষিতে

অনুরোধ করা হইয়াছে।

"বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি:
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে;
গগন-রতন-শশী চির-রাহু-গ্রাসে।"—

এখানে, উপমেয় মেঘনাদের উল্লেখ নাই। উপমান-ত্রয়ই উপমেয়-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বভাবোক্তি।। স্বভাবের বা বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা। যথা—

"কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক।"

এখানে, মাতৃ-প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনাই করা হইয়াছে।

"মন্দুরায় হেষে অশ্ব উর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলি,"—

স্বভাবোক্তির উদাহরণস্থল।

"পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি।"

স্বপ্নে দৌড়াইতে গেলে স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। সুতরাং, এখানে স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা করাই হইয়াছে।

প্রথম সর্গে রণক্ষেত্র-বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে সীতা-কথিত পঞ্চবটী-বাস বর্ণনায় অনেকস্থলই স্বভাবোক্তির সুন্দর উদাহরণ।

সমাসোক্তি।। সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় অচেতন পদার্থে সচেতনের কার্য্যাদি সম্যক্ আরোপ। যথা—

"———নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজ-সুন্দরি,
তোমায়! উঠ গো, শোক পরিহরি, সতি!"

এখানে, অচেতন রাক্ষসপুরীতে সচেতন ও শোকাকুলা রাজ-সুন্দরীর কার্য্যাদি আরোপিত হইয়াছে। অন্যত্র—

"নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি"—
"—ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে-দুয়ারে"

আধুনিক এক টীকাকার, যেমন টীকায়, তেমনি অলঙ্কার-বিচারে, স্থানে-স্থানে বড়ই শোচনীয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্রের সভায়—

"———ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত।"

এখানে, টীকাকার মহাশয় "সমাসোক্তি অলঙ্কার" বলিয়াছেন। ফলতঃ এখানে কোন অলঙ্কারই নয়। মূর্ত্তিমন্ত রাগ-রাগিণীরা দেবেন্দ্রের সভায় আসিয়া গীত আরম্ভ করিলেন। মূর্ত্তি এখানে কল্পিত বা আরোপিত নহে। সত্য-সত্যই তাহারা "মূর্ত্তিমতী"।

অন্যত্র যথা—অষ্টম সর্গে যমপুরী-বর্ণনায়—

"অস্থি-চর্ম্ম-সার, দ্বারে দেখিলা সুরথী,
জ্বর-রোগ।"— ইত্যাদি।

এখানেও ঐ টীকাকার "সমাসোক্তি অলঙ্কার" বুঝিয়াছেন। কিন্তু এখানেও কোন অলঙ্কার নহে। জ্বরাদি রোগ-সকল এবং হত্যাদি উপদ্রব-সকল মূর্ত্তিমন্ত শমন-দূত। জ্বরাদিতে মূর্ত্তি কল্পনা করা হয় নাই। সত্য-সত্যই তাহারা মূর্ত্তিমন্ত যমদূত-রূপে যম দ্বারে বিদ্যমান। সে সব মূর্ত্তির যথাযথ বর্ণনাও কবি দিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত।। বর্ণনীয় বিষয়ের সমর্থনার্থ সমভাবাপন্ন বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে দৃষ্টান্তালঙ্কার হয়। ইহাতে যথাদি উপমা-সূচক চিহ্ন থাকে না এবং উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্মও এক বলিয়া দেখান হয় না। কারণ, যথাদি চিহ্ন থাকিলে উপমা এবং সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলে প্রতিবস্তূপমা হয়।

"কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে,"

পুত্র-শোকে রাবণের মন সান্ত্বনা মানিতেছে না; একটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই উদাহৃত হইয়াছে।

"চলহ, দেখি, মোর সঙ্গে তুমি;
পরিমল-সুধাসহ বহিলে পবন,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ-কমল-গুণে, শুন, লো ললনে।"

এখানে, দুইটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া, শচীকান্ত শচীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন।

"মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগত-নয়নানন্দ?"

মেঘনাদের জন্য শোক করিতে-করিতে বিভীষণ এই দৃষ্টান্তটি দিয়া মেঘনাদের যৌবনাবস্থাতে কাল-কবলিত হওয়ার বিচিত্রতা দেখাইলেন।

"রাহুগ্রাসে হেরি' সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও হে সে কালে।"

রাম দুইটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া রাবণের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র-রিপু;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্র-বৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি"—

এখানে, রাম-রাবণের বৈরিতা তিনটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্তে উদাহৃত।

ভ্রান্তিমান।। সাদৃশ্য-বশতঃ প্রস্তাবিত বিষয়কে অন্য বস্তু বলিয়া কবি কল্পিত ভ্রম। (বাস্তবিক ভ্রম হইলে অলঙ্কার হয় না)।

"বাহিরি বেগে শোভিল আকাশে

দেবযান; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা।"

এখানে চাক্‌চিক্যশালী দেবযানকে জগৎ রবিদেব বলিয়া ভাবিল;—ইহা কবি-কল্পিত-ভ্রান্তি।

ব্যতিরেক।। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কথন।

"কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে কৌরবে?"

এখানে উপমান (মণিময় সভা) অপেক্ষা উপমেয়ের (রাবণের সভার) উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।

"—ভাতিছে কেশে রত্নরাশি, মরি,
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে?"—

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে।

"মুকুতা-মণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?"

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ সূচিত। পূর্ব্বোক্ত টীকাকার এস্থলে "অতিশয়োক্তি" বলিয়াছেন। কিন্তু "ব্যতিরেক" এখানে কাব্যাংশে সুন্দর।

ব্যাজস্তুতি।। স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি।

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!"

এখানে সমুদ্র-বক্ষে শিলাময় বাঁধকে "কি সুন্দর মালা" বলিয়া, স্তুতিচ্ছলে সমুদ্রকে নিন্দা করা হইয়াছে। বাচ্যার্থ স্তুতি; কিন্তু ব্যঙ্গার্থ নিন্দা।

নিদর্শনা।। বর্ণিতব্য কার্য্যের সাদৃশ্য-হেতু কোন বস্তুতে অবাস্তব ধর্ম্মের বা কার্য্যের আরোপ।

"ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—

এখানে বীরবর বীরবাহু ও শাল্মলী তরুবরের পতনে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য ফুল-দলে কর্ত্তন-শক্তি (এই অবাস্তব ধর্ম্ম) আরোপ করা হইয়াছে।

লক্ষণা।। শব্দের বৃত্তি-বিশেষ, যাহা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গে অন্যার্থের বোধ হয়।

"—এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মাগো!"

এখানে, "বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা" গৌণার্থে বিশ্ববাসীর আকাঙ্ক্ষা বুঝাইতেছে।

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে"

এখানে, "লঙ্কা" লঙ্কাবাসীকে বুঝাইতেছে।

এইরূপ— "—বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে।
রঘুবংশে. দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি।"

এখানে. "দাক্ষিণাত্য" অর্থে দাক্ষিণাত্য-বাসী।

প্রতীপ।। উপমানকে উপমেয়-রূপে বর্ণনা অথবা উপমানের বৈকল্য বা নিষ্ফলতা প্রদর্শন। যথা—

"অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্র-শিরঃ লাজে,
হেরি' পৃষ্ঠ-দেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি' উচ্চ কুচযুগ!"—

এখানে, উপমানের—(অমৃত, নাগদল ও মন্দরের) বিকলতা দেখান হইয়াছে।

সন্দেহ।। উপমেয়ে উপমান বলিয়া কল্পিত সন্দেহ। প্রকৃত সন্দেহ হইলে অলঙ্কার হয় না।—

"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে;—
নিশীথে কি ঊষা আসি' উত্তরিলা হেথা?"

এখানে, প্রমীলার দূতীকে ঊষা বলিয়া কল্পিত সন্দেহ।

"—প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল।"

এখানে, রাবণের প্রকৃত সন্দেহই হইতেছে। সুতরাং কোন অলঙ্কারই নহে। পূর্ব্বোক্ত টীকাকার এখানে "সন্দেহালঙ্কার" কহিয়াছেন। কল্পিত সন্দেহ না হইলে "সন্দেহালঙ্কার" হয় না।

দীপক।। একই কর্ত্তৃপদের অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে দীপক হয়; যথা—

"অজিন, রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে,
পাতি' বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি;
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে"—ইত্যাদি।

এখানে, "আমি" কর্ত্তৃপদের সহিত ক্রমান্বয়ে "বসিতাম," "নাচিতাম," "গাইতাম," "ভ্রমিতাম," "দেখিতাম," এতগুলি ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

তুল্যযোগিতা।। একই ক্রিয়ার সহিত নানা বিষয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন; যথা—

"শুনেছি, রাক্ষস-পতি, মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহ-নাদে, জলধির কল্লোলে";—

অন্যত্র— "———চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

অপ্রস্তুত প্রশংসা।। অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা বা প্রতীতি করণ।

"কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবি-কর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।"

অপহ্নুতি।। উপমেয়ের বা প্রকৃত বস্তুর অপলাপ করিয়া উপমানের বা অপ্রকৃত বস্তুর স্থাপন;

যথা— "বৃষ্টি-ছলে গগন কাঁদিলা"—

এখানে, বৃষ্টির অপহ্নব করিয়া তাহাতে ক্রন্দনের আরোপ করা হইয়াছে।

অর্থান্তরন্যাস।। অন্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থন; যথা-

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি!"

স্মরণ।। প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুভূতি হইতে সদৃশ বিষয়ের স্মরণ; যথা—

"সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথিয়া সিন্ধুরে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি সুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী-মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।"

বিষম।। কার্য্য কারণে বৈষম্য; যথা—

"—হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়?"—

কোথায় সাপ দেখিয়া পলায়ন, আর কোথায় তাহাকে গলায় বাঁধা!

নিশ্চয়।। অপ্রকৃত উপমান পরিহার করিয়া প্রকৃত বিষয়ের স্থাপন; যথা—

"———কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর-পদ-ভরে, নহে ভূকম্পনে!"

এখানে, ইতিপূর্ব্বোক্ত উপমান "ভূকম্পন" পরিহার করিয়া প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ রক্ষোবীর-পদ-ভরে লঙ্কাপুরীর কম্পন নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে।

পরিণাম।। কবি-কল্পনায় এক বস্তুর অন্য বস্তুতে পরিণতি; যথা—

"—এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে অহরহঃ
উজ্জ্বলে।"

এখানে, বিধাতার হাসি চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা-রূপে পরিণত হইয়াছে।

বিভাবনা।। প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি; যথা—

"মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী,
মণিময়, হেরি' তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ।"

এখানে, প্রসিদ্ধ কারণ (দংশন) ব্যতিরেকে, শুধু হেরিয়াই প্রাণ-জ্বালা।

সূক্ষ্ম।। সঙ্কেত দ্বারা কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইঙ্গিত।

"———দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি-সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী।

* * * *

গত-প্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজগর, বিজয়ী সংগ্রামে!''—

এখানে, সর্প ও ময়ূরের যুদ্ধ ও তাহাতে ময়ূরের বিনাশ, এই মায়া-দৃশ্যে ভবিতব্য মেঘনাদের পতনের ইঙ্গিত কল্পিত হইয়াছে।

আরও নানাবিধ অলঙ্কার এই কাব্যে দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। যাহা হউক, ইহা হইতেই পাঠকের উপলব্ধি হইবে, মেঘনাদবধ কাব্যখানি কাব্যালঙ্কারে কি সুন্দর-রূপেই সমলঙ্কৃত। কবি বিনয় করিয়া বলিয়াছেন বটে—

''———ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পা'ব
(দীন আমি।) রত্নরাজী?''

কিন্তু ইহা বিনয়ের ভাষা। মাতৃ-ভাষাকে তিনি কিরূপ বিবিধ রত্নালঙ্কারে সাজাইয়াছেন, এই কাব্য চিরকাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

রস

''বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।''—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাই কাব্যের সূত্র। ইহার অর্থ এই যে, রস যাহার আত্মা, এমন যে বাক্য, তাহাই কাব্য। শব্দ ও অর্থ যে কাব্য-পুরুষের শরীর, উপমাদি যাহার অলঙ্কার, মাধুর্য্যাদি যাহার গুণ, ধ্বনি যাহার জীবন, রস সেই কাব্য-পুরুষের আত্মা অর্থাৎ সার-স্বরূপ। ছন্দ, অলঙ্কার, গুণাদি ঐ কাব্য-দেহাত্মার উৎকর্ষ-সাধক। রস্-ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা। কাব্যে যাহাই আস্বাদনীয়, তাহাই কাব্য-রস। কাব্য পড়িলে বা শুনিলে বিশেষ-বিশেষ স্থলে বিশেষ-বিশেষ ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। ভাব স্থায়ী হইলেই রসের উৎপত্তি। উপভোগ্য বলিয়া ইহাই কাব্যের আস্বাদনীয় বস্তু। ইহা বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে,—ইহা অনির্ব্বচনীয়। সহৃদয় ব্যক্তিরা ইহা কেবল অনুভব দ্বারা আস্বাদন করেন। অনুরাগ-উৎসাহাদি মানব-মনের নানাবিধ চমৎকার ভাব আবলম্বনে নানাবিধ রসের সৃষ্টি। ভাব-ভেদে স্বাদ-ভেদ অর্থাৎ রস-ভেদ। আলঙ্কারিকেরা নয় প্রকার, কেহ বা দশ প্রকার কাব্য রসের উল্লেখ করেন—

''শৃঙ্গার বীর করুণাদ্ভুত হাস্য ভয়ানকাঃ।
বীভৎস রৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসাঃ দশ।।''

শৃঙ্গার (বা আদ্য), বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বাৎসল্য ও শান্ত।

যে ভাব স্থায়ী হইলে যে রসের উৎপত্তি, সেই ভাবকে সেই রসের স্থায়িভাব বলে। যেমন অনুরাগ শৃঙ্গারের, উৎসাহ বীরের ইত্যাদি। যাহা স্থায়িভাবের উদ্বোধক অর্থাৎ কারণ, তাহার নাম ''বিভাব।'' বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থায়িভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকে সেই রসের আলম্বন-বিভাব বলে;—যেমন, শত্রু-অবলম্বনে ক্রোধের সৃষ্টি হয় বলিয়া, শত্রু রৌদ্র-রসের আলম্বন-বিভাব। আলম্বনের চেষ্টা, ক্রিয়াদি, যদ্দ্বারা রসের স্থায়িভাব উদ্দীপিত হয়, তাহাই উদ্দীপন-বিভাব;—যেমন, রৌদ্র-রসে শত্রুর চেষ্টাদি। এক কথায়, যাহা রসের প্রধান বিষয়, তাহাই আলম্বন-বিভাব, আর যাহা রসের পরিপোষক, তাহাই উদ্দীপন-বিভাব। স্থায়িভাবের বাহ্যক্রিয়াকে সেই রসের অনুভাব বলে;—যেমন, ক্রন্দনাদি করুণ-রসের অনুভাব।

যখন ভাব স্থায়ী হইলে রসের উৎপত্তি, তখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রচনায় যেন কোন বিরোধী ভাব ভাবান্তর ঘটাইয়া রস-ভঙ্গ না করে। কেহ শোক করিতে-করিতে, যদি তাহার মধ্যে কৌতুক

করিয়া ফেলে (যাহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়), তাহা হইলে শোক ভাব স্থায়ী হইতে পাইল না,—বিরোধী ভাব কৌতুক আসিয়া, করুণ-রসে হাস্য-রস আনিয়া, রস-ভঙ্গ ঘটাইল। ইহা কাহারই ভাল লাগে না। সঙ্গীতে যেমন পৃথক্-পৃথক্ রাগ-রাগিণীর পৃথক্-পৃথক্ বিবাদী স্বর আছে, আলাপ-কালে যাহা ধ্বনিত হইলে সেই রাগ বা রাগিণী স্বর-ভ্রষ্ট হইয়া অনুপভোগ্য হয়, কাব্যরসেও সেইরূপ। কোন রসের পরিপুষ্টি-কালে, যদি বিরোধী রস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে রস ভঙ্গ হয়। রস-ভঙ্গ হইলে রচনার স্বাদ নষ্ট হয়। সেরূপ রচনা সুধীগণের অনুপভোগ্য। পায়সের সঙ্গে নিম ঝোল কাহার রুচিকর? অথবা তিক্ত মুখেই বা কে মিষ্টান্ন উপভোগ করে?

মেঘনাদবধ-কাব্যে সকল রসই আছে। তবে তাহার মধ্যে বীর ও করুণ রসেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এ দুয়ের মধ্যে আবার বীর-রসেরই প্রাধান্য এ কাব্যে বেশী। সেইজন্য আমি নিম্নে প্রথমে বীর এবং তৎপরে করুণ রসের বিষয় কহিয়া, পরে অন্যান্য রসের কথা কহিব।

বীর।। দান, ধর্ম্ম, দয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ উপলক্ষে উৎসাহ হইতেই বীররসের উৎপত্তি। ইহা পাঠকের বা শ্রোতার মনে বীর-ভাব উদ্দীপিত করে। সুতরাং, ইহা একটি পরম উপভোগ্য রস। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা উত্তম-প্রকৃতি ও হেম-বর্ণ বলিয়া বর্ণিত। মহেন্দ্র এই রসের অধিদেবতা। বিজেতব্য ইহার আলম্বন-বিভাব এবং বিজেতব্যের চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। ভয় ও নির্ব্বেদ, উৎসাহের বিরোধী বলিয়া, ভয়ানক ও শান্ত-রস বীর-রসের বিরোধী।

এই কাব্যখানি মুখ্যতঃ যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় বীর-রসাত্মক। ইহাতে নানা স্থলে করুণ-রসের অতি সুন্দর অভিব্যক্তি থাকিলেও, বিশেষতঃ ইহার শেষ-সর্গে করুণ-রস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিলেও, বলিতে হইবে যে, বীর রসই এই কাব্যের প্রধান রস। ইহা হইবারই কথা। লঙ্কা-যুদ্ধ এবং তাহার উদ্যোগায়োজন যে কাব্যের বিষয়; রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, যে কাব্যে যুযুধান বীরপুরুষ; এমন কি, যুবরাজ-মহিষী প্রমীলা ও তাঁহার চেড়ীগণ যে কাব্যে বীর-রমণী-রূপে বর্ণিত; সে কাব্যে বীর-রসের প্রাধান্য হইবারই কথা। তাই কবি স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন,—

"—গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত;"

কবি, বাঙ্গলা-কাব্যে ছন্দাংশে যেমন এক সুন্দর নূতনত্ব দিয়া গিয়াছেন, তেমনই সেই নূতন ছন্দে বীর-রসের যে কেমন চমৎকার অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহারও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে মধুসূদনের যেমন অতলনীয় কীর্ত্তি, ঐ ছন্দে বীর-রসের চমৎকার অভিব্যক্তিতেও তেমনই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব।

গ্রন্থারম্ভেই ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া শোকার্ত্ত রাবণের হৃদয় বীরোচিত উৎসাহে পূর্ণ হইল;—

"————সাবাসি, দূত, তোর কথা শুনি
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে?"—ইত্যাদি।

পরে,— "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীর-শূন্য লঙ্কা মম। কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ, হে বীরেন্দ্র-বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ।
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।

*   *   *   *

*   * সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূত-মন্দ্রে। সে ভৈরব রবে
সাজিল কর্ব্বুর-বৃন্দ বীরমদে মাতি," ইত্যাদি।

এইরূপ উৎসাহ-ব্যঞ্জক উক্তিতে এবং উদ্যোগে বীর-রস উপভোগ্য।

রাবণ মেঘনাদকে "বারম্বার" যুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইলে, মেঘনাদের উৎসাহ-ব্যঞ্জক উক্তি বীর-রসাত্মক;—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র! থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।" ইত্যাদি।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা এবং তাঁহার চেড়ীগণের লঙ্কা-প্রবেশার্থ বীর-সজ্জার বর্ণনা—"যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—" ইত্যাদি চমৎকার বীর-রসাত্মক। এইরূপ উৎসাহ-ব্যঞ্জক যুদ্ধোদ্‌যোগ-বর্ণনা এ কাব্যে বহুস্থলে বিদ্যমান। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গের অনেক স্থলেই বর্ণনায় ও বাক্যে বীর-রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

করুণ।। ইষ্টনাশে বা অনিষ্ট-পাতে বা প্রিয়বিয়োগে যে শোক, তাহা হইতেই এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা কপোত-বর্ণ ও যম-দৈবত বলিয়া বর্ণিত। শোক ইহার স্থায়িভাব; শোচ্য ব্যক্তি বা বিষয় ইহার আলম্বন-বিভাব; তদ্বিষয় দর্শন, শ্রবণ, মননাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব এবং ক্রন্দনাদি ইহার অনুভাব। আদ্য ও হাস্য ইহার বিরোধী; কারণ, অনুরাগ ও হাস, শোকের বিপরীত।

এ কাব্যে বীর-রসের পরেই করুণ-রসের প্রাধান্য এবং কবির অসামান্য তুলিকা-গুণে এ কাব্যে করুণ-রসের অভিব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। কাব্যারম্ভেই মূর্ত্তিমান্ করুণ-রস—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুল-পতি,
বাক্য-হীন পুত্র-শোকে। ঝর-ঝর-ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা, তিতিয়া বসনে," ইত্যাদি।

তারপর, বীরবাহুর শোকে রাবণের বিলাপ—"নিশার স্বপন সম, তোর এ বারতা" ইত্যাদি; লঙ্কার রণক্ষেত্র-বর্ণন; সভাস্থলে বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার বিলাপ; চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন; অষ্টম সর্গে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করিয়া রামের ক্রন্দন এবং সর্ব্বশেষে নবম সর্গে মৃত মেঘনাদের সামরিক অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বর্ণনা ও প্রমীলার সহমরণ—এই সকল স্থলের করুণ-রস—কেবল বাঙ্গলা-সাহিত্যে কেন?—যে কোন সাহিত্যেই গৌরবের বিষয় হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিতারোহণ-কালে প্রমীলার মুখে :

"—লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীব-লীলা স্থলে" ইত্যাদি—

এবং তৎপরে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতা-সমক্ষে "বিশদ-বস্ত্র" ও "বিশদ-উত্তরী" রাবণের মুখে :

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;"—ইত্যাদি

করুণরসের উৎস বলিলেও হয়। বোধ হয়, যেন রাবণের বজ্র-হৃদয় ফাটিয়া শোণিতের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিয়াছে! সর্ব্বশেষে—

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—

বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে!"

ইহাতে পাঠককে সপ্ত দিবানিশির অপেক্ষাও বেশী দিন করুণ-রস সিক্ত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। করুণ রসে কবির যে এতখানি ক্ষমতা ছিল, তাহা কবি নিজেও জানিতেন না। লিখিতে-লিখিতে, বোধ হয়, নিজেই অশ্রু সিক্ত হইয়া তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এক বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন—"I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakhana, for Promila I never thought, I was such a fellow for the pathetic."

রৌদ্র।। ক্রোধ হইতে রৌদ্র রসের উৎপত্তি। সেইজন্য সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা রক্তবর্ণ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। ক্রোধ ইহার স্থায়িভাব, শত্রু আলম্বন বিভাব, এবং শত্রুর চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। আদ্য, ভয়ানক ও হাস্য এই রসের বিরোধী। কারণ, ক্রোধাবস্থায় মনে অনুরাগ, ভয়, বা হাস্যের উদ্রেক একেবারেই অসম্ভব।

বীর-রসের স্থায়িভাব উৎসাহ। ইহাই মনে রাখিয়া, রৌদ্র ও বীরের পার্থক্য বুঝিতে হইলে। যুদ্ধ-বিগ্রহ-ঘটিত কাব্যে রৌদ্র-রস থাকিবারই কথা। এ কাব্যেও রৌদ্ররস বড় অপ্রচুর নহে।

তৃতীয় সর্গে বাসন্তী প্রমীলাকে লঙ্কায় যাইতে বারণ করিলে, প্রমীলা "রুষিয়া" কহিলেন—

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার্ হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?" ইত্যাদি।

ইহা রৌদ্র-রসের সুন্দর উদাহরণ-স্থল। রমণীর মুখে রৌদ্র-রসের সমধিক চমৎকারিত্ব!

ষষ্ঠ সর্গে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে। সেখানে পাঠক স্থায়িভাব বিচার করিয়া রস-নির্ণয় করিবেন। দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ছদ্মবেশী অগ্নিদেব বলিয়া ভ্রম করিলে, "রৌদ্র" দাশরথি উত্তর করিলেন—

"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।"

এখানে রৌদ্র-রস মূর্ত্তিমান্। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কবি বিশেষ বিশেষ স্থলে রসের জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজেই তত্তৎস্থলের রসের পরিচয় দিয়াছেন। "বিস্ময়" শব্দের প্রয়োগে অদ্ভুত-রসের পরিচয়, ভয়-ব্যঞ্জক "কাঁপিলা" আদি শব্দে ভয়ানক রসের পরিচয়, "সরোষে", "রুষিয়া" ইত্যাদি শব্দে রৌদ্র-রসের পরিচয়, কবি নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত অংশে "রৌদ্র দাশরথি" রৌদ্র-রসের পরিচায়ক।

সপ্তম সর্গে রাক্ষস-সৈন্যদিগের প্রতি মেঘনাদ-বধের প্রতিবিধানে উদ্যোগী রাবণের "ক্রোধভরে" অভিভাষণ :

"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী" ইত্যাদি।

যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের উক্তি রোষ-ব্যঞ্জক; সুতরাং রৌদ্র রসাত্মক।—

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ;—"এ রণ-ক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?" ইত্যাদি।

অদ্ভুত।। আশ্চর্য্য-জনক বিষয়ে বা দৃশ্যে যে বিস্ময়-ভাবের উদয় হয়, তাহা হইতে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা পীত-বর্ণ ও গন্ধর্ব্বাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। বিস্ময় ইহার স্থায়িভাব। অলৌকিক বিষয় বা ব্যাপার ইহার আলম্বন-বিভাব, এবং তাহার মহিমাদি উদ্দীপন-বিভাব। অন্য কোন রস ইহার বিরোধী নহে।

যুদ্ধাদি ব্যাপার লইয়া যে কাব্য, প্রেত-পুরীর সুবিস্তৃত বর্ণন যে কাব্যে আছে, সে কাব্যে অদ্ভুত রস থাকিবারই কথা। কোন কোন স্থলে বীর ও ভয়ানকের সঙ্গে, অদ্ভুতেরও সমাবেশ আছে। পাঠকগণ স্থায়িভাব স্মরণ করিয়া রস-নির্ণয় করিবেন। উৎসাহ ও ক্রোধে যেমন বীর ও রৌদ্রের পার্থক্য, তেমনই বিস্ময় ও ভয়ে, অদ্ভুত ও ভয়ানকের পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

প্রথম সর্গারম্ভে ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনী-বর্ণনায়—

"ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রবি
গগনে; বিদ্যুৎ-ঝলা-সম চক্‌মকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শন্‌শনে।"—

ইহা অদ্ভুত-রসের উদাহরণ। বিস্ময়ই এ বর্ণনায় স্থায়িভাব।

তৃতীয় সর্গে বীরবেশধারিণী প্রমীলাকে দেখিয়া হনূমানের বিস্ময়-ভাবাত্মক উক্তি—

"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে" ইত্যাদি,

এবং নৃমুণ্ডমালিনীকে বিদায় দিয়া বিভীষণের কাছে রামের উক্তি,

"ভৈরবরূপিণী বামা"—কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া,"—ইত্যাদি।

এ সব অদ্ভুত-রসাত্মক। কোন কোন সমালোচক এখানে রামের উক্তি ভয়-ব্যঞ্জক ভাবিয়া কবিকে দোষ দেন। বস্তুতঃ তাঁহারাই ভ্রান্ত। বীর-নারী দেখিয়া রামের ঐ সব উক্তি বিস্ময়-ব্যঞ্জক; কারণ, বেশে ও সাহসে এমন বীর-নারী রামের পক্ষে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব।

পঞ্চম সর্গে যখন লক্ষ্মণ চণ্ডী-পূজার্থ দুর্গম বন-পথে যাইতেছেন, তখন—

"কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীমবাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা"—ইত্যাদি।

এখানে ভয়ানক-রস নহে; —অদ্ভুত-রস। কারণ, মূর্ত্তি "ভীষণ-দর্শন" হইলেও লক্ষ্মণের মনে ভয়ের উদয় হয় নাই;—তিনি "সবিস্ময়ে"ই তাহা দেখিয়াছিলেন। ভয় হইলে তৎপরেই বীর-কেশরী "নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি" বিরূপাক্ষকে রণে আহ্বান করিতে পারিতেন না। এখানেও কবি "সবিস্ময়ে"-র দ্বারা রসের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে প্রেত-পুরীর বর্ণনায় নানাস্থানে অদ্ভুত-রসের সমাবেশ আছে। সে সমস্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যেখানে বিস্ময় স্থায়িভাব, সেইখানেই অদ্ভুত-রস; ইহা মনে রাখিলেই "অদ্ভুত"কে

"ভয়ানক" বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রেত-পুরীর বর্ণনারম্ভেই—

"সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা,
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন। ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে, প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটী
হাহাকার-নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!"

এখানে দৃশ্যটি বিস্ময়-জনক; সুতরাং অদ্ভুত রসাত্মক।

ভয়ানক।। ভয় হইতে ইহার উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কালাধিষ্ঠিত ও স্ত্রীবৎ নীচ-প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত। ইহা বীর-রসের ঠিক বিপরীত। বীর-রস অর্থাৎ দান, ধর্ম্ম, দয়া ও যুদ্ধবিষয়ে পুরুষোচিত উৎসাহে যে রস, তাহা উত্তম-প্রকৃতি, হেমবর্ণ এবং মহেন্দ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত। আর ভয়ানক-রস অর্থাৎ ভয়াশ্রিত যে রস, তাহা নীচ-প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং কালাধিষ্ঠিত। উত্তম বা বীরপুরুষে আর অধম বা কাপুরুষে যে প্রভেদ, বীর ও ভয়ানকের রূপ-কল্পনায় তাহা পূর্ণ প্রকটিত। যাহা হইতে ভয় জন্মে, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার ঘোরতর ভয়-জনক চেষ্টাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। আদ্য, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত ইহার বিরোধী। যে ব্যক্তি ভয়ে বিবর্ণ, স্খলিত-বচন, গলদঘর্ম্ম, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত-কলেবর এবং নিজেকে কালাধিষ্ঠিত ভাবিয়া "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে থাকে, তাহার মনে তখন অনুরাগ, উৎসাহ, রোষ, হাস্য বা নির্ব্বেদের স্থান কোথায়? ভগ্নদূতের মুখে "বীরবাহুর বীরতা" বর্ণন-কালে,

"——এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কার।" ইত্যাদি—

নিশাকালে বীর-রমণীদিগের লঙ্কাপ্রবেশ-কালে তাহাদের শঙ্খ-ধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়া—

"——কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী"—ইত্যাদি;—

এ সকল ভয়ানকের উদাহরণ। প্রেতপুরী-বর্ণনার স্থানে-স্থানেও এই রসের অবতারণা আছে।

বীভৎস।। কুৎসিতের প্রতি ঘৃণা হইতে বীভৎস-রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা নীলবর্ণ ও মহাকালাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। আদ্য বা শৃঙ্গার ইহার বিরোধী। যে কুৎসিৎ বিষয় অবলম্বনে ঘৃণার উদ্রেক করান হয়, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার বিকারাদির বর্ণনাই ইহার উদ্দীপন-বিভাব। আদ্য বা শৃঙ্গার ইহার বিরোধী। ঘৃণ্য ও নীচ-প্রকৃতি রস বলিয়া ইহার প্রচুরতা কোন কাব্যেই শোভনীয় নহে। এ কাব্যে কেবলমাত্র প্রেত-পুরীর নরক-বর্ণনায় কোন-কোন স্থলে ইহার সংক্ষিপ্ত ও সংযত উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশালোদর উদরপরতা—

"অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে"—ইত্যাদি।

ইহা বীভৎস-রসের প্রকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

উন্মত্ততার বর্ণনায়—

"——মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্নসহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে।"

ইহা যে বীভৎস-রসের চরম উদাহরণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

আদ্য বা শৃঙ্গার।। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একের প্রতি অন্যের অনুরাগ হইতে এই রসের উদ্ভব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা শ্যামবর্ণ ও বিষ্ণু-দৈবত বলিয়া কীর্ত্তিত। অনুরাগ ইহার স্থায়িভাব। উত্তম-স্বভাব নায়ক-নায়িকা ইহার আলম্বন-বিভাব। অনুরাগোদ্দীপক বিষয় ইহার উদ্দীপন-বিভাব। বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস ইহার বিরোধী। সুতারং, বীর-করুণ-রৌদ্রাদি-প্রধান এই কাব্যে আদ্য-রসের অবসর অতি অল্প। কয়েক স্থলে মাত্র সবিশেষ সংযত-ভাবে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলার কাছে মেঘনাদের বিদায়-গ্রহণকালে উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি :

"————কোথা প্রাণনাথ,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?"--ইত্যাদি

এবং "————ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে"---ইত্যাদি

আদ্যরসের সুন্দর ও সংযত অভিব্যক্তি।

লঙ্কার মেঘনাদের সহিত প্রমীলার মিলন-কালে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিও ঐরূপ।

চণ্ডী-পূজার্থ গমন-কালে লঙ্কায় বনরাজী-মধ্যে লক্ষ্মণের সম্মুখে বামাদলের আবির্ভাব এবং লক্ষ্মণের প্রতি তাহাদের অনুরাগাত্মিকা উক্তি আদ্যরসাত্মক। তবে মায়া-দৃশ্য বলিয়া এখানে রস না বলিয়া "রসাভাস" বলাই উচিত।

নরক-দৃশ্যে কামাতুর প্রেত-প্রেতিনীর যে শৃঙ্গার-রসাত্মক বর্ণনা আছে, তাহাকেও শৃঙ্গার-রসাভাসের উদাহরণ বলিতে হইবে। যদিও পাঠকের মনে উহা বীভৎস-রসেরই উদ্রেক করে, তবু যখন তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই বর্ণনার বিষয়, তখন তাহাকে বীভৎস না বলিয়া শৃঙ্গার-রসাভাস বলাই সঙ্গত।

হাস্য।। কৌতুকাবহ কথায়, কার্য্যে, আকারে বা ইঙ্গিতে হাস্যের উদ্রেক করে; তাহা হইতে এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা শ্বেতবর্ণ ও প্রমথ-দৈবত বলিয়া বর্ণিত। নির্ম্মল হাস্য শ্বেত-বর্ণই বটে এবং শিবানুচর প্রমথগণ আকার-প্রকারে হাস্য-রসেরই মূর্ত্তি-স্বরূপ। হাস্য ইহার স্থায়িভাব। অঙ্গাদির বিকৃতি, যাহাতে হাস্যের উদ্রেক করে, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। করুণ ও ভয়ানক ইহার বিরোধী; কারণ, শোক হাস্যের বিপরীত এবং ভয়ে হাস্য অসম্ভব। মেঘনাদবধ-কাব্যে হাস্য-রসের উদাহরণ নিতান্তই বিরল। কারণ, এরূপ গাম্ভীর্য্যময় কাব্যে তরল রসের অবসর অতি স্বল্প।

চেড়ীবৃন্দ-সহ প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ-কালে পথে হনূমান্ বাধা দিলে প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনী যখন হনূমান্‌কে বলিলেন—

"দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!"

তখন এই অবজ্ঞা-সূচক উক্তির ভিতরে একটু হাস্য নৃমুণ্ডমালিনীর অধর-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল বলিয়াই উহা পাঠকের মনে হাস্যের উদ্রেক করে। বোধ হয়, সলেজ-বানরাকৃতি হনূমানের মুখে দৃপ্ত রৌদ্র-রসের বচনাবলী শুনিয়া বীর-রমণী নৃমুণ্ডমালিনীর মনে হাস্য-রসের সঞ্চার হইয়াছিল।

সুগ্রীব যুদ্ধার্থে রাবণের সম্মুখীন হইলে—

"—হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—'রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনক-পুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারকারা রূপে;

তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ! ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবা-দশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?"

এই তীব্র বিদ্রূপাত্মক উক্তিটি হাস্য-রসের সুন্দর উদাহরণ স্থল। এই দুই স্থল ব্যতীত হাস্য রসের অবতারণা এ কাব্যে আর নাই।

শান্ত।। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে শম অর্থাৎ শান্তি বা নির্ব্বেদ হইতে এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রমতে ইহা উত্তম-প্রকৃতি ও কুন্দেন্দুসুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট এবং শ্রীনারায়ণ ইহার দেবতা। বিমল শান্তি কুন্দেন্দুসুন্দর কান্তিই বটে; এবং হৃদয়ে শ্রীনারায়ণের অধিষ্ঠান না হইলে নির্ব্বেদ আসিবে কেন? শান্তি বা নির্ব্বেদ ইহার স্থায়িভাব। বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, আদ্য ও হাস্য ইহার বিরোধী। কারণ, হৃদয়ে নির্ব্বেদের উদরে উৎসাহ, রোষ, ভয়, অনুরাগ ও হাস্য থাকিতে পারে না।

বীর-রৌদ্রাদি-প্রধান এই কাব্যে শান্ত-রসের উদাহরণও সবিশেষ বিরল। করুণ-রসের সংস্রবে কয়েক স্থলে শান্ত রসের অবতারণা আছে। বীরবাহুর শোকে রাবণের উক্তিতে --

"— ———হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
* * * *
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার্ রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

ইহা নির্ব্বেদ-ব্যঞ্জক। তৎপরে মন্ত্রী সারণের উক্তি--

"—বিশেষতঃ এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

শান্ত-রসের উদাহরণ-স্থল।

সীতার মুখে পঞ্চবটী-বাস-বর্ণনায় করুণ-রসের সহিত শান্ত রসের কি সুন্দর অভিব্যক্তি!

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার-যাত্রী লক্ষ্মণ লঙ্কার বৈভবাদি দেখিয়া রাবণের ঐশ্বর্য্যমহিমা খ্যাপন করিলে বিভীষণের উক্তি শান্ত-রসাত্মক:—

"যা কহিলা সত্য, শূরমণি।
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায়, আর আসে, জগতের রীতি,
সাগর-তরঙ্গ যথা!"

বাৎসল্য।। উপরি-উক্ত নয় প্রকার রস ছাড়া, কোন-কোন সংস্কৃত আলঙ্কারিক বাৎসল্যকেও রস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

"স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসংবিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্"।।—(সাহিত্যদর্পণম্)

উহার টীকায় আছে—"পুত্রাদীত্যাদিনা ভ্রাত্রাদিগ্রহণম্।"

পুত্রাদির অর্থাৎ পুত্র-ভ্রাতাদির প্রতি স্নেহ হইতে এই রসের উৎপত্তি। স্নেহই ইহার স্থায়িভাব। পুত্র ভ্রাতাদি ইহার অবলম্বন-বিভাব এবং তাহাদের ক্রিয়া-গুণাদি উদ্দীপন-বিভাব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা পদ্মগর্ভচ্ছবি-বর্ণ বলিয়া বর্ণিত এবং লোকমাতৃকাগণ ইহার দেবতা। পদ্মপর্ণ ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক পড়ায় পীতাভ পদ্মগর্ভচ্ছবির বর্ণ কেমন দেখায়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, উহা বাৎসল্য-রসেরই রূপ বটে—স্নিগ্ধ এবং গাঢ়। আর, সংসারের যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্য্যে যাঁহাদের কাছে করযোড়ে কল্যাণ প্রার্থনা করিতে হয়, সেই সর্ব্ব কল্যাণদাত্রী লোক-মাতৃকাগণ ভিন্ন বাৎসল্যরসের দেবতা আর কে হইতে পারে? উদাহরণ—মেঘনাদের প্রতি রাবণের উক্তি :

"————এ কাল সমরে
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার।"

মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরীর উক্তি—

"কেমনে বিদায় তোরে করি রে, বাছানি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
মোর।" —ইত্যাদি

এবং তৎপরে— "————যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুণ এ কাল রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি! কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমার এ ঘরে তুই!—ইত্যাদি।

এই সব পুত্রস্নেহ-অবলম্বনে বাৎসল্য-রসের সুন্দর অভিব্যক্তি।

ভ্রাতৃ-বৎসলতা, যেখানে স্নেহ স্থায়িভাব, চমৎকার হইলে, তাহাও বাৎসল্য রস বলিয়া গণ্য। বিশেষতঃ, লক্ষ্মণের প্রতি রামের স্নেহ,—যে রাম বলিয়াছিলেন—

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।।"

সেই রামের ভ্রাতৃ-স্নেহ, পুত্র-স্নেহ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। এ কাব্যে রামের ভ্রাতৃবৎসলতা-অবলম্বনে বাৎসল্য-রসের চমৎকার অভিব্যক্তি আছে। স্বপ্নাদিষ্ট চণ্ডী-পূজার জন্য দারুণ বিভীষিকাময় ঘোর বনে প্রবেশ করিবার জন্য লক্ষ্মণ রামের কাছে অনুমতি চাহিলে, রাম যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাৎসল্য-রসাত্মক—

"————কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে,
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়।"—ইত্যাদি।

তৎপরে লক্ষ্মণ যখন চণ্ডীর আদেশ রামকে জ্ঞাপন করিয়া মেঘনাদবধের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন সুভ্রাতৃবৎসল রামের মুখ দিয়া কবি যে চমৎকার ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা বাৎসল্য-রসের উৎস স্বরূপ চির-বিরাজ করিবে;—

"———হায়রে, কেমনে—
যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধ শ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু-বেগে
প্রাণ লয়ে; দেব, নর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।"—ইত্যাদি।

এবং তৎপরে,— "———কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?"— ইত্যাদি।

এই সব রসের, বিশেষতঃ বীর করুণ-রৌদ্রাদি প্রধান-প্রধান রসের সংযত সমাবেশে মেঘনাদবধ-কাব্যখানি কাব্যাংশে বড়ই উপভোগ্য। ইহাতে ছন্দের স্বাধীনতা, ভাষার রসোপযোগিতা ও বিবিধ অলঙ্কারের পারিপাট্য সর্ব্বত্রই রসের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন ত করিয়াছেই; তাহা ছাড়া সংযত তূলিকা-পাতে সর্ব্বত্রই রস চমৎকার গাঢ় হইয়াছে। এইজন্য এই কাব্য পড়িতে কোথাও ধৈর্য্য-চ্যুতি হয় না। ইহাতে লঙ্কার রণ-ক্ষেত্রের চিত্র কয়েকটি ছত্রে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীরবাহু ও মেঘনাদের জন্য রাবণের বিলাপ সুন্দর সংযত এবং সংযত বলিয়াই গাঢ়। ইহাতে যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণনাগুলি সর্ব্বত্রই নাতিদীর্ঘ। অন্যান্য রসেও ঐরূপ:—

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে;
লড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গ-বৃন্দ; ধক্-ধক্-ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা"।

এখানে, অল্প কথায় রুদ্র-মূর্ত্তির কি চমৎকার শব্দ-চিত্র! মধুসূদনের রসসৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই এইরূপ সংযম লক্ষিত হয়। অবশ্য ইহা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। অসীম ক্ষমতা না থাকিলে সংযম আসে না, সাজেও না। সুনিপুণ চিত্রকরই স্বল্প রেখাপাতে চিত্র ফুটাইতে পারেন।

গুণ

"গুণ্" ধাতুর এক অর্থ গুণিত করা" অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধন করা, উৎকর্ষ করা। অলঙ্কার-শাস্ত্রে রচনার ধর্ম্ম-বিশেষ, যাহা দ্বারা রসের পুষ্টি হয় এবং রচনা মনোহর হয়, তাহাই "গুণ" বলিয়া খ্যাত। দেহীর পক্ষে শৌর্য্যবীর্য্যাদি ধর্ম্ম-সকল যেমন আত্মার উৎকর্ষ-সাধক বলিয়া "গুণ" নামে খ্যাত, কাব্যেও তেমনই রচনার মাধুর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল কাব্যের আত্মা-স্বরূপ রসের উৎকর্ষ-সাধন করে বলিয়া "গুণ" বলিয়া কীর্ত্তিত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে দশবিধ গুণের উল্লেখ আছে। ওজঃ, মাধুর্য্য, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সুকুমারতা, অর্থ-ব্যক্তি, উদারতা, কান্তি ও সমাধি। তন্মধ্যে ওজঃ, মাধুর্য্য ও প্রসাদ—এই তিনই প্রধান।

ওজঃ।। রচনায় যে গুণ থাকিলে, তাহা হৃদয়কে উদ্দীপিত করে, তাহাই ওজঃ-গুণ। বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের অভিব্যক্তিতে এ গুণের সবিশেষ উপযোগিতা। এ কাব্যও সেইজন্য ওজোগুণ-প্রধান। এ কাব্যে ঐ সব রসাত্মক বর্ণনা বা উক্তিতে ওজোগুণ জাজ্বল্যমান।

মাধুর্য্য।। রচনায় যে গুণ থাকিলে, উহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাই মাধুর্য্য-গুণ। আদ্য, করুণ ও শান্ত রসে ইহার সবিশেষ উপযোগিতা। এ কাব্যে মেঘনাদ-প্রমীলার কথোপকথন, রামের, রাবণের

ও প্রমীলার বিলাপ এবং সীতা ও সরমার কথোপকথন মাধুর্য্য-গুণে মনোহর।

প্রসাদ।। রচনায় যে গুণ থাকিলে, উহা শ্রবণমাত্র চিত্তকে রসসিক্ত করে, তাহাই প্রসাদ-গুণ। এ কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথনাংশ আদ্যন্ত এই গুণ-বিশিষ্ট এবং এইজন্যই ঐ অংশ কাব্যাংশে এমন মনোরম হইয়াছে।

রীতি

দেহের অবয়ব-সংস্থানের ন্যায়, রচনায় পদ-সংঘটনাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে রীতি বলে। ইংরাজিতে যাহাকে style বলে, ইহা তাহাই। সংস্কৃত ভাষায় দেশ-ভেদে চারি প্রকার রীতি প্রসিদ্ধ—গৌড়ী, বৈদৰ্ভী, পাঞ্চালী ও লাটী। সেকালে এক এক প্রদেশে পদ সংঘটন-ভঙ্গি এক-এক প্রকার ছিল; সেইজন্য দেশ-ভেদে রীতি-ভেদ করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা হইতে পারে না। বাঙ্গলার পদ-সংঘটন-ভঙ্গি-ভেদেই রীতি-ভেদ করিতে হয়। বাঙ্গলা-আলঙ্কারিক পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় এ প্রণালীতে রাতি-ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গলা ভাষায় রীতি প্রধানতঃ দুই প্রকার;—সাধ্বী ও প্রাকৃতী। রচনা সাধু-ভাষা-প্রধান হইলে সে রীতিকে সাধ্বী বলে। বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রধানতঃ এই রীতিই অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। চলিত ভাষা অবলম্বনে রচনা করিলে, সেখানে প্রাকৃতী রীতি কহা যায়। নাটকাদিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। এ কাব্যখানিতে সাধ্বী রীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

সাধ্বী রীতি চারি প্রকার;—দাম্ভোলী, হৈমী, দ্বৈমাতুরী ও মাদনী।

দাম্ভোলী।। রচনা আড়ম্বরময়-শব্দ-সম্পন্ন ও গম্ভীর হইলে, দাম্ভোলী রীতি। ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যের "গৌড়ী" রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে বীর-রৌদ্র-অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের পরিস্ফুটনে দাম্ভোলী-রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। "দম্ভোলী-নিক্ষেপী" স্বয়ং যে কাব্যের একজন প্রধান উপনায়ক, সে কাব্যের অনেকস্থল যে দাম্ভোলী-রীতির উদাহরণ, তাহা ত হইবারই কথা।

হৈমী।। যেখানে রচনা মধুর ও ললিত-পদ-সম্পন্ন, সেখানে হৈমী। ইহা সংস্কৃতের বৈদৰ্ভী-রীতির অনুরূপ। সীতা ও সরমার কথোপকথনে অনেক স্থলে এই রীতি লক্ষিত হয়।

দ্বৈমাতুরী।। দাম্ভোলী ও হৈমীর মিশ্রণে দ্বৈমাতুরী-রীতি। ইহা সংস্কৃতের "পাঞ্চালী"-রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে বীর-রসের অভিব্যক্তিতে অনেক স্থলে এইরূপ সংমিশ্রণ বিদ্যমান।

মাদনী।। রচনা অতি মৃদু-পদ-সম্পন্ন হইলে মাদনী-রীতি। ইহা সংস্কৃতের লাটী-রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে সীতা ও সবমার কথোপকথনের অনেক স্থলই ইহার উদাহরণ।

দোষ

কাব্য-সমালোচনায় দোষ-গুণ, দুই-ই বিচার করা অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান। গুণ-বিচার যথাসাধ্য করিলাম। এখন দোষ-বিচার করিতেছি।

রসই যখন কাব্যের আত্মা, তখন, যাহা রসের অপকর্ষ ঘটায়, তাহাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'দোষ' বলিয়া গণ্য। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নানাবিধ দোষকে নানা নামে শ্রেণিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে আমি, এই কাব্যে যে সকল প্রধান-প্রধান দোষ লক্ষিত হয়, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

ছন্দোদোষ।। অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর, যতি-ভঙ্গ ও মাত্রা-পাত—এই চারি প্রকার ছন্দোদোষের মধ্যে এ কাব্যে যতি-ভঙ্গের বা মাত্রা-পাতের বিশেষ সম্ভাবনা নাই; কারণ, অমিত্রচ্ছন্দে যতি নির্দ্দিষ্ট-

নিয়মাধীন নহে এবং বাঙ্গলা চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ারে মাত্রার অর্থাৎ লঘু-গুরুর কোন নিয়ম নাই। তবু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, মধুসূদন অনেক স্থলেই ছন্দের সুর রক্ষা করিবার জন্য হ্রস্ব-দীর্ঘের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,"
"দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।"

এই সব স্থলে হ্রস্ব দীর্ঘ-ঘটিত পদের সমুচিত সমাবেশে ছন্দের সুর সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এরূপ সম্ভব হয় নাই। সেই-সেই স্থলে এক-প্রকার মাত্রা-দোষ ঘটিয়াছে বলিতে হয়·

"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী।"

এখানে, "ভ্রমিতেছিল" ও "চরিতেছিল" পদদ্বয়ে মাত্রা-পাত হওয়ায় উহা অন্যান্য স্থলের ন্যায় শ্রুতিমধুর হয় নাই।

অধিকাক্ষর।। এ কাব্যে কোথাও এ দোষ লক্ষিত হয় না। কয়েক স্থলে, যেখানে 'বৎস', 'বৎসর', 'উৎস', 'কুজ্ঝটিকা' ইত্যাদি আছে, সেখানে গণনায় পনের অক্ষর হইলেও উচ্চারণে 'ৎস' বা 'জ্ঝ' এক অক্ষর মধ্যে গণ্য। ন্যূনাক্ষরতা।। এ কাব্যে কোথাও নাই।

পদ ও বাক্য দোষ :

শ্রুতিকটুতা।। ঠিক শ্রুতিকটু না হইলেও স্থলে-স্থলে দুর্ব্বোধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়;—'যাদঃ পতি-রোধঃ', 'দেব-ওদন', 'প্রক্ষেড়ন' ইত্যাদি। বীর-রসাদিতে দুঃশ্রব শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু তাহা দোষাবহ না হইয়া গুণ বলিয়াই গণ্য।

অশ্লীলতা।। কবি এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইলেও, দুই-এক স্থলে, কথায় না হউক, ভাবে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। অষ্টম সর্গে কামুক ও কামুকী প্রেতদিগের কাম-লীলা বর্ণনা অশ্লীল-ভাবাপন্ন।

গ্রাম্যতা।। গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার এ কাব্যে ক্বচিৎ দুই-এক স্থলে দৃষ্ট হয়। "খেদাইছে", "ভাঁড়াইলা" ইত্যাদি। নবম সর্গে সীতার উক্তিতে "হ্যাদে দেখ' গ্রাম্য হইলেও, স্ত্রীলোকের মুখে অশোভন হয় নাই।

নিহতার্থতা।। শব্দের যে অর্থ অপ্রচলিত, সেই অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ। 'বল্লভ' পদ প্রিয়ার্থবাচক হইলেও, প্রায়ই প্রণয়ীতে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ কাব্যে প্রিয়ার্থে পুত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে—

"কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী।"

'জগদম্বা' মাতৃ-বাচক হইলেও সচরাচর কেবল দুর্গা ও কালীদেবীকেই বুঝায়। এ কাব্যে এক স্থলে লক্ষ্মীকে 'জগদম্বা' বলা হইয়াছে। (৬ষ্ঠ সর্গ, ১১৩-১১৪)।

অবাচকতা।। যে শব্দের অর্থে যাহা বুঝায় না, তাহা বুঝাইতে সেই শব্দের প্রয়োগ। "উৎস রজঃছটা", "সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা"—এখানে এবং সর্ব্বত্রই (মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যেও) রজতার্থে 'রজঃ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্তর্নিহিত অর্থে "অন্তরিত" ("অন্তরিত পরাক্রমে"; পিধানার্থে "নিকষ" ("নিকষে যথা অসি"); নাশকার্থে "নশ্বর" ("মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে"—"নশ্বর সংগ্রামে"); প্রতারণার উদ্দেশে রোষার্থে "প্রতারিত রোষ"—এইগুলি অবাচকতা-দোষের উদাহরণ।

এক টীকাকার "লঙ্কা, হৈমবতী পুরী" স্থলে "হৈমবতী" অর্থে পার্ব্বতী বুঝিয়া এখানে অবাচকতা·

দোষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, "হৈমবতী" অর্থে এখানে হেম-নির্ম্মিত-অলঙ্কার-বিশিষ্টা। সুতরাং, এখানে কবির উক্তিতে অবাচকতা-দোষ না হইয়া, বরং টীকাকারেরই অবাচ্যতা-দোষ হইয়াছে। এই কাব্যেই অন্যত্র আছে—"হৈমবতী ঊষা" অর্থাৎ ঊষা তরুণারুণ-রাগ-রঞ্জিতা বলিয়া যেন হৈমালঙ্কার-বিশিষ্টা।

অনুচিতত।।। মহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা অনুচিত। এ কাব্যে কোন কোন স্থলে এই দোষ ঘটিয়াছে :

"হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলিনী-পদ্মপদযুগ ধরি'
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি।"

অন্যত্র—

"সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!"

উম্মত্ততার বর্ণনায়—

"—কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হর-প্রিয়া যথা"

নিরর্থকতা।। বর্ণিতব্য বিষয়ের অনুপযোগী কিংবা অর্থহীন শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ;

"হে কৃত্তিকে হৈমবতি।"

কৃত্তিকা ও হৈমবতী একজন নহেন; সুতরাং 'কৃত্তিকে' এখানে নিরর্থক।

"------সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিল দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।"

সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের একত্র 'শোভা' পাওয়া অসম্ভব; সুতরাং নিরর্থক।

ক্লিষ্টতা।। নানা শব্দের যোজনা-দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ। সমুদ্র-তট বুঝাইতে "যাদঃ-পতি-রোধঃ"; মেঘনাদ বুঝাইতে "অসুরারি-রিপু"।

চ্যুত-সংস্কৃতি।। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদের প্রয়োগ;—"প্রফুল্লতি", "সত্রাসে" যথাক্রমে 'প্রফুল্ল' ও 'ত্রাসে' হওয়া উচিত। "শিরোপরি"ও ব্যাকরণ-দুষ্ট।

অধিকপদতা।। এক শব্দে যাহা বুঝায়, তাহার জন্য সেই শব্দের সঙ্গে আর-এক বা ততোধিক শব্দের ব্যবহার;—"অবগাহে দেহ"। এখানে 'দেহ' পদটি অধিক; কারণ, 'অবগাহে' বলায় জলে দেহ নিমজ্জন বুঝাইয়া থাকে।

"শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্র-নন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু বলি আশীষিলা মাতা!"

এখানে, 'নগেন্দ্র-নন্দিনী আশীষিলা'; সুতরাং 'মাতা' অধিক পদ।

"অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর,—'কহ রে সন্দেশ-বহ"

এখানে, 'রাবণ' বলিয়া আবার 'মন্দোদরী-মনোহর' বলার কোন সার্থকতা নাই। শুধু অনুপ্রাসের লোভে 'সন্দেশ'-এর খাতিরে 'মন্দোদরী'।

ন্যূনপদতা।। প্রয়োজনীয় পদের অভাব;—

"——শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ;"

এখানে, চতুর্থ ভুজের জন্য, 'পদ্ম'—এই পদের অভাব। তিনটি পদার্থ 'চতুর্ভুজে' বিসদৃশ হইয়াছে।

অর্দ্ধান্তরৈকপদতা।। একটি পদের একাংশ এক চরণের শেষে এবং অপরাংশ দ্বিতীয় চরণের আরম্ভে ব্যবহার : "—কহ, রে সন্দেশ-
বহ",
"শুইলা ফুল-শয়নে সৌরকরি-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী।"
"———বিবিধ-রতনে-
খচিত-আসনাসীন।"

এই সব স্থলে প্রকৃত-পক্ষে একটি পদ বিভক্ত হয় নাই; সংযুক্ত পদই বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি পদ বিভক্ত হইলেই প্রকৃত দোষের হয়।

প্রসিদ্ধি-ত্যাগ।। যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার পরিহার করিয়া নূতনের প্রয়োগ—

"শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে"

কৈলাসে মহাদেবের 'স্বর্ণাসন' অপ্রসিদ্ধ। নবম সর্গে প্রমীলা-সম্বন্ধে আছে—

"মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম-সহ সহগামী।"

বস্তুতঃ, রতি মৃতপতিসহ সহগামিনী হয়েন নাই।

গর্ভিতত্ব।। এক বাক্যের মধ্যে বাক্যান্তরের উক্তি;—

"———কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি কহিনু তোমারে।"

এখানে, বন্ধনী-বেষ্টিত বাক্যান্তরটিকে বক্ষ্যমাণ বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

"——কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগেহে?"

এখানে, 'তোর দুঃখে দুঃখী'—এই বাক্যন্তরটিকে মূল বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

এ কাব্যে যে কয়েক স্থলে গর্ভিতত্ব আছে, তাহা ইংরাজির অনুকরণে। সুতরাং, ইংরাজি-শিক্ষিতদের কাণে মন্দ লাগে না।

দূরান্বয়।। ক্রিয়াপদের সন্নিহিত না হইয়া দূরে অর্থাৎ বাক্যান্তরের পরে কর্ত্তা, কর্ম্মাদির অবস্থান।

"———কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"

এখানে, 'রেখছ' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'ধনে'; কিন্তু দুইয়ের মধ্যে বাক্যান্তরদ্বয়—'কাঙ্গালিনী আমি' ও 'রাজা' ব্যবধান হইয়াছে।

"কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ, হে, উদ্ধারি,
রঘু-বন্ধু, রঘু-বধূ, বদ্ধা কারাগারে।"

এখানে, 'উদ্ধারি' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'রঘুবধূ'; কিন্তু মধ্যে সম্বোধন-পদ 'রঘু-বন্ধু' ব্যবধান থাকায় দূরান্বয় হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দূরান্বয়ে অর্থ গ্রহণের ব্যাঘাত হয় না। যেরূপ দূরান্বয় হইলে তাহা হয়, তাহাই প্রকৃত-পক্ষে দোষের। এ কাব্যে সেরূপ দূরান্বয় দৃষ্ট হয় না।

অর্থদোষ :

ব্যাহতত্ব।। একই বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখাইয়া, পরে তাহার অন্যথা-করণ—

"আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আমি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

একানে, রাঘবকে 'ভিখারী' বলিয়া, ক্ষণপরেই আবার 'নৃমণি' বলায় উৎকর্ষ-কথন দ্বারা অপকর্ষ-কথন ব্যাহত হইয়াছে।

খ্যাতি-বিরুদ্ধতা।। যাহা লোক-প্রসিদ্ধ বা কবি-প্রসিদ্ধ তাহার বিরুদ্ধ-ভাব-ব্যঞ্জনা—

"শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা যমাবলী-মাঝে,
শরদে!"

শরতের মেঘ শুভ্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ; সুতরাং, উহার সহিত এখানে (কৃষ্ণবর্ণ) কেশের উপমা খ্যাতি-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

রস-দোষ :

বিরুদ্ধ-রস-বিভাব-পরিগ্রহ।। কোন রসের মধ্যে যদি বিরোধী রসের বিভাবাদি আসিয়া পড়ে, তবে মূল-রসের অপকর্ষ হয় বলিয়া, উহা দোষ-মধ্যে গণ্য।

তৃতীয় সর্গে সখিবৃন্দের প্রতি প্রমীলার সম্ভাষণ চমৎকার বীর-রসাত্মক; কিন্তু তন্মধ্যে—

"অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা,
দেখিব যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;"

এই আদ্য-রসাত্মক বর্ণনা আসিয়া পড়ায় এখানে রস-দোষ ঘটিয়াছে।

অকাল-রস-ব্যঞ্জনা।। যে সময়ে যে রস অশোভন, সেই সময়ে সেই রসের অভিব্যক্তি।

নবম সর্গে সামরিক শ্মশান-যাত্রাকালে শোকাকুলা চেড়িবৃন্দ-মধ্যে প্রমীলার ঘোড়া (বড়বা) চলিয়াছে :

"প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝল-ঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে;—মলিন দোঁহে—সারসন, স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি—কবচ, ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গ-সম!"

এখানে, ঘোর করুণ-রসের অভিব্যক্তির মধ্যে আদ্য-রসের বিভাব-বর্ণনা নিতান্তই অশোভন ও অনুপভোগ্য হইয়াছে।

প্রকৃতি-বিপর্য্যয়।। দেবতাদি দিব্য নায়ক-নায়িকার সম্ভোগাদি বর্ণন করিলে, দেব-প্রকৃতি ও দেব-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়; এইজন্য ইহা দোষ বলিয়া গণ্য। ২য় সর্গে হর-পার্ব্বতী সম্বন্ধে এই দোষ ঘটিয়াছে। উহা সংযত ও ইঙ্গিত-মাত্র হইলেও অনুপভোগ্য।

অঙ্গাতিবিস্তৃতি।। মূল বিষয়ের কোন-এক অঙ্গের অতি-বিস্তৃত বর্ণনা।

অষ্টম সর্গে অতি-দীর্ঘ নরক-বর্ণনাটি এই দোষে দুষ্ট। কবি অন্যান্য দৃশ্য-বর্ণনায় যেরূপ সংযত, এখানে সেরূপ হয়েন নাই। নরক-বর্ণনার মধ্যে আবার কামুকী প্রেতিনীদিগের বর্ণনাও অতি-বিস্তৃতি দোষে দুষ্ট। পরন্তু, উহা অশ্লীলভাবাপন্ন এবং আদ্য-রসাত্মক হইলেও বীভৎস!

পাত্রানৌচিত্য।। রস-অঙ্গে কতকগুলি 'অনৌচিত্য'-দোষ কথিত হইয়া থাকে—দেশানৌচিত্য, কালানৌচিত্য, অবস্থানৌচিত্য, বয়োনৌচিত্য, জাত্যনৌচিত্য, পাত্রানৌচিত্য ইত্যাদি। এ কাব্যে পাত্রানৌচিত্য দোষ স্থানে-স্থানে বিদ্যমান। যেখানে পাত্র-পাত্রীর কথা বা কার্য্য সেই পাত্র বা পাত্রীর পক্ষে অনুচিত হয়, সেইখানে পাত্রানৌচিত্য-দোষ।

দ্বিতীয় সর্গে, জননী-স্বরূপা পার্ব্বতীর কাছে সবিস্তারে আদ্য-রসের ভাষায় মোহিনী মূর্ত্তির রূপ বর্ণনা করা মদনের মুখে অশোভন; সুতরাং, অনুচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গে, গোপনে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সশস্ত্র লক্ষ্মণের প্রবেশ; দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হইলেও, মেঘনাদ-নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাত নিবারণে অক্ষমতা; নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা;—এ সকলই বীর-চরিত্রের পক্ষে পাত্রানুচিত। পাশ্চাত্য কাব্যাদির অনুকরণে লুব্ধ হইয়াই, কবি এই প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণের বীর-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যদিও, যে রাবণ রাম লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে ছলনা ও বল প্রয়োগ দ্বারা অবলা হরণ করিয়াছে, সেই রাবণের পক্ষ হইয়া যে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার প্রতি ন্যায় আচরণের তত প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না; যদিও পাপীর প্রতি শাস্তি-বিধানে ন্যায়-যুদ্ধই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না; যদিও রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে ক্ষত্র-ধর্ম্ম পালনেরও অবশ্য-কর্ত্তব্যতা লক্ষিত হয় না—লক্ষ্মণ নিজেই মেঘনাদকে এ সকল কথা বলিয়াছেন,—

"———জন্ম রক্ষঃকুলে
তোব; ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে?"——

তবু দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হইয়াও লক্ষ্মণ মেঘনাদ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাত নিবারণে অক্ষম হইলেন এবং সেই আঘাতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া 'ভূতলে' পড়িয়া গেলেন; পরে মায়া-দেবীর যত্নে চেতনা পাইবার পরে যখন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন মেঘনাদ শঙ্খ-ঘণ্টাদি লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, দৈবাস্ত্র-বলে বলী লক্ষ্মণকে কষ্ট করিয়া সেগুলি নিবারণ করিতে হইল না;—মায়াদেবীই 'বাহু প্রসরণে' সে সব দূরে ফেলিয়া দিতে থাকিলেন! ইহাতে লক্ষ্মণের বীর-চরিত্রকে সবিশেষ খর্ব্ব করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি এ কাব্যে লক্ষ্মণকে বীর-ভাবে দেখান নাই, এমন নহে;—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মণ 'বীর-কেশরী', 'সৌমিত্রি-কেশরী', 'রৌদ্র দাশরথি'। ৫ম সর্গে বিভীষিকাময় বনরাজি-মাঝে মহাদেবকেও লক্ষ্মণ বীরের ন্যায় যুদ্ধার্থ আহ্বান (Challenge) করিয়াছেন; মহাদেবও 'বাখানি সাহস তোর' বলিয়া 'বিনা রণে' পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেঘনাদবধের পরে রাবণ যখন রুদ্র-তেজে পূর্ণ হইয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে শক্তিশেলে আহত করেন, তখন সে যুদ্ধে রুদ্র-তেজঃ-শলী রাবণকেও বলিতে হইয়াছে : "বাখানি বীরপণা তোর আমি,
সৌমিত্রি-কেশরী।"

তবু কবি মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে, বোধ হয়, কেবলমাত্র পাশ্চাত্য কাব্য-নাটকের অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়াই লক্ষ্মণকে হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। Shakespeare তাঁহার "Troilus and Cressida" নামক নাটকে নিরস্ত্র Hector-কে Achilles-কর্ত্তৃক নিহত করাইয়াছেন।

এ কাব্যে রাম-চরিত্র সম্বন্ধেও অনেকে ঐরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। সেইজন্য এই দোষ-

পরিচ্ছেদে সে কথারও আলোচনা করিতে হইতেছে।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা ও তাঁহার চেড়িবৃন্দ লঙ্কাভিমুখে চলিয়া গেলে, বিভীষণের কাছে রামের উক্তি—"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে" ইত্যাদি বীরের পক্ষে অনুচিত ভয়-ব্যঞ্জক। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দূতীর প্রতি রাম যাহা কহিয়াছেন, সেই বীরোচিত সৌজন্য-ব্যঞ্জক উক্তির সহিত সংযোজনা করিয়া দেখিলে, পরে বিভীষণের কাছে 'ডরিনু' ইত্যাদি কথাগুলি কাপুরুষতা-ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয় না; উহা ভয়ের ভাষায় বিস্ময়-প্রকাশ মাত্র। কারণ, রমণীর এরূপ বীর-ভাব রামের পক্ষে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব; সুতরাং বিস্ময়-জনক।

অষ্টম সর্গে যখন রুদ্র-তেজ-পূর্ণ রাবণ রামকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন :

"——না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ! এ ভব-মণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।"

তখন রাম 'না রাম, না গঙ্গা' কিছুই বলিলেন না। কেহ-কেহ বলেন যে, ইহাও রামের ন্যায় বীরের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মহাদেবের আদেশে আজ রাবণ 'মহারুদ্রতেজে পূর্ণ'। এই রুদ্র-তেজের কাছে দেব-বীর্য্যও নিষ্ফল;—সেনানী কার্ত্তিকেয়কেও যুদ্ধে বিরত হইতে হইয়াছে! রাম নীরব থাকিবেন, ইহাতে আব আশ্চর্য্যের কথা কি? বিশেষ, যখন রাবণ আজ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, তখন 'ধীর' রামের পক্ষে নীরবতাই বরং শোভন হইয়াছে।

লক্ষ্মণের জন্য সমধিক ভয়-ব্যাকুলতা ও কাতরতাও বীর রামের পক্ষে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাবিতে হইবে যে, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। কারণ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদ-বধ এবং রাবণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধনই এ কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং, রাম এ কাব্যে সুভ্রাতৃবৎসল-রূপেই চিত্রিত। অযোধ্যা-ত্যাগ-কালে সুমিত্রা-জননী লক্ষ্মণকে রামের হস্তে ন্যাস-স্বরূপই দিয়াছেন। সুতরাং, লঙ্কার বনরাজি-মাঝে চণ্ডীর দেউলে গিয়া চণ্ডীপূজা করা যে কি ব্যাপার, বিভীষণের মুখে তাহা শুনিয়া, লক্ষ্মণের জন্য রামের ভয়-ব্যাকুলতাই রামের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসলের পক্ষে স্বাভাবিক।

অষ্টম সর্গে মূর্চ্ছাগত লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের বিলাপ ভ্রাতৃবৎসলতার চমৎকার অভিব্যক্তি। যাহাকে সুমিত্রা-মাতা ন্যাস-স্বরূপ রামের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সুমিত্রা-মাতার কাছে দায়ী, তাহাকে ছাড়িয়া কি সীতার উদ্ধার? এই দায়িত্ব ভাবিয়াই রাম বিলাপ করিতে-করিতে বলিয়াছেন—

"——চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি"

এই উক্তিতে রামের বীরত্বে আঘাত লাগে নাই; বরং তাঁহার ভ্রাতৃত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে অন্যান্য রামায়ণ-কবিরাও এইরূপেই রামকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। তবু কবি ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর সহিত রামের যুদ্ধে রামের বীরত্ববর্ণনা করিতে ভুলেন নাই—

"অগ্নিময়-চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া,
বৃষ-স্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে

কুমারে" —ইত্যাদি।

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণকে হীন করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু রামকে এ কাব্যে হীন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং ভ্রাতৃবৎসল রামের ভ্রাতৃবৎসলতা অতি সুন্দর-রূপেই দেখান হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একথাও বলিতে হইতেছে যে, রামায়ণেও রাম-লক্ষ্মণের চিত্র একেবারে নির্দ্দোষ নহে। বনবাসের আজ্ঞায় পিতার প্রতি লক্ষ্মণের অযথা ঘোরতর উষ্মা নিতান্তই পুত্রানুচিত এবং স্ত্রীলোক শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন বীর-পুরুষানুচিতই হইয়াছে। রাম কর্ত্তৃক বালী-বধ-ব্যাপার বীরচরিত্রের আদর্শ নহে। লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ বীরত্বে সর্ব্বত্রই যে রাবণ, মেঘনাদ বা অন্যান্য রাক্ষস-বীর অপেক্ষা মহত্তর, তাহাও রামায়ণে দেখি না। মেঘনাদ কর্ত্তৃক নাগপাশ-বন্ধনে রাম-লক্ষ্মণকে বিষ্ণু-প্রেরিত গরুড়ের সাহায্যে রক্ষা পাইতে হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-পক্ষকে নানা সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে;—শুধু বীরত্বে কুলায় নাই। বস্তুতঃ, মানুষ এবং মানুষের কৃত অন্যান্য কার্য্যের ন্যায়, কাব্য-নাটকও নির্দ্দোষ হয় না। বাল্মীকি-ব্যাসে দোষ আছে, কালিদাস-ভবভূতিতে, সেক্সপীয়ার্-মিল্টনে, হোমার্-ভার্জ্জিলে—সকল কাব্যেই দোষ লক্ষিত হয়। মধুসূদনও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। কিন্তু গুণাংশে বাঙ্গলার আর একখানি কাব্য নাই, যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। আদ্য-রস ছাড়া, বীর-করুণাদি প্রধান ও পরম উপভোগ্য রসগুলি এ কাব্যে চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত;—বীর ও করুণে বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা এখন পর্য্যন্ত অদ্বিতীয়। বঙ্গমাতার প্রতি কবি একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন—

"তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।"

বঙ্গ-জননী কবির নিবেদন শুনিয়াছেন। গৌড়জন তাঁহার কাব্যের দোষ ভুলিয়া গুণই ধরিয়াছেন এবং যতদিন বঙ্গভাষা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন অমর কবির এই কাব্যখানি বাঙ্গলা-সাহিত্য-সরোবরে "মধুময় তামরস"-স্বরূপ চির-প্রস্ফুটিত থাকিবে। ❑

কার্ত্তিক, ১৩২৪

মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সজনীকান্ত দাস

'মেঘনাদবধ-কাব্য' মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি। তাঁহার আর কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যন্ত না পৌঁছিত, তাহা হইলেও শুধু এই একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন।

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না; মধুসূদনের চিঠিপত্র হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা এই—

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ৬নং লোয়ার চীৎপুর রোড হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

> The subject you propose for a national epic [সিংহল বিজয়] is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *vira ras* (বীররস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* fist....
>
> I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩১১-১৩, ৩১৬।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মে মাসে উহা প্রকাশিত হয়। মধুসূদন যে পরীক্ষার ছলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' আরম্ভ করিয়াছিলেন, উপরের পত্রাংশে তাহার আভাস আছে। ঐ বৎসরের ১৫ মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের একটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই—

> I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩১৮।

১৪ জুলাই মধুসূদন লিখিয়াছেন—

> I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours; I am at times as lazy a dog as ever walked on to legs; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent!...
>
> ..let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity!—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩২৪-৫।

পরবর্ত্তী কয়েকটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা সম্বন্ধে অনেক খবর লিখিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কিত অংশগুলি সঙ্কলন করিয়া এই ভূমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্টের পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন—

> I am *so* happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second. and as soon as I can get a copy made. you shall have it I hope the second Book will *enchant* you! The name is "বরুণানী," but I have turned out one syllable To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.—'জীবন চরিত', পৃ. ৩৩১।

রাজনারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুক্ত পত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্টের। মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে 'মেঘনাদবধ' রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন · ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর

> .. But I must first finish my *Meghanad* That will take me some months.-- 'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৬৮।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি

> The first five books of Meghanad are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৭১।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই তারিখের পূর্ব্বেই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র হইতে এই তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম খণ্ড প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া; পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই; আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। সুতরাং আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড (৬ হইতে ৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৭। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ----

> মেঘনাদবধ কাব্য। / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / " - কৃতবাগদ্বারে বংশেস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ, / মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যোবাস্তি মে গতিঃ।" / রঘুবংশঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

দিগম্বর মিত্র (রাজা) প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেন বলিয়া মধুসূদন তাঁহাকে এই কাব্য উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ ছিল---

মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য. - আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তথাচ আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক. কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব - ইতি।

কলিকাতা

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

বৎসরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুন তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) আমরা দেখিতে পাই :

> Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.—'জীবন চরিত' পৃ. ৫২৮।

এই পত্র লিখিবার পাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে "ক্যাণ্ডিয়া" জাহাজযোগে মধুসূদন ইউরোপ যাত্রা করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("a *real* B. A.") সম্পাদিত সটীক 'মেঘনাদবধ কাব্য' দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে "মঙ্গলাচরণে"র তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া "২৫ শে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল" করা হয়। হেমচন্দ্রের "মুখবন্ধে"র তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯—অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ—প্রথম খণ্ড ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুসূদন তখন বিদেশে। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল—১ম খণ্ড, ৫/ +১৫১; ২য় খণ্ড ১২৮। "বঙ্গভূমির প্রতি" ("রেখো, মা, দাসেরে মনে") কবিতাটি প্রথম খণ্ডে "মুখবন্ধে"র শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের এই "মুখবন্ধ" পরবর্ত্তী কালে চতুর্থ সংস্করণ হইতে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভূমিকা" নামে প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্ত্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। বর্ত্তমান সংস্করণে এই "ভূমিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। "মুখবন্ধে" হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> পুত্র মুখাবলোকন করিলে নবপ্রসূতা স্ত্রীর যেরূপ সুখোদ্বোধ হয়, গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থকর্ত্তারও আনন্দোদ্ভব হইয়া থাকে, আর যেমন সেই শিশুসন্তান বাল্যনিবন্ধন রোগ পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশস্বী হইলে মার আর আনন্দের সীমা থাকে না, সঙ্কপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থমালা সন্দর্শনে গ্রন্থকর্ত্তাও যার পর নাই সুখী হয়। কোন সহৃদয় ব্যক্তি আজি মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিয়া তাহার অপ্রমেয় সন্তুষ্টি অনুভব করিতে না পারেন? অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই অত্যাদমকপ্লাবিত দেশে এমন ব্যাপক যশোলাভ করিবে একথা কার মনে ছিল? কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে সেই অসম্ভাবিত ফল আজি মাইকেল মধুসূদনের জন্য ফলিয়াছে। বৎসরেক মাত্র হইল এই গ্রন্থ প্রথমবার মুদ্রিত হয় কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ১০০০ খণ্ড পুস্তক পর্য্যবসিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল— কতই ভয় দেখাইয়াছিল কতই নিন্দা করিয়াছিল, এমন কি, লেখক স্বয়ং এক মাস পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করে নাই। কিন্তু সে দিন আর নাই।

মধুসূদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যের আর সংস্করণ না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অনুপস্থিতি। তাঁহার কলিকাতায় পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২১ আগস্ট ১৮৬৭); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪৮। এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৬ মার্চ ১৮৬৯ (পৃ. ১৭২)। হেমচন্দ্রের পরিবর্ত্তিত "ভূমিকা" চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে।* ষষ্ঠ সংস্করণে সম্পূর্ণ কাব্যখানি দুই খণ্ড একত্রে (পৃ. ৩২০) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে আর কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন এই গ্রন্থের "মঙ্গলাচরণ" বা উৎসর্গপত্রটি বর্জ্জন করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগম্বর মিত্রের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলপ্রদ সংবাদ আছে। আমরা 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি—

---

* 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ১৭৮) নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তৃতীয় সংস্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করেন।" ইহা যে ভুল, তাহা এই ভূমিকার তারিখ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল দেখিলেই বুঝা যায়।

১। মধুসূদন রাজনারায়ণকে—১৪ জুলাই, ১৮৬০

....You know I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year. and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.—পৃ. ৩২৩।

২। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে?
মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে।
মায়াময় মায়াসুত-বিদিত জগতে।

You will at once see whom I imitate :

"Who of the gods impelled them to contend?
Latona's son and Jove's..."—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt?
The infernal serpent."—Book I.—পৃ. ৩২৭-২৮।

৩। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Here is the First Book of the Meghanad. I hope you will find the writing legible; you need not return the sheets. I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism of Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes'; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."....

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank Verse! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says :—"I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm. —পৃ. ৩২৯-৩১।

৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe....

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter

(of whom you have no doubt heard) has promissed to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect. I most thankfully acknowledge. I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers.—পৃ. ৪৭৬-৭৭।

৫। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

You will have by this time reached the old nest. Pray. write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted. I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad. will finish me or I finish him Thank Heaven. I have triumphed. He is dead. that is to say. I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that I don't think it impossible to equal Virgil. Kalidasa and Tasso. Though glorious. still they are mortal poets : Milton is divine

Do write to me what you think. old man. Your opinion is better than loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies. I understand. are readig the book and crying over it You ought to put your wife in the way of reading the verse.—পৃ. ৪৭৯-৮০।

৬। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you. old man? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা --and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko. presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers *

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr Ram is to be conducted through Hell to his father. Dasaratha. like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore. I hear. is quite taken up with it. S—told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man." meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road. and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have. for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage. though with an unaltered love for you.

Yours Ever Michael M. S. Dutt.

---

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এই মানপত্র ও তদুত্তরে মধুসূদনের বাংলা বক্তৃতা সংগৃহীত ও "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র ২৩শ সংখ্যক গ্রন্থ 'মধুসূদন দত্তে'র ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name! What a nice man! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.— পৃ. ৪৮০-৮১।

৭। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

The second and last part Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose. ..I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—"The most magnificent." My printer Babu I. C. Bose (a very intelligent man and once a most worm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I. Book Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank Verse. A great victory that, old boy....

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.—পৃ. ৪৮১-৮৩।

৮। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O! that you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you.—পৃ. ৪৮৪-৮৫।

৯। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III. which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplementary. He who is "beautiful." "tender" and 'pathetic". with a dash of "sublimity." is sure to float down the stream of time in triumph All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas. the Latin Virgil. the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these: her Milton is a grander being. Like his own Satan. he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height. but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings: but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. He is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII. and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English :—

"I am reaing a new poem, Sir!" "A poem!" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied—"Why, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "Well, read and let me know." My literary shopkeeper looked hard at me and said "Sir, I am afraid you wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him,

"* * * বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language."—পৃ. ৪৮৬-৮৮।

১০। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

We are now printing the last Book (IX) of Meghanad. So you may expect him

by the beginning of the next month (English)....

We have just got over the noise of the Mohorum. I tell you what;—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet! But *De gustibus non est disputandum.*— পৃ. ৪৮৮-৮৯।

১১। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur Pedagogue....

... ..Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা. Read—

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music—

"আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।"

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

of Milton, and the lines

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour"—

of Shakespear. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing"?

* * * *

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful.—পৃ. ৪৯০-৯২।

১২। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again....

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another.—পৃ. ৪৯৩-৯৪।

১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticized; some don't like your remarks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language."—পৃ. ৫২৫।

১৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

....Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name শিব written ষিব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth ,Illiad, and I am not ashamed to say that I hav intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *more melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather

roughish elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.—পৃ. ৪৭২-৭৩।

রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও সমালোচক কর্তৃক 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে ভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচনা হয় নাই। এই কাব্য মাত্র দুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বসু যে সমালোচনার সূত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মহাকাব্যের প্রকৃতি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য। কেহ কেহ মনে করেন যে মহাকাব্য প্রাচীন কালের বিশিষ্ট সম্পদ্; আধুনিক কালে খাঁটি মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি মাত্র আছে। ইলিয়াড, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত। অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ বা মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট, ভল্‌টেয়ারের হাঁরিয়াড্ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসান হইয়া থাকে।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। কিন্তু ইহারা যে শ্রেণীর, যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর নহে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মহাকাব্যগুলির মধ্যেও তিনি অনুরূপ প্রভেদ দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ যে অর্থে ইলিয়াড্ অথবা অডেসি মহাকাব্য সেই অর্থে প্যারাডাইস্ লষ্ট মহাকাব্য নহে। তিনি বলিয়াছেন, "বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীন কালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না।"

অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও ইলিয়াড্ প্রভৃতি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে ইহাদের পার্থক্যের মধ্যে মৌলিক সঙ্গতি আছে কিনা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের দেশে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ এই বলিয়া মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :

"মহাকাব্য সর্গে বিভক্ত হইবে; তাহার নায়ক একজন দেবতা অথবা সদ্বংশজাত, ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় হইবে। সদ্বংশজাত বহু নৃপতিও নায়ক হইতে পারে; শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি ইহার অঙ্গী রস হইবে এবং অন্য রসগুলি প্রধান রসের অঙ্গ হইবে। ইহাতে নাটকের সমস্ত সন্ধিগুলি থাকিবে, কাহিনীটি ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে উদ্ভূত হইবে অথবা কোন সজ্জনকে আশ্রয় করিবে। ইহার ফল হইবে চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তি অথবা চতুর্ব্বর্গের যে কোন একটিও হইতে পারে। আরম্ভে নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা বস্তুনির্দ্দেশ থাকিবে, কখনও কখনও খলাদি ব্যক্তিদের নিন্দা অথবা সাধুব্যক্তিদের প্রশংসা থাকিবে। ইহা একই ছন্দে রচিত হইবে এবং কাব্যের অন্তভাগে অপরজাতীয় ছন্দ থাকিবে। ইহা নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব হইবে এবং ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। কোথাও কোথাও নানা ছন্দোময় সর্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্ত্তী সর্গের বিষয়ের সূচনা থাকিবে। ইহাতে সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণগমন, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগ্যভাবে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্ণিত হইবে। কবি, বৃত্তান্ত, নায়ক বা অন্য কাহারও নামে মহাকাব্যের নামকরণ হইবে এবং সর্গের মধ্যে যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান (উপাদেয়) তদনুসারে সর্গের নামকরণ হইবে।"(সাহিত্যদর্পণ -ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এই বিবরণ যথেষ্ট দীর্ঘ হইলেও এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে ইহার মধ্যে মহাকাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য্যের কোন পরিচয় নাই। এই আপত্তির মধ্যে আংশিক সত্য আছে। বিশ্বনাথের মৌলিকতা ছিল খুব কম, তিনি সাহিত্যের দুরূহ ব্যাপারগুলি সহজ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা

বিচিত্র নয় যে তিনি মর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা বহিরঙ্গের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এখানে তিনি এমন এলোমেলোভাবে নানা বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ রচনা 'বর্ষ সমালোচনা'র কথা মনে হয়। ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণে কাণ্ড আছে মাত্র সাতটি এবং তাহার অঙ্গী রস করুণ, শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত নহে, এই মত আনন্দবর্দ্ধন প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথের বর্ণনার মধ্যেও মহাকাব্যের স্বরূপের পরিচয় নিহিত আছে। এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করার পূর্ব্বে ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের পিতামহ অ্যারিষ্টটলের মত আলোচনা করা যাইতে পারে। অ্যারিষ্টটলের যে গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডিরই বিস্তারিত বিশ্লেষণ রহিয়াছে, এপিক বা মহাকাব্যের কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে ট্র্যাজেডির মত মহাকাব্যেও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্তু যেহেতু ইহা দৃশ্যকাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশী। ইহার ভাব ও ভাষা হয় ঐশ্বর্য্যবান্ এবং রাজসিকগুণবিশিষ্ট হেক্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা রচিত হয়। ট্র্যাজেডির মধ্যেও চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মহাকাব্যে বিস্ময়কর, অসম্ভাব্য ব্যাপারের স্থান অনেক বেশী। ট্র্যাজেডির গণ্ডি সীমাবদ্ধ, তাহার মধ্যে ঐক্যবোধ বেশী সুস্পষ্ট; মহাকাব্যে সেই সংসক্তি নাই, কিন্তু ইহা বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে সমধিক সমৃদ্ধ।

উপরে যে মতগুলি বিবৃত হইল তাহা হইতে একটি কথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। মহাকাব্যে একটা বিশালতা, বিস্তৃতি ও ঔদার্য্য আছে যাহা ইহাকে অন্য সকল কাব্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। এইজন্যই ইহাতে উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে, এবং তাহার জন্য সাধারণতঃ অষ্টাধিক সর্গের প্রয়োজন হয়; এইজন্যই ইহার নায়কের চরিত্রে উদাত্ততা বাঞ্ছনীয় এবং ইহার ছন্দে, অলঙ্কারে এবং ভাবের মধ্যে আমরা গাম্ভীর্য্য ও গৌরব কামনা করি। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি কোন একজন কবির সম্পত্তি নহে, তাহারা কোন একটি সমগ্র জাতির সম্পদ্। জাতির চতুর্দ্দিকে নানা ভাব-ভাবনা বহুকাল ধরিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই সব ভাব যাঁহারা প্রকাশ করেন সেই সমস্ত কবিরা হয়ত অখ্যাত থাকিয়া যান, কিন্তু পরে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে কোন এক কবি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহার প্রতিভা এই সকল বিচ্ছিন্ন ভাব ও অনুভূতিকে মালার মত গাঁথিয়া দেয়। এই কবিই মহাকবি এবং ইঁহার রচনাই মহাকাব্য। ইহাই হোমার, বাল্মীকি, ব্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই তাঁহাদের রচনাকে ঠিক ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলা যায় না; রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও অডেসির মধ্য দিয়া একটি জাতি বা সভ্যতার বহুকালের সঞ্চীয়মান ঐতিহ্য স্থায়ী রূপ পাইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতেও মহাকাব্যের প্রধান গুণ—বিস্তৃতি। আধুনিক কালে ছোট-বড় প্রত্যেক কবির লেখাই ছাপাখানার সাহায্যে একটা বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ পায়। একের রচনা অপরের রচনার সঙ্গে মিলিয়া ভাবের একটি অশ্রান্ত প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীন কালের মত মহাকাব্য এখন আর রচিত হইতে পারে না, কারণ বিভিন্ন কবির বিচ্ছিন্ন রচনা মহাকবির সংশ্লেষক শক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। রামেন্দ্রসুন্দরও বলিয়াছেন যে মহাকাব্যের মধ্যে যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা থাকে তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি যে গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতা আজকালকার কাব্যেও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই উন্মুক্ততা এখন প্রায় অনধিগম্য হইয়াছে। অন্ততঃ যদি অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের লক্ষণ হইত তাহা হইলে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক রচনা মহাকাব্যপদবাচ্য হইত। তাহা যে হয় নাই তাহার কারণ ইলিয়াড্ বা মহাভারতে যে উন্মুক্ততা আছে তাহা পরবর্ত্তী যুগের রচনায় তেমনভাবে পাওয়া যায় না; যে পরিমাণে তাহা পাওয়া যায় সেই পরিমাণে আধুনিক কাব্যও মহাকাব্যের সীমানায় পৌঁছায়।

বিস্ময়বোধ—বিশাল রস

আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্র মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রধানতঃ আট বা নয়টি স্থায়িভাবে বিভক্ত করিয়া আট বা নয়টি রসের পরিকল্পনা করিয়াছে। এইরূপ সাহিত্যবিচারের কতকগুলি অসুবিধা আছে। যদি স্থায়ী ভাবগুলিকে বাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে আমাদের হৃদয়ের অন্যতম স্থায়ী ভাব হইতেছে বিস্ময়বোধ। এই বিস্ময়বোধ অল্পবিস্তর সমস্ত কাব্যেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে. ওয়াল্টার পেটার ইহাকে রোমান্টিক কাব্যের মূল উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিস্ময়বোধ যখন বিরাট্ কিছুর দ্বারা উদ্বোধিত হয় তখন তাহা একটা বিশিষ্ট রসের সঞ্চার করে যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে বিশালরস। এই জাতীয় কাব্যে উন্মুক্ততা থাকিতে পারে, ইহার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম নিয়মানুসারে লিখিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূল লক্ষণ হইবে বিস্তৃতি। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে বীর, শৃঙ্গার অথবা শান্তরস মহাকাব্যের অঙ্গী রস হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আনন্দবর্দ্ধন মনে করেন যে রামায়ণের অঙ্গী রস হইল করুণ। বাস্তবিক পক্ষে মহাকাব্যে যে কোন রসের সমাবেশ হইতে পারে, অলঙ্কারবর্ণিত নয়টি রসের যে কোন একটি অঙ্গী হইতে পারে যদি তাহা বিশালতার অনুভব জাগাইতে পারে। ইহাই সমস্ত মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ।

প্রাচীন যুগের যে চারিখানি মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই গুণটি বর্ত্তমান আছে। অ্যাকিলিস, য়ুলিসিস, রাম, অর্জ্জুন—ইঁহারা সবাই বিরাট্ ব্যক্তি, ইঁহাদের কার্য্যকলাপে দেবদেবীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। রামচন্দ্র অবতার-শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণও পার্থসারথি এবং ট্রয়ের যুদ্ধে দেবদেবীদের উৎসাহ এত বেশী যে কখনও কখনও তাঁহারা নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, ভক্ত বা প্রেয় মানবকে রক্ষা করিয়াছেন, নিজেরাও আহত হইয়াছেন। দেবদেবীরা এত প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দেবাতিরিক্ত নায়কদের ক্ষমতার লাঘব হয় নাই। অ্যাকিলিস্ হেক্টর ডায়মিডিস, পাণ্ডব ও কৌরব বীরগণ, লক্ষ্মণ, হনুমান, রাবণ ও মেঘনাদের শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয় নাই। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি লক্ষণ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ। যে সমস্ত উপমায় তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা সূচিত হইয়াছে সেই সকল উপমা খুব দীর্ঘ, তাহাদের মধ্যে বিশালতা ও বিস্তৃতির অনুভব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তন্মধ্যে দেব-মানব-রাক্ষসের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া একটি নৈতিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের সবচেয়ে বড় কথা রামের বাহুবল নহে, সীতার দুঃখ নহে; রাম যে পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন, ধর্ম্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সেই পত্নীকে বনবাসে দিয়াছিলেন ইহাই রামায়ণের প্রধান বক্তব্য। মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ একটি বিরাট্ সংগ্রাম, উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে অতিমানবীয় বীরত্বের অভাব নাই। কিন্তু এই বীরত্ব ও সংগ্রামের বিশালতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে মহাভারতের নৈতিক তত্ত্ব। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সংসারের নিঃসারতা প্রতিপাদন করা এবং ইহার নায়ক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ—ভীষ্ম বা অর্জ্জুন নহেন।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বৈশিষ্ট্য—পরিকল্পনা

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যাঁহারা প্রাচীন মহাকাব্যের অনুকরণে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহাদের অন্যতম এবং তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য একখানা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই গ্রন্থের বিচারে প্রথমেই একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। মাইকেল সনাতন ভারতবর্ষীয়

আদর্শের বিরোধিতা করিয়া এই মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বিশ্বনাথের আইনকানুন মানিয়া চলিবেন না। বিশ্বনাথের অধিকাংশ নির্দ্দেশ মহাকাব্যের বহিরঙ্গ-বিষয়ক; সুতরাং তাহা না মানিলে কোন ক্ষতি নাই এবং মধুসূদন সকল নির্দ্দেশই যে অমান্য করিয়াছেন তাহা নহে। বহিরঙ্গ ছাড়িয়া অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তিনি বিশ্বনাথের মৌলিক নির্দ্দেশগুলি অমান্য করেন নাই। তাঁহার মহাকাব্য বীররসপ্রধান, অন্যান্য রসগুলি অঙ্গীর সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্ত্তমান; তাঁহার নায়ক দেব নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, দেব ও মানবের শত্রু রাক্ষস, কিন্তু তিনি সদ্বংশজাত এবং ধীরোদাত্তচরিত্রবিশিষ্ট; তিনি দেবারি হইলেও দেবাদিদেব মহেশ্বর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। মধুসূদন বিশ্বনাথের নিয়মের যে বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা গৌণ। তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে সনাতন ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা। বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্যে রাম মহামানব, অবতারশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের কাব্যে রাক্ষসগণ ভীষণ, কিম্ভূতকিমাকার জীব। তাহাদের বাহুবল থাকিতে পারে, কিন্তু চরিত্রের ঔদার্য্য বা মহত্ত্ব নাই। মাইকেলের পরিকল্পনা অন্যরূপ। তিনি ভারতবর্ষীয় আদর্শে বিশ্বাসী নহেন। তাঁহার সৃষ্ট দেবদেবীরা মানুষের মতই। এখানে তিনি হোমারের রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু হোমারের দেবদেবীদের মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে মাইকেলের দেবদেবীদের মধ্যে তাহা নাই; তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ—রাক্ষসভীতি। রাক্ষসদিগকে বড় করিতে যাইয়া মাইকেল মধুসূদন দেবতা ও মানুষকে ছোট করিয়াছেন। তাঁহার রাম বীরশ্রেষ্ঠ নহেন, ভীরুস্বভাব ও অশ্রুপাতপ্রবণ এবং লক্ষ্মণ অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে নিহত করিয়াছেন। মাইকেল এই আপত্তি সানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি রাম ও তাঁহার দলকে (Ram and his rabble) পছন্দ করেন না। প্রাচীন পুরাণের এই বিকৃতি সকল দিক্ দিয়া নিন্দার্হ বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করিলে মাইকেলের এই বিকৃতি সাহিত্যের দিক্ দিয়া তেমন দোষাবহ নাও হইতে পারে। সমস্ত প্রাচীন কাহিনীই কালক্রমে বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিল আর্য্য-অনার্য্যসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু পরে যখন আর্য্যসভ্যতা ও অনার্য্যসভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়া গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের জন্য এবং অন্যান্য কারণের জন্যও পরবর্ত্তীকালে রাম যুযুৎসু আর্য্যসভ্যতার প্রতীক না হইয়া ভক্তবৎসল দেবতায় রূপান্তরিত হইলেন। 'মেঘনাদবধে' কাহিনীর রূপান্তরণের আর একটি ধাপ পাওয়া যায় মাত্র। অবশ্য এই পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী পরিবর্ত্তন অপেক্ষা অনেক বেশী দূরপ্রসারী। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা অফুরন্ত শক্তির লীলার সহিত পরিচিত হইয়াছি। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে মাইকেল মধুসূদন শক্তির ঐশ্বর্য্যের প্রতিনিধি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এই শক্তি ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির বাঁধাধরা নিয়ম মানিয়া লইতে চাহে না; প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্যের গগনস্পর্শী হর্ম্ম্যচূড়া রচনা করে। যে রাম ভক্তবৎসল, যিনি চিরাচরিত ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রধান প্রতিভূ তিনি এই নূতন ভাবের উপযুক্ত বাহন হইতে পারেন না। তাঁহার অপেক্ষা স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, বাসববিজয়ী, দেবত্রাস রাবণ-মেঘনাদেই এই বিদ্রোহী ভাবের উপযুক্ততর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইতে পারে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মাইকেল মধুসূদন যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বিকৃতি নহে, কালোচিত রূপান্তরণ।

আর একটি দিক্ হইতে বিচার করিলেও আমরা এই পরিকল্পনার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার পরমাশ্চর্য্য সম্মিলন হইয়াছিল।

তিনি হোমারের অনুকরণে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, হোমারের অনুসরণ করিয়াই রাক্ষস-নায়কদিগকে বীর্য্যবান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ট্যাসোকে অনুসরণ করিয়া তিনি প্রমীলার চরিত্রে যোদ্ধৃজনোচিত শৌর্য্য আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হোমারবর্ণিত ট্রয়যুদ্ধ বা ট্যাসোবর্ণিত জেরুজালেম-উদ্ধার-কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু রাক্ষসদের প্রতি তিনি যতই সহানুভূতিসম্পন্ন হউন্ না কেন, তাঁহার যুদ্ধের বর্ণনা যত তেজোদৃপ্তই হউক্ না কেন, তাঁহার কাব্যে বাহুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে নৈতিক শক্তির অনতিক্রম্য প্রভাব। রাবণ অমিতবিক্রম বীর, তাঁহার পুত্র বাসববিজয়ী; কিন্তু প্রথম হইতেই এই কথা স্পষ্ট করা হইয়াছে যে পরস্ত্রীহরণের অপরাধের জন্য রাবণকে ধ্বংস হইতে হইবেই। প্রথম সর্গে রাবণের মহিষী চিত্রাঙ্গদাই বলিয়াছেন :

হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

রাবণের শক্তির মূলে দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের কৃপা। তাই স্বয়ং উমা যখন মহেশ্বরকে বশীভূত করিতে গেলেন তখন তিনি কন্দর্পের সাহায্য গ্রহণ করিলেন যাহাতে তপস্বী মহাদেব পার্ব্বতীর প্রতি অনুকূল হইতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল এত বিশদ প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন ছিল না। মহাদেব খুব সহজেই বলিলেন,

পরম ভকত মম নিকষা নন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
* * *
মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।

লক্ষ্মণ যে মেঘনাদকে মারিতে উদ্যত হইলেন তাহার অন্যতম কারণ এই যে পিতার অধর্ম্মের ফলে মেঘনাদ পূর্ব্বের মত অপরাজেয় থাকিতে পারিবেন না। তিনি রামকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন—

অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি;
তার পাপে হতবল হবে রণভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে লক্ষ্মণ অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অন্যায় সমরে লক্ষ্মণ ব্রতী হইয়াছেন ন্যায়েরই জন্য; এই উপায়েই পরস্ত্রী-অপহারকের যথাযোগ্য শাস্তি সম্ভব। লক্ষ্মণ যে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বয়ং মহাদেবের নির্দ্দেশ ছিল। রাবণও পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছেন :

কি কুক্ষণে তোর (শূর্পণখার) দুখে দুখী
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?

অন্যত্রও তিনি প্রাক্তনের বা পূর্ব্বজন্মফলের অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ইলিয়াডেরও মূল ঘটনা পরস্ত্রী-অপহরণ। এই গ্রন্থে কোন কোন জায়গায় এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে যে হেলেন মেনেলাউসের বিবাহিতা পত্নী এবং সেই হিসাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই ট্রয়বাসীদের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই মত প্রাধান্য পায় নাই, পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণও নাই। তিনটি দেবীর মধ্যে রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্যারিস্ একজনকে নির্ব্বাচিত করিয়া পুরস্কারস্বরূপ

হেলেনকে পাইয়াছিলেন এবং অপর দুই দেবীর কোপভাজন হইয়াছিলেন। ট্রয়যুদ্ধে দেবীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রতিফলিত হইয়াছে; নৈতিক প্রশ্নটি এখানে অবান্তর না হইলেও অপ্রধান। আর একটি মহাকাব্যের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তুলনা করিলে এই বৈশিষ্ট্যটি অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। প্রমীলার চরিত্র ট্যাসোর ক্লোরিণ্ডার অনুকরণে অঙ্কিত হইয়াছে। ক্লোরিণ্ডা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সম্মুখসমরে নিহত হইয়াছেন। প্রমীলা রামলক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম প্রমীলার দূতীকে বলিলেন :

তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
* * *
বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনারণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।

ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যের রাম ভীরু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ভীরুতাও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং এই নৈতিক আদর্শ সমস্ত কাব্যখানিকে বিস্তৃতি ও ঐক্য দান করিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন ভারতীয় আদর্শের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া রাক্ষসদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহাকাব্যকে মহত্ত্ব দান করিয়াছে গার্হস্থ্য নীতি-ধর্ম্ম, যাহার কাছে রক্ষোরাজকে নতশির হইতে হইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টি—দেবদেবী

শুধু মৌলিক পরিকল্পনা নহে চরিত্রসৃষ্টিতেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমেই দেবদেবীদের কথা ধরা যাইতে পারে। ইলিয়াডে দেবদেবীগণ মানব-মানবীর ন্যায়। মানব-মানবীর সব দোষগুণই তাঁহাদের আছে, শুধু তাঁহাদের শৌর্য্য ও শক্তি মানবাতিরিক্ত। তাঁহারা গ্রীক্ ও ট্রোজান্‌দের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক সময় আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। নিজেদের রাজ্যে তাঁহারা মানবোচিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইয়াছেন; দেবরাজ জিউস্‌কে দেবমহিষী হিরা মর্ত্ত্যবাসিনী নায়িকার মতই মুগ্ধ করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনের দেবদেবীরা হোমারের আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছেন; সেইখানেও পার্ব্বতী মোহিনী মূর্ত্তিতেই মহাদেবকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এখানে কুমারসম্ভবের উমা-মহেশ্বর-সংবাদের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও কুমারসম্ভবে যে যতিশ্রেষ্ঠ মহাদেব ও পূজারতা পার্ব্বতীর পরিচয় পাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তাঁহাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা বরং জিউস্ ও হিরারই অনুরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও মহাদেব যে অমোঘ নীতি-ধর্ম্মে অনুরক্তি দেখাইয়াছেন জুপিটারে তাহার স্পর্শমাত্র নাই। অন্যান্য দেবদেবীগণ হোমারের দেবদেবী অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ তাঁহারা সবাই মেঘনাদের ভয়ে ত্রস্ত এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পর তাঁহারা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন তাঁহাদের শক্তি অপহৃত হইয়াছে। সুতরাং পার্থিব বীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠত্ব হোমারের দেবদেবীর মধ্যে দেখা যায় এখানে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। তাহা হইলেও মাইকেল স্বর্গবাসী দেবদেবী ও অশরীরী মায়া প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষগোচর মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তাই প্রমাণিত করে। তাঁহার সৃষ্টির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ—পরিকল্পনার

ঐশ্বর্য্য। শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া নহে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ইন্দ্র, শচী, মদন, রতি, পার্ব্বতী, মুরলা প্রভৃতি দেবদেবীগণ অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্। তাঁহাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ন্যায়ান্যায়বোধ, ভক্তবাৎসল্য তাঁহাদিগকে সাধারণ নর-নারী অপেক্ষা উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে এবং তাঁহারা হইতেছেন সেই নৈতিক শক্তির প্রতীক যাহা পাপাচারী রাবণকে সবংশে নিধন করিবে।

রাম—লক্ষ্মণ—রাবণ—মেঘনাদ

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাম ও লক্ষ্মণের এবং তাঁহাদের সহযোগীদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাম ও লক্ষ্মণ মাইকেলের প্রতিভার অপূর্ণতার পরিচায়ক এইরূপ মত বহুলোকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই মতের আংশিক সত্যতা মানিতেই হইবে। তবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাম ও লক্ষ্মণ এই কাব্যে অবতাররূপে কল্পিত না হইলেও তাঁহারা ধর্ম্মের অমোঘ নিয়মের বাহন মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের ব্যক্তিগত শৌর্য্য তাঁহাদের পক্ষে শেষ কথা নহে, তাঁহারা সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও চরাচরব্যাপী নীতির প্রতিনিধি যাহা রাবণ লঙ্ঘন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, তিনি সকল প্রলোভন জয় করিতে পারেন, এমন কি দিব্যাঙ্গনারা তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারেন নাই। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি কাতর নহেন, স্বয়ং শূলী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও তিনি প্রস্তুত, এবং রাবণ যখন তাঁহাকে বধ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তিনি সদর্পে অথচ সংযতভাবে উত্তর করিলেন :

ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষঃকুলপতি
নাহি ডরি যমে আমি, কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি
যথাসাধ্য কর রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।

লক্ষ্মণ বীরশ্রেষ্ঠ হইলেও মেঘনাদকে অন্যায় সমরে নিধন করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি সচেতন বলিয়াও মনে হয় না। তাঁহার যুক্তি বীরের যুক্তি নহে :

আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে?
* * *
মারি অরি, পারি যে কৌশলে।

মাইকেল মধুসূদন যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে বাল্মীকি-অঙ্কিত রাম কর্ত্তৃক বালিবধের চিত্র ইহা অপেক্ষা মহত্তর নহে। কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে তিনি দৈবশক্তির বাহন হিসাবে অন্যায় সমরে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রজিৎবধের পরে রাম যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহার মধ্যে মাইকেলের চরিত্রাঙ্কনের উপযুক্ততর সমর্থন পাওয়া যাইবে। রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন :

লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র।
* * *
পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব! সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে।

লক্ষ্মণ চরিত্রের কথা পরে পুনরায় আলোচিত হইবে। মাইকেলের অঙ্কিত রামের দুর্ব্বলতা সুবিদিত।

তিনি যে প্রমীলার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই ইহা তাঁহার নৈতিক আদর্শের উচ্চতা প্রমাণ করে বটে, কিন্তু ইহাও সত্য যে তিনি তখনই বিভীষণকে বলিয়াছিলেন :

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে;

লক্ষ্মণকে লঙ্কাপুরীতে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বাধিক শঙ্কিত হইয়াছে, তিনি প্রায় বৃদ্ধা রমণীর মত ভীত হইয়াছেন। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে রাবণ যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি একবার অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে রাবণ বলিলেন—

কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর! মারিব তারে, যাও ফিরি তুমি
শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ।

অম্‌নি রাম শত্রুকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ কাপুরুষতা লজ্জাকর। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেও হনুমান ও সুগ্রীব অমিততেজে রাবণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের তুলনায় রামকে অতিশয় হীনপ্রভ বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মণ শক্তিশেলের দ্বারা আহত হইলে রাম যে শোকাকুল হইয়া পড়িলেন তাহাতেও তাঁহার নারীসুলভ কোমলতাই প্রকাশ পায়। এখানে রাবণের তুলনায় তাঁহার নিকৃষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকাকুল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস অসংযত নহে, তন্মধ্যে স্বীয় অসহায়তার জন্য আক্ষেপ আছে, কিন্তু নিজের প্রতি অকুণ্ঠিত আশ্বাসও আছে, কল্পনা ও অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে এই উচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ গভীর শোকে আহত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি অভিভূত হয়েন নাই। তিনি ধীর, স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহার তুলনায় রামচন্দ্রের অশ্রুপাতপ্রবণতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।

শুধু সাহিত্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে মাইকেলের চরিত্রাঙ্কনের স্বপক্ষে একটি কথা বলা যাইতে পারে। ঋষিবর্ণিত কাহিনীতে রাম-লক্ষ্মণের যে প্রাধান্যই থাক্ বা এই বিষয়ে আমাদের যে সংস্কারই থাকুক্ না কেন, মাইকেলের পরিকল্পনায় রাম-লক্ষ্মণের স্থান গৌণ এবং রামের বীরত্বের অভাব অথবা লক্ষ্মণের অন্যায় সমরে শত্রুহত্যা এই পরিকল্পনার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। মাইকেলবর্ণিত রাবণ নরশোণিতপিপাসু রাক্ষস নহেন, আর্য্যসভ্যতার শত্রু অনার্য্য রাজা নহেন, তিনি রক্ষোরাজ, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে তুলনীয়। দেবতাদের সঙ্গে কলহে রত হইলেও তিনি লক্ষ্মীর ভক্ত ও শিবের প্রিয়। তিনি যাগযজ্ঞ করেন, তাঁহার পুত্রবধূ আর্য্যরমণীর মত অনুমৃতা হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্রের শ্রাদ্ধে

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;

রাবণ আদর্শ রাজা, স্নেহময় ভ্রাতা, অনুরাগী স্বামী এবং সন্তানবৎসল পিতা ও শ্বশুর; তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও কোমলতার পরমাশ্চর্য্য সম্মিলন হইয়াছে। কিন্তু তিনি পাপাচারী। অপর পাপের কথা গ্রন্থে লিখিত হয় নাই; শুধু একটির উল্লেখই যথেষ্ট। বৈদেহীকে চুরি করিয়া তিনি জগতের নৈতিক নিয়মপ্রপঞ্চকে বিচলিত করিয়াছেন। এই নিয়মপ্রপঞ্চ তাঁহার বিরুদ্ধে সংহত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতা মহাদেব আছেন, যে রক্ষোরাজলক্ষ্মীকে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সেবা করিয়াছেন তিনি আছেন, অন্যান্য দেবদেবীরা আছেন, স্বীয় অনুজ বিভীষণ আছেন। এখানে রাম ও লক্ষ্মণের নিজস্ব বাহুবল ও মানসিক শক্তির অবকাশ কম। স্বয়ং মহাদেব লক্ষ্মণকে বর দিয়াছেন,

ভগবতী রামের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, দৈব অস্ত্রে লক্ষ্মণ অজেয় হইয়াছেন, মায়াদেবী তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়াছেন এবং বিভীষণ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়াছেন। এই জায়গায় রাম বা লক্ষ্মণের ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়-বোধের বা শৌর্য্যের প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত গৌণ।

এই জন্যই ষষ্ঠ সর্গের যুদ্ধবর্ণনা এত চমৎকার হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে লক্ষ্মণ তস্করের মত যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র রথীকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এই যুদ্ধের বর্ণনা যদি কোন ভাব জাগাইতে পারে তাহা লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে জুগুপ্সা। এই কারণে কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্ব্বনিকৃষ্ট। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মেঘনাদের বধ সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা; যদি এই অংশ নিকৃষ্ট হইত তাহা হইলে সমগ্র কাব্যের মধ্যেও সেই নিকৃষ্টতা আপতিত হইত। কিন্তু সমগ্র কাব্যসম্বন্ধে আমাদের মনে বিস্ময় ও আনন্দের ভাবই জাগরিত হয় এবং ষষ্ঠ সর্গকেও আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়াই মনে করি। ইহার কারণ অমিত-তেজা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র মেঘনাদ এখানে পরাভূত হইয়াছেন—সমস্ত বিশ্ববিধানের দ্বারা, লক্ষ্মণের দ্বারা নহে। এই জন্যই তাঁহার সাহস ও বিক্রম অতিমানবীয় স্তরে উন্নীত হইয়াছে, এবং প্রাক্তনের বিরুদ্ধে তাঁহার অসহায়তাও অপরিসীম বিশালতা লাভ করিয়াছে।

প্রমীলা

মেঘনাদের জীবনের ঐশ্বর্য্য ও মৃত্যুর মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কবি প্রমীলা চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদ শুধু বাসববিজয়ী বীর নহেন, তিনি যোগ্য পিতামাতার যোগ্য পুত্র; তদুপরি তিনি বীর্য্যবতী সাধ্বী রমণীর পতি। প্রমীলা ও মেঘনাদকে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই প্রমোদকাননের বিলাসবিভ্রমের মধ্যে। এখানকার বর্ণনা তাঁহাদের জীবনের ঐশ্বর্য্যময়তার পরিচয় দেয় এবং আসন্ন বিষাদময় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিশেষ মাধুর্য্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে মাইকেলের এই বর্ণনা ট্যাসোর আর্মিনিয়া-রাইনাল্ডো কাহিনীর অনুসরণে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ট্যাসো লিখিয়াছেন মায়াবিনীর কুহকের কথা, আর মাইকেল আঁকিয়াছেন—দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র। এই কারণে মাইকেলের বর্ণনায় যে যথার্থতার ছাপ আছে ট্যাসোর বর্ণনায় তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। ইহার পর তৃতীয় সর্গে প্রমীলাকে দেখি বীরমূর্ত্তিতে—তিনি রাঘবের বিজয়ী চমূকে অগ্রাহ্য করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছেন। মেঘনাদবধূ প্রমীলার চরিত্র মাইকেলের মৌলিক সৃষ্টি। তিনি কাশীরাম দাসের মহাভারতে অশ্বমেধপর্ব্বে প্রমীলানাম্নী বীর রমণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং ভার্জ্জিলের ক্যামিলা ও ট্যাসোর নায়িকাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্যামিলা, ক্লোরিণ্ডা প্রভৃতি নায়িকাদের সঙ্গে মর্ত্ত্যের সম্পর্ক খুব কম। তাঁহারা যেন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রণয়ীর সংস্রবে আসিয়াছেন, কিন্তু এই প্রণয় দূরাগত প্রতিধ্বনির ন্যায়, ইহার দ্বারা তাঁহাদের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত হয় নাই। প্রমীলার ইতিহাস অন্যরূপ। তিনি রাবণ-মন্দোদরীর স্নুষা, মেঘনাদের পত্নী ও রাক্ষসকুলের রাজবধূ এই সম্পর্কের দ্বারা তাঁহার সমস্ত জীবন প্রভাবান্বিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে দেখি তাঁহার কল্যাণী প্রেমময়ী মূর্ত্তি, তিনি প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদের সঙ্গে আনন্দের নীরে ভাসিতেছেন। কিন্তু যখন কঠিনতর কর্ত্তব্যের আহ্বানে মেঘনাদকে চলিয়া যাইতে হইল, তখন তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন। কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাঁহার নিজের চরিত্রও রূপান্তরিত হইল এবং এই রূপান্তরণের পরিচয় পাই তৃতীয় সর্গে, যেখানে যোদ্ধবেশে রাঘবসৈন্যদলের মধ্য দিয়া তিনি লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়াডে ষষ্ঠ সর্গে ট্রয়ের রাজকুমার হেক্টর যুদ্ধের প্রাক্কালে স্ত্রী অ্যান্ড্রম্যাকি ও শিশুপুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে

যান। সেই দৃশ্য অতিশয় করুণ। এই দৃশ্যের অনুসরণে মাইকেল মেঘনাদ-প্রমীলার সাক্ষাতের বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু পতির আসন্ন পরাজয় ও মৃত্যুর ছায়া অ্যাণ্ড্রম্যাকির উপরে পড়িয়াছে। এই রোরুদ্যমানা অ্যাণ্ড্রম্যাকির সঙ্গে দর্পিতা প্রমীলার কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রাক্কালেও প্রমীলা পারিবারিক জীবনের বন্ধন বেশী করিয়া অনুভব করিয়াছেন। ব্রুটাস্‌পত্নী পোর্‌শিয়ার মত তাহাই তাঁহার সাহসের উৎস :

দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী।
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে;

কিন্তু গর্ব্বিতা, অশঙ্কিনী রমণী শাশুড়ীর কোমলতম আদেশও অমান্য করিতে পারেন না। তিনি মন্দোদরীর অনুরোধে স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে বিরত হইলেন।

প্রমীলার কথা স্মরণ করিলে আমরা ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মেঘনাদের মৃত্যু শুধু বীর সৈনিকের পতন নহে, এই মৃত্যু একটি স্নেহসমৃদ্ধ দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল। প্রমীলা ক্যামিলা, ক্লোরিণ্ডার মত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন নাই; স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হইলেন। নবম সর্গে প্রমীলার যে ছবি দেখি তাহা শোকাকুলা সদ্যঃ বিধবার ছবি; কিন্তু সেইখানেও তাঁহার বীরোচিত স্থৈর্য্যের অভাব হয় নাই। তিনি মহাতীর্থযাত্রীর মত বীরবেশে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছেন। শুধু এক মায়ের কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষণিক বিহ্বলতা অতিক্রম করিয়া তিনি শান্ত সংযতভাবে বিধির বিধান মানিয়া লইলেন :

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে।

সীতা

মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্যজীবনের যে চিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে তাহা মাইকেলের পরিকল্পনার স্বকীয়তা প্রমাণ করে। ইহা পরোক্ষভাবে গ্রন্থের মৌলিক পরিকল্পনার উপরেও আলোক সম্পাত করে। মেঘনাদ ও প্রমীলার সুখের নীড় ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়, কিন্তু রামলক্ষ্মণের ইহা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। কিন্তু এমনি স্নেহসমৃদ্ধ দাম্পত্যজীবনকে রাবণ সবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে সবংশে নিহত হইতে হইল। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীররসপ্রধান কাব্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যে জিনিষটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেছে গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা। ইহাই সীতা ও সরমার কাহিনীর প্রবর্ত্তনার সার্থকতা। ভবভূতির উত্তররামচরিতকে অনুসরণ করিয়া মাইকেল রামসীতার দণ্ডকারণ্যস্থিত গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার একটি অতি মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন। সীতা সরমাকে বলিতেছেন :

ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।

প্রকৃতির ক্রোড়ে এই যে মাধুর্য্যমণ্ডিত জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কপোতীকে অপহরণ করিয়া রাবণ তাহাই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাধ সেই ব্যাধের অপরাধের সঙ্গেই তুলনীয় যে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত করিয়া শাশ্বত কালের জন্য ধিক্কৃত হইয়াছে। রাবণের ইহাই এই জাতীয় প্রথম অপরাধ নহে। জটায়ু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়াছেন :

চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজ হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেমদীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম জানি।

মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি। এই একটি ঘটনাকে মাইকেল মধুসূদন নানাভাবে বিশালতা দান করিয়াছেন। শুধু জটায়ু কেন, সীতা বিশ্বাস করিয়াছেন সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি তাঁহার গ্লানির কথা বহন করিয়া রামলক্ষ্মণের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। এই আশায় তিনি আকাশ, সমীর, মেঘ ও ভ্রমরের কাছে আবেদন করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহার দূতের কার্য্য করিবে। তাঁহার এই বিশ্বাস অলীক নহে, কারণ মাতা বসুন্ধরা তাঁহাকে স্বপ্নে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন :

বিধির ইচ্ছায় বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে।

সুতরাং সীতা-হরণ ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে; ইহা বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এবং সীতার জন্ম হইতে এই বিধানের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাকাব্যোচিত পরিকল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টির মহিমার উল্লেখের পর উহার বর্ণনার ওজস্বিতার কথা বলা প্রয়োজন। ভাষা ভাবেরই বাহন মাত্র এবং ভাষা ছাড়া কবির ভাবও অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মাইকেলের ভাষায় ও বর্ণনায় সর্ব্বত্র মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হোমার যেমন কোন দেবতা বা বীরের নাম করিলেই তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণনায় সমৃদ্ধি আনয়ন করেন, মাইকেলও তেমনি করিয়াছেন। তিনি কোন বীর, বীররমণী ও দেবতার নাম করিলেই তাঁহাকে উপযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কোথাও তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর নাম করিয়াছেন আবার কোথাও বীরের বিশেষ অস্ত্রের বা তৎসম্পর্কিত প্রাচীন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব শচীপতি কিংবা দম্ভোলিনিক্ষেপী কিংবা নমুচিসূদন, বরুণ জলেশ পাশী, কার্ত্তিক তারকারি অথবা কৃত্তিকাকুল বল্লভ সেনানী, লক্ষ্মণ সৌমিত্রি বা উর্ম্মিলা বিলাসী, বিভীষণ বিভীষণ রণে (যদিও বিভীষণ রণ করিয়াছেন এমন প্রমাণ নাই)। শুধু প্রত্যেক নায়ক বা নায়িকাই যে সর্ব্বত্র যথাযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন তাহা নহে। কবি যখন ইঁহাদের কথা বলিয়াছেন, তখন অবকাশ পাইলেই ইঁহাদের চরিত্রের, রূপের বা পরিবেশের সমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্মণের সঙ্গে শিবের সাক্ষাতের বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে :

কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যানদুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ যেন

ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে।

এই বর্ণনায় মাইকেলের প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাদেব ভোলানাথ, তিনি ভিখারী, তিনি শিব। কিন্তু এখানে তাঁহার কল্যাণমূর্ত্তির কোন পরিচয় নাই। কবি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার ভীমকান্তরূপ। সেই জন্য তিনি এমন কয়েকটি জিনিষই নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহা এই ভীষণতার পরিচয় দিতে পারে—ললাটে শশিকলা, শিরে জটাজূট এবং তাহার মাঝারে জাহ্নবীর ফেনলেখা, অঙ্গে বিভূতি, হস্তে ত্রিশূল। এই বর্ণনায় 'মহোরগ'-শব্দটিও লক্ষণীয়। বর্ণনাকে ওজস্বিতা দেওয়ার জন্য মাইকেল মধুসূদন সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্য ওজোগুণসমৃদ্ধ হইয়াছে এবং অনেক জায়গায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণবহুল পদের প্রয়োগে এই ওজস্বিতা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রকে সুনাসীর, সূর্য্যকে ত্বিষাম্পতি, বজ্রকে ইরম্মদ, লৌহাস্ত্রকে প্রক্ষেড়ন বলিলে বর্ণনার গৌরব ও গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পায়। মাইকেল এই রীতির বহুল প্রয়োগ করিয়া মহাকাব্যোচিত দীপ্তি আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে রৌদ্র, বীর ও অদ্ভুত রস এবং এই সকল রসের জন্যও ওজস্বী বর্ণনার প্রয়োজন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণতঃ যে দীপ্তি বা ওজস্বিতা বীর, রৌদ্র বা অদ্ভুত রস প্রকাশ করে তাহা দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের অপেক্ষা রাখে। মাইকেল লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে অতিদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতে প্রযোজ্য হইলেও বাংলায় তাহা বেমানান হইবে। সেইজন্য তিনি সমাসবদ্ধ পদসংঘটনার পরিবর্ত্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমন্বিত, গুরুগম্ভীরনাদবিশিষ্ট, সচরাচর-অপ্রচলিত শব্দের সন্নিবেশ করিয়া দীপ্তিগুণ আনয়ন করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রয়োগ তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা প্রমাণ করে। এইখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংযুক্ত বর্ণ অপেক্ষা হসন্ত বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়; এই জন্য রবীন্দ্রকাব্য ওজোগুণ অপেক্ষা মাধুর্য্যগুণের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উপমা

মহাদেবের যে বর্ণনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার উপমা-সমৃদ্ধ লক্ষণীয়। হোমারের অন্যতম প্রধান গুণ উপমার বৈশিষ্ট্য। হোমার অধিকাংশ বিষয়কে উপমার সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ তাঁহার উপমাগুলি উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপমানের বৈশিষ্ট্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া মহাকাব্যকে বিশালতা দান করে। মাইকেলের কাব্যে উপমার প্রাচুর্য্য হোমারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু হোমার যেমন উপমানকে বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন মাইকেল তাহা করেন নাই। তিনি উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়া অন্য উপমানের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার উপমাগুলি বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া ভাবকে ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়াছে। আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন যে কাব্যের আত্মা হইতেছে ঔচিত্যবোধ। ঔচিত্যবোধের অর্থ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে এবং তাহাকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে নানা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই সকল কূট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে সৎকাব্যে ঔচিত্যবোধ থাকিবেই এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপমাসমূহ প্রায় সর্ব্বত্রই অতিশয় ঔচিত্যবান্। মাইকেল ঠিক যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সুপরিচিত কিংবদন্তী বা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই ভাবটিকে সুস্পষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করিয়াছেন। মহাদেবের প্রশান্ত মহিমা বর্ণনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাই তিনি শিরঃস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন সর্পের মস্তকস্থিত মণির; এই তুলনায় শশিকলার

উজ্জ্বলতা ও মহাদেবের ভীমকান্ত রূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। মহাদেবের জটাজূটের সঙ্গে রাত্রির এবং জাহ্নবীর ফেনলেখার সঙ্গে কৌমুদীর শুভ্ররেখার তুলনায় মহাদেবের ভীষণতা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে আবার আঁধারের রহস্যময় রূপও প্রস্ফুট হইয়াছে।

মাইকেলের অধিকাংশ উপমাই ঐশ্বর্য্য, বৈচিত্র্য ও ঔচিত্যের পরিচয় দেয়। তাঁহার যে সকল উপমা প্রচলিত কথায় পরিণত হইয়াছে তাহাদের দুই একটির আলোচনা করিলেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ রাবণের কাছে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। ইহা রাত্রির স্বপ্নের মত অলীক। যে কোন কবি এই তুলনা দিতে পারিতেন। রাবণ এই অবিশ্বাস্যতার কারণ দর্শাইতে যাইয়া বলিতেছেন :

অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সেই ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে?

এই অসম্ভব কার্য্যের কথা শুনিয়া রাবণের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে :

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

শাল্মলী তরুবর বিশালতা ও দুশ্ছেদ্যতার জন্য সুপরিচিত, ফুলদল কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি এবং ফুলদলের অন্য যে শক্তিই থাকুক্ ছেদনকার্য্য তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। রামের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুও রাবণের কাছে একেবারে অসম্ভাব্য বলিয়া ঠেকিতেছে। এই উপমার ব্যঞ্জনা এইখানেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। রাবণকে এই অসম্ভাব্য ব্যাপার মানিয়া লইতে হইবে; প্রতি পদে রাবণ দেখিয়াছেন যে ভিখারী রাঘব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সমুদ্রে শিলা ভাসিয়াছে, নিহত হইয়াও রাম পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন; সুতরাং ফুলদলের পক্ষে কর্ত্তন করা এবং বিশাল শাল্মলী তরুকে কর্ত্তন করাও অসম্ভব না হইতে পারে।

মাইকেলের অগণিত উপমাসমূহের যে কোন একটি ধরিলেই এই বিস্তৃতি ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজা দশানন যখন প্রাসাদশিখরে উঠিলেন তখন মনে হইল :

কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

কিন্তু তিনি বাহিরে তাকাইয়া যখন শত্রুবৃন্দকে দেখিলেন তখন তাহারা প্রতীয়মান হইল :

বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মণ্ডলে।

দুইটি সুপ্রসিদ্ধ উপমার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলে মাইকেলের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমীলা যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতা যে সরমাকে তাঁহার দুঃখের কথা প্রকাশ করিলেন তাহা উভয়তঃই স্রোতস্বতীর গতির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে। প্রমীলা যখন বাহির হইতেছেন তখন তিনি বাধার দিকে দৃষ্টি দেন নাই, নিজের অপ্রতিরোধনীয় গতির কথাই প্রকাশ করিয়াছেন :

কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

কিন্তু সীতা যখন পূর্ব্বস্মৃতির রোমন্থন করিয়াছেন তখন শোকের নিপীড়ন অনুভব করিয়াই মনের

কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানেও সেই অপ্রতিরোধনীয় গতির কথা আছে, কিন্তু তাহা শোকের বেগ, উদ্দেশ্যবান্ উৎসাহের পরাক্রম নহে :

বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে;..........

প্রথম দৃষ্টান্তে সিন্ধুর আহ্বান প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই আহ্বান যে স্রোতস্বতী শুনিয়াছে তাহার কাছে যে কোন বাধাই অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুঃখের পীড়ন এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে মন আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া সেই পীড়নের ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে। এম্‌নি করিয়া একই উপমান পরস্পর-বিরোধী করুণ ও বীররসের অভিব্যক্তি দিয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাইকেল সংযুক্ত বর্ণবহুল শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষাকে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছেন; আবার উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়া বর্ণনার মধ্যে বিশালতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আনিয়াছেন। এই দুইগুণের সম্মিলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্য অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। যে কোন সুপ্রসিদ্ধ উপমার আলোচনা করিলে এই সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে :

উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে;

বক্ষ্যমাণ উপমায় বিদ্যুৎ ও বজ্রের সঙ্গে প্রমীলার মোহিনী মূর্ত্তি ও উদাত্ত স্বর তুলিত হওয়ায় প্রমীলার সৌন্দর্য্য ও বীর্য্য মহিমান্বিত হইয়াছে এবং সংযুক্তবর্ণের বহুল প্রয়োগ ও অনুপ্রাসের সুনির্ব্বাচনে এই বর্ণনা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বর্ণনা

'মেঘনাদবধ কাব্যে' বহু সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে এবং সেই সব বর্ণনার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য মাইকেলের প্রতিভার স্বকীয়তার সাক্ষ্য দেয়। এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য—ঐশ্বর্য্যবোধ। কাব্যের প্রারম্ভেই দেখি রাবণ এক অপূর্ব্ব সভায় কনক আসনে বসিয়া আছেন :

ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চে স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।

এই বর্ণনায় ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ইহা বীরত্বব্যঞ্জক নহে, বরং এই সভা প্রোজ্জ্বল রঙ্গালয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহার পরে রণক্ষেত্রের যে চিত্র পাই তাহা ভীষণতার জন্য স্মরণীয়। আবার তাহার পরেই আসিয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদকাননের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা :

বৈজয়ন্ত ধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়, চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দন কানন যথা।

সর্গের প্রারম্ভে যে গোধূলির বর্ণনা আছে তাহাও কমনীয়তার জন্য উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সীতাকর্ত্তৃক গোদাবরীতীরস্থ জীবনযাত্রার কাহিনী। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীররসপ্রধান মহাকাব্য। তন্মধ্যে এই সকল মাধুর্য্যগুণসমন্বিত বর্ণনা কবিপ্রতিভার বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়। বীররসপ্রধান বর্ণনায়ও এই বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে মাইকেল যোদ্ধৃবেশধারিণী প্রমীলার উল্লেখ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বর্ণনা অতিশয় নিরাভরণ। মাইকেলের প্রমীলার বর্ণনা অলঙ্কারসমৃদ্ধ, বীররস ও শৃঙ্গাররসের সমন্বয়ে ঐশ্বর্য্যবান :

বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গমন্দিরা·
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূলপাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতনসম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুমধনুঃ। মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুমশরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা;

কিন্তু যেখানে কবি দেবতা, রাক্ষস ও মানবের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা দিয়াছেন সেইখানে শুধু শৌর্য্যবীর্য্য ও ভীষণতার চিত্র আঁকিয়াছেন। সেইসব বর্ণনায় অলঙ্কারের ও শব্দসম্ভারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য লক্ষণীয়। সপ্তম সর্গের যে কোন একটি খণ্ডাংশ লইলেই মাইকেলের বর্ণননৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হইবে :

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
* * *
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি:
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমিরবিনাশী
দিনমণি; * * *
জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি।

এই দুইটি বর্ণনার তুলনা করিলে মাইকেলের বর্ণনাবৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। প্রমীলা রণসাজে সজ্জিতা হইলেও, তাঁহার অন্তরীক্ষে থাকিয়া কুসুমেষু স্বীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া

চলিয়াছেন। প্রমীলা উপমিত হইয়াছেন ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীনা শচী ও গরুড়বাহিনী রমার সঙ্গে অথবা সিংহবাহিনী উপমার সঙ্গে যিনি মহিষমর্দ্দিনী হইয়াও অন্নপূর্ণা। এই বর্ণনা ঐশ্বর্য্যময়, ইহার মধ্যে কঠিন ও কোমলের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু রাক্ষস অনীকিনী কবিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে উগ্রচণ্ডা চণ্ডীর কথা, যাঁহার মধ্যে কোমলতার লেশমাত্র নাই। প্রমীলার চতুর্দ্দিকে যে বিভা খেলা করিয়াছিল তাহা বিদ্যুতের ক্ষণিক হাসির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে; ক্ষণপ্রভা বলিয়াই ইহা মোহিনী, কিন্তু দেবদানবমানবের যুদ্ধে সৌদামিনীর যে প্রভাকে দেখিতে পাই তাহা ভয়ঙ্করী, চামুণ্ডার হাসিসদৃশা।

মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ভীষণতার বর্ণনা দিয়াই মাইকেল ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি বীভৎসতারও বর্ণনা দিয়া তাঁহার মহাকাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। ভার্জ্জিল, দান্তে ও মিল্টনের অনুসরণ করিয়া মাইকেল অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় তিনি বিশেষভাবে দান্তের নরকবর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। দান্তের বর্ণনায় যে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় মাইকেলের বর্ণনায় তাহা নাই, কিন্তু মাইকেলের বর্ণনায়ও তীব্রতার অভাব নাই, এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে দান্তের যোগ্য শিষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যে কোন দৃষ্টান্ত বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি কয়েকটি সুনির্ব্বাচিত শব্দের সাহায্যে ভীষণতার নগ্নমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং বর্ণনা যতই বীভৎস হউক্ না কেন তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে নীতিধর্ম্মে কবির অবিচলিত বিশ্বাস।

স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি নয়নাগ্নি মিশিছে তা' সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা;—"এই যে
নারী-কুল রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা বসন্তে যেমতি
বনস্থলী; কামি-মন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা!"

রমণীর সে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামনার উদ্রেক করে, যাহাদের রূপের বর্ণনা কবিগণ যুগে যুগে করিয়া আসিয়াছেন এইখানেও তাহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। মর্ত্ত্যে এই অধরোষ্ঠ বিম্বফলের সঙ্গে তুলিত হইত, স্তনযুগ কনক কটোরার কথা স্মরণ করাইয়া দিত, নাসাপথ তিলফুলকে লজ্জা দিত, নয়নের দ্যুতির কাছে চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ হার মানিয়াছিল। বসন্ত পুষ্পাভরণসজ্জিতা বনস্থলীর উল্লেখ বৈপরীত্যের দ্বারা ইহাদের রূপের ভীষণতা বাড়াইয়া দিয়াছে মাত্র।

দোষ

বহুগুণসমন্বিত হইলেও মেঘনাদবধ কাব্য ক্রটিশূন্য নহে এবং সেই প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যক। প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থের পরিধি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের একটি খণ্ডাংশ লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে; মহাকাব্যবর্ণিত ব্যাপার সংঘটিত হইতে তিন চার দিনের বেশী সময় লাগে নাই। ইহার সঙ্গে যদি তুলনা করি অষ্টাদশ পর্ব্বব্যাপী মহাভারত বা চতুর্ব্বিংশসার্গব্যাপী ইলিয়াডকে তাহা হইলে এই গ্রন্থের সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ভার্জ্জিলের

ঈনিড্, দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া এবং ট্যাসোর জেরুজালেম উদ্ধার প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃতপরিসর। মেঘনাদবধ কাব্যে সর্ব্বব্যাপী নীতিধর্ম্মের কথা আছে, এবং রাবণ যে বিশ্ববিধানকে বিচলিত করিয়াছেন তাহা বারংবার কথিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ-প্রমীলার ব্যক্তিগত কাহিনী এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলাবিপর্য্যয়রূপ বিষয়টি যথোচিত প্রাধান্য পায় নাই। বোধ হয় মাইকেলের পরিকল্পনায় একটা স্ববিরোধিতা ছিল। বিশ্ববিধানে বিপর্য্যয় সংঘটিত করিয়াছেন মেঘনাদ-পিতা রাবণ এবং সেই হিসাবে মেঘনাদও ইহার জন্য দায়ী। অথচ মাইকেলের সমস্ত সহানুভূতি আপতিত হইয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার উপর। মেঘনাদের পক্ষ অন্যায়ের পক্ষ, অথচ বিধিব এমনই বিধান যে—

....হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।

ধর্ম্মের বিধান রক্ষা করিবার জন্য দেবতারা লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধে নিয়োজিত করিয়াছেন। অথচ উমা বলিয়াছেন :

মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
* * *
অবশ্য লক্ষ্মণশূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতিসহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি,
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।

এই মৌলিক অসঙ্গতিতে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মাইকেল রাম ও তাঁহার দলকে পছন্দ করিতেন না অথচ তাঁহাদিগকেই ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিভূ করিয়াছেন।

মহাকাব্যোচিত দীপ্তি লাভ করিবার জন্য মাইকেল অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত, সংযুক্তব্যঞ্জন সমন্বিত শব্দের প্রয়োগ করিয়া এবং উপমার বাহুল্যের দ্বারা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন এবং অধিকাংশক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও ভাষা অনাবশ্যকভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছে এবং উপমায় কষ্টকল্পনা এবং অতিশয়োক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রসাদগুণ বা স্বচ্ছতা সর্ব্বরসসাধারণ এই সব জায়গায় তাহার অভাব হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই দোষের পরিচয় স্পষ্ট হইবে।

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত।

এখানে অস্পষ্টতা ছাড়া পুনরুক্তির দোষও হইয়াছে।

তুরঙ্গম আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায়রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস সরসে

রমণীর গতির সঙ্গে তুরঙ্গমের আস্কন্দনের তুলনা শোভন নহে; বিশেষতঃ পরবর্ত্তী উপমান মধুর আন্দোলনের পরিচায়ক। মন হয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আকর্ষণে কবি এইরূপ বর্ণনা দিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা!)

মধুস্বর প্রকাশ করিবার পক্ষে 'কাদম্বা' শব্দ অনুপযোগী এবং ইহা শ্রুতিকটুও বটে।

উপমার মধ্যেও কোথাও কোথাও কষ্টকল্পনা ও অস্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামের মধুর শব্দের কথা স্মরণ করিয়া সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন :

যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমনি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।

এখানে হোমারীয় উপমার অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু উপমান ও উপমেয়ের মৌলিক বৈসাদৃশ্যের জন্য সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দুই এক জায়গায় অতিশয়োক্তির জন্য বর্ণনা একেবারে মাধুর্য্য বিবর্জ্জিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সকল মায়াবিনীরা লক্ষ্মণকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের বেণীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এইভাবে :

মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত!
হায়রে এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গভূষণ শূলী।

এখানে কষ্টকল্পনা ও উপমাবাহুল্যে বর্ণনা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। মাইকেল সর্ব্বত্র ভাষায় ওজোগুণের প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন এবং সফলকামও হইয়াছেন। কিন্তু দুই এক জায়গায় তাহা সম্ভব হয় নাই এবং সেইখানে বিপরীত রকমের ত্রুটি দৃষ্ট হয়; তথায় কথ্য ভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া মাইকেল মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন :

দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো নাগো আর তার কাছে
মোর কিরে প্রাণেশ্বর।

মাইকেল যে রীতিতে মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে অতিগাম্ভীর্য্য, অতিশয়োক্তি, দূরান্বয়, পরুষতা এবং গুরুচণ্ডালী দোষ প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এই সকল দোষ অতিক্রম করিয়া দীপ্তি ও সৌকুমার্য্যের সমন্বয় করিতে পারিয়াছেন।

অমিত্রচ্ছন্দ

মাইকেল মধুসূদনের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন; বাংলার প্রচলিত ছন্দ ছিল পয়ার, তাহার মিত্রচ্ছন্দ অর্থাৎ তাহার মধ্যে অন্ত্য অক্ষরের মিল আছে। তাহার আর একটি লক্ষণ এই যে তাহার মধ্যে প্রতি ছত্রে চৌদ্দ অক্ষর বা মাত্রা থাকে এবং আট মাত্রা ও চৌদ্দ মাত্রার পর বিরাম হয়। মাইকেল যে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন তাহাতে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর অটুট রহিয়াছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ অন্ত্য অক্ষরের মিল বর্জ্জন করেন। ইহাতে সুবিধা হইল এই যে প্রত্যেক দুই ছত্রের পরে ভাবধারা থামিয়া যায় না, ভাব আপনার গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি

আর একটি নূতনত্বেরও প্রবর্ত্তন করেন। সাধারণতঃ পয়ারে আট মাত্রার পরে যতি পড়ায়, কাব্যের গতি একঘেয়ে হয়। কিন্তু এখানে নানা ছত্রে নানা জায়গায় বিরাম থাকায়, কাব্যের গতিতে বৈচিত্র্যের প্রবর্ত্তন হয়। এই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। কবি হেমচন্দ্র যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিলে মাইকেল মধুসূদনের মৌলিকতা অনুমিত হইবে :

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারীদেশে; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে

এখানে প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে পয়ারের নিয়মানুসারে আট মাত্রার পরে প্রথম যতি পড়ে। হেমচন্দ্র মনে করেন দ্বিতীয় ছত্রে দশ মাত্রার (আসি'র) পর প্রথম বিরাম হয়। তৃতীয় ছত্রের বিরামস্থল চার মাত্রার (নারীদেশে'র) পর। এখানে মাইকেলের আর একটি কৌশল লক্ষ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয় ছত্রে প্রথম পর্ব্ব দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব চার মাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে ছন্দের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাবের গতির জন্য দ্বিতীয় ছত্রের 'উতরিলা' তৃতীয় ছত্রের 'নারীদেশে'র সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। ফলে ছন্দের গতি এইভাবে প্রবাহিত হইয়াছে :

যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে / আসি, উতরিলা—নারীদেশে /

প্রথম পর্ব্বে থাকিবে দশ মাত্রা এবং শেষের পর্ব্বে থাকিবে আট মাত্রা। ইহাতে ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে; এই ছত্রের মধ্যে আর একটু কৌশলও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম পর্ব্বে দুইটি পর্ব্বাঙ্গ কল্পনা করা যাইতে পারে। আট মাত্রার পর প্রথম বিরাম পড়িবে এবং দশ মাত্রার পর পুনরায় বিরাম পড়িবে। এইরূপ ভাবে ছন্দের গতি অনুসরণ করিলে, এই আঠার মাত্রাকে ৮+২+(৪+৪) মাত্রায় ভাগ করা যাইতে পারে।

এইভাবে এক ছত্রকে আর এক ছত্রের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে ছন্দের প্রবাহ দীর্ঘীকৃত হইয়া যায় এবং কাব্যের ভাষা বিস্তৃতির ব্যঞ্জনা দিতে পারে। হেমচন্দ্র এই দীর্ঘীকরণকে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন এইরূপ বিরাম-যতি সংস্থাপনের ফলে পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু দুঃশ্রাব্যতা দোষ হইয়াছে। হেমচন্দ্রের এই মত সবাই গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। স্রোতের নিয়মই এই যে সে অবিশ্রান্ত প্রবাহে অগ্রসর হইতে থাকে; সে থামিয়াও থামে না। এক ছত্র হইতে অপর ছত্রে ছন্দকে টানিয়া নিলে এই অবিশ্রান্ত গতিবেগ আভাসিত হয়। এই অগ্রগতি পয়ারের মধ্যে সমধিক সুসমঞ্জস হয়, কারণ পয়ারের দুই অংশ সমান নয়। শেষের পর্ব্ব (৬) প্রথম পর্ব্ব (৮) হইতে ছোট; তাই যদি ইহার রেশ টানিয়া পরবর্ত্তী ছত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ধ্বনিতরঙ্গ অধিকতর বিস্তার ও সামঞ্জস্য লাভ করে। হেমচন্দ্র যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন তাহাদের বিচার করিলেই, মাইকেলের ছন্দচাতুর্য্য সমধিক পরিস্ফুট হইবে :

১। কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে
২। নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক

এই সকল পংক্তিগুলি পড়িলে দেখা যাইবে যে শেষের পর্ব্ব অবলীলাক্রমে পরবর্ত্তী ছত্রের প্রথম শব্দের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য ছন্দের গতিও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এইখানে বাংলা ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে অমিত্রচ্ছন্দ একটি বিদেশী ঢং, বাংলা পদ্যে উহা মানানসই হয় না; মাইকেল মধুসূদন জোর করিয়া

উহা বাংলার উপরে চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে বাংলা পদ্যে অমিত্রচ্ছন্দ বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে। বাংলায় লঘু গুরু পদের বা দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বরের উচ্চারণগত পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, পয়ারের পরিধি খুব বিস্তৃত। ইংরেজি iambus-এর মত ইহা দ্বিমাত্রিক নহে। সুতরাং বাংলা পদ্যে যতির ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। পয়ার মূলতঃ দ্বিমাত্রিক ছন্দ, দুই, চার, ছয়, আট এমন কি দশমাত্রার পরও বিরামস্থল পড়িতে পারে এবং অতি সহজে একটি ছত্রের শেষ পর্ব্ব পরবর্ত্তী ছত্রের প্রথম পর্ব্বের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। লঘু গুরু উচ্চারণের (accent-এর) পার্থক্য নাই বলিয়া এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের প্রভেদ না থাকায় যে স্বচ্ছন্দতা অমিত্রচ্ছন্দের লক্ষ্য তাহা বাংলায় অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। বাংলার আর একটি সুবিধা এই যে ইহাতে সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগের জন্য মাত্রার বৈষম্য হয় না। এইজন্য ইচ্ছামত সংযুক্তব্যঞ্জন সমন্বিত পদের অনুপ্রবেশ করাইয়া ভাষার ওজস্বিতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। মাইকেল এই সকল কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাংলা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের সার্থকতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিবার সময় মাইকেল মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

"Will not this make me immortal?"

গৌড়জন আনন্দে তাঁহার কাব্যামৃত পান করিয়া তাঁহার জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়াছে। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য, ১২ আষাঢ়, ১৩৫৬, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা।

মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন

রাজনারায়ণ বসু

আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদিগের মতে স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও এসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল ইহা-দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়া-রূপ জনয়িতা ও ইউরোপ-রূপ জনয়িত্রীর সন্তান-স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ-গুণ-সমালোচনা বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক পংক্তি-দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকথঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্য-রস-পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন[1] ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভা-বর্ণনা অতিশোভন। বীরবাহু-শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না---"ধন্য শিক্ষা তব কবিবর!"—আর্য্য ও সেমিটিক মিশ্র ভাবগর্ভ[2] পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর :

"——নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!"

অনুপ্রাস-গুণ এই পংক্তিটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

"ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী—"

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চিত্র! কবি যে করুণরসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি, তাহার আর একটি উদাহরণ।

১। ————গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
২। আর্য্য—হিন্দু: সেমিটিক—ইহুদীয়

"বরজে সজারু পশি বারুইর যথা"--ইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররস বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানের বর্ণনা :

"—কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।—"

কয়েকটি অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে।

"—নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;"—ইত্যাদি

এই হিক্র-চিত্র-পূর্ণ রাক্ষসবন্দিগণের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা-শক্তির একটি উদাহরণ। শব্দ-বিন্যাসের যদি কিঞ্চিৎমাত্র অন্যথা হয়, ইহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভূত অলঙ্কাররাজিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যা-বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর নহে, ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব, দুর্গা, কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও রতি হোমরের ৠম্বার ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমালা-পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্মৃতি-পথারূঢ় হয়।

"হেন ভাবি জোভ, দুই বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব্ব দেবমাতা।
যুগল মূরতি উর্দ্ধে নিম্নে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হ'য়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হ'তে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ম্ময় প্রভা,
দর দর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।" হোমর ১২শ সর্গ ৩৪৬-৫৬ পং।

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন, তাহা দাম্পত্য-প্রণয়পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা-বর্ণনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। বায়ুকর্ত্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝাসকলের উন্মোচন-পাঠে বর্জিলের ইওলসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধ-

যাত্রার বর্ণনা চমৎকার। চতুর্থ সর্গের প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর :

"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দূরবস্থা যেরূপ করুণরসের সহিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহার উপযুক্তরূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোকরস-বর্ণনা-শক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকাদ্বারা সহানুভূতির অশ্রু-দ্বার উন্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাল্মীকি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদেয় সকল বর অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরে আমাদিগের কবিকে ভূষিত করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরূপ বন্য-সরলতা এবং আনন্দকর বিজনবাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দূরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন! এই সমুদয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি :

"শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাস,[১]
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ-বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর-স্নান-বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইটালীয় কবিদিগের লেখনীযোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত! প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইবের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকগণের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনাবাক্যসকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটি পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি;

"কুসুম কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যা-বর্ণনা বিশেষ মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজতচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এইস্থানের অনেকগুলি উপমা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপমার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপমা সঙ্কলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসজ্জা বর্ণনা যারপরনাই উৎসাহকর এবং যথার্থ হোমরোপম। যুদ্ধ-বর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক্ ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাণ্ডদেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ

১। এই পংক্তির শেষাংশ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

সম্ভাষণ বা আচরণ করেন নাই। তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব-বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ-বর্ণনা অতিশয় করুণরসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক-বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, বর্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃত পতির নিমিত্ত আর্ত্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা না করিয়া কবি বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য-দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

এক্ষণে কাব্যের দোষসকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইষ্ট্ অপেক্ষা সেটান, নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদিগের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা-সাধনান্তে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটি শ্লেষোক্তি-প্রায় বোধ হয় :

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়াছিলেন! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি,

"বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ" ইত্যাদি

এই উপমা-দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্ব্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—যথা, ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংক্তি, এবং ৭ম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস-সুন্দরীগণের মুক্তকেশপাশ ও নিশ্বাস, প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা দ্বারা উক্ত স্থলসকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এ-প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায়সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়,"

ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী পালে পালে গৃধিনী, শকুনি;
পিশাচ"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের মনে ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীর-রমণীদিগের রণ-সজ্জা ও যুদ্ধ-যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ মুহুর্ম্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে!"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটি পংক্তি হাস্যকর :

অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?

* * * *

দেখিব, যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে;"

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধ-জ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যের অতি সাধ্বী নারী-চরিত্রও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী-জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।[৪] সীতার নম্রতা, অসাধারণ সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরি-উক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্য-গীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা, রসিকা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধ-বাতুল রমণীরাই হরিণদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

"চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!"[৫]

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এককালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটি অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়, মিল্টন কখন এরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে :

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;"[৬]

৪। "কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে! ৪র্থ সর্গ ১৮৬-৯৩ পংক্তি

৫। ৫ম সর্গ ৩৮৭-৮৮ পংক্তি

৬। ৯ম সর্গ ২৯৫ পংক্তি

এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের একান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিকর হইবে না। এরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী, বিশেষতঃ যে প্রকার উন্নত ও মহত্ত্বাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব-বিরুদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্ত্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ-ক্রিয়ার সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ণনার অতি দীর্ঘতা। এই দোষের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক-বর্ণনায় এই দোষটি উপলক্ষিত হয়। নরক-রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিগণের একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ নীতি-গর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতি গর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে। হোমর, বর্জিলের কত মহাবাক্য তাঁহাদিগের স্বজাতীয় সাধারণ জন-সমাজে সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।'

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ না হইতেও পারে, কারণ কোন কোন স্থলে আমার মত ভ্রমসঙ্কুল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদ' বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ্ বলেন, "লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্ত্তির যেরূপ নিদান, দোষের অল্পতা সেরূপ নহে। আমাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষগুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে।" মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীররসে পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররসে পরিপূর্ণ; এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে, এত অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়েড্ ও মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ, সময় মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলে না; মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গভাষাতে নূতন কবিতা-রচনা-প্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন অথচ অতি অল্প স্থলে তাঁহার কষ্ট-কবিত্ব-দোষ উপলক্ষিত হয়। তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা-প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর। ইহার শব্দ-বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ

অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব! কত বংশ-পরম্পরা গত হইবে, তথাপি আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের যে-সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তূরী ধ্বনির ন্যায় যে-সকল স্থান বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে-সকল স্থান আমাদিগের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমল-করুণরসে বিগলিত করিতেছে, তাহাদিগেরও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে মেঘনাদ যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্তা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূর-ব্যাপ্ত। কবির ভাবসকল স্বজাতির মনোবৃত্তির উপাদান হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব-সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে। ❑

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—একপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দাণ্ডে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে বাঙ্গালা, নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন, যে কালি পরশ্ব হিমাচল পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইত। সেরূপ অনুমান-শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয় স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে, কি উপায়ান্তর হইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন-ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষায়। তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল।*

---

* শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে গৃহীত। 'পুস্তক বিপণি' সংস্করণ।

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোনও লেখকের দোষ গুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও ভাববিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধ হয় সকলের উপরে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা' এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য, তাহা য়ুরোপে 'এপিক্' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ রচনা এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 'তিলোত্তমা' প্রথমে রচিত; কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্ত সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়া কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের বিষয়টি সেই 'রামায়ণ' হইতেই গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিন্তু দত্ত সাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। দৃশ্যাবলী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজস্ব সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও ক্রমপরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলাকুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে, বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু যে সকল ভাব তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পরিপাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে, এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কারগুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র-রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন, এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি বা বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং আবেগময়-ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একেবারে নির্দ্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোনও প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন

করে। দত্ত সাহেবের ন্যায় মার্জ্জিতরুচি ও প্রতিভাবান লেখকের এরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও ঐরূপ চুরী লক্ষিত হয়।

তাহার পর, ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তুতিলা', 'স্বনিলা', 'নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমরা মেঘনাদবধ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে না। সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না, সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে-কোনো গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন, তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইঁহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড়ো একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সংকুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোনো দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোনো দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরু-স্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোনো দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি-শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভালো না লাগুক, কবিতার অন্যসকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধরো তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাববিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলনসমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্যজড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্যতা কিয়ৎ-পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি রীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভালো লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবসুদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্য সম্বন্ধেও ঐরূপ বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারাই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইঁহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কী একটি ভীষণ চিত্রই

পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুজিয়া পাই না। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ করো; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিংকরী চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডবশিবির-দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজি সমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অন্যরূপ কী করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজিসংকুল সভায় কি গাম্ভীর্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, 'রাবণের সভা তরঙ্গ সংকুল, নক্রকুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর'।[১] বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কী করা যায়, কোনো কোনো পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি

ইহা কি রাবণের সভা? ইহা তো নাট্যশালার বর্ণনা!

কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান করিতেই হইবে তাহার অর্থ কী? না-হয় সুন্দরই হইল, ইঁহাদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এককথায় বলিয়া রাখি যে, কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলী, বাঁশরী, স্বরলহরী, গোকুল, বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা-বর্ণনায় মিষ্টভাবের পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভালো, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কী ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কী অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কী আছে! কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়। এখন দেখা যাউক রাবণের রোদন কী প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন, কাঁদিতেছেন কিরূপে—

১। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দরকাণ্ড

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা— তিতিয়া বসনে ইত্যাদি

রানী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে-সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন, এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালী জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসানো অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে—

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কী পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কালসমরে? ইত্যাদি

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া 'সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ' সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,

এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।

রাবণ কহিলেন, 'কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ-পরাণ অবোধ'। ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথাগুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল—'কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব দুঃখ'—এ কথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি সভাসুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী মনোহর,

একে তো অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার 'মন্দোদরী মনোহর,' আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড়ো বড়ো কবিরা এক-একটি বিশেষণে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক-এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের 'মন্দোদরী মনোহর' বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কি? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কোনো বর্ণনা করিবেন তখন 'মন্দোদরী মনোহর' রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত, বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেননা ডমরুধ্বনি না শুনিলে ফণী কখনো উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ।
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে

সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে—

তবু বৎস যে হৃদয় মুগধ—
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী;
তুমি হে জগতপিতা, এ কী রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?

সুরুচি পাঠকেরা কখনোই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কী একটি মহান, গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোনো কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না। সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক, কবি কহিলেন—

বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[২]

"বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্‌গারপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা

২। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ

রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি, পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে!

হেনকালে রোদনের 'মৃদু নিনাদ' ও কিঙ্কিণীর 'ঘোর রোল' তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন, এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিক্তা কিংকরী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্র-মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া 'ঘোর কোলাহলে' কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না তো আর সহ্য হয় না, পাত্র-মিত্র সভাসদ আদিকে এক-একটি খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিংকরী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল। একে তো ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়ত ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভালো লাগিল, রাবণ কহিলেন,

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।

এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরুধ্বনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত ভর্ৎসনায় রাবণ শোকে অভিমানে 'ত্যজি সুকনকাসন উঠিলা গর্জিয়া'। সুকনকাসন সুসিন্দূর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভালো শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্ধৃত করিতাম।

যাহা হউক, প্রথম সর্গের এতখানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় তো কী বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই তো তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে, 'এ ভব মণ্ডল মায়াময়' আর তিনি উত্তর দিবেন, 'তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!' যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন 'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাধ এ শয়নে সদা' তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে

মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন-'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদ ভরে।

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন, 'এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারম্বার'। কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্বরী যোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে মুখ,
কিম্বা সে গঙ্গোত্রীপার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরিখ যখন অম্বুরাশি ঘোর-নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

ইহার মধ্যে ভয়ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি 'প্রভঞ্জন' 'কলম্বকুল' প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্রসমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা

চরিত্রে চিত্রে কী অভাব কী হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ষণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না, এইজন্যই বঙ্গদেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোনো কোনো পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? একজন চিত্রকর একটি কালীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন, পুরাণে কালীর কিরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাস্যে যিনি শ্মশানভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদমস্তক স্বর্ণালংকারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়োই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোনো দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কী দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এ স্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

অনন্তর হনুমান-কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।[৩] মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করার মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুথি-সর্বস্ব-পাঠকেরা দেশীয় কবি বাল্মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজি কবি মিল্‌টন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,

> Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,
> Tears, such as angles weep, burst forth :—

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[৪]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[৫]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না : সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[৬]

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[৭] এই-

৩। সুন্দরকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়। ৪। যুদ্ধকাণ্ড, ২৯ অধ্যায়। ৫। যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায়। ৬। যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায় ৭। যুদ্ধকাণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে: হায় দেহ তার, দেখো সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে,

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি তো বেশ হইল, কিন্তু আবার 'কিম্বা তরু' দিয়া কমাইবার কী প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ডভাব বুঝাইতে না পারিয়া 'কিম্বা তরু' দিয়া আরও উচ্চ করিয়াছেন।

তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন-চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই 'সন্দেশবহ' ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; রুদ্রতেজে বীরভদ্রবলী রাবণের মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,

প্রফুল্ল হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বন মাঝে, প্রভঞ্জনবলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।

বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মতো মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা তো সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ঐরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্মস্পৃক্ হইয়াছে। পরে দূত উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জিয়া উঠিলেন—

এ কনক-পুরে,

ধনুর্ধর আছে যত সাজো শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে।

পাঠকেরা বলিবেন এইবার তো হইয়াছে; এইবার তো রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন কিন্তু পাঠক হয়তো দেখেন নাই 'তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে' রাবণ স্বভাবত তো এত তেজস্বী নন, তিনি মহারুদ্রতেজ পাইয়াছেন, সেইজন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা শুনিলে বাঁচিবেন কিরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাবগুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপূর্বক রাক্ষসপতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রীপ্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রিসদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু 'কোমল সে ফুলসম' করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন!

'এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদিগের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল।'

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভভাগে 'মধুকরী কল্পনা দেবীর' যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফল কী হইল? এইখানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪

আমরা গতবারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বাভাবিক, ইহা বুঝাইতে বড়ো একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন 'রাবণ পুত্রশোকে কাঁদিয়াছে, তবেই তো তাহার বড়ো অপরাধ!' পুত্রশোকে বীরের কিরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা-আপনাকেই তাহার আদর্শস্বরূপ করিয়াছেন। ইঁহাদের একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যোঝাযুঝি করা আমাদের কর্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস আসিয়া তাঁহাকে নিধন সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্মুখভাগেই তো তিনি আহত হইয়াছিলেন?"

রস।— হাঁ সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।

সিউয়ার্ড।—তবে আর কি! আমার যতগুলি কেশ আছে ততগুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।

ম্যাল্কম।—তাঁহার জন্য আরও অধিক শোক করা উচিত।

সিউয়ার্ড।—না, তাঁহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মতো

মরিয়াছেন, ভালোই, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার ভালো করুন। —ম্যাকবেথ

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বলিতেন যে,

হা পুত্র, সিউয়ার্ড, বীরচূড়ামণি
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!

অ্যাডিসন তাঁহার নাটকে পুত্রশোকে কেটোকে তো ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই!

স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!

তাঁহারা বলিতেন, "হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!"

রাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয়লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তো তখন রুদ্যমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা-চিত্রিত রাবণকে তো স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন, "অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?" আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে সকল বিষয়েই তো একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই তো আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্রশোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, আর-একজনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক। যদি ম্যাকবেথের ডাকিনীরা কাহারও কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি তো বলিতেছি না যে, বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যতখানি দুঃখ কষ্ট পায় বীর তেমনই পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মতো, বীরের মতো তাহা সহ্য করিতে পারেন; শরীরের বল লইয়াই তো বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন "ঐ প্রকার মত পূর্বেকার স্টোয়িকদিগেরই সাজিত, এখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না; স্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থিরভাবে দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।" শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে কী করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীরপুরুষের উপযুক্ত! তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে

অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাঁহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছে করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা তো এইরূপ ঠিক করিয়াছি যে রাবণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন! স্টোয়িকদের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগ-রাগিণী নষ্ট হয় সেইরূপ এক-একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই-সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেই প্রকার বিরোধী গুণ। যাক—এ-সকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচনা করা যাউক।*

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মতো হয় নাই তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্রচিত্রের দোষ এই যে, তাঁহার চরিত্র কিরূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদবধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয়ে সমালোচনা করিয়াই দেখা যাউক।

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মী কহিলেন,

—হায় লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে!

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দ্রজিৎ কোথায়?" লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এতদূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসল বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন,

—বহুকালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
বহুবিধ রত্ন-দানে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্মদোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যতদিন বাঁচে

* আমরা পূর্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাকে একটু মোচড়াইয়া 'কিংশুক' শব্দে কিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে ফুলই বুঝায়, ইত্যাদি।

রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।

আর-এক স্থলে—

না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখো, রাবণ বিনাশ করো, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভালো করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমকহারামী করিবেন, তবে নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কখনোই তাঁহাকে

বহুকালাবধি
বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি

পূজা করিতেন না।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন, ইহা আমাদের কানে ভালো শুনায় না। ঐ ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদুহাস্য-বিষমাখা একটি মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেবভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ঐরূপ আর-এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মন?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে— জিজ্ঞাসিয়ো, বিজ্ঞ জটাধরে।

এখানে "বিজ্ঞ জটাধর" কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর-এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সংবরণ করিতে বলিলেন।

লক্ষ্মী কহিলেন,

কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মন কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রানী মন্দোদরী,
কী আর কহিব তার?

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্তবৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্ত-গৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কিরূপ

দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারও কোনো সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদবধে দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই। ইন্দ্রাদির চরিত্র সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ভারতী, ভাদ্র ১২৮৪

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে হানি কী হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপলারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কী বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণ লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে পুরা এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকোচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র-মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পরবিরোধী ভাব। গুপ্তভাবে রাবণের শত্রুতাসাধন করাতে কপটতা এবং কখনো ভক্তবৎসলতা দেখানো ও কখনো তাহার বিপরীতাচরণ করাতে পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্বোক্তরূপ হীনচরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিও বা পুরাণে ঐরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিৎকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! 'ধিক মোরে' কহিলা গম্ভীরে
কুমার, 'হা ধিক মোরে!' বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুদলে।

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিৎকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছে তখন :

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুবারি রিপু;
কী ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘ বাহন, রুষিবেন দেব অগ্নি।

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভালো লাগিল।

সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,

... ...
মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্র চাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।

পূর্বে কবি রোদনের সহিত ঝড়ের যেরূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেইরূপ রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মেঘবিদ্যুৎ ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভালো লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাই তো তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কি বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদবধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধরা যেন!
নির্ঝর ঝরিতে বারি রাশি স্থানে স্থানে-
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না "শিখিপুচ্ছ চূড়া যথা মাধবেব শিরে!" মাইকেল ভালো এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপুচ্ছ, পীতধরা, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোনো কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী;
তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশ আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারি ধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।

এই সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাক্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদগর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত শোভে দন্তরূপে!
জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।

পাঠকেরা বলুন দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্যজনক হইয়া পড়ে কি না!

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

কোথায় প্রাণ সখে,
রাখি এ দাসীরে, কহো, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য-কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই "রঙ্গরসের" কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব-কবি-রচিত সহজ হৃদয়ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখো, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কী দোষ রাধার পাইলে?
শ্যাম, ভেবে দেখো মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী।
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কিহে ত্যজিলে?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাকো হরি যথা সুখ চাও।
একবার, সহাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মতো, শ্রীচরণ দুটি,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে?

চণ্ড ঠাকুর

ইহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে, কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা

ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়তো ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেইরূপ কৃত্রিমতাময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার তো একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এইজন্য কহিতেছেন,

ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ইত্যাদি

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলগুলিই কৌশলময়। তৃতীয় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের কটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,

রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে ইত্যাদি

প্রমীলা কহিলেন,

ও পদ-প্রাসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি, শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; ইত্যাদি

যেন স্ত্রী-পুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে,
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ সদনে।
জাগিলা বীর কুঞ্জর কুঞ্জবন গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখিকুল! মিল প্রিয়ে, কমললোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্যকান্ত মণি-
সম এ পরাণ কান্তা, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্ঘরতন।
উঠি দেখো শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জুকুঞ্জবনে
কুসুম! ইত্যাদি

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি 'যথা' আসিয়াছে- --

যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে,
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী। ইত্যাদি

বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবে তো রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর-একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্রগমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাঁহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন—

জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি—
কী লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী! সরু মাজা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই, এ বীর-কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসরে, ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রুজল? হেমবাবু কহিয়াছেন, "বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?" সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু "জানি আমি কেন তুই" ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সমালোচনা স্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতিবিরহে রোদন করিতেছেন।

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কলস্বরে,

বাসন্তী নামেতে সখি বসন্ত সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;
'ওই দেখো আইল লো তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃ কুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?' ইত্যাদি

পূর্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কী হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না, কবির অণুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতি-তরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচত সঙ্গীর ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত করে না তো, কালভুজঙ্গিনী স্বরূপ তিমিরযামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—চলো, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী কহিল— কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?
রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী!
কী কহিলি, বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু 'বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল' ভাবচ্ছটা কই? সকলগুলিতেই 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব নাদে গজ বারী মাঝে' 'কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা' ভিন্ন আর কিছুই নাই।

চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি
... ...
... হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি।

শেষ দুই পঙ্‌ক্তিটি আমাদের বড়ো ভালো লাগিল না; এক তো কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন এ কথা কোনো শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়ত কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চিৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়ত 'নাদেন' শব্দটি আমাদের কানে ভালো লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজ বলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব কুল সম্ভবা আমরা, দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলা মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চলো সবে রাঘবের হেরি বীর-পণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে; ইত্যাদি

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন-না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন-না কেন, তাহাতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সূর্পণখা পিসির মদনদেবের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন—

কী কহিলি বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

যখন কবি বলিয়াছেন—'রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা।' তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্র মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য-পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোখ ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনোমতে ভালো লাগে না!

একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু
স্ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা: অবরোধে
কুলবধূ: বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বন হস্তী বনে;

ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জিয়া উঠিল। অমনি 'নৃমুণ্ডমালিনী সখি (উগ্রচণ্ডাধনী)' রোষে হুংকারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল— অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে

লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী
দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ কুল-বধূ
(শশিকলা সমরূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,— কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।

ভয়ংকরী ভীমা প্রচণ্ড খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলাসমরূপে, অশোক বনে শোকাকুল রঘুকুলকমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না। কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ংকরী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃকুলবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভালো হইত। কিংবা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল। প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন, চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,

চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জর জরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।

আমরা ভয়ে জড়সড় হইব, না কটাক্ষে জর-জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝরেন বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে।

নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল।

হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী

শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা—

উগ্রচণ্ডাধনী কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণী বাজে, মন্দ নহে!

উত্তরিলা ভীমা-রূপী : বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,
... ...
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহো রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধরো,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম অসি,
কিংবা গদা। মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভালো লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর-একটি কথা আসিতেছে, মহাকাব্যে যে-সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে এবং উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কী? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মতো যে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য কী? এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কী একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল।

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;

নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হইয়া গেল। কোদণ্ড টংকার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝনঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কী? না প্রমীলা প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবত মনে হয় কিনা যে, ইন্দ্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরও কিছু প্রধান ঘটনা ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি-উক্ত উপাখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

কহিলেন স্বরীশ্বর, 'এ ঘোর বিপদে
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।'

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।

এ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা অন্যায় হইয়াছে; প্রতিনায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে; হিমালয়কে ভূমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চত্ব প্রতিভাত হয় না, সকল পর্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। একবার, দুইবার, তিনবার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায়? পৃথিবী বীরের। সহস্রবার অকৃতকার্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন? চিত্রের প্রারম্ভভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ো সুকবি-সংগত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকট গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড়ো অসন্তুষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল; একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে?
কোন পতি দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিয়ো বিজ্ঞ জটাধরে!

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্বের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিয়ো এ-সব কথা।

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত—
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী।

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত না হইয়া যদি অস্ফুট অন্ধকার-কুজঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভালো হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই;

—কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভালো হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের

রাতটা না জাগিলেই ভালো হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,

'পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত', কহিলা পৌলোমী
অনন্ত যৌবনা, 'যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা নাথ কহো কী কারণে?'

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব-অস্ত্র পাইয়াছেন তাহা সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না—

সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি, প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে,
কিন্তু কী কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারে বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা-ঝলে সৌদামিনী;
তবু থর-থরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ,

পাঠক দেখিলেন তো, ইন্দ্র কোনোমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না।

বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদে রে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।

উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষণ্ণ ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সরসে যেমতি
সুধাকর কর রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।

বিষণ্ণ-সৌন্দর্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই 'কিম্বা' আনেন, সেখানেই আমাদের বড়ো ভয় হয়,

কিম্বা দীপাবলী—
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে

হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।

পূর্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদপার্বণ, সমুদয়গুলিই উল্লাস-সূচক।

এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পূরিব:
রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে।

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয়তো বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছে। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

দেহ পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদ এবে।

বড়ো বাড়াবাড়ি হইয়াছে; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে; এইবার সকলে কহিবেন যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড়ো সাহসী করে নাই, এক-একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান, তবে মাইকেলের কী অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোনো কার্যেরই নহে। মেঘনাদবধের যদি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথরূপে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন; আর যেখানে পুরাণকে মার্জিত করিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

চলো মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চলো ত্বরা করি।

'বাছা' কহিলেন—

কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহিরিবা, কহো দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।

হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখো বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!

'বাছার' সহিত 'মাতার' কী চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিলটি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরও কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন? মহাদেবের নিকট পার্বতী গমন করিলেন,

মোহিত, মোহিনী রূপে; কহিলা হরষে
পশুপতি, 'কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?' হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা; 'এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহু দিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতি পরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি পাশে?'

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোনো ধর্ম-শাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাব যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ-নীচ ভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন—

যা লো তুই সৌদামিনী গতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরী, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ইত্যাদি

অসুরমর্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে 'বাছার কোমল দেহে রক্তধারা' দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড়ো

সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতেও এমন নারী আছেন, যাঁহারা পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মায়াদেবী, পার্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসংগত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

ভারতী, কার্তিক ১৩০৪

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, 'যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।* ...ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না।' যখন কৈকেয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 'মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।... চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।... ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না; সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।' সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি-উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র সমালোচনা করিব, অথবা যদি মাইকেল রাম-চরিত-চিত্রে আদিকবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সংগত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

—শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে? ইত্যাদি

তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালোই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্যাদা বুঝেন; অবলা স্ত্রীলোকের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন তো জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।

এ রাম কী বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা! প্রমীলা তো লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়। তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

এবে কি করিব, কহ, রক্ষ-কুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,

* উদ্ধৃতিগুলি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত রামায়ণ হইতে

কে রাখে এ মৃগ পালে?

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখো সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে।...
...এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে!

লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন--- মারি রাবণিরে, দেব, দেহো আজ্ঞা দাসে!

রঘুনাথ উত্তর করিলেন— হায় রে কেমনে—

যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। ইত্যাদি

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন যে, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন—

উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে;
'স্মরিলে পূর্বের কথা রক্ষকুলোত্তম
আকুল পরাণ কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?' ইত্যাদি

কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশবাণী হইল।

উচিত কি তব, কহো, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি?

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতরভাবে কহিলেন,

সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর!

বিভীষণ কহিলেন, কোনো ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জায় আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষসসৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সেন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

'পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে;
... ...
রাখো গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য-দোষে; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে।...
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখো হে উদ্ধারি
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বন্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে! স্নেহ-পণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা বাঁধো হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি!'
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরু স্বভাব রাম বনের বানরগুলাকে লইয়া এতকাল লঙ্কায় তিষ্ঠিয়া আছে কিরূপে তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কিরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাঁহার দেবীমাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief,
Not even the Thunderer's favour brings relief.
Patroclus—Ah!—say, goddess, can I boast
A pleasure now? revenge itself is lost;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is slain!
'Tis not in fate the alternate now to give;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart;
On these conditions will I breathe: till then,
I blush to walk among the race of men."
A flood of tears at this the goddess shed :
"Ah then, I see thee dying, see thee dead!
When Hector falls, thou diest."—"Let Hector die,
And let me fall! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain!
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away;
Since unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achilles' hand;

Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an idle burden to the ground,
(Others in council famed for nobler skill,
More useful to preserve, than I to kill)
Let me—But oh! ye gracious powers above!
Wrath and revenge from men and gods remove,
Far, far too dear to every mortal breast,
Sweet to the soul, as honey to the taste :
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind
Me Agamemnon urged to deadly hate:
'Tis past—I quell it; I resign to fate.
Yes—I will meet the murderer of my friend:
Or (If the gods ordain it) meet my end.
The stroke of fate the bravest cannot shun ·
The great Alcides, Jore's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath,
And sunk the victim of all-conquering death.
So shall Achilles fall! Stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread!
Let me, this instant, rush into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her long dishevel'd hear?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me—Hence! my arms, my arms!—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know, Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যমপুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন :

—কী হেতু হেথা সশরীরে আজি
রঘুকুল চূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর করো ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।

পরে দশরথের নিকটে গেলেন:

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন তো ভালো হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমন-কি ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই! এমন অশরীরী

আত্মার বক্ষঃস্থল কিরূপে যে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রাম সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় 'ভিখারী রাম' 'ভিখারী রাম' করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভালো লাগে না; এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে 'আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য করো।' একজন নিস্তেজ দুর্বল বলিতে পারে, 'আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা করো।' কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্বাসিত বনবাসী মাত্র।

"ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে।"

"অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।"

"বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।" ইত্যাদি

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার এ কী দুর্দশা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনোকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিত—সে রথে আরোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্যপরাক্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ করো।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্মদ যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও—তাহাকে বিনাশ করো। বিভীষণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ণ হইলেন ও মুহূর্তকাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। 'এখন বিষাদের সময় নয়' বলিয়া রাম রাবণ-বধার্থ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাবীর অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। শর-জালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত-দেহে সসর্প-পর্বতের ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল হইতে বহু যত্নেও রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন, শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ্য না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপনপূর্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখো, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টনপূর্বক এই স্থানে থাকো এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা করো। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ঐ সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করতঃ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করো, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছুতে ভীত হইয়ো না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন ও জানকীবিয়োগ এই সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করো। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য করিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র, চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হওয়াতে একটি তুমুলশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এই তো রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতনদৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভালো হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

ভারতী, পৌষ ১২৮৪

রামের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী। ইত্যাদি।

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ন সহকারে, নিশ্চিন্তভাবে দুই-একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড়ো ভালো হয় নাই। 'সভয়ে' কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনুমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, 'রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুলবালাদের' দেখিয়াছেন, শোকাকুলা রঘুকুলকমলকে দেখিয়াছেন, 'কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে' দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! '—কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম,

তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে।' যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সন্ত্রাসে, সজল নয়নে, প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি-একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তুলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক-ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্রভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শন ভীষণ 'মূর্তি' মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্ষেবড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? 'সভয়ে' এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে 'রঘুজ-অজ-অঙ্গজ' দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত্র ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন,

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহো, মহারথি, একি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!

যদি ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে শয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জ্বলন্ত মূর্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তার।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কী আর কহিব?

তখন : জলদপ্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,
'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!

এ কথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমস্বনের কোনো আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাঁহার কোনোমতে সহ্য হয় না, তরবারির উপরে সর্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে

প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভালো হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্পবয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎপরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন।[১]

'রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধনপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।... আপনি অনায়াসে দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?... বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।... তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহার পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবে না।

...প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক

১। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোনো প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গে কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন-না, বিদ্যুতবৎ ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতিক মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে।... যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধন দান ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধবর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এইখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

'তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কিরূপে আমার অনিষ্ঠ করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয় স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটির যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধিশৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয়বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনি তো আবার সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরু লোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার তো সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখো, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্যগুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।'

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথা মাত্র কখনো কার্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কোন্ দুষ্কর কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস্। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস্। কিন্তু দেখ্ এই পথটি তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কী হইবে, যদি তুই সম্মুখযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস্ তবে আমরা তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ্ আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এইজন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে, এইজন্য অলংকারশাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এইজন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ-রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে যে, যখনি তাহার ফুলবাগানে বসন্তের বাতাস বয় তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুলবাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কী করে? সে প্যাটার্ন কিনিয়া চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কী করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন। তিনি নিজেকেই কখনো বা রামরূপে, কখনো বা রাবণরূপে, কখনো বা হ্যামলেটরূপে কখনো বা ম্যাকবেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থাবিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই—ইঁহাদের কেবল কেরানিগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এইজন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।

নকলনবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা-না-একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে তো কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল তখনি মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন হাতে পাইয়া কোনো সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল তখনি সে উদ্যমের কার্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে! ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরও নাবিয়া আসা যাক, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের

জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কী আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনী তো এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকিটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি। অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে শুরু করেন।

এপিক (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক বলিতে লোকে সাধারণত বুঝিয়া থাকে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই তাহা আর এপিক হইবে কী করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক দেখিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভালো হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক লেখে তবে তাহাকে এপিক বলিব না! এপিক কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কী হইতে? কবিরা এপিক লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন 'এসো একটা এপিক লেখা যাক' বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্যচরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য। মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কী ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি বাল্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল— কেবলমাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখো, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখো, একদিকে রামের সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসারত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার

জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ বর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়তো কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ, আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আট শো পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এইজন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্রবিকাশ, চরিত্রমহত্ত্ব দেখিতে চাই! মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়তো কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে-একটি মহান চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষারললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় হইয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এত দূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ-মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয়-পরাজয় মাত্র, কখনো মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোনখানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই সেখানে কী আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্য-সাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন-কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোনো পাত্র আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোনো অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখো। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধিভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখো দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি তেমনি আর-একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিতভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম, তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিজগতে না জন্মিয়া ভিন্নদেশীয় কবিজগতে জন্মিতাম তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই-সকল অমর সহচর সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দিকব্যাপী সেই কবিজগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর-একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন মহৎকল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন : I despise Ram and his rabble। সেটা বড়ো যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য-রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতরো প্রকৃতি বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোনো কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুবজ্যোতি সূর্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে কিরণ দান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে।

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্যচরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সম্মুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন সেই আহ্বানসংগীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল। মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন; অমনি সরস্বতীর বন্দনা শুরু করিলেন। মাইকেল জানেন অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক-বর্ণনা আছে; অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোনো প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সংকীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ-নরক-বর্ণনার অবতারণা করিলেন। মাইকেল জানেন কোনো কোনো বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়; অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখো দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠামো প্রস্তুত করিয়া

মহাকাব্য লিখিতে বসেন—যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশত পড়িতে পারে, বাংলা ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানি বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনো হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গমহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।

ভারতী ভাদ্র ১২৮৯

[পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। পরবর্তী অংশে তার ইঙ্গিত মিলবে]

প্রসঙ্গ : মেঘনাদবধ কাব্য

১

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

যে জিনিসটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিসটা কোথাও নাই।

মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজসিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছিল তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? তাহাদের সেমেটিকভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিত্যে বেশভূষা রাগরাগিণী ধর্মকর্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না; যদি এমন হয় যে কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।

য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে-একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য,

তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি-না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারি দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনোকিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

[‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩১৪]

২

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

[‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের ‘ভারতী’ অধ্যায়, ১৩১৮]

তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক, ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত।

[‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের [illegible]]

ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য।

[‘আত্মপরিচয়’, বৈশাখ, ১৩১৯]

পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর মর্যাদা, সুগম্ভীর হয়ে বাজল---‘সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু’; তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ পতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল---‘চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে’; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে--‘কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি’; তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল—‘কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।’

[‘ছন্দ’ গ্রন্থের ‘ছন্দের অর্থ’ প্রবন্ধ, চৈত্র ১৩২৮]

[সুবোধ সান্যালকে লেখা] শান্তিনিকেতন

কোনো এক সময়ে আমি হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সহিত মেঘনাদবধের তুলনা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে আমারই মূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। যদি আমার সেই লেখা উদ্ধৃত করিয়া আজ কোনো লেখক আমাকে মাইকেলের প্রতিকূলে তাঁহার স্বদলে সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করান, তবে ইহা আমার কর্মফল।

১লা মাঘ ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজারবার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্টন ইংরেজি ভাষায় লাটিন-ধাতুমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলা ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটি মাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাঁড়ুজ্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন। এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কি না, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কি না, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে—কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে। তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপনসৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়। ❑

[‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের ‘সাহিত্যরূপ’ প্রবন্ধ, বৈশাখ ১৩৩৫]

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্য' একটি এপিক বা মহাকাব্য। এক্ষণে দেখা যাউক, ইউরোপীয় এপিক ও আমাদের মহাকাব্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কিনা, উহাদের মুখ্য তাৎপর্য একই কি না এবং 'এপিক কাব্যে'র স্থলে আমরা 'মহাকাব্য' প্রয়োগ করিতে পারি কি না।

প্রসিদ্ধ ইংরাজি আলংকারিক Hugh Blair বলেন : "এপিক কবিতার প্রকৃতি সহজভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, কবিতার আকারে কোনো প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের আবৃত্তি করা।" তিনি আরও বলেন : 'মনুষ্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কল্পনার পরিসর বৃদ্ধি করা, আর এক কথায়, আমাদিগের বিস্ময় ও ভক্তিরসের (Admiration) উদ্রেক করাই এপিক কবিতার উদ্দেশ্য। বীরোচিত ক্রিয়াকলাপ এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণনা ভিন্ন এই উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য মাত্রই উন্নত চরিত্রের ভক্ত ও পক্ষপাতী। এই-সকল রচনায় বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, ধর্ম, ঈশ্বরভক্তি, উদারতা প্রভৃতি উন্নত ভাব সকল অতি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আনীত হয় এবং এইরূপে সাধু লোকদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সংকল্পে ও দুঃখ দুর্দশায় আমাদিগের ঔৎসুক্য ও মমতা জন্মে, আমাদিগের হৃদয়ে উদার জনহিতকর ভাব সকল জাগরিত হয়, ইন্দ্রিয়-কলুষিত হীন কার্যের চিন্তা সকল অপসারিত হইয়া আমাদিগের মন নির্মল হয় এবং উন্নত ও বীরোচিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদিগের হৃদয় অভ্যস্ত হয়।" বিশেষরূপে আলোচনা করিতে গেলে এপিক কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে —প্রথমত, কাব্যগত বিষয় কিংবা কার্য সম্বন্ধে; দ্বিতীয়ত, কর্তা কিংবা পাত্রদিগের সম্বন্ধে,— তৃতীয়ত, কবির আখ্যান ও বর্ণনা সম্বন্ধে।

এপিক কবিতাগত কার্যের তিনটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। কার্যটি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। এই তো গেল য়ুরোপীয় এপিকের সারমর্ম। এক্ষণে আমাদিগের আলংকারিকগণ মহাকাব্যের কিরূপ লক্ষণ দিয়াছেন দেখা যাউক।

'সাহিত্য দর্পণে' আছে : 'কাণ্ড-বিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্ত গুণান্বিত কোনো সদ্‌বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে। সংকুলোদ্ভব একবংশজাত কতগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত—এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধুদিগের গুণকীর্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে। কখন কখন উহাতে নানা ছন্দময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে, উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথা সূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুক্তি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে অথবা বৃত্তান্তের নামে কিংবা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্বাপেক্ষা বেশি উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে। মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত যথা, রঘুবংশ, শিশুপাল বধ, নৈষধ ইত্যাদি। আর্য মহাকাব্যকে আখ্যান বলেন। যথা, 'মহাভারত'।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কী, তাহার মর্মগত তাৎপর্য কী তাহার প্রাণগত ভাব কী—সে বিষয়ে কোনো কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। —উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।

এপিক কাব্যের যে-সমস্ত লক্ষণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপিক কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্য দর্পণকার ঠিক এইরূপ মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সারমর্মটি কোনো প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিক কাব্যের কাব্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর সাহিত্য দর্পণে যে আছে : সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়,— তাহার তাৎপর্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক। উক্ত লক্ষণগুলি এপিক কাব্যের লক্ষণের সহিত সাধারণ একরূপ মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যদর্পণ যে বলিয়াছেন, শৃঙ্গার রসও মহাকাব্যের অঙ্গী হইতে পারে—এই কথাটিতে একটু গোল বাধে। কারণ শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকিলে এপিক কাব্যের গাম্ভীর্য রক্ষিত হইতে পারে কি না এবং তাহাতে মহৎ ও উচ্চ ভাবের তেমন স্ফূর্তি পায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সে যাহা হউক,— এপিক কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে ঐক্য থাকুক বা না থাকুক—ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত য়ুরোপীয় এপিকের আদর্শেই তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণ অনুসারেই আমরা তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব।

প্রথমত, দেখা যাউক, মেঘনাদবধ কাব্যের কার্যটি এক কি না। অ্যারিস্টটল বলেন, কাব্যের একত্ব এপিক কবিতার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা নিশ্চিত, যে উপন্যাস এক ও অখণ্ড, যাহাতে ঘটনাগুলি পরস্পরের উপর পরস্পর লম্বমান, এবং একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ঘটনাই উন্মুখ,—তাহাতে পাঠকের যতদূর মনোরঞ্জন হইতে পারে, তাহার হৃদয় যতদূর আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-নিরপেক্ষ ঘটনার বর্ণনায় কখনো হইতে পারে না। অ্যারিস্টটল আরও বলিয়াছেন, এই একত্ব একজন মনুষ্যের কার্যকলাপে বদ্ধ থাকিলেই হইবে না, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট কালের ঘটনা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু রচনার বিষয়টির মধ্যেই একত্ব থাকা আবশ্যক। বড়ো বড়ো এপিক কাব্য মাত্রেই কার্যের একত্ব উপলব্ধি হয়। ইটালি দেশে ঈনিয়সের বাস স্থাপন—এই বিষয়টি বর্জিলের কাব্যগত বিষয়। ওই কাব্যের আদ্যোপান্তে ওই উদ্দেশ্যটি জাজ্বল্যমান। ওডিসির একত্বও এই একই প্রকৃতির। অর্থাৎ স্বদেশে য়ুলিসিসের প্রত্যাগমন ও পুনর্বসতিই উহার উদ্দেশ্য। একিলিসের ক্রোধ ও তদ্‌ভূত ফলাফল ইলিয়াড কাব্যের বিষয়। অখৃস্টানদিগের নিকট হইতে জেরুজালেম উদ্ধার করা ট্যাসোর এবং স্বর্গ হইতে আদমের বহিষ্করণ মিলটনের রচনাগত বিষয়। ওই সকল কাব্যেই উপন্যাসের একত্ব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধসাধন কিংবা শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভ—উহার কোন্‌টি কাব্যগত বিষয় উহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই; তাহার পরেও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিস্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, দেখা যাউক, মেঘনাদবধের বর্ণিত কার্যটি মহৎ ও বৃহৎ কি না। কাব্যটি মহৎ ও বৃহৎ হইলে সেইসঙ্গে সেই কার্যের কর্তাকে অর্থাৎ নায়ককেও মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। যদিও সমস্ত রামায়ণের মধ্যে সীতা উদ্ধারই সর্বাপেক্ষা মুখ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান, তথাপি মেঘনাদের বধসাধনরূপ কার্যকে কবিবর মধুসূদন তাঁহার নিজ কাব্যে প্রাধান্য দেওয়ায় বিশেষ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যেহেতু সীতা উদ্ধারের পক্ষে মেঘনাদবধ একটি প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায়; যে মেঘনাদের প্রতাপে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সর্বদাই সশঙ্কিত, তাহাকে বধ না করিতে পারিলে সীতা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হইত। কিন্তু কবি লক্ষ্মণ বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নায়করূপে নির্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল। কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরগুণে ভূষিত উন্নত চরিত্রের মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক যে কে তাহা আমরা কাব্যের নাম মাত্র পাঠেই অবগত হইতে পারি না। কারণ, কাব্যখানির নাম মেঘনাদবধ, উহাতে মেঘনাদকেও নায়ক বুঝাইতে পারে এবং মেঘনাদবধের কর্তা লক্ষ্মণকেও নায়ক মনে হইতে পারে। তবে, আসল নায়ক ধরা পড়ে কোথায়? না, যেখানে কবি লক্ষ্মণ ও মেঘনাদকে একত্রে আনিয়াছেন। লক্ষ্মণকে তস্কর ও সর্পের ন্যায় অলক্ষিতভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করাইয়া কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র অথচ বীরদর্পে দর্পিত মেঘনাদকে বধ করাইয়া লক্ষ্মণের চরিত্র যারপরনাই হীনবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং মেঘনাদকে বীরত্ব ও উদারতাগুণে ভূষিত করিয়া নায়ক স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদের পরাজয়েও জয় হইয়াছে এবং লক্ষ্মণের জয়েতেও বাস্তবিক পরাজয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয়ে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত—তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহার কাব্যের নায়ক করিতে পারেন, এবং তাঁহার পাত্রদিগকে যেরূপ করিয়া ইচ্ছা আঁকিতে পারেন। এই বিষয়ে Blair যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ কথা। তিনি বলেন, সকল চরিত্রকেই যে সৎ-চরিত্র হইতে হইবে এরূপ কোনো কথা নাই—স্থল বিশেষে অসম্পূর্ণ চরিত্র—এমন-কি, পাপিষ্ঠ চরিত্রেরও অবতারণা করা যাইতে পারে—কিন্তু কাব্যের যাহারা কেন্দ্রস্থল, সেই নায়কদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদ্রেক না হইয়া প্রত্যুত বিস্ময় প্রীতি ও ভক্তিরসের উদয় হয়, এরূপ রচনা করা নিতান্ত কর্তব্য। বিশেষত মাইকেল মধুসূদনের পক্ষে এ দোষটি নিতান্ত অমার্জনীয়। আপনার ছাগকে কেউ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক, কিংবা লেজের দিক দিয়াই কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি, তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? মূল গ্রন্থে যে সমস্ত চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন—তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কী অধিকার আছে? বিশেষত যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রাম-লক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রাম-লক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড়ো মহান চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কাব্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিংবা মেঘনাদকে নায়ক করিবার তো কোনো অর্থই পাওয়া যায় না।

সাধারণত, চরিত্র চিত্রে কবিবর মধুসূদনের ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদকে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। যাহা কিছু তাঁহার চরিত্রে স্ফূর্তি পাইয়াছে সে সেই যজ্ঞাগারের দৃশ্যে। তাঁহার পাত্রদিগের চরিত্রে সূক্ষ্ম প্রভেদ সকল উপলব্ধি হয় না। রাবণও বীর,

মেঘনাদও বীর—রাবণও বিলাসী, মেঘনাদও বিলাসী। প্রভেদের মধ্যে একজন পিতা, আর একজন পুত্র। যেমন এক জাতীয় হইলেও প্রত্যেক লোকের মুখশ্রী বিভিন্ন— সেইরূপ সাধারণতঃ এক প্রকৃতির হইলেও প্রত্যেক লোকের চরিত্রে সূক্ষ্ম তারতম্য ও বৈষম্য লক্ষিত হয়। এই বৈষম্যগুলি পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিতে পারিলে কবির বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে ব্যাস অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় কবিদিগের মধ্যে এই অংশে হোমর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নীচে ট্যাসো। মেঘনাদবধ কাব্যে যতগুলি পুরুষ চরিত্র আছে, তন্মধ্যে রাবণের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত ও আত্মসংগত হইয়াছে। কিন্তু মূল রামায়ণে যেরূপ রাবণের দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড ভাব উপলব্ধি হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। মূল রামায়ণেও তাঁহার বিলাপ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার শোক ও রোষের ভাব এমন নিপুণভাবে মিশ্রিত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তাহাতে তাহার চরিত্রগত ভীষণ গাম্ভীর্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মূল রামায়ণে রাবণের বিলাপ বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থলে আছে যে, রাবণের নেত্র হইতে কিরূপ অশ্রু পতিত হইতেছিল? না, যেমন জ্বলন্ত দীপশিখা হইতে তপ্ত তৈল বিন্দু বিন্দু স্খলিত হয়। এই একটি উপমা দ্বারা রাবণের রোষদীপ্ত শোক কেমন জ্বলন্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্র কেমন সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দানববালা প্রমীলা যে সময়ে পতি দর্শনে যাত্রা করিতেছেন সে দৃশ্যটি অতি চমৎকার—তাহা পাঠকের মনকে বীরভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে। সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার চরিত্র বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দেবদেবীগণের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মেঘনাদবধ কাব্যে অনেক সময় দেবোচিত গাম্ভীর্য রক্ষিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মেঘনাদবধ কাব্যের কার্যটি মহান হইলেও তৎসম্পর্কীয় পাত্রদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তেমন সুন্দর রূপে বিকশিত হয় নাই। ওই বৃহৎ কার্যটি সাধন করিবার জন্য যে-সকল সরঞ্জামের আবশ্যক, তাহা খুব জমকালো হইয়াছে সন্দেহ নাই, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল হইতে তাহার বিস্তৃত আয়োজন অত্যন্ত ঘটা করিয়া আহরণ করা হইয়াছে। বলিতে কী মেঘনাদবধ কাব্যে সরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা চরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?

অবশেষে দেখা যাক্, মেঘনাদবধ কাব্য আখ্যান ও বর্ণনা অংশে উপাদেয় হইয়াছে কি না। কাব্যগত কার্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলেই যে উপাদেয় হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। কারণ, কেবলমাত্র সাহসের কার্যগুলি, যতই কেন বীরোচিত হোক না—নীরস ও বিরক্তিকর হইতে পারে। কিন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া, দেবদেবী প্রভৃতি অলৌকিক সরঞ্জাম (machinery) আনয়ন করিয়া, দুই-একটি সুন্দরী প্রকরী (Episode) প্রবর্তিত করিয়া এবং যাহাকে এপিক কবিতার পাকচক্র বলে (Intrigue) সেই নায়কদিগের বাধাবিঘ্ন সকল যথোপযুক্ত রূপে কাব্যমধ্যে বিন্যাস করিয়া তাঁহার কাব্যটিকে একরূপ বেশ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

এপিক-কাব্যগত আখ্যান-বিন্যাসের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। কবি আপনার মুখেই সমস্ত উপন্যাসটি বর্ণনা করুন কিংবা তাঁহার কাব্যগত বিষয়ের পূর্ব ঘটনাগুলি তাঁহার পাত্রদিগের মুখেই বর্ণনা করুন—তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কবিবর হোমর তাঁহার ইলিয়াডে প্রথমোক্ত প্রথাটি ও তাঁহার ওডিসিতে দ্বিতীয়োক্ত প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার কাব্যগত মূল বিষয়ের পূর্ববর্তী আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি সীতা ও সরমার কথোপকথনে ব্যক্ত করিয়া সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদিও মাইকেল মধুসূদন চরিত্র চিত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু বাহ্য দৃশ্যগুলি একরূপ মন্দ চিত্রিত করেন নাই; তাঁহার অনেকগুলি ছবি বেশ সজীব ও জীবন্ত। আমার বোধ হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা তিনি লৌকিক দৃশ্যগুলি চিত্রিত করিতে অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্রকর্মের প্রণালী এই যে, তিনি প্রত্যেক খুঁটিনাটি ধরিয়া চিত্র করেন—দুই-একটি

পোঁচ দিয়া চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার রাবণের সভা বর্ণনা—লঙ্কাপুরী বর্ণনা—রণপ্রয়াণের বর্ণনা পাঠ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে। তাঁহার ভাষায় এপিক কবিতাসুলভ তেজস্বিতা ও বেগবত্তা আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার পাত্রদিগের কথাবার্তায় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাই—অকৃত্রিম আবেগ নাই—কেমন সকলেই অভিনয় করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। উত্তর প্রত্যুত্তরগুলি বেশ কাটাকাটা, সাজানো গোছানো, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের অভাব উপলব্ধ হয়। উহাতে প্রেমের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের স্থলে নাগরিক রসিকতা, প্রকৃত শোকের স্থলে আড়ম্বরময় বিলাপ, এবং প্রকৃত বীরত্বের স্থলে আস্ফালনই অধিক প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের কবি অধিকাংশ স্থলে পুরাতন কবিদিগেরই অনুসরণ করিয়াছেন—নূতন ভাব অতি অল্পই আছে। সেই কোকিল, সেই ভ্রমর, সেই পদ্মিনী, সেই চকোর। তাঁহার উপমাগুলি অনেক সময় কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়, অনেক সময় মনে হয় উপমা দিবার জন্যই উপমা দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় তিনি অযথা স্থলে 'যথা' প্রয়োগ করিয়া রসভঙ্গ করেন। সাধারণত বলিতে গেলে অলংকারের আড়ম্বরে তাঁহার কবিতায় সরল সৌন্দর্যের স্ফূর্তি পায় না। যে সর্গে সীতা সরমার নিকট তাঁহার পূর্ব কাহিনী বলিতেছেন, —সেই সর্গটি অতি চমৎকার—উহার অনেক অংশে স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফূর্তি আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার রচনায় কুরুচি প্রকাশ পায়। তাঁহার নরক বর্ণনা অত্যন্ত বীভৎসজনক। যদিও ইলিয়াড ও মিলটনেও কোনো কোনো স্থলে ওইরূপ বীভৎসজনক বর্ণনা আছে, তাই বলিয়া উহা অনুকরণীয় নহে। কোনো ইংরাজ সমালোচক বলেন, ইলিয়াডের তৃতীয় সর্গান্তর্গত হার্পিদিগের উপন্যাস, এবং প্যারাডাইস লস্টের দ্বিতীয় 'বুকের' অন্তর্ভুক্ত পাপ ও মৃত্যুর রূপকটি উক্ত দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভালো হইত।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক-না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সুখপাঠ্য। বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের সমাবেশ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণে অত বড়ো গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না, প্রত্যুত আমোদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোরঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্টির সাজে সুসজ্জিত কোনো প্রতিমাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময় আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ওই প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলংকারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু একটি কথা শেষে বলা আবশ্যক। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া আমাদের সাহিত্যরাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হাস্যাস্পদ প্রয়োগ থাকিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন করিয়া সাধারণত তিনি বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয়, অন্তত এই উপকারটির জন্য তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

"মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান মরিচিমালীর" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে "মেঘনাদই" বঙ্গের "প্রদীপ্ত প্রভাত তারা!" যিনি বাঙ্গালীকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিম বাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন! কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিবে? প্রবন্ধ লেখকের সে উদাম বুঝি কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদবধের" রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তান মাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব, তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প; জগতে অতুলনীয়া দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি; লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীর পুরুষদের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব;—সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয়ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধ কিরীটিনী" লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে, চেড়ীদলবেষ্টিত, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ! অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণ মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, "মেঘনাদে" তাহা পড়িতেছি। "মেঘনাদের" রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in "মেঘনাদ" is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ "এদেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি! বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই সয়তান তুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ্য অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধের" রাবণ? কতকটা ভক্তিপ্রীতির আধার! তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!

প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?"

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন

"হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!"

তখন "মহামন্ত্রবলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন!--যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্ব্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তিরই নিদানমাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদবধের" রাবণ কতকটা ভক্তির ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষচর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

"দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া"

তখন মর্ম্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে বলিয়াছিলেন,--শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না,--বলিয়াছিলেন :

"এতদিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে!"

ফলতঃ "মেঘনাদবধ কাব্যে"র রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না। "মেঘনাদের" রাবণ,--যেন মানুষ অনেক শোক পাইয়া স্থৈর্য্যলাভ করিয়াছে;-- দুর্ব্বৃত্ত যুবক যেন কত ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য! আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান, পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, এ কথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কেবলমাত্র "কোমল সে ফুলসম" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না।

আমরা যাহা বুঝিতে চাই, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্যমধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্ত্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন;--ক্রোধে যে কুসুমদাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন,

"ধিক্ মোরে।...
...হা ধিক্ মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;

ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর। তাঁহার বীরভাব যেমন সঙ্গত, তেমনি সরল! এতদিন তিনি নিশ্চিন্তমনে, প্রমোদ-উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদ-নিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদ বার্ত্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণজ্ঞান করেন! সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন

"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি,
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দব রাজপদে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎ-তরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে; এই দেখুন--

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে! পুত্র-বৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল ও সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন, বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে পারেন, কিন্তু মাতার, মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকেন্দরসাকে কখনও মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে। বলিলেন,

"কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশনে কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি। হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,

দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি' এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব যুগ, সমর-বিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"

এই বীরত্ব, এই পিতৃমাতৃভক্তি পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নী-বাৎসল্য প্রেমের আদর্শস্থল। তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ঊষা সমাগমে কুঞ্জবনগীতে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।

"প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) 'ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি :—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন!
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!"

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হ'লে ফুটিতে কি তুমি কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়?"

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন! তবু প্রমীলা আর একবার স্বামীকে নির্জ্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। "মেঘনাদ ধীরে ধীরে,
কুসুম বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে"
যাইতেছিলেন! 'ধীরে ধীরে', কেন না তখন প্রমীলার চারু মূর্ত্তি হৃদয়ে তাঁহার জাগিতেছিল! এমন সময়,

"সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা

"প্রমীলারে।"

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন।—দেব বৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্ত্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের!—কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি : "সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,

কহিলা।"

আবার যখন মূর্ত্তিমান্ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিম শয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহ-বিচ্যুত হইতে আর বড় দেরী নাই, তখন তাঁহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল! নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়শাসনে সন্দেহ জন্মিল না!

"দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদ চরিত্রের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য;—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যময়! সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানব হৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমান মাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নির্ভীক ইন্দ্রজিৎ আত্মচরিত্রের সর্ব্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না;—তাঁহাদের কার্য্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়! সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়;—মেঘনাদের বীরদর্প; সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য্য!

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়। মনে হয় জন্মদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তবে আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্যে"র মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে? 'অন্যায় মৃত্যু?' সে আবার কি! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা ত মনেই হয় না! সে অন্যায় বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি কেবল "মেঘনাদবধ" পাঠকালেই হয়! ইহার অর্থ কি?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিধ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষস কুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্ব্বগুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন?

"প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী। আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা মাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!"

তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা; কিন্তু ইহাই "মেঘনাদবধ কাব্যে"র বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কার স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার

নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্যের ন্যায়পরতা বা Poetical justice এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে যে, যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত, নিয়মিত সংযমিত হয়, অন্তর্জ্জগৎ অবিকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথামাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা, যে শষ্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন; অনন্ত শূন্যে অনন্ত পরিমিত অনন্ত সৌরজগতমণ্ডলী তেমনি নিয়মেরই অধীন।—সর্ব্বত্র নিয়ম! তুমি কবি;—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রুবিসর্জ্জন কর; তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার! অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। জড়জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহার শক্তিবিশেষ যখন আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে তখন ইহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না! দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে; ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করে, "মেঘনাদবধ" কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব! সৌন্দর্য্যসার মেঘনাদ দেবদুর্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য! সর্ব্বজ্ঞ কবির অপূর্ব্ব, অতুল্য মোহময় সৃষ্টি! সত্য বটে।—কিন্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এ জগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য! এ সত্যের ব্যভিচার নাই।

বলিয়াছি ত যে জড়জগত বল, অন্তর্জ্জগত বল; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড়শক্তি; আর যে অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি রুশিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তশক্তি!—শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন!—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সান্ত্বনার কথা এই যে অন্তর্জ্জগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কি না, আজও মনুষ্যজ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত! সাধ্যপক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তি প্রয়োগের কারণ হইও না। তোমার কার্য্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিয়া দেখ কথা এক। সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ "মেঘনাদবধ কাব্য" অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

"মেঘনাদবধ কাব্যে"র জ্ঞানময় কবি প্রমীলা চরিত্রে কয়েকটি গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃ সুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রীপুরুষের সাম্য কখনও ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রীজাতি লইয়া! কাব্য দেখ, স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহ সংসারে সকল সুখের আকর;—কিন্তু বিধিটা এক তরফা করায় ইহার শুভকারিতা অনেক কমিয়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য্য নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ খেলে,—বিষাদ,—কেন না তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্ম্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা ঠিক ধর্ম্ম নহে। ফল নিরপেক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের সমবায়ে নির্ম্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরববিধ্বংসকর!

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য্য সমাজে দুই তিন বার সে চেষ্টা হইয়াছে;—তবে ফল বড় হয় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্য্যকারিতা সমাজ গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদী চরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখর বুদ্ধিশালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্ম্মিণী!—সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর একবার সে যত্ন হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্রশাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্র প্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্ব্বেসর্ব্বা স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অসভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্য যে সে আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে চায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণ কুলের চিরোর্ব্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিন কতক স্ত্রীচরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিণী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদিবিলাসিনী কালিকার মূর্ত্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যাহা অনন্তশক্তি দেবে পারিল না বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্ত্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখনও বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখন নহে। ওডিনের (Odin) উপবর্গ অসভ্য ইউরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্রশাস্ত্র, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

"মেঘনাদবধ কাব্য" যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন,

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?"

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্য সংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে! প্রথমে

বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—আর আমাদের মধুসূদন "প্রমীলা" চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলা চরিত্রের আর একটি ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;—প্রমীলা চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষসদম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ❑

মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা

দীননাথ সান্যাল

সীতা একদিকে যেমন বসুন্ধরার অযোনি-সম্ভবা কন্যারত্ন, অন্যদিকে তেমনিই কবিগুরু বাল্মীকির অপূর্ব্ব মানসী-সৃষ্টি। রামায়ণের পুরুষ-চরিত্রগুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, কাব্যজগতে তদ্রূপ চরিত্র কল্পনার অতীত নাও হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে কল্পনা সীতাকে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না। রামায়ণ-কাব্যে তিনি মানবীরূপে বর্ণিতা হইলেও, লোকহৃদয়ে তিনি দেবীরূপেই প্রতিষ্ঠিতা ও পূজিতা। কবি-কল্পনায় আদর্শ নারীজনোচিত গুণগুলি যত দূর উচ্চে উঠিতে পারে, সীতা-চরিত্রে সে সমস্তই তত উচ্চে,—বুঝি-বা ততোধিক উচ্চে উঠিয়াছে। মনে হয় যেন, ঐ সকল গুণগুলির সমষ্টি করিয়া নারীর আকারে কবিগুরু মানবের চক্ষে ধরিয়াছেন!

এমন-যে বাল্মীকির সীতা, মেঘনাদবধ কাব্যে কবিকে সেই সীতার অবতারণা করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া নহে,—কবিত্ব-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে;—কাব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সীতা-চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। যে সীতার প্রেম-প্রবাহ কৈকেয়ীর নিদারুণ বাধা না মানিয়া, পঞ্চবটীবনে পরম পবিত্র শ্রীধারণ করিয়াছিল; পরে, ধূর্ত্ত মায়াবী রাবণের মায়াকৌশলে যে সীতার প্রেম-প্রবাহে পর্ব্বতসম বাধা সমুপস্থিত; যে সীতার উদ্ধারের জন্য বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয় কিষ্কিন্ধ্যার বানরের সহিত সখ্য করিয়া, বানরের সহায়তায় অলঙ্ঘ্য সাগরকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন এবং লঙ্কার প্রবল-প্রতাপান্বিত রাবণ-রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—তখনও যে সীতা অশোকবনে রাম-বিরহে নিরন্তর রোরুদ্যমানা ও রাবণের উপদ্রবে উৎপীড়িতা;—সে সীতাকে উপেক্ষা করিলে, ইহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হইত না। শুধু যুদ্ধ-বর্ণনায় কাব্য হয় না; তাহা হইলে আজকালকার সংবাদপত্রগুলি এক-একখানি অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত! সুতরাং কাব্যের অনুরোধেই কবিকে অশোকবনে সীতার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই অশোকবনেই সীতা-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। এই অশোকবনে লোক-নয়নের অন্তরালে রাবণের সহিত একাকিনী সীতার যে দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক সমর চলিয়াছিল, তাহার কাছে অসংখ্য বানরসেনার সহায়তায় রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কাযুদ্ধ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। এই অশোকবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সীতা আজ যশস্বিনী,—রাম-লক্ষ্মণের অপেক্ষাও সমধিক যশস্বিনী। এই অশোকবনেই রাবণের কামানলে সীতার প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষা! এই অনল যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার পক্ষে, পরে চিতানল শীতলতা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই অশোকবনের করুণ দৃশ্যের প্রভাবই লঙ্কাযুদ্ধের ফলাফলের জন্য পাঠকের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। সুতরাং কাব্যাংশে এই অশোকবনের চিত্রই লঙ্কাকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। তাই বলিতেছিলাম যে, অশোকবনে সীতার চিত্র প্রদর্শন করা মেঘনাদবধ কাব্যে ইচ্ছাকৃত নহে;—নিতান্তই অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্মীকি যে সীতাকে সমগ্র রামায়ণ ব্যাপিয়া রেখায় রেখায়, বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিন দিনের ঘটনা-অবলম্বনে যে কাব্য, তাহার মধ্যে সেই সীতা-চরিত্র চিত্রণ করিতে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিকেই চিন্তাকুল হইতে হয়। মধুসূদনও চিন্তাকুল হইয়াছেন এবং কাব্যকলায় সেই চিন্তা ব্যক্ত করিয়া, পাঠককে মহচ্চরিত্র শ্রবণের জন্য উৎসুক করিয়াছেন। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গারম্ভে যে সুন্দর বাল্মীকি-বন্দনা আছে, তাহা কাব্যের একটা নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলী বন্দনা নহে;—তাহা সীতা-চরিত্র চিত্রণের গুরুত্ব কাব্যকলায় অভিব্যক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম সর্গারম্ভে সরস্বতী-বন্দনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন;—পরে আর কোন সর্গারম্ভেই বন্দনা নাই;—গ্রন্থ-মধ্যে কেবলমাত্র

অশোকবন নামক এই চতুর্থ সর্গারম্ভে কবি শঙ্কিত হৃদয়ে বাল্মীকি-বন্দনা করিয়াছেন। ইহা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের গুরুত্বব্যঞ্জক বন্দনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি যখন বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া বলেন,

তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।

তখন তিনি "দীন", "দূর" ও "তীর্থ" এই তিনটি শব্দে বর্ণনীয় বিষয়ের পবিত্রতা ও আয়াসসাধ্যতা এবং তৎপক্ষে নিজের দৈন্যের প্রতি সুন্দররূপেই ইঙ্গিত করিলেন। বন্দনা-শেষে বলিয়াছেন;—"কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।" কৃপা প্রার্থনা কেন? কেন না, কবি অশোকবনে সীতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত! দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন লোকে দুর্গানাম করে; দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন লোকে দ্বারদেশে নমস্কার করে; তেমনই অশোকবনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে কবির এই বন্দনা, এই কৃপাপ্রার্থনা। এই বন্দনাটিতেই পাঠকের মনে একটা অসাধারণ দৃশ্যের জন্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া তোলে। ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যকলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠককে অশোকবন দেখাইবার পূর্ব্বে কবি আর একটু কাব্যকলাকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম সর্গের শেষে দিবাবসানে মেঘনাদের সামরিক অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এই অভিষেক ম্রিয়মাণ লঙ্কাবাসীর মনে বিজয়াশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং লঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় মহা আনন্দোৎসব। অশোকবনের চিত্র উদ্‌ঘাটনের পূর্ব্বে কবি এই আনন্দোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন;—দেখাইয়াছেন---

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপমালিনী—রাজেন্দ্রাণী যথা রত্নহারা!

গৃহে গৃহে আলোকমালা, গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি, এবং সর্ব্বত্র বিজয়াশার উল্লাস-সঙ্গীত। ইহার পরেই কবি অশোকবনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিলেন,—যেখানে আলোক নাই, আশা নাই, আনন্দধ্বনি নাই,—সেই আঁধার ও নীরব অশোকবনের শোকাবহ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। বৈপরীত্যের সমাবেশ (contrast) যেমন চিত্রকলার, তেমনি কাব্যকলারও একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। লঙ্কার এই আনন্দোৎসবের দৃশ্যের পরেই কবি যেই বলিলেন :

একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে নীরবে।

তখন পাঠকের মনে সেই অশোককাননের আঁধার ও নীরবতা যেন দ্বিগুণ গাঢ় হইয়া উঠিল। তারপরে কবি অশোককাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাল্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে পাওয়া যায় না। শোকে সমগ্র কাননটি যেন সীতাময় হইয়া উঠিয়াছে! তরুরাজি পুষ্পাভরণ ফেলিয়া দিয়াছে; পবন রহিয়া রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; পক্ষিকুল অরবে শাখায় বসিয়া আছে;—প্রবাহিণী উচ্চ বীচিরবে সীতার শোকবার্ত্তা বহন করিতেছে;—সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী! মাত্র একুশটি ছত্রে এই অশোকবনের চিত্রে সীতা-হৃদয়ের দুঃখছবি পাঠককে যেন আকুল করিয়া তুলে।

কাব্যকলার অনুরোধে কবিরা পাত্র-পাত্রীদের প্রতি কখনও নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হন, আবার কখনও বা সহৃদয় ও সদয়ও হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ অবস্থায় নির্দ্দয় হওয়া আবশ্যক, আর কোন্ অবস্থাতেই-বা সদয় হওয়া আবশ্যক, ইহাই উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্যকলার বিষয়। বহুকাল ধরিয়া সীতা এই অশোকবনে রাবণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা ও নিগৃহীতা হইয়াছেন। এখন লঙ্কাযুদ্ধ অবসানপ্রায়। বীরযোনি লঙ্কায় আজ মেঘনাদ ও স্বয়ং রাবণ ছাড়া আর বীর নাই। রাবণ নিজেই বুঝিয়াছেন যে, লঙ্কার রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি সীতাকে আর লোভের চক্ষে দেখিতে

পারিতেছেন না। রাবণ সীতাকে এখন কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতে করিতে, রাবণ স্বয়ংই বলিয়াছেন;

কি কুক্ষণে পাবকশিখা-রূপিণী জানকীরে
আমি আনিনু এ হৈম গেহে!

রাবণের চক্ষে সীতা আজ "পাবকশিখা-রূপিণী!" এখানে রূপের "রূপিণী" নহে,—রূপকের "রূপিণী";—পাবকশিখা-স্বরূপিণী—প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা! যাহার গৃহদাহ উপস্থিত, সে অগ্নিকে যে চক্ষে দেখে, রাবণ সীতাকে সেই চক্ষে দেখিতেছেন! "আনিনু" বলায় বিলাপের গাঢ়তা হইয়াছে। লোকের গৃহে আগুন লাগে; দৈবাৎ বলিয়া মনে একটা প্রবোধ থাকে। কিন্তু রাবণের সে প্রবোধটুকুও নাই;—দৈবাৎ নহে;—তিনি নিজেই এই আগুন আনিয়াছেন! এখন রাবণের মনের অবস্থা এইরূপ। এখন আর রাবণ-কর্ত্তৃক সীতার উৎপীড়ন কাব্যকলার হিসাবে সাজে না। তবু চেড়ীবৃন্দ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপীড়ন না হইতেছে এমন নহে;—সরমার কাছে সীতার কথাতেই তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উৎকট উৎপীড়নের সময় আর নাই; কারণ, লঙ্কার এখন শোচনীয় অবস্থা। এদিকে সীতার মনের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। রাবণের যে বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সেই মেঘনাদ আজ যুদ্ধে ব্রতী! লক্ষ্মণ একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন! ইহাতে দুর্ভাগিনী সীতার মনে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরা-ঘটিত ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের স্বভাবই এই। উপস্থিত এই বিপদ;—তারপরে, এখনও স্বয়ং রাবণ বাকী। সুতরাং সীতার মনের আঁধার এখন ক্রমশই ঘনীভূত। এ অবস্থায় সীতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, ঐ শোকতপ্ত ও নিরাশহৃদয়ে সান্ত্বনা-বারি সেচন করিয়া আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সহৃদয় কবি তাহাই করিয়াছেন।

দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী,
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।

সান্ত্বনার প্রতিকূল, উৎপীড়নকারী চেড়ীবৃন্দকে লঙ্কার উৎসব দেখাইতে পাঠাইয়া দিয়া, কবি সেই গাঢ়-আঁধার অশোকবনে ক্ষণেকের জন্য একটা শান্ত নীরবতা সৃষ্টি করিলেন :

একাকিনী বসি' দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন!

ভীষণ আঁধার, যেন প্রেতপুরের ন্যায়! ভীষণ নীরবতা,—জনপ্রাণী নাই,—সীতা একাকিনী! এমন সময়ে,—সান্ত্বনার এই সুন্দর অবসরে—

সরমা সুন্দরী আসি' বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে,সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!

সমবেদনা ও সান্ত্বনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, চক্ষে অশ্রুভার এবং হস্তে সিন্দূর লইয়া, "পা দুখানি" পূজা করিতে আসিয়াছেন। অশ্রুর সহিত অশ্রু,— ইহাই ত প্রকৃত সমবেদনা; আর, সতী নারীর এমন বিপদে সিন্দূরই ত সুন্দর সান্ত্বনা। তাই সরমা সমবেদনা ও সান্ত্বনার এই দুইটি উপাদান লইয়া আসিয়াছেন। সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরে এই দুইটি জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য;—সমবেদনায় অশ্রুমোচন করে, সীতার পক্ষে লঙ্কায় আর কে আছে? এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া এমন বিপদের দিনে মনে আশা জাগাইয়া দেয়, এমনই বা আর কে আছে? "অনুমতি" লইয়া সরমা সযত্নে সীতার সীমন্তে সিঁদুরের

ফোঁটা দিয়া "পদধূলি" লইলেন! রেখায়-রেখায় সীতার দেবীভাব পাঠকের মনে অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। তারপর যখন পদধূলি লইয়া সরমা বলিলেন :

ক্ষম লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু;—

তখন বোধ হইল, যেন অধম মানবী দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে!

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদ-তলে;

সরমা সীতার পদতলে বসিলেন;—পার্শ্বে নহে, "পদতলে"! সীতার দেবীভাব ফুটাইবার জন্য কবির কি যত্ন! কিন্তু ইহাতেও কবির মনতৃপ্তি হইল না;— তাই কবি উপমা দিয়া বলিয়া উঠিলেন :

আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি'
দশ দিশ্!

এতক্ষণ রেখায়-রেখায়, বর্ণে বর্ণে যে দেবীচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই উপমা দ্বারা যেন সেই চিত্রে finishing touch দেওয়া হইল! হিন্দুর হৃদয়ে দেবীভাব ফুটাইতে এ তুলনার আর তুলনা নাই। তুলসী হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপ্রাঙ্গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলেও হয়; আর তুলসীমূলে দীপদান, হিন্দু-গৃহের প্রাত্যহিক সান্ধ্য উৎসব;—কারণ, তুলসী "দেবী," তুলসী 'বিষ্ণুপ্রিয়া"।

সুবর্ণ প্রদীপের সহিত উপমায় সরমার রাজৈশ্বর্য্য ও উজ্জ্বল রূপ সুন্দর সুব্যক্ত হইয়াছে। সেই সুবর্ণ প্রদীপ আজ তুলসীর মূলে জ্বলিয়া সার্থক হইল। ধনীর গৃহে সুবর্ণ প্রদীপ থাকে, কিন্তু তাহা সংসারের কোন কাজেই লাগান হয় না;—রন্ধন-গৃহে নয়, শয়ন-গৃহে নয়, বৈঠকখানাতেও নয়;—সে সোনার প্রদীপ কাজে লাগে কেবল দেবদেবীর পীঠতলে; আর তাহাতেই সেই সুবর্ণ প্রদীপের সার্থকতা। আজ সরমাও সেইরূপ সীতার পদতলে বসিয়া সার্থক হইলেন। রূপ ও ঐশ্বর্য্যকে পবিত্রতার পদতলে বসাইয়া পবিত্রতার মাহাত্ম্য যেন চিত্রিত করা হইল! এই একটি উপমায় কবি সীতাকে কত উচ্চ আসনে বসাইলেন! অশোকবনে সীতা পাঠকের চক্ষে যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন!

তারপর, যখন সরমার অনুরোধে সীতা তাঁহার হরণ-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি বলিতেছেন :

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,—

হিন্দুর মনে গঙ্গার পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ, তাহা না বলিলেও চলে। সেই গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান "গোমুখী" এবং সেই জন্যই উহা এক পবিত্র তীর্থস্থান। এমন পবিত্র তীর্থ গোমুখী-গুহার সহিত সীতা-মুখের এবং ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ স্বরে নিঃসৃত গঙ্গার পবিত্র বারিধারার সহিত সীতা-কথিত স্বীয় পূর্ব্বকথা-পরম্পরার উপমায়, সীতা ও তাঁহার জীবন-কাহিনীর পবিত্রতা চরমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

তুলসী ও গঙ্গার বারিধারা, এই দুইটি জিনিসই হিন্দুর মনে পবিত্রতা ভাবের Symbols স্বরূপ। সরমা প্রথমে সেই তুলসীমূলে সুবর্ণ প্রদীপরূপে সার্থক হইয়াছেন; এখন আবার গঙ্গার পবিত্র বারিধারা পান করিয়া মন-প্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। দুটি মাত্র উপমায় সীতার পবিত্রতার ছবি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! কাব্যকলার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

তারপর, কবি সীতার পঞ্চবটী-বাসের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশে বড়ই সুমধুর ও সুন্দর। আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের রীতিই এই যে, সর্ব্বাবস্থাতেই তাহাতে প্রসন্নতা বিরাজ করে। তাই

সীতা বলিতেছেন : দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি, দেখ মনে,
কিসের অভাব তার?

রাজার নন্দিনী, রঘুকুলবধূ হইয়াও, তিনি এই দাম্পত্য-প্রেমের প্রভাবেই পূর্ব্বের রাজ-সুখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে, ক্রমে এই বনবাসের সুখের তুলনায় পূর্ব্বের রাজ-সুখ তাঁহার কাছে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে কুটীরের চারিদিকে নিত্য প্রস্ফুটিত ফুলকুল! প্রভাতে কোকিলের পঞ্চম স্বরে জাগরণ! কুটীর-দ্বারে শিখিসহ সুখিনী শিখিনীর নর্ত্তন! করভ করভী মৃগশিশু, বিহঙ্গাদি অহিংসক জীবসকল সদাব্রত ফলাহারী অতিথি! নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সরসীকে আরসী করিয়া, যখন সীতা কুবলয় দিয়া কেশসজ্জা ও নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অঙ্গসজ্জা করিতেন, তখন রাম তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া কৌতুক-সম্ভাষণ করিতেন! রামের পক্ষে ইহা কৌতুক-সম্ভাষণ হইতে পারে; কিন্তু পাঠকের চক্ষে তখন সীতা বাস্তবিকই "বনদেবী"। বনবাসের এই সুখের কথা শুনিতে শুনিতে, সরমার মত পাঠকেরও বলিতে ইচ্ছা করে :

শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে।

এই বনবাস-চিত্রে, সীতার দাম্পত্য-প্রেমিকতার সঙ্গে তাঁহার জীব-প্রেমিকতা, আর তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমিকতাও পূর্ণ প্রকটিত। সীতা-চরিত্রের এই মনোহর অংশ রামায়ণের বিশাল অরণ্যকাণ্ডে বিক্ষিপ্ত। মধুসূদন যেন তাহারই সারসংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত ভবভূতির সীতার ও কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া মিলাইয়া, বনবাসিনী সীতা-চরিত্রের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিয়াছেন। দুইটি মাত্র পৃষ্ঠায় শান্ত ও মাধুর্য্য-রসের এমন একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করা যে কোন উৎকৃষ্ট কবিরই গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার, অশোকবনবাসিনী সীতার মুখে তাঁহারই পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতির কাহিনী! সুতরাং সেই সুখ-স্মৃতিকে যেন দুঃখের রসে পাক করিয়া, এক অপূর্ব্ব করুণ-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে! দুঃখের অশ্রুজল দিয়া সুখের কথা লিখিলে যেমন হয়, করুণ-রসের নিবিড় ছায়ায় শান্ত ও মাধুর্য্য-রসের ছবি আঁকিলে যেমন দেখায়,—অশোকবনে সীতার মুখে তাঁহার পঞ্চবটী-বাসের সুখ-স্মৃতিও তেমনই হইয়াছে। পঞ্চবটীর এই সুখ-শান্তির কথা বলিতে বলিতে, যেই রামের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, অমনি সীতার শোকোচ্ছ্বাস সেই সুখের কথাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি' মোরে সম্ভাষি' কৌতুকে।—

বলিয়াই, সীতার শোক-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—

হায় সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?

তখন, সরমার সান্ত্বনায় আবার শোক সম্বরণ করিয়া সীতা পূর্ব্ব-কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে আবার যেই রামের কথা আসিল,—

শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি' গৌরী-সনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা!—

অমনি শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—

এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?

বলিয়া সীতা নীরব হইলেন। পরে সরমার সান্ত্বনায় আবার পূর্ব্ব-কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে শোকোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়া সীতার কাহিনী-প্রবাহ এক অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে! এরূপ একটি চিত্র রামায়ণে নাই। রামায়ণে সরমার উল্লেখ আছে বটে, এবং সরমা সীতার কাছে আসিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু মধুসূদন যেমন অশোকবনে সীতা ও সরমার কথোপকথনচ্ছলে, এক অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, এমন চিত্রটি রামায়ণে নাই। এই একটি চিত্রে সমগ্র রামায়ণের সীতা যেন মূর্ত্তিমতী এবং সেই সঙ্গে সরমাও যেন সান্ত্বনার মূর্ত্তি ধরিয়া পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশোকবনে সীতার কথা মনে হইলেই সেই সঙ্গে সরমার কথাও মনে পড়ে;—শোক ও সান্ত্বনা একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব রসে পাঠকের মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে! মেঘনাদবধ কাব্যে এই সীতা ও সরমা মধুসূদনের এক মহতী কীর্ত্তি এবং ইহার চিত্রণে তাঁহার কাব্যকলার অসাধারণ স্ফূর্ত্তি!

সীতা-হৃদয়ের উদারতা কবি কেমন কৌশলে একটি কথায় দেখাইয়াছেন, শুনুন। সীতাকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া, সরমা মনের দুঃখে রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন :

নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?

রাবণ "দুষ্ট" হইলেও তিনি এ দোষে দোষী নহেন। সুতরাং সীতা রাবণের প্রতি আরোপিত এই দোষের ক্ষালন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন :

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু।

রাবণের প্রতিও সীতার এমন উদারতা (charity) মধুসূদনের কীর্ত্তি।

আর একটি বিষয়েও মধুসূদন সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মায়া-মৃগের পশ্চাতে রাম ধাবমান হইয়া দূর বনে গিয়া পড়িয়াছেন;—কুটীরে সীতা এবং প্রহরী লক্ষ্মণ। সীতা সহসা দূরাগত আর্ত্তনাদ শুনিলেন : "কোথারে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি কালে?"

সীতা বিচলিত হইয়া লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ রামের বাহুবল অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি রামের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, বরং সীতাকে সেই ভয়-সঙ্কুল বিজন বনে একাকিনী রাখিয়া যাইতেই আশঙ্কিত হইয়া, সীতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। তখন রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা লক্ষ্মণকে অকথ্য ও অশ্রাব্য কথায় গালি দিয়াছিলেন। সে কথা উচ্চারণ করিতেও আমাদের কুণ্ঠা হয়।

মনে হয়, যেন সেই পাপেই সীতাকে সুদীর্ঘকাল লঙ্কার অশোকবনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল! মানবচরিত্র এবং ঘটনা-পরম্পরার বিচার করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই কটূক্তি সম্বন্ধে বাল্মীকিকে সমর্থন করিতে পারা গেলেও, আমরা যখন সমগ্র রামায়ণের সীতা ও লক্ষ্মণকে চিনিয়াছি, তখন আমাদের কানে ঐরূপ কটূক্তি বেজায় বাজে। মধুসূদনেরও বাজিয়াছিল। তাই, তিনি সীতার মুখে অশ্রাব্য কটূক্তি না দিয়া, তীব্র তিরস্কারে লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে বাধ্য করিলেন :

সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে!

লক্ষ্মণের ন্যায় বীরের প্রতি "রে ভীরু," "রে বীরকুলগ্লানি," বড় সামান্য গালি নয় এবং রমণীর মুখে "যাব আমি," বীর লক্ষ্মণের পক্ষে বড় কম গঞ্জনার কথা নহে! কিন্তু তাহা হইলেও, এমন অবস্থায় এমন তীব্র তিরস্কার ও গঞ্জনা সীতার মুখে অসঙ্গত হয় নাই;—তীক্ষ্ণ হইলেও, ইহা মর্ম্মঘাতী নহে;—ইহাতে অকথ্যতা বা অশ্রাব্যতা নাই। রামায়ণের সীতা-চরিত্রের এই কালিমা রেখাটুকু মধুসূদন ক্ষালন করিয়া উৎকর্ষ সাধনই করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সীতা-চিত্রে মধুসূদন নানাবিধ কাব্যকলার প্রয়োগ করিয়াছেন। হরণকালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহাব অন্যতম। তখন সীতার চক্ষে জগৎ অন্ধকার; কোথায় যাইতেছেন, তার ঠিক নাই;—রামলক্ষ্মণের কেহই জানিলেন না;—বিজন-বন, কেহই দেখিল না;—ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার! তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন;—কিন্তু শুনিবার লোক কই? নিরুপায় হইয়া, তিনি অঙ্গের অলঙ্কাররাজি খুলিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন;—কিন্তু তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। তিনি মনের আবেগে আকাশকে ডাকিলেন, সমীরণকে ডাকিলেন, মেঘকে ডাকিলেন;—কিন্তু সে ত মনের আবেগ মাত্র! তবে কি সীতা, এ বিপদে নিতান্তই অকূল সমুদ্রে ভেলা? সীতার ভবিষ্যৎ কি একান্তই নৈরাশ্যময়? মানব-মনের পক্ষে এরূপ অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! এইরূপ স্থলই করুন কাব্যকলার উপযুক্ত অবসর; এবং মধুসূদন তাহা প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই;—অতি সুন্দররূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। নিরুপায় হইয়া, সীতা জননীর আরাধনা করিলেন—

এ বিজন দেশে,
মা আমার, হ'য়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি!

তখন রাবণ ও জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে—

কাঁপিলা বসুধা, দেশ পূরিল আরবে!

সীতা অচেতন হইলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, সীতা সরমাকে বলিতেছেন :

শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!

দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী,
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি সুপ্রসন্ন বিধি
এতদিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি মৈথিলী!
ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ্ চেয়ে'।

অকূল সমুদ্রে ভাসমান ভেলার পক্ষে সুদূর প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোক যেমন, স্বপ্নে জননীর এই বাণীও তেমনই সীতার নৈরাশ্যময় হৃদয়ে ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার করিল। তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট ঠিক Bioscope-এর মত করিয়া স্বপ্নময়ী সীতার চক্ষে এক এক করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে রামের সহিত সুগ্রীবাদি পঞ্চ বীরের মিলন হইতে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই সীতা দেখিলেন। রাবণ-বধের পরে সুরবালাগণ সীতাকে রামের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া, সীতাকে লইয়া যাইতেছেন;—তখন যাহা ঘটিল, সীতার কথাতেই শুনুন :

হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি
কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!

ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথহারা পথিকের মনে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে যে ভাব হয়, স্বপ্নে এই সুদীর্ঘব্যাপী ঘটনা-পরম্পরার অবসানে রামকে দেখিয়া, সীতার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছিল। এমন সময়ে সীতার মোহভঙ্গ হইল;—সুখের স্বপ্নও বিলীন হইল! জাগিয়া সীতা দেখিলেন,—যে রাবণ, সেই রাবণ! আর জটায়ু;—

ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!

আবার যে নৈরাশ্য, সেই নৈরাশ্য!—যে অকূল সমুদ্র, সেই অকূল সমুদ্র! কিন্তু তবু এই স্বপ্নে একটা আশার বাণী দিয়া গেল। এতগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য; তাহাও আবার জননী-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত!—ইহা স্বপ্ন হইলেও, মিথ্যা হইবার নহে, নৈরাশ্যময় হৃদয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এই দীর্ঘকাল অশোকবনে সীতা, বোধ হয়, এই আশার স্বপ্ন অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছেন। সীতার কাছে এ স্বপ্ন অমূল্য। তাই এই স্বপ্ন-কাহিনী শুনাইতে গিয়া, সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন :

শুন লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!

সরমা মন দিয়া সবই শুনিলেন। এ পর্য্যন্ত স্বপ্নের সকল ঘটনাই ফলিয়াছে, সুতরাং আর যাহা বাকী, তাহাও ফলিবে,—এইরূপ সান্ত্বনাও দিলেন। শেষে বলিলেন :

আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরীদল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ, রঙ্গে আসি, আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুল না দাসীরে সাধ্বি! যতদিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা নিত্য,

বিদায়কালে সরমার এই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন যেন বাস্তবিকই দেবী-প্রতিমার পদে অধম মানবীর নিবেদন বলিয়াই মনে হয়। সীতাও সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত! যেন সরমার ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াই, সীতা-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল :

সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন!

"কাঙ্গালিনী" সীতা সরমাকে এই কৃতজ্ঞতা-উপহার সজল নয়নেই দিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে পাঠকের সজল নয়ন আর অনুমান করিতে হয় না! তখন, চেড়ীবৃন্দের আগমন-আশঙ্কায়—

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি!

অশোকবনের দৃশ্যারম্ভে আমরা সীতাকে "একাকিনী" দেখিয়াছিলাম;—এখন আবার যে একাকিনী, সেই একাকিনী হইলেও, আমরা নিজের মন দিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, "হিতৈষিণী"র কাছে দুঃখের কাহিনী কহিয়া হৃদয়ের দুঃখভার-লাঘব, এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, তাহা সীতার হইয়াছে;—আর সমবেদনা ও সান্ত্বনায় সীতার মনে এ অবস্থায় যতটুকু শান্তি দেওয়া সম্ভব, সরমা তাহা দিয়া গেলেন। সীতার ন্যায়, পাঠকের মনও অজ্ঞাতসারে সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তারপর, এই সীতা-চিত্রে মধুসূদনের চরম কৃতিত্ব সীতার রক্ষোদুঃখ-কাতরতায়। রামায়ণে আমরা অত্যাচারকারিণী চেড়ীদিগের প্রতি সীতার ক্ষমাগুণের উদাহরণ পাই। যুদ্ধের শেষে, হনূমান্ ঐ সকল চেড়ীদিগকে প্রাণে মারিবার অনুমতি চাহিলে, সীতা বারণ করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন যে উহারা রাবণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র, উহাদের দোষ নাই। ইহা আদর্শ গুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেঘনাদবধের কবির সে সুযোগ হয় নাই। কিন্তু রক্ষোদুঃখে কাতরতা উহা অপেক্ষাও উচ্চাদর্শ, এবং মধুসূদনই তাহা দেখাইয়াছেন। হরণকালে যখন মূর্চ্ছাগতা সীতা স্বপ্নে ভবিতব্য ঘটনার পট দেখিতেছেন, তখন লঙ্কাযুদ্ধে লঙ্কার হাহাকার রব শুনিয়া, স্বপ্নেই সীতা চঞ্চল হইয়া বসুন্ধরাকে বলিয়াছিলেন :

রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে, মা আমার!

ইহাতে সীতা-হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার রক্ষোদুঃখ-কাতরতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহা স্বপ্নের আবেগ মাত্র। কবির মন এইটুকু আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না : আর চিত্রও তাহাতে উজ্জ্বল হয় না। তাই কবি নবম সর্গে আর একবার অশোকবনের করুণ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন; রাবণ রামের কাছে সাত দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করিয়া আজ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন—প্রমীলা মৃত পতির সহানুগমন করিবে। সুতরাং লঙ্কায় আজ নিরন্তর হাহাকার রব! কিন্তু সীতা কিছুই জানিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলে, চেড়ীরা মারিতে আসে! সীতার দুঃখে দুঃখিনী সরমা ইন্দ্রজিৎ-বধের সুসংবাদ লইয়া, অশোকবনে উপস্থিত;—

যথায় অশোক-বনে বসেন বৈদেহী
অতল জলধি-তলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে।

সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের বধ-বার্ত্তা শুনিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে ধন্যবাদ করিতেছেন;—কিন্তু কান তাঁহার লঙ্কার হাহাকারের দিকে—

কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি!

তারপর যখন শুনিলেন—

প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি' দেহ দাহ-স্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি!—

তখন "ভব-তলে মূর্ত্তিমতী দয়া" সীতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরমার সহিত তিনিও কাঁদিয়া কহিলেন :

কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী।
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে।
শূন্য রাজ-সিংহাসন! মরিলা জটায়ু,

বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজবলে.
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ, হেথা.
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে.
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে. হায় লো. শুকাল
হেন ফুল!

সরমা সান্ত্বনা দিলেন :

দোষ তব, কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী.
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?
নিজ কর্ম্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।

রক্ষোদুঃখে সরমা কাঁদিতে লাগিলেন; আর সেই সঙ্গে—

রক্ষঃকুল-শোকে সে অশোকবনে
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে!

এই ক্রন্দনেই মধুসূদনের অশোকবনের চিত্র শেষ হইল! ক্রন্দনে ইহার আরম্ভ হইয়াছে,—মধ্যেও নিরন্তর ক্রন্দন!—সীতার শোকের ক্রন্দনের সহিত সরমার সমবেদনার ক্রন্দন মিশিয়া এক অপূর্ব্ব অশ্রু-প্রবাহ, এই সীতা-সরমার সম্মিলন!

মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে অশোকবনে সীতা ও সরমার এই চিত্রপটখানি সুচারু কাব্যকলার সাহায্যে কি সুন্দর করিয়াই আঁকিয়াছেন! ইহা সমবেদনা ও সান্ত্বনার শীতল ছায়ায় শোকের কি সকরুণ চিত্র! করুণ-রসের সহিত পূর্ব্ব-স্মৃতির মাধুর্য্য-রস মিশাইয়া, কি অপূর্ব্ব রসেরই সৃষ্টি করা হইয়াছে! ইহাতে উৎকট উৎপীড়নের নিদারুণ দৃশ্য নাই; অথচ ইহার মাধুর্য্য রসেও যেন পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়।

বাল্মীকির সীতাকে যেন crystallise করিয়া, মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে দেখাইয়াছেন; এবং তাহার উপরেও বর্ণপাত করিয়া, তাহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন। রামায়ণে সীতার আদর্শ খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ কাব্যকলার গুণে যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর সরমা,—যিনি রামায়ণে রেখাঙ্কিতা মাত্র,—সেই সরমা মধুসূদনের কৃপায় ভক্তিমতী সান্ত্বনা ও সমবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, সীতার পদতলে ও পাঠকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহাও মধুসূদনের অসাধারণ কৃতিত্ব। মধুসূদন যদি আর কিছু না করিয়া, কেবল এই সীতা-সরমা চিত্রটি মাত্র দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। ❑

[নারায়ণ, ১৩২২]

মেঘনাদবধ কাব্য

নগেন্দ্রনাথ সোম

মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি মহাকাব্য "মেঘনাদবধ কাব্য" বঙ্গ-সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডারের সর্ব্বোত্তম রত্ন—বিশ্ব-কাব্য-কাননের মহার্হ-কুসুমাহৃত মধু-ভরা মধুচক্র—ত্রিদিবের সদ্যঃফুল পারিজাত—ভাব-সরোবরের সহস্রদলে বিকশিত কমল-কানন। মেঘনাদবধ কাব্য ভাষার পীযূষোদধি; ইহার পদ-লালিত্য, অর্থ-গৌরব এবং উপমা বঙ্গসাহিত্যে তুলনাতীত এবং অনুকরণাতীত। ইহা মধুসূদনেই আরব্ধ ও মধুসূদনেই পর্য্যবসিত। ইহার মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কার বঙ্গবাসীকে এতাবৎকাল মাতাইয়া রাখিয়াছে এবং "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" মাতাইয়া রাখিবে। অমিত্রাক্ষর-কাব্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডে মহাকবি মিল্‌টন যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, একচ্ছত্র সম্রাট্, বঙ্গদেশে তেমনই মধুসূদনও সমকক্ষ-বিহীন, অদ্বিতীয়। "প্যারাডাইস্ লষ্ট" ও "মেঘনাদবধ" নট-নটীর নৃত্য-গীত প্রধান নহে; ভেরী-নিনাদিত রণ-ভূমির বীর-নাদে ও কল্লোলিত সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে মুখরিত। এই দুই অতুল্য মহাকাব্যে ঐশিক শক্তি পূর্ণ-বিকশিত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মেঘনাদবধ কাব্য দুই খণ্ডে (১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গ ১ম খণ্ড এবং ৬ষ্ঠ সর্গ হইতে ৯ম সর্গ ২য় খণ্ড) প্রকাশিত হয়।* দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ভার বহন করেন। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মধুসূদন তাঁহারই নামে এই মহাকাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য-বিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি

কলিকাতা

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

কিন্তু পরে, তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসকালে মিত্রজ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে

* ১২৬৭ সালের ২২শে পৌষ প্রথম খণ্ড এবং ১২৬৮ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়।

মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিরও হৃদয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন ঐ উৎসর্গ-পত্র প্রত্যাহার করেন।

মহাকবি কালিদাসের "রঘুবংশ" হইতে মধুসূদন নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

"—কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ,
মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।।"

"মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বপ্রতিষ্ঠিত "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"র পক্ষ হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছায় প্রকাশ্য সভার আয়োজন করিলেন। বঙ্গ দেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনা সেই প্রথম। মধুসূদনের পূর্ব্বে কোন কবি বা লেখক এরূপ সম্মান লাভ করেন নাই। সেই সভায় মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধিত করিবার উল্লাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের, ১২ই ফেব্রুয়ারী,* মঙ্গলবার, সন্ধ্যার সময় মধুসূদন, বন্ধুবর গৌরদাস ও তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইয়া, ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড হইতে, কালীপ্রসন্ন সিংহের যোড়াসাঁকোর প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধুসূদন যাইতে যাইতে শকট মধ্যেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পণ্ডিত রামকুমারকে বলিলেন, "পণ্ডিত! কালীপ্রসন্ন আমাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রকাশ্য সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে।" পণ্ডিত বলিলেন, "কিসের দুর্ভাবনা?" মধুসূদন বলিলেন, "সভায় অভিনন্দনের উত্তর আমাকে বাঙ্গালায় দিতে হইবে। বাঙ্গালা বলা ত আমার অভ্যাস নাই।" পণ্ডিত বলিলেন, "উত্তর ত প্রস্তুতই আছে, আপনি সভাতে গুছাইয়া বলিতে পারিলেই হইবে।" এইরূপ কথা হইতে হইতে শকট দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ অন্যান্য বন্ধুর সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধুসূদন শকট হইতে অবতরণ করিবামাত্র কালীপ্রসন্ন তাঁহার 'পাণিপীড়ন' করিয়া, তাঁহাকে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। সভাস্থলে মধুসূদন উপস্থিত হইবামাত্রই সমবেত সুধীমণ্ডলী তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত রামকুমার বলিতেন, সভার গাম্ভীর্য্যে ও উপস্থিত জন-মণ্ডলীর উল্লাস-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন আসন গ্রহণ করিলে, "স্বাগত-গীতি" গীত হইয়া, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া, কবির কণ্ঠে স্বহস্তে মাল্য-দাম পরাইয়া দিয়া, হ্যামিল্টন কোম্পানীর নির্ম্মিত একটি রজতময় সুরম্য পান-পাত্র (Silver Claret Jug) কবিকে উপহার দিলেন।

এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মধুসূদনের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত হইল—

My dear Sir.

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language. I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving. while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be

* তখন কেবল মাত্র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

obliged. and I have no doubt all will be pleased. by your kind presence at mine on Tuesday next. the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে যে মানপত্র দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ,—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য এ কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয় ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান্ হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজদুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরাজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্। ১

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা করেন। তাহার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল—বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা। বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়! ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।--[২]

এ সম্বন্ধে মধুসূদন একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. মধুসূদন সম্ভবতঃ অভিনন্দনের উত্তরে তাঁহার লিখিত বক্তব্য পাঠ করিয়াছিলেন; এই পত্রের উপসংহারে লেখা ছিল---Fancy! I was expected to speechify in Bengalee! যিনি "মেঘনাদবধ কাব্য" রচয়িতা, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, তাঁহার পক্ষে বিষম অগ্নি-পরীক্ষা! ইহার অপেক্ষা কৌতুক-জনক বিষয় আর কি হইতে পারে!

কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি প্রবন্ধে মধুসূদনকে কবি হিসাবে হোমর, ভার্জিল ও মিল্‌টন্ অপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করায় পাদরি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত 'Indian Reformer' পত্রে মধুসূদনের কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

The Editors of the *Vividartha Sangraha,* in their blind admiration of Mr. Dutt, prefer his poetry to that of Homer, Virgil and Milton. We can only account for this singular perversity of taste by supposing that the gentlemen who have sat themselves up as Judges on the Bengali republic of letters have never read intelligently a line of the Greek or Latin or English Bard.

Hindu Patriot-সম্পাদক ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

The fact is the Poetry of each nation has distinctive natural features and the writer who can retain those distinctive features in his poetry, is sure to be the darling of his nation and may exultingly say *non omnis moriar.** We freely confess that it is not our object to fight for Mr. Dutt, and as for the Editors of the *Vividartha* they know how to return scorn for scorn and blow for blow. But we cannot refrain from saying that we fancy the *Reformer* har not read Mr. Dutt's poetry with the attention it has a right to expect from educated Bengalees, and that if he has, he has forgotten those days when he sat on his mother's lap, and heard those beautiful legends that shed a halo of glory around our country and people, and are our only inalienable wealth! If the *Reformer* has no sympathy with anything that is Hindoo, all that we can do is to bow him out of the room politely.

১ ও ২। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ তারিখের "সোমপ্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত।

* Not all of me shall die.

Being neither Greeks nor Romans nor believers in the Mosaic account of creation. the Editors of the *Vividartha* need not blush if a Hindoo legend stirs up their feelings more than the poetry of Homer. Virgil and Milton. We should certainly call them silly. if they did violence to their feelings. in order to show the world how very thoroughly they had been "regenerated"

কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিবিধার্থ সংগ্রহে" মেঘনাদবধের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

"হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয় বস্তুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণ-রাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি! অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাঁহাকে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

"মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধি-জল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্ব্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই। কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণ্যে লজ্জিত হইব।"*

"মেঘনাদবধ কাব্য" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন একদিন মধুসূদন কোন কার্য্যোপলক্ষে চীনাবাজারে গিয়াছিলেন। তথায় দেখেন, জনৈক দোকানদার তাহার দোকানের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে মেঘনাদবধ পাঠ করিতেছে। কৌতূহলাবিষ্ট রহস্যপ্রিয় কবি, দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন?"

দোকানী।—আজ্ঞে এ একখানি নূতন কাব্য।

মধুসূদন।—কাব্য! আপনাদের ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাই নাই—তা আবার কাব্য!

দোকানী।—সে কি মহাশয়! মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে পারে।

মধুসূদন।—আচ্ছা, পড়ুন দেখি শুনি!

এই কথা শুনিয়া সেই সাহিত্য-প্রিয় দোকানদার সন্দিগ্ধ নেত্রে মধুসূদনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার বোধ হয়, আপনি এ গ্রন্থকারের ভাষা বুঝিতে পারিবেন না।"

মধুসূদন।—ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি কি?

অগত্যা সেই দোকানদার স্বেচ্ছামত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেন,—

---

* "বিবিধার্থ সংগ্রহ" শকাব্দ ১৭৮৩ আষাঢ়, মেঘনাদবধ কাব্য-সমালোচনা।

বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন!—ইত্যাদি

কিয়ৎকাল পরে, তিনি নিরস্ত হইলে, মধুসূদন তাঁহার হস্ত হইতে পুস্তকখানি লইয়া কয়েকটি স্থল নিজে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঠের ভাব-ভঙ্গি, উচ্চারণ ও সুর-লালিত্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, বিস্ময়-ব্যগ্র স্বরে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?" মধুসূদন তাঁহাকে অস্পষ্টভাবে একটা জবাব দিয়া, প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "খুব চলিবে মহাশয়, খুব চলিবে; ইহা বাঙ্গালায় এক নূতন সৃষ্টি। মনে হয়, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছন্দ।" তখন মধুসূদন তাঁহার সহিত কর-মর্দ্দন করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন। বন্ধুবর্গের নিকট তিনি নিজেই এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন। ফলে, সেই অজ্ঞাতনামা দোকানদারের কথা সার্থক হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর-ছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধ বাঙ্গালায় চলিয়াছে; গ্রন্থ প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সহস্রখণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল।

একদিন "উকীল-লাইব্রেরীতে" মধুসূদন বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একটি উকীল আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, মেঘনাদবধের নরক বর্ণনাটা আপনি মিল্‌টন্ হইতে লইয়াছেন, ঠিক্ কি না?" মধুসূদন হাসিয়া কবিগুরু দান্তে হইতে কতকটা নরক-বর্ণনা আবৃত্তি করিলেন। পরে মিল্‌টন্ হইতেও ঠিক্ তদ্রূপ ভাবের বর্ণনা আবৃত্তি করিয়া উকীল মহাশয়কে বলিলেন, "এই দেখুন, মিল্‌টন্ যে স্থান হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সেই স্থান হইতে লইয়াছি!"

মধুসূদন সময়ে সময়ে বলিতেন—My writings are three-fourth Greek. এ কথাটি গ্রীক্-ভাষা ও গ্রীক্‌দিগের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগের নিদর্শন—হোমর-পাঠের ফল। গ্রীক্-আদর্শেই তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ বিরচিত। কিন্তু তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ হিন্দুত্বের ছাঁচে গঠিত ও হিন্দু পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-রচনা-কালে তিনি একখানি পত্রে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

"It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own in the present poem I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done."

তখন মেঘনাদবধ অনেকেই পাঠ করিতে পারিতেন না। এমন কি প্রথম প্রথম তখনকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও অমিত্রচ্ছন্দের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উহা পাঠ করিতে সমর্থ না হইয়া প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দাই করিতেন। একদিন দীনবন্ধু মিত্র শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি শোন দেখি, আমি পড়িতেছি"। এই বলিয়া দীনবন্ধু মেঘনাদবধ পাঠ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কোন্ কাব্য পাঠ করিতেছেন? এ অতি সুন্দর! এ বই ত আর সে বই বলিয়া বোধ হইতেছে না!" সেই দিন হইতে শ্রীশচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ... ...

"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায়" রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন,—

এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি! মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শত্রুও অনেক। তাঁহার সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল।

তিনি কলেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে, তাহা অতীব কৌতূহলজনক। যখন আমি ঐ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রথম দুই সর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাকে "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" সংবাদপত্রে তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে আমি ঐ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষগুণ বিচারের সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষে গুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষে গুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষ ও গুণ আছে, কিন্তু "দোষেগুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুল সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল; যথা,—হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিল্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজ-গাম্ভীর্য্য ও রচনার জম্‌জমাট্ দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। "যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে," "নাদিল দম্ভোলি কড় কড় রবে" ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে! এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধ কাব্যের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে মাইকেল মধুসূদন "খেদাইনু" "নাদিলা" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি "রামভদ্র" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনা দ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ সত্ত্বে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি? মেঘনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী-কবিতা প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার আর

সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।* কয়েক বৎসর হইল, অমৃতবাজার পত্রিকায় "ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য" নামে মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটী হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজীতে হোমর প্রভৃতি কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটী তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্য্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ... ...

রাজনারায়ণ বসু পরবর্ত্তী কালে, কবির মৃত্যুর বহুবৎসর পরে, তাঁহার "আত্ম-চরিতে" মেঘনাদবধের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—আমি [১৮৬০ সালের শেষে] মেদিনীপুর যাইবার পূর্ব্বে কবিকুলসূর্য্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দুকলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই খ্রীষ্টীয়ান হইয়া বিসপস্ কলেজে পড়িতে যান। তৎপরে অনেক দিন মান্দ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যে সময়ে দেখা করিলাম তিনি তখন মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালিখি হইয়াছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ওই লেখালিখি আরম্ভ হয়। ওই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য *Indian Field* নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই-তিন সর্গ আমার অভিপ্রায়ের জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, 'কবে আমি দেখিব মধুসূদনবদনসরোজং'। আমি জয়দেব হইতে ওই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সেদিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, My dear Raj, this will surely make me immortal: আমি বলিলাম, 'তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন,—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।।

আরো বলিয়াছেন—

যদ্যাকণ্ঠকুলা সুকৌশলমনুধ্যানং চয়দ্বৈষঃবং
যচ্ছদীব বিবেকতত্ত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতঃ।
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাৎময়ঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ।।

হাফেজ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উপর মুক্ত বর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে,

* এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি।

"ভবিষ্যদ্বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক্ আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু: কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না, এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।" তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যেদিন আহার করিব সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইদিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। ... ... ❑

এই অংশটি নগেন্দ্রনাথ সোম রচিত 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

মধুসূদন ও তাঁর বন্ধুসমাজ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণত কবিরা দু'জাতের। এক দল আত্মগত কথা বলেন অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কথা বেশি করে বলেন। তাঁরা হলেন গীতিকবি অর্থাৎ 'লিরিক পোয়েট'। আর এক দল কবি নিজেদের কথা তত বেশি বলেন না, যতটা অপরের কথা, বাইরের কথা, নানা চরিত্র, লোকজন, ঘটনার কথা বলেন। তাঁরা কখনো মহাকবি, কখনো আখ্যানকাব্যের কবি। মধুসূদন ছিলেন মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের কবি। অবশ্য গীতিকবিতাও লিখেছিলেন। তাঁর সনেটের কথা মনে পড়বে, তাঁর আরো দু'তিনটি কবিতার মধ্যে তাঁর গীতিকবির মনই ধরা পড়েছে। তিনি মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ করতেন যে তাঁর মধ্যে কোন্ ভাবটি বেশি—গীতিকবির না মহাকবির? আসলে মধুসূদনের মধ্যে গীতিকবির ভাবও অনেকটাই ছিল, তা তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও অন্যান্য রচনাতেও প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। গীতিকবিরা নিজের নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে কবিতা রচনা করেন বলেই অপরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাঁদের ততটা দরকার হয় না। যেন পাঠকেরা আড়াল থেকে তাঁদের কবিতা শুনে থাকেন। মধুসূদন যদিও আখ্যানকাব্যের কবি, কিন্তু মহাকাব্যও লিখেছেন। তবুও তাঁর চারিদিকে একটি বড় রকমের ভক্তগোষ্ঠী, পাঠক সমাজ ও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন এবং বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিতা চর্চা করেছিলেন, অবশ্যই ইংরেজি ভাষায়।

পনের ষোল বছর বয়সেই তাঁর হাত থেকে নিখুঁত ইংরেজি ভাষায় লেখা গদ্য, পদ্য আসতো। সেই কবিতাগুলি তিনি কলকাতায় যেসব ফিরিঙ্গি কাগজ ছিল তাতে প্রকাশ করতেন। যিনি যৌবনে পৌঁছাননি তাঁর পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ছন্দ মিলিয়ে, শব্দ মিলিয়ে, ব্যাকরণ ঠিক রেখে কবিতা লেখা খুব কঠিন কাজ। বিশেষত ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয়। তখন মধুসূদন যে বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা তাঁর জীবনীতেই দেখা যাবে।

বলতে গেলে মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান, অল্প বয়সেই ইংরেজি শিখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য জীবনযাপনের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণও ছিল। ফলে ঐ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ অশন বসন আচার ব্যবহার তাঁর প্রথম যৌবনে আয়ত্ত হয়েছিল, তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন—কি জন্য তিনি খ্রিস্টান হলেন এবং তাঁর পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন, এবং তারপর তিনি মাদ্রাজে গেলেন। সেখানে ক' বছর যাপন করলেন এবং আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। সে কথা তাঁর জীবনীতে বিশেষ করে লেখা আছে। দেখা যাচ্ছে, মধুসূদনের চারিদিকে এমন একটা গোষ্ঠী ছিল যারা তাঁর প্রতিভার অত্যন্ত প্রশংসা করত। সেই বাল্যকাল থেকেই—এই যেমন গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কুবিহারী দত্ত এঁরা সব তাঁর স্কুলের বন্ধু। হিন্দু স্কুলে সবাই পড়তো। তাঁরা সকলেই তাঁর প্রথম জীবনে লেখা ইংরেজি কবিতার খুব প্রশংসা করতেন। এমন কি ভোলানাথ চন্দ বার্ধক্যে পৌঁছেও মধুসূদনের কৈশোরে লেখা ইংরেজি কবিতার লাইন মুখস্থ বলতে পারতেন। প্রথম জীবনে এই বন্ধুরাই তাঁর কাব্য-চর্চার সহায়ক ছিলেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁরা মনে করতেন, কালে মধুসূদন ইংরেজি ভাষার একজন মস্ত বড় কবি হবেন। ক্রমে মধুসূদনের মনেও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্য লিখে বিশেষ নাম করতে পারবেন। তাই বন্ধুদের বলতেন, আমি বায়রনের মতো একজন বড় কবি হবো। তোমরা আমার জীবনী লিখো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৈশোর যৌবনে তাঁর ইংরেজি কবিতা, তার কাব্যমূল্য যাই হোক না কেন, সেই কবিতার বিকাশের জন্য তাঁর সহপাঠীদের প্রশংসা খুব দরকার ছিল। কবিরা

অনুভূতিপ্রবণ হন, তাঁদের বন্ধু-বান্ধব না থাকলে তাঁরা কিছুতেই মনে শান্তি পান না। এই যেমন ইংরেজি সাহিত্যের 'লেক' কবিগোষ্ঠী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, লে হান্ট প্রমুখ স্কটল্যাণ্ডের 'লেক' অঞ্চলে বাস করতেন। এক সঙ্গে থাকার ফলে পরস্পরের মধ্যে একটা বান্ধবতা জন্মে গিয়েছিল। ঠিক মধুসূদনের কৈশোর জীবনে যে-সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ছিলেন, তাঁরা তো কবি ছিলেন না, কিন্তু সমঝদার ছিলেন এবং তাঁর ঐ ইংরেজি কবিতার প্রশংসা করতেন। অবশ্য তাঁর কবিতাগুলি এখনকার মানদণ্ডে খুব একটা ভাল জাতের কিছু নয়, কারণ সেই ষোল-সতের বছর বয়সে একজন বিদেশির পক্ষে ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করে মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য কবিতাগুলি যাই হোক না কেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাঁর প্রশংসা করে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একজন নতুন কবির পক্ষে সেই ধরনের প্রশংসা দরকারও বটে। সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সহপাঠী ছিলেন যেমন—গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, এঁরা সবাই একই বিদ্যায়তনে পড়তেন।

এই যুগটা ছিল ডিরোজিও যুগ। ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্ব কনিষ্ঠ অধ্যাপক। তাঁকে আমরা ফিরিঙ্গি বলতে পারি না কারণ তাঁর জন্ম-মৃত্যু কলকাতায়। এই ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসেবে এলেন তখন তাঁর চারিদিকে ছাত্ররা ভিড় করে থাকতেন। ডিরোজিও ছিলেন সেকালের পক্ষে খুবই বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী। এই আদর্শগুলি যখন তিনি তাঁর তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন তখন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের শক্ত বাঁধনটা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রের মনেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা হিন্দু আচার 'অস্বীকার' করতেন, খাদ্য-অখাদ্য তফাত মানতেন না, হিন্দু দেব-দেবীদের অশ্রদ্ধা করতেন। সেই একটা কালাপাহাড়ি যুগ, এই যুগেই মধুসূদনের আবির্ভাব। এই যুগের অন্য ভাবও ছিল অর্থাৎ রামমোহনের ব্রহ্মতত্ত্ব। তাঁর অনুরাগীবৃন্দের একটা দল ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু রক্ষণশীলদের আর একটা দল ছিল রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ছিলেন যার নেতা এবং প্রচারক। ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক। এঁরা রামমোহন গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। তৃতীয় দলে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে সংযত আর একটি সম্প্রদায়। কিন্তু তখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে পারেনি।

যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে উঠল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভূদেব মুখোপাধ্যায় এলেন, এবং যে মনোভাবের পূর্ণতা ঘটল বাঙ্কমচন্দ্রের মধ্যে। কিন্তু মধুসূদন যখন এসেছিলেন তাঁর যৌবনে কলকাতার ভাবজগতে, সমাজ শিক্ষায়, ধর্মে এক প্রচণ্ড রকমের আলোড়ল চলছিল, মধুসূদন সেই রকম একটা সমাজ-সংকটের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গীরা পাশ্চাত্য ধরনের মনোভাবের বশবর্তী ছিলেন। তাঁরা সকলে ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা এ্যাডাম স্মিথের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। রাজনীতির দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সোসাল ডেমোক্র্যাট। সেই জন্য অনেকেই তাঁদের সমীহ করে চলতো।

মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। তিনি বোধহয় প্রথম যৌবনে খুব বেশি বাংলা ও সংস্কৃত শেখেন নি। তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন বিশপ্স কলেজে। বিশপ্স কলেজে কিছু সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন কবি হলেন তখন সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে খুব ভাল করে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে সংস্কৃত, পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতি থেকে রস সংগ্রহ করা কঠিন হয়নি। এখানে তাঁর কয়েকজন বন্ধুর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গৌরদাস বসাক ছিলেন তাঁর সহপাঠী, আবাল্য সহচর এবং মধুসূদনের প্রতিভাকে তিনি

ধূমায়িত করেছেন, প্রজ্বলিত করেছেন। এই গৌরদাস বসাক, তাঁর প্রথম জীবনের সঙ্গী, শেষ জীবনের সঙ্গী এবং যখন মধুসূদন মাদ্রাজ গিয়ে কলকাতার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, পিতা চলে গেছেন, মাতা তো আগেই চলে গেছেন, তখন এই গৌরদাস কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে পত্রযোগে সংযোগ রক্ষা করতেন। তিনি ধর্মত্যাগ করে যেন সম্পূর্ণ অবাঙালী না হয়ে যান, তাঁর এ দিকে গৌরদাসের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এবং গৌরদাস কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে বইটই পাঠাতেন। ইতিমধ্যে মধুসূদন মাদ্রাজের 'স্যারকুলেটার পত্রিকায়' ইংরেজিতে কাব্য লেখেন। এই কাব্য গ্রন্থাকারে ছাপাও হয়। বইটি হলো 'ভিশনস্ অফ দি পাস্ট'। সেটি কলকাতায় এলো এবং ফিরিঙ্গি খবরের কাগজে দেওয়া হলো সমালোচনার জন্য। ফিরিঙ্গি কাগজওয়ালারা একজন দেশীয় ব্যক্তি, সে হোক না খ্রিস্টান, সে কবি হতে চাইছে এবং তাদের কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছে, একথা তারা মানতেই পারলো না এবং এই সব কাগজে মধুসূদনের এই কাব্যের প্রচুর নিন্দামন্দ ছাপা হল। ফলে এতে মধুসূদন খুব দুঃখ পেলেন, পাওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর এই কাব্যের এক কপি বিঠন সাহেবকে (যিনি তখন শিক্ষা সচিব) দেওয়া হল। অবশ্য গৌরদাসই দিয়েছিলেন।

বিঠন সাহেব বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য অনেক কিছু করেছিলেন এবং বাঙালির সঙ্গে তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। গৌরদাস তাঁকে এই বইখানা দিলেন এবং বলেন যে তাঁর বন্ধু সুদূর মাদ্রাজে বসে এই ইংরেজি কাব্য লিখেছেন। বিঠন সাহেব পরে চিঠি লিখে জানালেন যে তোমার 'বন্ধুর' এই কাব্যে যথেষ্ট গুণপনা আছে কিন্তু তবু এই বৃথা সাধনা কেন? তিনি কি মনে করেন যে, রক্ষণশীল ইংরেজি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমালোচকরা তাঁর এই কাব্যের কোনদিন স্বীকৃতি দেবে? ইংরেজরা ভয়ঙ্কর সংকীর্ণমনা; তাঁদের বাইরে কেউ সাহিত্য চর্চা করে খ্যাতিলাভ করছে এটা তাঁরা মানতে চান না। সুতরাং এই কাব্য লিখে তাঁর কি লাভ হবে? কিন্তু এত বড় ক্ষমতা যাঁর রয়েছে তিনি বরং মাতৃভাষাতেই লিখুন। মাতৃভাষায় না লিখলে তাঁর কাব্য কোনো দিনই কালজয়ী হবে না। এই চিঠির একটি প্রতিলিপি গৌরদাস মধুসূদনকে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে তাঁর একটু অনুরোধও জুড়ে দিলেন যে আমার ও কলকাতায় তোমার যে বন্ধুবান্ধব আছে তাদের অনুরোধ বিদেশি ভাষায় কাব্য রচনায় তোমার যে ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে তার সবটা তুমি বাংলা ভাষায় প্রয়োগ কর তাহলে তুমি একজন অসাধারণ কবি হতে পারবে।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

কেউ কেউ বলেন এই সনেটটি মধুসূদন বিঠন সাহেবের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলেন। বিঠনের চিঠি পাওয়ার পর তাঁর মনে হল এতদিন তিনি বিফলে ঘুরে মরেছেন। এইবার তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আমার মনে হয়, এই অনুমান ঠিক নয়, কারণ, মধুসূদনের প্রখর বিচারবুদ্ধি ছিল। বিঠন সাহেবের এই চিঠি না পেলেও তিনি বাংলা কাব্যে ফিরে আসতেন।

গৌরদাস বসাকের কাছ থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন। তবু নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন ভারতীয়ের পক্ষে ইংরেজি কাব্যে পাড়ি জমানো একান্ত অসম্ভব ব্যাপার, যতই গুণপনা থাক না কেন। বিঠন সাহেবের চিঠি না পেলেও তিনি অল্পকালের মধ্যে বুঝতে পারতেন যে ইংরেজি ভাষায় তাঁর কাব্য

চর্চা নিষ্ফল হতে বাধ্য। যাই হোক গৌরদাসের চিঠি ও বিঠন সাহেবের অভিমত একই সঙ্গে পেলেন। তার অনেক আগে থেকেই তিনি সংস্কৃত জানতেন; তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য পড়তে আরম্ভ করেছিলেন কেন? তিনি গৌরদাসকে বলতেন, দেখ, আমি এত ঘটা করে সংস্কৃত পড়ছি, তামিল পড়ছি কেন? আমার মাতৃভাষাকে অলংকৃত করার জন্যে। অর্থাৎ তিনি যে বাংলা ভাষায় একজন রচনাকার হতে যাচ্ছেন সেটা তাঁর কলকাতায় আসার আগেই বোঝা গিয়েছিল। তখন তিনি বলতেন "আমি যে এত ঘণ্টা করে বাংলা সাহিত্য চর্চার জন্য ব্যয় করছি তাতে কি আমি একজন কবি হিসেবে দেশের মধ্যে স্বীকৃতি পাব না?" গৌরদাসের কাজ ছিল মধুসূদনের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, নতুন সৃষ্টির পথে তাঁকে নিয়ে যাওয়া। সেইজন্য মধুসূদনের জীবনে গৌরদাসের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ভাবে পড়েছিল। তাঁর আরও অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল। যখন তিনি কলকাতায় এসে পুলিশ কোর্টে ইণ্টারপ্রেটারের চাকরি নিলেন, তখন কলকাতার নাগরিক সমাজে মিশতে লাগলেন এবং কলকাতায় এ যুগের যে সব প্রধান প্রধান ব্যক্তি ছিলেন,—কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর, তিনি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং কলকাতায় এসে তাঁর প্রতিভা প্রকাশের পথ পেল। তাঁর এই প্রতিভা প্রকাশের জন্য তাঁর বন্ধু বান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তিরা অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছিলেন। শোনা যায় সমালোচকের লেখনীর আঘাতে কবি কট্‌সের জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছিল। স্কটিশ রিভিউ পত্রিকায় সম্পাদকরা অকারণে কীটস্-এর কবিতার নিন্দা করতেন। তরুণ কবি কীটস্ এই সব আঘাতে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অনেকে মন করেন যে কীটস্-এর অকাল মৃত্যুর কারণ এটাই। তা সে যাই হোক না কেন, মধুসূদন কিন্তু এই রকম আঘাত পাননি। যদিও তিনি বাংলা সাহিত্যে যে কাজ করতে চেয়েছিলেন তার উপর গুরুতর আঘাত আসা সম্ভব ছিল। কারণ তিনি বাঙালি চেতনার একেবারে মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি নিজে খ্রিস্টান ছিলেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতিতে তাঁর বিশ্বাস না থাকা অনুমান করা যেতে পারে, তবুও তিনি যা রচনা করলেন তা বাঙালির সমস্ত চেতনাকে প্রথম দিকে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের মধ্যে যথার্থ কাব্যগুণ ছিল। প্রথমে বাংলার চেতনায় আঘাত দিলেও ধীরে ধীরে তা আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই আত্মস্থ হওয়ার মূলে ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুরা—যেমন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম ভক্ত,—ডিরোজিওর আদর্শে বিশ্বাসী যারা ভারতীয় হিন্দু সমাজের কিছুই মানতো না। সেই রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেবার পর তাঁর উগ্রতা চলে গেল, তিনি একটা নিয়ম-শুদ্ধ জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনিই ছিলেন মধুসূদনের কাব্যের যথার্থ সমঝদার। মধুসূদন কিছু লিখলে তাঁর অভিমত আগেই চাইতেন। এবং রাজনারায়ণ নানা পত্র পত্রিকায় মধুসূদনের প্রতিভার বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী ও অন্যান্য রচনাতেও মধুসূদন সম্পর্কে খুবই প্রশংসনীয় মন্তব্য আছে। অর্থাৎ তাঁর বন্ধু বান্ধব সহপাঠী পরিচিত পরিজনরা যাঁরা তাঁর চারপাশে ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে কেন্দ্র করে ছিলেন। সকলেই মনে করতেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। এরকম ভাগ্য খুব কম কবিরই হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কথা মনে পড়বে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক আঘাত আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। মধুসূদনকে অতটা সইতে হয়নি, কারণ তাঁর বন্ধু বান্ধবরা আগে থেকেই উৎসাহ উদ্দীপনার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন! তার মধ্যে যে একটা মস্ত বড় প্রতিভা রয়েছে, শুধু মাত্র আগুনের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল, এ তাঁর বন্ধুরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন। রাজনারায়ণ বসু অতিশয় কাব্যরসজ্ঞ ছিলেন। তিনি মধুসূদনের রচনার ভিতরকার রস বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই দেখালেন মধুসূদনের সত্যিকার

প্রতিভা কোথায়। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর (মধুসূদনের) প্রতিভাকে স্বীকার করতেন। তিনি পত্র-পত্রিকায় মধুসূদনের কাব্য, নাটক ও প্রহসনের চমৎকার ব্যাখ্যা করে নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমাদের দেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ছিলেন তুলনামূলক সমালোচনার সত্যিকারের একজন আধুনিক ব্যক্তি। সেই তিনি পাশ্চাত্য ধরনের সমালোচনার আদর্শে মধুসূদনের কাব্য, নাটকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন এবং তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ প্রথম মধুসূদনের প্রতি আকৃষ্ট হল। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কাব্য, নাটক, কবিতা পড়তে লাগলো। অবশ্য তাঁর কবিতার মধ্যে যে উগ্র আধুনিকতা ছিল অনেকে তা সহ্য করতে পারত না। কেউ কেউ তাঁর সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি কেউ। বিশেষ করে তাঁর নাটক ও প্রহসনের জনপ্রিয়তা ছিল কাব্যের চেয়ে বেশি। তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার হিসাবেই। কাব্য রচনাকার হিসাবে তাঁর পরে খ্যাতি হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। ভূদেব ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান ও সংযত, যদিও প্রথম জীবনে তিনি কিছুটা ভিন্ন পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি ঘরে ফিরে এলেন, সনাতন জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি চাইতেন মধুসূদন যাতে ফিরিঙ্গি না হয়ে যান এবং ইংরেজের যেন ব্যর্থ নকল না করেন। মধুসূদন একটি মৌলিক প্রতিভা। একজন জিনিয়াস। তিনি ফিরিঙ্গির নকল করবেন কেন? তাঁর ভিতর থেকে মৌলিক জিনিস বেরিয়ে আসবে, এটাই ভূদেব লক্ষ্য করেছিলেন। মধুসূদনের প্রতিভার যে অনন্য সাধারণ মৌলিকতা ছিল সেটা ভূদেব বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি মধুসূদনের কাব্য কবিতার প্রশংসা করেও একদিন তাঁকে বললেন, "তুমি তো এত কাব্য লিখলে, মহাকাব্য এবং পাশ্চাত্য আদর্শের চূড়ান্ত করে ছেড়েছ, কিন্তু তুমি কি ব্রজেন্দ্র নন্দনের বংশীধ্বনি করিতে পার?" অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে কিছু লিখতে পার কি? শোনাও না একবার। এ এক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা এবং বলতে পারা যায় অনুরোধ। যে মধুসূদন অশনে বসনে বিবাহের মধ্য দিয়ে একেবারে "ডাহা ইংরেজ" তাঁকে কিনা বলা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের বৈষ্ণব গান লিখতে। তিনি খ্রিস্টান হলেও তাঁর মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না। আসলে খ্রিস্টান মধুসূদন ছিলেন বাঙালি মধুসূদন। তাই তাঁর কাব্যে মহাকাব্যে উগ্র ধরনের আধুনিকতা থাকলেও তিনি বৈষ্ণব রস ভুলতে পারেন নি। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যেই বহু জায়গায় বৈষ্ণব রস, রাধাকৃষ্ণের এপিসোডের কথা অলংকারাদির মধ্যে আছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু বললেন, রাধাকৃষ্ণের লীলার কথা, সে তো দুর্নীতিপূর্ণ হিন্দু পুরাণ ও কাব্যের কুৎসিত রচনা। কিন্তু মধুসূদন থেমে গেলেন না, তিনি বললেন, দেখ, আমরা যখন কাব্য লিখব তখন ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকাই উচিত। তিনি বীরাঙ্গনা কাব্য লিখলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনুরোধ করলেন যে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দনের বংশীধ্বনি কর। সে অনুরোধ তিনি রাখলেন। তিনি ভূদেবকে শুধু ভালবাসতেন না, তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করতেন। তিনি ভূদেবের বাড়িতে যেতেন এবং তাঁর মাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, হয়তো তাঁর মধ্যে নিজের জননীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও পাইকপাড়ার জমিদার সিংহ বাবুদের নাম উল্লেখ করি। এঁরা তাঁকে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। কেশবচন্দ্র নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। তিনি মধুসূদনের নাটকের প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন। খুব ভাল ইংরেজি জানতেন এবং ইংরেজি নাটকের ইতিহাসটাও তাঁর খুব ভালভাবে জানা ছিল। তাঁর সঙ্গে মধুসূদনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। মাইকেল তাঁর সঙ্গে নাটক নিয়ে আলোচনা করতেন। নাটকের ভাষা ভঙ্গিমা, তাঁর বাচন রীতি কি হবে না হবে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে

আলোচনায় মধুসূদন খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য লিখলেন এবং যখন বললেন যে যথার্থ মহাকাব্য এবং যথার্থ নাটকের ভাষা হতে গেলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ (ব্ল্যাংক-ভার্স) চাই তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটু সন্দিহান হলেন।

যতীন্দ্রমোহন সঙ্গীতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যেও। তিনি ভেবেছিলেন যে ব্ল্যাংক ভার্স বাংলায় রচনা করা খুবই দুরূহ, ইংরেজিতে হয়েছে। ফরাসিতে তখনও ব্ল্যাংক ভার্স প্রচলিত হয়নি। এই বাংলা পয়ার ছন্দে আমাদের কান তৈরি। তাই মিল্টনের ব্ল্যাংক ভার্সের অনুকরণ আমাদের বাংলা সাহিত্যে সম্ভব হবে না। কিন্তু মধুসূদন অসম্ভবকে সম্ভব করতে এসেছিলেন। কবিতা লিখে তিনি দেখালেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ চোদ্দ মাত্রার পয়ারেই সম্ভব। সুতরাং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তিনি বাজি ফেলে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য লিখলেন। এবং দেখালেন অমিত্রাক্ষর ছন্দেও এই রকম কাব্য রচনা সম্ভব। যতীন্দ্রমোহন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে সম্ভব নয়। এই সংশয় থেকেই মধুসূদনের মনে একটি দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত হয়েছিল। তিনি বলতেন, যে-বাংলার পিতামহী সংস্কৃত তার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও ছন্দের প্রাণের বস্তু মধুসূদন জানতেন। তাই তিনি সনেট লিখেছেন। ভারতের কোনও ভাষায় তখন সনেট লেখা হয়নি। পেত্রার্কীয় এবং শেক্সপীয়রীয় দুই ধরনের সনেট লিখেই তিনি দেখালেন যে বাংলা ভাষায় শক্তি আছে, অর্থাৎ নমনীয়তা এবং দৃঢ়তা দুইই আছে। তাই কাব্য রচনার যে কোনও প্রকরণ এতে সম্ভব।

পাইকপাড়ার জমিদাররা মধুসূদনের খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে উপরোধে অনেকগুলি নাটক লিখলেন, অভিনয়ও করা হলো তাঁদেরই মঞ্চে। তাঁর প্রহসন দুটি অর্থাৎ 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁদের অনুরোধেই লেখা হয়। একখানিতে উন্মার্গগামী কলকাতার যুবক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণ এবং অন্য একটিতে গ্রাম্য জমিদারের কদর্য চরিত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুইখানি নাটক অর্থাৎ প্রহসন পাইকপাড়ার সিংহ বাবুদের নাটমঞ্চে অভিনীত হয়নি, যদিও সিংহবাবুরা খুবই চেষ্টা করেছিলেন। না হওয়ার কারণ—যাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, তাঁদের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁতে নিন্দা করা হয়েছে এবং যাঁরা অতি আধুনিক উগ্র তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের নিন্দে করা হয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতাতে'। তাঁরা আন্দোলন করলেন যাতে পাইকপাড়ার নাটমঞ্চে প্রহসন দুটি অভিনীত না হয়! তাই সিংহবাবুরাও ভয় পেয়ে অভিনয় করাতে পারলেন না। কিন্তু কলকাতার আশেপাশে দুইখানি প্রহসন অনেকবার অভিনীত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। মধুসূদনের সঙ্গে প্রথম দিকে বিদ্যাসাগরের তেমন পরিচয় ছিল না। মধুসূদন তখন বিদেশে অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। কলকাতায় যাঁদের উপর তাঁকে নিয়মিত টাকা পাঠানোর ভার ছিল তাঁরা তা পাঠাতেন না। বিদেশে তিনি কি করবেন, কলকাতায় কার কাছে লিখবেন। তখন বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়লো। শুনেছিলেন বিদ্যাসাগর করুণার সাগর, যদিও তেমন পরিচয় ছিল না। বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন খুব করুণ ভাষায়। এবং বিদ্যাসাগর এখান থেকে অতি কষ্টে টাকা যোগাড় করে তাঁকে পাঠালেন। অর্থাৎ দুঃখের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ঘটলো। যখন দেশে ফিরলেন তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে সাগ্রহে, সানন্দে গ্রহণ করলেন। তাঁর থাকার ব্যবস্থা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এবং দরকার পড়লে টাকা সংগ্রহ করে দেওয়া বিদ্যাসাগর নিজেই এই কাজটি করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধার কথা সকলেই জানেন। সেই বিদ্যাসাগর মধুসদনকে বললেন যে তোমার মেঘনাদবধ কাব্য সে আমি পড়তে

পারি না, এ বড় কঠিন। তবে ব্রজাঙ্গনা কাব্য আমার বড় ভাল লাগে। মধুসূদন ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গেছেন এমন কথা সেকালের কেউ কেউ বলতেন এবং বাহ্যত সেটাও যে মিথ্যা, তাও তো নয়। তবুও মধুসূদন যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুবই আস্থাবান ছিলেন এবং এর পুরাণ ঐতিহ্যকে ভালবাসতেন তার প্রমাণ হলো ব্রজাঙ্গনা কাব্য। "কেন এত ফুল তুলিলি সজনি।"—এই সঙ্গীত ভারতীয় ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মধ্যে যেন ভারতচন্দ্র ও নিধুবাবুর সুর পাওয়া যায়, যা বাঙালির প্রাণের সুর সেটা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কলকাতায় তাঁকে যত রকম সম্ভব সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি মধুসূদনের অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যটি পড়ে অনেকে মনে করেছিলেন যে মধুসূদন বুঝি বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তর সাধক। তাই নবদ্বীপের বৈষ্ণব-ভক্ত মধুসূদনকে বৈষ্ণব মনে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর হোটেলে। সেই সব কৌতুককর গল্প মধুসূদনের জীবনীকারেরা সংগ্রহ করেছেন। এই ব্রজাঙ্গনা কাব্য ঠিক যে বৈষ্ণব পদাবলী হয়েছিল তা নয়। না ভাবে, না ভাষায়। এর রাধা নায়িকা-রাধা হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলীর মহাভাবস্বরূপিণী রাধা হয়নি। তিনি এর মধ্যে দিয়ে রাধাকে মানবী করেছিলেন। এটাও একটা মস্ত বড় রীতি ভঙ্গ বলতে পারি।

শোনা যায় চীনাবাজারে একজন মুদি সুর করে করে মেঘনাদবধ কাব্য পড়ার চেষ্টা করছিল। সে তো বেশি শিক্ষিত ছিল না। তার রামায়ণ মহাভারত পড়ার বিদ্যে ছিল না। তবুও সদ্য প্রকাশিত এই কাব্যটি সে পড়ার চেষ্টা করছিল। মধুসূদন হঠাৎ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন শুনলেন যে অর্ধশিক্ষিত একজন পাঠক, যে পয়ার সুর করে পড়তে অভ্যস্ত, সে তো এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঠিক ঠিক যতি দিয়ে পড়তে পারবে না—এটাই তো স্বাভাবিক। মধুসূদন তখন তার দোকানে উঠে তার হাত থেকে বইটি নিয়ে তাকে পড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিভাবে পড়তে হয়। মুদিও তখন শশব্যস্ত। মধুসূদন তাকে বললেন, তুমি তো কাব্যটি পড়লে, তোমার এই কাব্যকে কেমন মনে হ'ল। এই কাব্য চলবে? সেই অর্ধশিক্ষিত মুদি বল্‌লে, "এই কাব্য খুব চলবে।"

শুনে মধুসূদন নিশ্চিন্ত হলেন যে, মুদিখানার মুদি যখন কাব্যের রস গ্রহণ করতে পেরেছে তখন বৃহত্তর পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই এ কাব্য গ্রহণ করবে। জগদ্বন্ধু ভদ্র মেঘনাদবধ কাব্যের একটি কৌতুকপূর্ণ প্যারডি লিখেছিলেন। সেটা 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' নামে পরিচিত। একটি সর্গই লিখেছিলেন। সেটা বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্র কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবও ছিলেন। লেখাটিতে খুব প্রতিভা ছিল। ব্যঙ্গ মহাকাব্য লেখা খুব শক্তির পরিচায়ক। এমনকি মধুসূদনও সেটি পড়ে ভারি খুশি হয়েছিলেন। এবং শোনা যায় স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর ভক্তদের বলতেন, এই যে তোরা ছুঁচো বধ কাব্য লিখলি, তাতে কার কি ক্ষতি হলো? মাইকেলের কি কোনও ক্ষতি হয়েছে? তাঁর প্রতিভা গগনস্পর্শী তা চিরকালই থাকবে। অর্থাৎ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে যে আলোড়ন তুলেছিল তা সেকালের ইতিহাস থেকেই দেখা যাবে। এর মূলে ছিল তাঁর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের সহযোগিতা, সমর্থন এবং প্রশংসা। এই রকম ভাগ্য কজন কবির হয়!

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজ হয়তো খ্রিস্টান মধুসূদনকে পছন্দ করতো না, কিন্তু তাঁর কাব্যকে ভালবাসতো। মধুসূদন ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কিন্তু জীবনে তাঁর সুখ হয়নি। বন্ধুদের অত্যন্ত সহযোগিতা সত্ত্বেও তাঁর সুখ হয়নি, তাঁকে বলতে গেলে নিঃস্ব অবস্থায় হাসপাতালের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে শেষ দিন পর্যন্ত মৃত্যু মুহূর্ত গণনা করতে হয়েছে। বহু অর্থ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই জমিয়ে রাখেননি। তাই শেষ জীবনে তাঁকে রোগ ও ঋণের জ্বালা ভোগ

করতে হয়েছিল। এটি আমাদের বড় দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ঋণ করে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তবুও মধুসূদন জীবনে শান্তি সুখ পান নি। মৃত্যুকালে তাঁর চার দিকে বন্ধুবান্ধবরা সমবেত হয়েছেন এবং সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা, বেদনা নিয়ে তিনি মহাযাত্রা করলেন। আমাদের বাঙালি সমাজের ইতিহাসে পরম শোকাবহ ঘটনা, মধুসূদনকে অনাথ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এবং বাঙালি জাতির একমাত্র সান্ত্বনা—মধুসূদন অসহায় ভাবে মৃত্যু বরণ করেন নি, তাঁর চারি দিকে বন্ধু বান্ধবের দল ছিলেন।* ❑

* টেপরেকর্ডারে গৃহীত আলোচনা।

'নিত্য অলংকৃত হীরা মুক্তা মরকতে'

অলোক রায়

'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'[১]—এমন কথা বলতে একালে সম্ভবত কেউ রাজি হবেন না। কাব্যে অলংকারের উপযোগিতা স্বীকার করলেও, অলংকারের স্থান সম্বন্ধে আধুনিক কাব্য পাঠকের মনে সংশয় আছে। উনিশ শতকেই বঙ্গীয় সমালোচক কোন্তের সঙ্গে জানান, 'অলংকারশাস্ত্রের নাম শুনিলে ইংরেজিওয়ালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে।'[২] অথচ 'সৌন্দর্যমলংকারঃ'[৩] মানতে কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়, আর রবীন্দ্রনাথ সেইভাবেই কাব্যে অলংকারের ভূমিকা নির্দেশ করেন, 'কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই-কাজে। এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হলে চলে না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।'[৪] এখানে 'অলম্' বলতে বোঝানো হয়েছে 'ভূষণ'। মধুসূদন যেমন বলেন 'কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার।' কিন্তু ভূষণ বলতে সাধারণত বলয়কুণ্ডলাদির কথা মনে জাগে। এইখানেই সংশয়ের জন্ম।—'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্।'[৫] তাহলে কি কাব্যে অলংকার শুধু বাহ্যসৌষ্ঠব বৃদ্ধির উপায়? 'অলম' শব্দের অবশ্য আর একটি অর্থ আছে—'পর্যাপ্তি' বা 'পরিপূর্ণতা'। রবীন্দ্রনাথ অলংকারকে যখন এদিক থেকে দেখেন, তখন বলেন, "অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। ....সেই বাণীর সংকেত অলংকারে বাজতে থাকে 'অলম্' - অর্থাৎ 'বাস্, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।"[৬] কিন্তু তাহলে কটককুণ্ডলের কি হবে? আসল প্রশ্ন অলংকার্য কি? তথাকথিত বস্তুবাদী বা দেহবাদীরা কাব্যদেহকে অলংকার্য মনে করেছেন বলেই এমন ধারণা জন্মেছে 'অলংকারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ।'[৭] কিন্তু অভিনবগুপ্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, অচেতন শবশরীর কুণ্ডলাদির যোগেও সুন্দর হয়ে ওঠে না, বা সন্ন্যাসীর শরীর বলয়াদি অলংকার যুক্ত হলে সুন্দর না হয়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে। আসল কথা হলো 'অলংকার্যস্য অনৌচিত্যাৎ। ন চ দেহস্য কিঞ্চিৎ অনৌচিত্যম্ ইতি বস্তুত আত্মা এব অলংকার্যঃ।'[৮] তাহলে দেহ নয়, আত্মাই অলংকার্য। অলংকার তাই কাব্যের অবিচ্ছেদ্য নিত্যধর্ম—রসের দ্বারা আক্ষিপ্ত হলে যার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সঙ্গে একই প্রযত্নে যা সম্পন্ন হয় তাকেই কাব্যে অলংকার বলবো।[৯]

কিন্তু অলংকার বললেই আমাদের মনে জাগে হীরামুক্তামরকতে অলংকৃতা নারীমূর্তি বা উপমা-রূপক-যমক সজ্জিতা কবিভাষা। সৌন্দর্যই যদি অলংকার হয়, তাহলে কাব্যের ভাষাকে সৌন্দর্যের প্রয়োজনেই অলংকৃত হতে হবে। অ্যারিস্টটল চেয়েছেন কাব্যের ভাষা হবে একই সঙ্গে প্রসাদ গুণান্বিত এবং প্রাত্যহিকতাবর্জিত। প্রাত্যহিকতাবর্জিত শব্দ বলতে তিনি বোঝেন 'the strange word, the metaphor, the ornamental equivalent'[১০] ইত্যাদি। আসলে অলংকৃত বাক্য বলতে তিনি মেটাফরের ব্যবহারই বুঝেছেন, কারণ তাঁর কাছে 'It is metaphor above all that gives perspicuity, pleasure, and a foreign air.'[১১] পরবর্তীকালে লনজাইনাসও কাব্যে অলংকৃত ভাষা ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—'figurative language is a natural source of grandeur, and that metaphors contribute to sublimity; and also that it is emotional and descriptive passages that most gladly find room for them.'[১২] শুধু তাই নয়, অ্যারিস্টটলের থেকেও

আরও তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি জানান, 'The use of trivial words terribly disfigures passages in the grand style'[১১] তবে অ্যারিস্টটল যেমন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মেটাফর 'must be appropriate and not far-fetched, but not too obvious either.'[১২] লনজাইনাসও তেমনই সতর্ক করে দিয়েছেন, 'The appropriate occasion for their use is when the emotions come pouring out like a torrent, and irres is tibly carry along with them a host of metaphors.. However, it is obvious, even without my stating it, that the use of metaphors, like all the other beauties of style, is liable to lead to excess.'[১৩]

শেষ পর্যন্ত সেই ঔচিত্যের কথাই আসে। একমাত্র কবিই জানেন অলংকার ব্যবহারের ঔচিত্য, আর সেখানেও মূল সূত্র হলো 'রস জীবিতভূত।' কিন্তু ভরত থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ পর্যন্ত ভারতীয় আলংকারিকেরা শুধু অলংকারের সংখ্যাই বাড়িয়ে গেছেন, কাব্যবিচারে অলংকারের গুরুত্ব তাতে বাড়ে নি। ভরত যেখানে চারটি মাত্র অলংকারের কথা বলেছিলেন (উপমা, রূপক, দীপক ও যমক), পরবর্তীকালে সেখানে দুশোর বেশি অলংকারের নাম পাওয়া যাচ্ছে।[১৪] আলংকারিকেরা নৈয়ায়িকদের মতোই সূক্ষ্মবিচারে দক্ষতা দেখিয়েছেন, কিন্তু আনন্দবর্ধন বা কুন্তকের মতো দু'একজনকে বাদ দিলে ভরত থেকে বিশ্বনাথ পর্যন্ত প্রায় সকলেই বাক্যের 'দোষ-গুণ' নির্ণয়ে এত বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন যে আধুনিক পাঠক (তথাকথিত ইংরেজিওয়ালারা) অলংকার শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব বেশি উৎসাহ বোধ না করলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। যদিও আলংকারিকেরা বলেন, 'এই যে সৌন্দর্যার্থক অলংকার, যা কাব্যকে গ্রাহ্য অর্থাৎ উপাদেয় করে তোলে, এরই স্বরূপনির্ণয় আর বৈচিত্র্যব্যাখ্যান কাব্যশাস্ত্রে করা হয় বলে কাব্যশাস্ত্রও অলংকারশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।'[১৫] কিন্তু কার্যত শব্দালংকার আর অর্থালংকারের শ্রেণীবিভাগ ও লক্ষণ নির্ণয় কাজেই আলংকারিকদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। 'সৌন্দর্য' বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা আলংকারিকদের রচনায় কদাচিৎ মিলবে। অলংকার শাস্ত্রের ঐতিহাসিককেও তাই বলতে শুনি, 'No doubt, most writers on general Poetics, betray some critical acumen and give us a great deal of critical or samicritical matter while considering the application of a rule or principle, especially in the chapters on Dosa and Guna; but their outlook is often and necessarily limited by their confining themselves to rigid rules and specific definitions.'[১৬] ভরত যখন কাব্যের 'দোষ' প্রদর্শনের জন্য গূঢ়ার্থ, অর্থান্তর, ভিন্নার্থ, একার্থ, অভিপ্লুতার্থ, ন্যায়াদপেত, বিষম, বিসন্ধি প্রভৃতির কথা বলেন, কিংবা ভামহ যখন অপার্থ, ব্যর্থ, একার্থ, সংশয়, অপক্রম প্রভৃতি দশ রকম দোষের কথা বলেন (মম্মট ষোল রকম 'দোষ' নির্দেশ করেন) তখন তা কাব্যবিচারে সত্যই কতটা সাহায্য করে তা বলা মুশকিল। কবিযশোপ্রার্থী যাতে এই সব দোষ পরিহার করেন এই ভেবেই হয়তো কাব্য রচনার 'প্রবেশিকা' হিসাবে অলংকারশাস্ত্রের পঠনপাঠন প্রসার লাভ করে। কিন্তু ভামহের মতো অনেকেই জানতেন, গুণ কোথাও দোষ হয়, আবার দোষ কোথাও গুণ হয়। আর কাকে বলে দোষ, আর কাকে বলে গুণ, তাই নিয়েই কি বিতর্কের শেষ আছে? অলংকারপ্রস্থান যে শুধু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই নিদর্শন নয়, তার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিও ছিল, এমন কথা একালে কোনও কোনও পণ্ডিত স্মরণ করিয়ে দিলেও[১৭] শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বীকার করতেই হয়, 'The attempts of these exponents of the Alamkara School are limited to a systematic classification of poetic expression into fixed rhetorical categories ; and from this formal treatment their works have the general appearance of technical manuals comprising a collection of definitions, illustrations and empirical canons elaborated for the benefit of the aspiring poet. Poetry is regarded,

more or less, as a mechanical series of verbal devices, in which a desirable sense must prevail, and which must be diversified by means of certain tricks of phrasing, which consist of the so-called poetic figures and to which the name Alamkara is restricted."[১]

দুই

উনিশ শতকে মধুসূদন যখন কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন বাংলা কাব্য বলতে তাঁর সামনে ছিল ভারতচন্দ্র ও কবিগান রচয়িতা কিছু অর্বাচীন যাত্রাপাঁচালিকার। ভারতচন্দ্র এবং তাঁর অনুকারীদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি জানতেন তাঁর কাব্য 'will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar— the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius'.[২] তাঁর মুখে আমরা আরও শুনি : 'I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them!'[৩] পোপকে যেমন মধুসূদন কখনও বড়ো কবি মনে করেন নি, তেমনি 'বঙ্গীয় পোপ' ভারতচন্দ্র এবং তাঁর অনুকারীদেরও কবি হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন নি— 'The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*Our* Pope, who has—

Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!

May frown or laugh at us, but I say—'Be hanged' to them!'[৪] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হলে তিনি পত্রে লেখেন, 'I suppose you have heard of poor Issur Chunder's death! God rest his soul!'[৫] পরে চতুর্দশপদী কবিতা রচনাকালেও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি যথার্থ কোনও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না—

"স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণকাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুরঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য?"

আসলে মধুসূদন অত্যন্ত সচেতনভাবে ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালা-ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যবৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। মধুসূদনের কাব্যের ভাষা-ছন্দ-অলংকারের অভিনবত্ব এক নতুন কাব্যাদর্শের সূচনা করেছে। প্রথম দিকে অনেক দিন পর্যন্ত মধুসূদনের কাব্য যথোপযুক্ত স্বীকৃতি পায় নি, তার অন্যতম কারণ 'তিলোত্তমাসম্ভব' বা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা ছন্দ-অলংকার বাহ্যত 'different from that of the man of Krishnagar'। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, "বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। .....আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কবিতা গদ্‌গদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা!" অন্যদিকে 'বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি Caricature করিতেন—

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

মধুসূদনের কানেও নিশ্চয় পৌঁছেছিল বিদ্যাসাগরের অপছন্দের কথা, আর উত্তেজিত হয়ে পত্রে তাই লেখেন, "I have heard that V-has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the 'master-singers' whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry This ebulition of ill-nature on the part of [V—] has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city At least, that is what I hear Jotindra thinks it is 'clanfeeling' or in plainer words downright envy Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty envious fellow"[২২] কিন্তু বিদ্যাসাগর যে 'dirty, envious fellow' ছিলেন না, তার অজস্র প্রমাণ মধুসূদন পরবর্তীকালে পেয়েছেন। কিন্তু এখানে তো শুধু বিদ্যাসাগরের কথা বলা হচ্ছে না, ভারতচন্দ্র-দাশরথীর কবিতা পাঠে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে মধুসূদনের কবিতা অরুচিকর মনে হবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে!

অবশ্য মধুসূদনকেও এক ধরনের আপসরফা করতে হয়েছে। তিনি যে-চিঠিতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন, সেই চিঠিতেই জানিয়েছেন, "Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—'হাঁ, উত্তম উত্তম অলংকার আছে। মন্দ হয় নি'।"[২৩] মধুসূদন জানতেন, তাঁর কাব্য যতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হোক না কেন, 'উত্তম উত্তম অলংকারে'র জন্য তা প্রাচীনপন্থীদের কাছে সমাদৃত হবে। কিন্তু 'অলংকারের জন্য অলংকার'—কাব্যের পক্ষে কতটা কাম্য তা বলা কঠিন। লালমোহন বিদ্যানিধি থেকে শ্যামাপদ চক্রবর্তী পর্যন্ত যাঁরাই বাংলা-অলংকার গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরাই মধুসূদনের কাব্য থেকে অলংকারের নমুনা সংগ্রহে তৎপরতা দেখিয়েছেন। মনে হয়, হেন অলংকার নেই, যার নিদর্শন মধুসূদনের কাব্যে পাওয়া যাবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য থেকে মধুসূদন কিভাবে অলংকার সংগ্রহ করেছেন তা নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থও রচিত হয়েছে, যার সিদ্ধান্ত বাক্যটি হলো, "মধুসূদনের কাব্যে অলংকারের স্থান একটু অনন্য সাধারণ। কাব্যের প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি চরিত্র চিত্রণে কবি অলংকারের পর অলংকারের শোভাযাত্রা বার করেছেন। অলংকারকে 'এহো বাহ্য' বলে পাশ কাটিয়ে রেখে তাঁর কোন চিত্র কোন চরিত্রকে চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলি কবির উপস্থাপ্য বস্তুর অপরিহার্য অঙ্গ—অলংকারের সঙ্গে তাদের একটা নাড়ীর যোগ আগাগোড়াই।"[২৪] কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে অসংখ্য অলংকারের তালিকা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় বলে আমাদের মনে হয় না। দীননাথ সান্যাল এক সময় 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পাদনা কালে এই ধরনের সংগ্রহ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।[২৫] অন্যদিকে বাঙালি আলংকারিকেরা মধুসূদন-ব্যবহৃত অলংকারের স্বরূপ নির্দেশেও যে একমত হতে পেরেছেন তা নয়। অলংকারের লক্ষণ-বিচারে তাদের আগ্রহ কাব্য-বিচারের আগ্রহকে ছাপিয়ে গেছে। যেমন—

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!"

এই অংশটি সম্বন্ধে আলংকারিকের মন্তব্য—'এখানে শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক হয়েছে। শোকের আশ্রয় বা আধার বামাকুল, এবং মুক্তকেশ (আলুথালু কেশ) শোকের অন্যতম প্রকাশচিহ্ন। বামাকুল,

মুক্তকেশ, ঘন নিশ্বাস, অশ্রুবারিধারা, হাহাকার রব—এগুলি উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ। তেমনি এবার ঝড় (উপমান অঙ্গী)-এর অঙ্গ সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, প্রলয়বায়ু, আসার (বর্ষণ), জীমূতমন্দ্র (মেঘগর্জন)।' এর মধ্যে কাব্যের সৌন্দর্য বা রূপকালংকারের অভিনবত্ব প্রদর্শনের কোনও প্রয়াস নেই। তুলনায় মধুসূদনের সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণ বসুর মতামত আমাদের কাছে গ্রাহ্য না হলেও তার মধ্যে যথার্থ কাব্য বিচারের প্রচেষ্টা আছে—'চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষসসুন্দরীদের মুক্তকেশপাশ ও নিশ্বাস প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার সহিত....তুলনা দ্বারা উক্ত স্থলসকলের হোমারোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এ-প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত।'[১১] অনুরূপভাবে আলংকারিকেরা মধুসূদনের কাব্যের বিভিন্ন অংশের অলংকার-নির্ণয় কালে প্রচুর তর্কবিতর্কের অবতারণা করেছেন, কিন্তু তার সাহায্যে সৌন্দর্য ব্যাখ্যা দূরে থাক, অর্থোদ্ধারেও তাঁরা কতটা সহায়তা করেছেন তা বলা মুশকিল। যেমন—

১. সুরাসুরবৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি-সুত যত
বিবাদিল দেবসহ সুধামধু হেতু
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।

'স্মরণ' অলংকার, না কি শুধুই 'উপমা'?

২. মরে নর কালফণী-নশ্বর-দংশনে—
কি এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ?

'বিভাবনা' না 'অতিশয়োক্তি' অলংকার?

৩. কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!

সমগ্র অংশটি 'অপ্রস্তুত প্রশংসা' অলংকার, না কি শুধু শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি? প্রথমাংশ কি 'দৃষ্টান্ত' অলংকার?

৪. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ!

বাংলা-মতে 'ব্যাজস্তুতি' বলা হলেও ইংরেজি-মতে 'Irony' বলা যাবে কি?

৫. কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলংকার? বুঝিতে না পারি!

'কাকু বক্রোক্তি' না 'অর্থান্তরন্যাস' অলংকার?

উনিশ শতকের পণ্ডিতেরা মধুসূদনের কাব্যে অলংকারের বাহুল্যদর্শনে খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনেও অলংকারের সুপ্রয়োগ সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছিল। দীননাথ সান্যালের মতো তালিকাবদ্ধ আকারে না হলেও রামগতি ন্যায়রত্ন প্রাচীন আলংকারিক রীতি অনুসারে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দোষ-গুণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফল হলো—'মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও

সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দোষ নহে।...উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলংকার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেক স্থলও আছে, সেখানে সেই সেই অলংকারগুলি অতি কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২/৩টি কথা দ্বারা উৎকৃষ্ট কবিরা যে সকল অলংকার নির্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংক্তিও লাগিয়াছে।' 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' নামে সেকালের একটি রহস্যগ্রন্থে প্রাচীনপন্থীদের আপত্তি প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের মুখে আরও তীব্র ভাষায় শোনা গেছে : 'এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে সাত সংখ্যক উপমা সংযোগ করিয়া লেখক পরিচ্ছেদ সম্ভূত প্রকৃত মূর্তিটি দেখিতে দিতেছেন না। ...লেখকের নানাবিধ গুরুভার অলংকারে এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের কটিদেশ ত্রিভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ...অধিক অলংকার দিলে কবিতা সুন্দরীর স্বাভাবিক বিনোদিনী মূর্তি দেখা যায় না। সে ধারণা না থাকাতে মাইকেল স্তূপাকার অলংকারে কবিতাকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন।'[১]

ন্যায়রত্ন বা তর্কবাগীশের মুখেই শুধু যে আপত্তির কথা শোনা গেছে তা নয়, সেই 'a *real* B A.' যাঁর লেখা ভূমিকার জন্য মধুসূদন গর্বিত, তাঁকেও বলতে শুনি, 'তিনি উপর্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্বত্র উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।'[১] আধুনিক কালে অনেকেই এমন কথা বলেছেন যে মধুসূদন নতুন ধরনের কাব্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার জন্যই একটু বেশি পরিমাণে অলংকার ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন নিজে অবশ্য শুধু অনুপ্রাস ও যমকের কথা বলেছেন-- "I have used more 'অনুপ্রাস' and 'যমক' than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank Verse."[১] কিন্তু কেবল অনুপ্রাস-যমক নয়, সব ধরনের অলংকার ব্যবহারেই আতিশয্য দেখা গেছে, এবং মধুসূদন-ভক্তকেও তাই একালে মন্তব্য করতে হয়েছে, 'এই ধরনের আলংকারিকতা প্রাচীন আদর্শের কবিকর্ম বলিয়াই, বোধহয়, মধুসূদন তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতেই পারেন নাই--- কোনরূপ নিয়মরক্ষাই করিয়াছেন; অনেক স্থলে তাহা কবির ভাষা না হইয়া কাব্যের ভাষা হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন কাব্যে কালিদাস ও আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, যে ধরনের উৎকৃষ্ট কবিশক্তির পরিচয় এই উপমাতেই দিয়াছেন, মধুসূদনের কবিশক্তি যে তাহার অনুরূপ নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ...যদিও তাঁহার ভাষায় প্রাচীন কবিভাষার অনুকরণ যথেষ্ট আছে, এবং তাহাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক, তথাপি শব্দালংকারে— যমক অনুপ্রাস প্রভৃতিতে তাঁহার যেমন পটুত্ব, অর্থালংকারে তেমন নহে; তাহার কারণ—একটি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, অপরটি কাব্যবিধির বাধ্যতামূলক।'[১]

তিন

তাহলে মধুসূদনও 'প্রাচীন আদর্শের কবিকর্ম' অনুসরণে আলংকারিকতা গ্রহণ না করে পারেন নি। অথচ মধুসূদন সগর্বে বলেন, 'I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russians.'[১] এখানেই তাঁর কাব্যাদর্শের মধ্যে দেখা দিয়েছে এক অনিবার্য স্ববিরোধ। নাটক রচনাকালে তাঁর স্বঘোষিত নীতি হলো, 'I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan.'[১] কিন্তু কাব্য বা নাটক রচনাকালে মধুসূদন প্রায় সব সময়েই মেনেছেন 'সাহিত্যদর্পণে'র—'কাব্যবিধি বাধ্যতামূলক'। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের সঙ্গে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নি, ফলে 'সাহিত্যদর্পণে'র মতো অর্বাচীনকালে রচিত একটি অলংকার গ্রন্থকে[১] তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করেছেন (বিশ্বনাথ তাঁর গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে ছয়টি শব্দালংকার এবং প্রায়

সত্তরটি অর্থালংকারের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন)। অন্যদিকে ভরত থেকে শুরু করে ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রট পর্যন্ত সকলেই কাব্য বিচারে দোষ-গুণের উল্লেখ করেছেন, আর মধুসূদন তাঁদের গ্রন্থ না পড়লেও 'সাহিত্যদর্পণে'র সপ্তম পরিচ্ছেদ নিশ্চয় পড়েছিলেন। ফলে কাব্যে 'দোষ' পরিহার এবং তথাকথিত 'গুণ' বৃদ্ধির প্রয়াস মধুসূদনের রচনায় দেখা যাবে।

কাব্য রচনাকালে মধুসূদন অবশ্য শুধু সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র নয়, পাশ্চাত্য আলংকারিকদের নির্দেশের কথাও মনে রেখেছেন। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি যখন সাহিত্য-সমালোচনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলেন তখন এই কয়েকজনের রচনার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, – 'Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya-Darpan, Burke, Kames, Alisson,' Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German Schlegel'[৫৭] মধুসূদন এঁদের রচনার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত অলংকারের নমুনা এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য অলংকারের দৃষ্টান্ত বা উল্লেখ সংগ্রহ ছাড়া এঁদের রচনা মধুসূদনকে কি ভাবে সাহায্য করেছে, ঠিক বোঝা যায় না। যদি অভিনবত্বের কথা বলি, তাহলে আমাদের অপরিচিত কিছু অলংকারের দেখা মিলবে মধুসূদনের কাব্যে। যেমন মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে একটি পত্রে লেখেন—

..সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা?

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,-

And whisper whence they stole
Those balmy spoils—

of Milton, and the lines

Like the sweet south
That breaths upon a Bank of violets
Stealing and giving odour—

of Shakespears. Is not the 'চুম্বন' a more romantic way of getting the thing that 'stealing'?[৫৮]

মধুসূদনের উক্তি অনুসরণে আধুনিক আলংকারিক মন্তব্য করেন, 'এখানে উৎকর্য সম্পাদন হইয়াছে।' এবং কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্য-অনুভবের ফলে পাঠকচিত্তে তৎসদৃশ কাব্যের স্মরণ হতে থাকে বলে এর নাম দেন 'কাব্য-স্মৃতি' অলংকার।[৫৯] কিন্তু একে কি নতুন অলংকার বলবো? আবার লনজাইনাস যাকে Adjuration বা এক ধরনের Apostrophe অলংকার বলেন, মধুসূদনের কাব্যে তার নিদর্শন–

কোথা মরি সে সুচারু হাসি
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকরকররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনী?

কিংবা লনজাইনাস ব্যাখ্যাত Asyndeton-এর নিদর্শন—

হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সারথী

পদাতিক, যমজয়ী।

(দ্র. 'The phrases, disconnected, but none the less rapid, give the impression of an agitation which at the same time checks the utterance and urges it on And the poet has produced such an effect by his use of asyndeton.')[১০]

কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যের অনুসরণে মধুসূদন যখন একই বাক্যে তথাকথিত 'লিঙ্গবিভ্রাট' ঘটিয়ে বসেন, তখন বাঙালি আলংকারিকের মনে হয়—

দেখিনু অশোকবনে (হায় শোকাকুলা!)
রঘুকুলকমলেরে।

—সীতাকে কমলিনী না বলে কমল বলা দোষের। 'শোকাকুলা' স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণটি লক্ষণীয়।[১১] কিন্তু লনজাইনাস যাকে Polyploton বলেন সেখানে 'changes in case, tense, person, number and *gender*' সবই সম্ভব, এবং কাব্য সৌন্দর্যের হানিকর তো নয়ই, বরং 'very powerful ausciliaries in the production of elegance and of every kind of sublime and emotional effect'[১২] কবির নিজের বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ উত্তমপুরুষের মুখে ভাষণও (changes in *person*) মধুসূদনের কাব্যে পাওয়া যাবে।

অবশ্য এই রকম বিচ্ছিন্নভাবে অলংকার-নির্ণয়, তা সে সংস্কৃত অলংকারই হোক, আর পাশ্চাত্য Rhetorical figures-ই হোক, কাব্যবিচারে কতটা সাহায্য করে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় নই। এছাড়া অলংকার-প্রয়োগে 'দোষ' বা 'গুণ' নির্ণয়ের মধ্যে আলংকারিকের গুণপনার প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে অধিকাংশ সময়ে তার মূল্য যৎসামান্য। মধুসূদনের পত্রে দেখা যায় 'Erotic Similes' কিংবা 'allusions to the loves of lotus and Moon' অথবা 'The idea of fixed lightning'[১৩] নিয়ে তিনি বড়োই চিন্তিত। কিন্তু তিনি তো জানতেন, 'The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say if there be any beauty at all.'[১৪] তাহলে শেষ পর্যন্ত 'সৌন্দর্যমলংকারঃ'—সে অলংকার 'hackneyed' বা 'imitation' যাইই হোক না কেন। উনিশ শতকের পণ্ডিতেরা যেখানে সাধারণভাবে অলংকার নিয়েই খুশি ছিলেন, মধুসূদন সেখানে জোর দিয়েছেন imagery-র উপর।[১৫] কাব্যে যে ছবি আঁকা হয় তা নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার নয়—কারণ ভাবকে প্রত্যক্ষ করে তোলায় জন্যই ছবির আশ্রয় গ্রহণ। এইখানেই মধুসূদনের কাব্যের সীমাবদ্ধতা, যাকে আগে বলেছি তাঁর কাব্যাদর্শের স্ববিরোধিতা—আধুনিক কবির ভাষায়, 'মাইকেল যে ব্যক্তিত্ব ও কবিত্বের প্রমাণ তাঁর বীরত্বমূলক প্রয়াসে গুরুতেই দাখিল করেন, সে মানসিক কাবিক শক্তিমত্তা প্রতিকূল অবস্থায় যেন মাত্র বহিরঙ্গ জয়েই নিঃশেষ, এবং তাঁর কবিতার অলংকরণস্বভাব বিকল্পনা বা ফ্যান্সিতেই আবদ্ধ থেকে গেল। আর এটা যে শুধুমাত্র তাঁর ধ্রুপদী রূপের বিষয়ে উৎসাহবশত হয়, তা-ও নয়, কারণ মিল্টনও মাইকেলের তুলনায় ব্যক্তিস্বরূপকে মুক্ত করেন অনেক বেশি। অধিকন্তু, তাঁর কবিতাগুলিতেও মাইকেলকে ঠিক নৈর্ব্যক্তিক বলা যায় না।'[১৬]

উল্লেখপঞ্জি

১ বামন, কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১/১/১।
২ 'অলঙ্কারশাস্ত্র', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৮, পৃ ১৮।

৩. বামন, কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১/১/২।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের স্বরূপ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দশম খণ্ড ১৯৮৯, পৃ ৫৬৬।

৫ ভামহ, কাব্যালংকার ১/১৩।

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যধর্ম', সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ৪৭৭।

৭ বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ ১/২, বৃত্তি।

৮ ধ্বন্যালোক ২/৬, টীকা।

৯ দ্র 'রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্য-ক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ন নির্বর্ত্যঃ সোহলংকারো ধ্বনৌ মতঃ।।' ধ্বন্যালোক ২/১৭।

১০. Aristotle. *On the Art of Poetry* tr by Ingram Bywater. Oxford. 1959. p. 75

১১ Aristotle. *The Art of Rhetoric*, III 2 & 11 tr by John Henry Freese. The Loeb Classical Library. 1939.

১২. Longinus. 'On the Sublime' *Classical Literary Criticism*. Tr by T S. Dorsch Penguin Books 1965. p 142. also p 140

১৩ P. V Kane. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi. 1961. p 375

১৪. শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কার-চন্দ্রিকা, ১৩৬৩, পৃ. ৩০০।

১৫ Sushil Kumar De. *History of Sanskrit Poetics*. Vol II. 1960. p. 285

১৬ 'The primary test of alankars from the higher standpoint of literary criticism is their readiness to help the reader in understanding and unravelling the mysteries of the complexities of human life.' Sivaprasad Bhattacharyya *Studies in Indian Poetics*. 1981 p 61

১৭ Sushil Kumar De *Some Problems of Sanskrit Poetics*. 1981, p. 12-13.

১৮. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯০৭, পৃ ৩১০। (পরে শুধু 'যোগীন্দ্রনাথ বসু' নামে উল্লিখিত)।

১৯ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৩২৩।

২০ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৪৫৬।

২১ নগেন্দ্রনাথ সোম, মধু-স্মৃতি, ১৩২৭, পৃ ৭২৩।

২২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি সংস্করণ ১৯৮৯, পৃ. ৭১ এবং পৃ. ৪১।

২৩ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৩২৮-২৯।

২৪ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস, ১৩৬৯, ভূমিকা পৃ. ৬।

২৫ দীননাথ সান্যাল কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত মেঘনাদ-বধ কাব্য, ১৩২৪, পৃ ৩৩—৫১।

২৬ শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কার-চন্দ্রিকা, পৃ ৭৪।

২৭. রাজনারায়ণ বসু, 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন', সমালোচনা-সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ৬।

২৮ রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সংস্করণ, চুঁচুড়া, ১৩১৭, পৃ ২৬৫।

২৯ সুবলোকে বঙ্গের পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), অলোক রায় সম্পাদিত, গ্রন্থন প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ. ১১৯—২৪।

৩০ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা' (১২৭৪) মেঘনাদবধ কাব্য, পি. সি মজুমদার অ্যান্ড ব্রাদার্স, ১৩৭০, পৃ ৩৮।

৩১ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৪৫৫ ৫৬।

৩২ মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫, পৃ ১৭৩, ১৭৭।

৩৩ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৩১৫।

৩৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু পৃ. ৩১৭।

৩৫ 'He is however more or less a compiler and not an Original writer.' P. V. Kane. *History of Sanskrit Poetics*. p. 303.

৩৬ আধুনিক কালে কারও মনে হয়েছে, মধুসূদন এখানে স্যার আর্চিবাল্ড এলিসন-এর (১৭৯২—১৮৬৭) কথা বলেছেন, যিনি ঐতিহাসিক ও আইনজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন, সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত, 'কবি সম্ভবত সমালোচনা প্রসঙ্গে ভুল করে এই নামটির উল্লেখ করেছেন।' ক্ষেত্র গুপ্ত, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, ১৩৭০,

পৃ ১৮৪। কিন্তু মধুসূদন আদৌ ভুল করেন নি, তিনি এখানে যে আর্চিবাল্ড এলিসন-এর (১৭৫৭—১৮৩৯) কথা বলেছেন, ওঁর লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো 'Taste' (১৭৯০)। দ্র. *Dictionary of National Biography* vol I p. 286

৩৭ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৩১৯।

৩৮ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৪৯১।

৩৯ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্য শ্রী, ১৩৫৬ পৃ ২৫৩।

৪০ Longinus *Classical Literary Criticism*, p 129

৪১ শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কার চন্দ্রিকা, পৃ ২২১।

৪২ Longinus, *Classical Literary Criticism*, p 133 and 132

৪৩. যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৩৩৫।

৪৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৩২৬।

৪৫. In reading over my poem you must look—1st to the imagery 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed 3rd to the individual flow of each verse Do not care for the *general effect* যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৪৭৫।

৪৬ বিষ্ণু দে, 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস', মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৭, পৃ ১১।

বিধি-বন্দি রাবণ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

মাইকেল মধুসূদন যখন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গটি লিখে ফেলেছেন তখন বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর খুবই ইচ্ছে হয়, গ্রীক পুরাণের অসাধারণ সৌন্দর্যময় অংশগুলিকে আমাদেরই পৌরাণিক কাহিনীর জগতে নিয়ে এসে দৃঢ় ও গভীরভাবে রোপণ করেন। আপাতত, মেঘনাদবধ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে নিজের খুশিমতো প্রয়োগ করতে তাঁর খুবই ইচ্ছে জাগছে এবং বাল্মীকির কাছ থেকে যথাসম্ভব কম ঋণ করাই তাঁর পক্ষে ভালো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, এতে চমকে যাবার মতো কিছু নেই। মহাকাব্যের অহিন্দু চরিত্র নিয়ে অভিযোগ করতে হবে না বন্ধুকে। কারণ গ্রীক কাহিনী থেকে সরাসরি ধার করবেন না তিনি, তবে চেষ্টা করবেন, একজন গ্রীক যেমন করে লিখতেন সেইভাবে লিখতে।

একথা ঠিকই যে, বেশ কিছু গ্রীক দেবদেবী থেকে শুরু করে গ্রীক সাহিত্যের অখণ্ড সৌন্দর্যদৃষ্টি, পূর্ব সংস্কার-মুক্তি, মানবিক রসবোধ, ভারসাম্যময় ঋজুদৃষ্টি, এমনকি কিছু গ্রীক বীরত্ব পদ্ধতি ও সামাজিক সংস্কারকে পর্যন্ত মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীর হিন্দুসংস্কারের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশিয়ে নিতে পেরেছেন। এই মিশ্রণের সূত্রে তিনি ভাষারীতি, শব্দ ও শব্দবিন্যাস, ছন্দ, অলঙ্কার এবং বিষয়বস্তুকেও কতখানি যত্নের সঙ্গে দেশীয় করতে চেয়েছেন তার প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রে যথেষ্ট আছে।

কিন্তু উনিশ শতকের দুটি সংস্কৃতির সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামায়ণ কাহিনীর আভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের যে পরিবর্তন মাইকেল ঘটাতে চেয়েছিলেন তার মূল কথাটি হলো, রাম এবং তাঁর বানর-সৈন্যবাহিনীকে গৌণ করে রাবণের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, যেহেতু রাবণের চরিত্র তাঁর মনকে উন্নত করেছে। এই নতুন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই মেঘনাদবধের রাম ও রাবণ---এই দুটি পরস্পর-বিপরীত পক্ষকে মাইকেল নতুন ক'রে বিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন।

এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতায় গ্রীক দৈবের অমোঘ নিয়মকে মেনে মাইকেল রাবণ ও মেঘনাদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত দক্ষতা দেখিয়েছেন গ্রীকদের হিরোয়িক কোড বা বীরত্ববিধি অনুযায়ী। অথচ আমাদের দেশীয় সংস্কারে ও সমকালীন মানবিকবোধে সেই দৈববন্দী মানুষের অহঙ্কারী বীরত্ব-প্রকাশ মোটেই বিসদৃশ বলে ঠেকেনি। অন্তত সমকালীন কোনো সমালোচক এই রাম-রাবণের নতুন বিন্যাসকে তেমন তীব্রভাবে ধিক্কার দেন নি।

কিন্তু একটু খুটিয়ে দেখলে মনে হয়, যে দৈবকে বিরূপ দেখে মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ শত্রুপক্ষ বিনাশে উদ্যোগী হয়েছেন, তা পূর্বনির্দিষ্ট দৈব বা বিধি অথবা রাবণের নিজেরই কর্মফল কি না, এ ব্যাপারে কবির একটু দ্বিধা ছিল এবং সেই দ্বিধার ফলেই রাবণ-মেঘনাদের সর্বনাশের ব্যাপারে মূল কারণ ব্যাখ্যায় তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রাখেন নি। এই সঙ্গতি না থাকার ফলে বিধির কাছে রাবণ তাঁর পাপের মূল কারণ-সূচক যে প্রশ্নগুলি সমগ্র কাব্যব্যাপী বারবার করে গেছেন তার নৈতিক ভিত্তি কতখানি সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

প্রথম সর্গে বীরবাহুর পতনের পর গভীরভাবে আহত রাবণ বিলাপ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,/হরিলি এ ধন তুই?' আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তিনি বলেছিলেন, 'বনের মাঝারে যথা শাখা দলে আগে/একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে/নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ এ দুরন্ত রিপু/তেমনি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে/নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে/এর শরে!' এবং শাখাহীন-বৃক্ষ-রূপ রাবণ এবার 'কাঠুরিয়া'র শেষ মর্মান্তিক ঘা খাবেন এই আশঙ্কাতেই

বোধ হয় নিজের পাপের স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, 'হায় সূর্পণখা,/কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,/কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা/এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)/পাবক শিখারূপিণী জানকীরে আমি/আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,/ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে/পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!' এই উচ্চারণের মধ্যে রাবণের নিজকর্ম দোষের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল, সর্বনাশের কারণটিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, এবং মনের জ্বালায় তিনি যে নৈতিক দিক থেকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদা যখন শোকে-অভিমানে বিলাপ করেছেন রাবণের কাছে এসে, তখন রাবণ কিন্তু নিজের পাপকর্মের কথা একবারও উচ্চারণ করেন নি। কেবল বলেছেন, 'গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?/হায় বিধি বশে, দেবি, সহি এ যাতনা/আমি!' শুধু এই কথা নয়, নিজের পাপকর্মের কথা অনুচ্চারিত রেখে পুত্র পরাক্রমে যে বংশগৌরবই বেড়েছে চিত্রাঙ্গদাকে তা-ই বোঝাতে গেছেন। ফলে চিত্রাঙ্গদার মুখ থেকেই কঠিন কথাটি শুনতে হয়েছে রাবণকে : 'কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি/লঙ্কাপুরে? হায় নাথ, নিজ কর্মফলে,/মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!'

কিন্তু প্রথম সর্গে রাবণ ওই একবারই নিজের পাপকর্মের কথা বলেছেন এবং তার মর্মজ্বালায় জ্বলছেন বলে বনবাসী হতে চেয়েছেন। পরে মেঘনাদের সৎকার পর্যন্ত আর কখনোই তিনি নিজের কর্মদোষের কথা স্বীকার করেন নি। মেঘনাদের মৃত্যুর পর সপ্তম সর্গে যখন তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন তখন পুত্রশোকে কাতর মন্দোদরী এসে রাবণের চরণে পড়লে রাবণ বলেছেন : 'বাম এবে রক্ষঃ-কুলেন্দ্রানি,/আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি/এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে/মৃত্যু তার!' রাক্ষসদের সামনেও বলেছেন, 'কিন্তু দেবনরে পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে/বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে/বামতম মোর প্রতি; তেঁই শুখাইল/জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।' নবম সর্গে লক্ষ্মণ যখন নতুন প্রাণ পেলেন তখনও রাবণ বলেছিলেন, 'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?' এবং মেঘনাদের চিতার সামনে রাবণ যে-অন্তিম শোক প্রকাশ করেছেন তাতে বলেছেন, তাঁর আশা ছিল মেঘনাদের সামনেই তাঁর মৃত্যু হবে। মেঘনাদকে রাজ্যভার সমর্পণ করে তিনি মহাযাত্রা করবেন।— 'কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে/তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!' চতুর্থ সর্গে সীতার স্বপ্নের মধ্যে রাবণের মুখেও বিধির বিরূপতার কথাই শোনা গেছে। এবং প্রমীলাকে মেঘনাদের চিতায় আরোহণ করতে দেখে একটু নতুন কথা বলেছেন তিনি। সে হলো 'পূর্বজন্মফল'—নিছক বিধি নয়, নিজ কর্মদোষও নয়। সুতরাং রাবণের উক্তি থেকেই আমরা মেঘনাদ-রাবণের সর্বনাশের তিন রকম কারণ পাচ্ছি : কখনো নিজ কর্মদোষ, কখনো বিধি, কখনো পূর্বজন্মফল।

২

এখন মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যান্য চরিত্র রাবণের সর্বনাশের কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দেখা যাক। দ্বিতীয় সর্গে দেখি, ইন্দ্রদেব যখন শচীর সঙ্গে বসে আছেন তখন লক্ষ্মী এসে ইন্দ্রকে বললেন, রাবণের ভক্তিতে ও সেবাযত্নে তিনি বহুকাল স্বর্ণলঙ্কায় অবস্থান করছেন কিন্তু 'হায়, এতদিনে/বাম তার প্রতি বিধি। নিজকর্মদোষে,/মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে/না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,/কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু/পারে সে বাহির হতে?' কাজেই লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে রাবণের নিজকর্মদোষে বিধি বাম হয়েছে। অবশ্য রাবণের ওপর তাঁর কর্মদোষের শাস্তি চাপাতে বিধিকে 'বাম' করবার জন্যে তিনিই নিজে এগিয়ে গেছেন প্রথম। ষষ্ঠ সর্গেও মায়াদেবীকে লক্ষ্মী রাবণের কর্মদোষের কথাই বলেছেন। ইন্দ্র গিয়ে উমাকে বলেছেন, 'পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি-/দেবদ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,/দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন/হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি/ কভু কি

উচিত মাতঃ?' এখানে ইন্দ্রকেও দেখছি রাবণের পাপকর্মকেই ধিক্কার দিয়ে উমাকে রাবণের প্রতি কৃপা করতে বারণ করছেন। ইন্দ্রপত্নী শচীও বলেছেন, 'আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে দেবি,/এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে?' শেষ পর্যন্ত সকলেরই সমবেত চেষ্টায় মহেশ্বর বললেন, 'পরমভকত মম নিকষানন্দন;/কিন্তু নিজকর্মফলে মজে দুষ্টমতি।/বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,/মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে;/কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি!' কাজেই দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্মী থেকে শুরু করে ইন্দ্র শচী উমা ও মহেশ্বর পর্যন্ত সকলেই বিধি বা প্রাক্তনের অন্তর্গত হয়েই বলেছেন, বিধি বাম এবং প্রাক্তনের গতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই, কারণ, রাবণ নিজের কর্মফলেই তার সবনাশ আনছেন! যাই হোক, দেব-দেবী সকলেই কর্মফলের জন্যেই কষ্ট হয়ে প্রাক্তনের অবধারিত গতিকে জানিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ দেব-দেবীর দৃষ্টিতে নিছক বিধি নয়, কর্মফলই বিরূপ বিধি হয়ে আসছে।

অন্যদিকে তৃতীয় সর্গে লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাচ্ছেন তখন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে তিনি অভয় দিয়ে বলেছেন : 'অধর্ম কোথা কবে জয়লাভে?/অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃকুলপতি;/তার পাপে হতবল হবে রণ-ভূমে/মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।' এবং বিভীষণও লক্ষ্মণের কথাই সমর্থন করে বলেছেন, 'নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃকুলপতি!' এখানেও রাবণের কর্মদোষ বা পাপকর্মকেই দায়ী করা হয়েছে। জটায়ুও চতুর্থ সর্গে (সীতার পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে) মৃত্যুর সময় রাবণকে বলে গেছেন : 'কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষ? পড়িলি সঙ্কটে/লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী রতনে?' ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণ মেঘনাদকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন, 'পরদোষে কে চাহে মজিতে?' এ-সমস্ত কথাই প্রমাণ করে রাবণ নিজকর্মদোষে তাঁর সর্বনাশকে ডেকে এনেছেন।

কিন্তু দেব-দেবী বা সাধারণভাবে মানব-মানবীর চোখে যদিও রাবণের সর্বনাশ রাবণেরই ডেকে-আনা, নিজের ভাগ্য তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন, তবু অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে রাবণের এই অন্যায়কেও 'পূর্বজন্মফল' বা 'পূর্বনির্দিষ্ট বিধি' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, রাবণের এই পাপও যেন আগে থেকেই বিধি-নির্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ গ্রীক দৈবের মতোই এই অন্যায়েরও পূর্ব-নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল যাকে ভারতীয় দৃষ্টিতে পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ব্যাখ্যা করে আমরা সান্ত্বনা পাই। কর্মদোষে যে ভাগ্য বিরূপ হয় তার একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে, কিন্তু কর্মদোষও যদি আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকে তাহলে মানুষের সমস্ত কর্মপন্থার ওপর আয়ত্তের অতীত এক শক্তির কথা ধরে নিতে হয়, যার হাতে মানুষ একেবারেই অসহায়। এইরকম অসহায় শক্তির হাতে রাবণ যে ক্রীড়নক তার প্রথম ইঙ্গিত পাই চতুর্থ সর্গে সীতার স্বপ্নদর্শনে বসুন্ধরার উক্তিতে : 'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে/রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে/অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি/ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!/যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি/রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি/এতদিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে।' বসুন্ধরার এই উক্তি থেকে মনে হয়, রাবণের সীতাহরণ যেন বিধির পূর্বনির্দিষ্ট বিধান। এ বিধানের কাছে রাবণ যেন অসহায়। এই চতুর্থ সর্গেই আরেকবার পূর্বনির্দিষ্ট বিধানেই যে সীতাহরণ হয়েছে এমন ইঙ্গিত রয়েছে সরমার উক্তিতে। বসুন্ধরার উক্তিকে সমর্থন করেই সরমা বলেছেন : 'কিন্তু সত্য যা কহিলা/বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি/আনিয়াছে হরি তোমা; সবংশে মরিবে দুষ্টমতি।' প্রথম সর্গে রাবণ যে বলেছিলেন, 'কি কুক্ষণে' ... পাবক শিখারূপিণী জানকীরে আমি আনিনু এ হৈমগেহে'—সেই 'কুক্ষণ' শব্দটির মধ্যেও হয়তো পূর্বনির্দিষ্ট বিধানের ইঙ্গিত থাকতে পারে। নবম সর্গে রাবণ যে দূতকে পাঠিয়েছেন রামের কাছে মেঘনাদের সৎকারের জন্য সময় চেয়ে সেই দূতের মুখেও এই পূর্ব নির্দিষ্ট বিধানের ইঙ্গিত আছে। অনেক মিনতি করে সে বলেছে : 'কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!/বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?/যে বিধি,

হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে/সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে রিপু;/খগেন্দ্র নাগেন্দ্র বৈরী; তার মায়াছলে/রাঘব রাবণ-অরি —দোষিব কাহারে?' অর্থাৎ যে মৌলিক বা প্রাকৃতিক কারণে জড় ও জীবজগতে শাশ্বত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, সেই শাশ্বত দ্বন্দ্বেরই একটি রূপ রাম-রাবণের শত্রুতা।

লক্ষণীয় যে, রাবণ যেমন নিজের পাপকর্মের কথা খুবই কম বলেছেন, পূর্বজন্মের কর্মফলের কথাও বোধ হয় একবারই বলেছেন, এবং অধিকাংশ সময়েই বিরূপ ভাগ্যের কথা বলে গেছেন, তেমনি অন্যদিকে, দেবদেবীরা রাবণের ঔদ্ধত্য ও পাপকর্মের কথা বারবার বলেছেন এবং অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং জটায়ুও ওই পাপকর্মের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু বসুন্ধরার মুখেই অনায়ত্ত ও পূর্বনির্দিষ্ট সেই অপ্রতিবিধেয় বিধানেরই প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, সরমার মুখে তার সমর্থন আছে এবং শেষ সর্গে রাবণের দূতের মুখে সেই অপ্রতিবিধেয় বিশ্ববিধানের স্বরূপটি পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম থেকেই অনায়ত্ত শক্তির হাতে রাবণ যে অসহায় ক্রীড়নক একথা বারবার রাবণের মুখে বলালে বোধ হয় রাবণের প্রতিশোধ-সংকল্পের জোর কমে যায় ভেবেই মাইকেল অনায়ত্ত শক্তির কথা আভাসে তাঁর মুখে বলিয়েছেন। এমন কি, নিজের কর্মদোষের কথাও একবারই বলিয়েছেন তাঁর মুখে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের জ্বালার কথাও। বসুন্ধরা, সরমা এবং দূতের মুখে তিনবার মাত্র সেই অনায়ত্ত শক্তির কথা বলিয়ে হয়তো রাবণের বীরোচিত সংকল্প ও আশু কর্তব্যকেই বড় ক'রে মাইকেল দেখাতে চেয়েছেন। এবং একেবারে শেষ সময়ে, মেঘনাদের চিতায় প্রমীলাকে উঠতে দেখেই 'পূর্বজন্মফল' বলে সমস্ত চেষ্টার ব্যর্থতায় রাক্ষসলক্ষ্মীর উদ্দেশে রাবণকে দিয়ে হাহাকার করিয়েছেন। ইসকাইলাসের নাটক আগামেমনন-এর সূচনায় ট্রয়ের সর্বনাশের আভাস থাকা সত্ত্বেও তো আগামেমননের কর্মদোষ দেখিয়ে 'চরিত্রই নিয়তি' এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির বিধান থাকা সত্ত্বেও যেমন চরিত্রের কর্মদোষ দেখাবার অদ্ভুত প্যারাডক্স্ প্রাচীন গ্রীক জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি রাবণের পরিণতির মধ্যেও কাজ করছে, 'পূর্বজন্মফল' বলে তাকে মাইকেল দেশীয় সাজ পরাবার যতই চেষ্টা করুন না কেন। এক জন্মেই কর্মদোষ ঘটিয়ে তো দেবতারা তাঁকে শাস্তি দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে প্রধানত বিরূপ বিধির কথা বলেই রাবণ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর 'প্রতিবিধিৎসায়' বীরোচিত লড়াই করে শূন্য স্বর্ণলঙ্কায় ফিরলেন! তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহার মূলে কোনো নৈতিক সমর্থন ছিল না বলেই তা নিছক প্রতিশোধ-স্পৃহা! রাবণের স্রষ্টা একটু বেশি elevated হয়েছিলেন বলেই প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁর অস্ত্র। নইলে হয়তো বিশ্ববিধানের হাত থেকে রাবণকে মুক্ত করে 'চরিত্রই নিয়তি'—এই বাক্যটির তাৎপর্যে মাইকেল অন্য মাত্রা আনতে পারতেন। ❑

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কাব্যের নারীচরিত্র

সত্যবতী গিরি

'রেনেসাঁস' শব্দের মৌলিক অর্থ পুনর্জন্মলাভ। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ এখন দাঁড়িয়ে গেছে নবজাগৃতি বা নবজাগরণ। শব্দটিকে যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন রেনেসাঁস বলতে বোঝায় মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে মানব মনের মুক্তি, এই দৃশ্যমান জগৎ আর জীবন সম্পর্কে অন্তহীন জিজ্ঞাসা কৌতূহল আর মানুষের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু দেশের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেনেসাঁসের অপরিহার্য শর্ত নয়। তাই সমাজ বিপ্লব ঘটেনি বলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালির রেনেসাঁসকে অর্থহীন বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্য :

"The Renaissance was not a popular movement. It was a movement of a small number of scholars and artists encouraged by liberal patrons." (History of Western Philosophy, 2nd edn. London, 1961, p-488) অর্থাৎ রেনেসাঁস হচ্ছে ভাবজগতের আন্দোলন। কিছু সংখ্যক গবেষক বাংলার রেনেসাঁসকে গণজাগরণের প্রেক্ষিতে বিচার করে এর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেই গণজাগরণ সম্ভব। বাংলাদেশে তা সম্ভব না হওয়ার কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা। আর এজন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের পুনর্বিচারে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস এক রূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়—

"পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন, সেটা কী পদার্থ? কোথায় এবং কখন জাগরণ হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতি কেন্দ্র' হয়, যদি রেনেসাঁর সূর্য 'জ্যোতির কনক পথে'র মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও; কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার? কেন অতীতের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য? কেন পৌরাণিক যুগের স্বপ্নের ঘোরে আজও তাঁদের স্বপ্নচারিতা?" ('বাংলার নবজাগৃতি', ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ; কলিকাতা ১৯৭৯, পৃ-১৬৪)

ঐতিহাসিক সুমিত সরকারও এই নবজাগরণ সংক্রান্ত মিথ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন "Calcutta and the Bengal Renaissance"-এ (Calcutta the living city volume / the past edited by Sukanta Chaudhuri)। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কোন কোন সময়ে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ঘটনাকে নবজাগরণ বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই নগরনিবদ্ধ বহুলাংশে খণ্ডিত আর অসম্পূর্ণ নবজাগরণ বাংলা ও বাঙালির নানামুখী বিকাশে একটা catalytic agent বা গোত্রান্তর সংঘটনকারী কার্যকারকের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের মধুসূদনের নারীচরিত্র সম্পর্কিত আলোচনাও এই সূত্রকেই মেনে নিচ্ছে। আধুনিক নারীবাদী সমালোচনা নানামুখী। এর একটি সংজ্ঞা হলো -"সাহিত্যে নারীচরিত্র কীভাবে চিত্রিত হয়েছে বা নারীদের সম্বন্ধে কী জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ লেখক লেখিকা উভয়ের সৃষ্টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" আমাদের আলোচনায় এই রীতিটিকেই গ্রহণ করা হবে।

তথাকথিত নবজাগরণের সূচনায় যে প্রবল মানবতাবাদের উদ্বোধন ঘটেছিল—তার শুরু

রামমোহনকে দিয়ে। তার অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"যে সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাসভায় চ্যাথাম বার্ক, ফকস্ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীগণের অগ্নিময় বক্তৃতা ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময় আমেরিকাবাসীগণ পরাধীনতারূপ কঠোর নিগড় ভেদ করিবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিতেছিলেন এবং ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন প্রভৃতি মহাত্মারা উক্ত মহদুদ্দেশ্য সাধন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে সময়ে 'সভ্যতার রত্নখনি' ফরাসীভূমিতে প্রবল ঝঞ্ঝা ঝটিকার পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল;—ভলটেয়ার ও রুশোর ঐন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা পূর্বক জাতীয় মহাবিপ্লবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষে ওয়ারেন হেস্টিংসের বুদ্ধি চাতুর্য ও প্রবল প্রতাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়িকৃত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

পাশ্চাত্য শিক্ষায় সদ্যশিক্ষিত বাঙালি তখন ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করতো। প্রসন্নকুমার ঠাকুর রীতিমতো গর্ব করে বলেছিলেন—"If we were to be asked, what government we would prefer, English or anyother, we would, one and all reply, English by all means, ay, even in preference to a Hindu government." কিন্তু এরপর ইংরেজের স্বরূপ শিক্ষিত বাঙালিরা বোঝার পরও, পরাধীন জাতির স্বাধিকার অর্জনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার পরও শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়।

অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের একটা বড় দিক ছিল নারীপ্রগতির সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা। ইংরেজের শোষণের ফলে ১৭৬৯-৭০ সালের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' খুব দ্রুত গ্রাম-সমাজকে ভেঙে দিল। নারীসমাজের উপর শোষণ পীড়ন, আর সামাজিক নির্যাতনের পরিমাণ আরও বাড়লো। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহপ্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো ভয়াবহ প্রথাও সমাজ-বিবেককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতো না। মনুর বিধিবিধান নিয়ন্ত্রিত পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচেষ্টা শুরু হল। একাজেও অগ্রণী পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী রামমোহনের আর এক কীর্তি ধর্মসংস্কার। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্য এনে আর সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মসংস্কার করে তিনি নিরপেক্ষ উদারনৈতিক নারীনিগ্রহবিহীন দেশাচারবিবর্জিত মানবতামুখী ধর্মের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন-পরবর্তী বিদ্যাসাগরের বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে তাঁর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা রোধ করার চেষ্টা আর সেই সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা রামমোহন-পরবর্তী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলেও বিদ্যাসাগর রামমোহনের ধর্মসংস্কার নীতিকে গ্রহণ করেন নি। নিজে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত হয়ে শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন তাঁর সামাজিক আন্দোলনকে সফল করার জন্য। কারণ তিনি জানতেন উনিশ শতকের সেই সময়ে মেয়েদের মনোভাব পরিবর্তন করতে না পারলে তাঁর আন্দোলন সফল হবে না, শাস্ত্রের দোহাই ছাড়া অন্য কোনো মতই তারা গ্রহণ করবে না।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর তাঁদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এলেন। আর অবধারিতভাবে সেখানে উঠে এলো মেয়েদের প্রসঙ্গ। বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস' আর 'শকুন্তলা'য় রামায়ণ মহাভারত দুই মহাকাব্যের দুটি নারীচরিত্রকে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির মুখোমুখি দাঁড় করালেন। তাঁর 'শকুন্তলা' অবশ্য মহাভারতের নয়, কালিদাসের। বাঙালিদের কালিদাসের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ও উনিশ শতকীয় নবজাগরণের একটি উজ্জ্বল দিক।

নবজাগরণ যুগের উজ্জ্বল দ্রষ্টা মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন না। কিন্তু প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস-কে তিনি

অভিনন্দন জানিয়েছেন সনেট লিখে। 'বীরাঙ্গনা' উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। দেশের পরাধীনতার গ্লানিও তাঁর কবিমনকে স্পর্শ করেছে। এই একই প্রাগ্রসর চেতনা থেকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে উঠেছে নারীর সর্বাঙ্গীণ বন্ধন মুক্তির শিল্পিত প্রয়াস। আবার এরই পাশাপাশি থাকে চিরকালের ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের প্রতি কবির নম্রগভীর শ্রদ্ধা। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র কখনও পুরুষের অবিচারের প্রতিবাদে মুখর, কখনও প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশে সাহসিনী, কখনও দীপ্ত অসংকুচিত যৌবনের তেজোময় লাবণ্যে উনিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষের মানসী প্রতিমা।

হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকার সময়ই একটি রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে 'হিন্দু ফিমেল' নামে যে প্রবন্ধটি তিনি লেখেন সেখানে তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা : "The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete." [An Essay: on the importance of educating Hindu Females; মধুসূদন রচনাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত; ১৯৬৫; সাহিত্য সংসদ]

হিন্দু কলেজের এক কিশোর ছাত্রের এই ঘোষণায় উনিশ শতকের সচেতন শিক্ষিত বাঙালির নারী সম্পর্কিত সামগ্রিক অভীপ্সাই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে এই Young Bengal-এর সমালোচনার তীব্রতাও লক্ষ্য করার মতো : "In India, I may say in all the oriental countries, woman are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of man ...., The people of this country do not know the pleasure of domestic life." [তদেব]

মধুসূদনের এই উক্তিও কেবল ব্যক্তি মধুসূদনের নয়, সামগ্রিকভাবেই উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের উপলব্ধি। স্ত্রী শিক্ষার আরম্ভ ও প্রসার আন্দোলনের মূলে একদিকে ছিল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও অন্যদিকে শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত পরিশীলিত জীবনসঙ্গিনী তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা।

মধুসূদনের হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের সময় ১৮৩৭-৪২। এর অনেক আগেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সতীদাহ প্রথাবিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয় 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। এছাড়া মেরি অ্যান কুকের উদ্যোগে ১৮২৪-এ তৈরি হয় 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশান'। কিন্তু বিদেশি মিশনারিদের এই প্রচেষ্টা সেভাবে সার্থক হয় নি। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন—"An Apology for Hindu Female Education containing evidence in favour of the Education of Hindu Females"। এরও আগে রামমোহন রায় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে সহমরণ বিষয়ে বিতর্কে নেমে প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন—"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" (হিতকরী সভা, স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বসন্তকুমার সামন্ত; পৃ: ২৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

এইসঙ্গে নিজেদের জীবনের দুর্ভাগ্যকে জয় করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মহিলারা নিজেরাও বিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করেছিলেন। ১৮৩৫-এর ১৫ই মার্চের সমাচার দর্পণে শান্তিপুরের মহিলাদের শিক্ষার দাবিকে সমর্থন করে চুঁচুড়ার মহিলারা চিঠি লিখেছিলেন।

মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা পরবর্তীকালের বেথুন স্কুল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বেথুন কৃষ্ণনগরের একটি সভায় বলেছিলেন— "For her own sake and in her own right, I claim for women her proper place in the scale of created beings. God has given her an intellect, a heart and feelings like your own and these were not given in vain." বেথুনের এই দাবিতে পুরুষের প্রয়োজনে নারীর শিক্ষিতা হয়ে ওঠার কথা বলা হয় নি; ব্যক্তি হিসেবে, স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে নারীর

বুদ্ধি, হৃদয়বত্তা আর অনুভূতির বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই সর্বতোভাবে লক্ষ্য করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যের দুটি সর্গ লিখেই কবি 'কৃষ্ণকুমারী' লিখতে শুরু করেন। আবার নাটকটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় সর্গ থেকে লেখা শুরু হয় তাঁর মহাকাব্য। হিন্দু কলেজের কিশোর ছাত্রের enlightened partner-এর দেখা পাওয়া গেল এতদিন পর প্রমীলার মধ্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে পেলাম বিদ্রোহিণী চিত্রাঙ্গদাকে। জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথের মতে—"মধুসূদন পরে বীরাঙ্গনা কাব্যে দলিত ফণিনীরূপিণী জনার যে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখাপাত হইয়াছে।" কিন্তু দেবযানীর সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদার সাদৃশ্য বেশি। জনা বহুপত্নীক পুরুষের অবহেলিতা পত্নী নয়, সে স্বামিপ্রেমধন্যা। পুত্রের মৃত্যুশোকে শুধু নয়, স্বামীর সঙ্গে মতের অমিলও তার যন্ত্রণার কারণ। আর সৌন্দর্যময়ী চিত্রাঙ্গদা রাবণের বহুপত্নীর একজন। সমালোচক মোহিতলাল চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের মনোযোগের কথা বললেও আমাদের মনে হয় কেবলমাত্র রূপমোহে নারীর প্রতি পুরুষের এই আকর্ষণ তাঁর পত্নীত্বের মর্যাদাকে অপমান করে।

চিত্রাঙ্গদা নিজেকে লঙ্কাপুরীর একজন সাধারণ প্রজা বলেই মনে করেন। রাবণের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন না। তাই রাবণের কাছে তাঁর প্রশ্ন—

"দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?" (১ম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য, চরণ ৩৫৩ ৫৫)

নিজেকে 'দরিদ্র' আর 'কাঙ্গালিনী', সেইসঙ্গে রাবণকে 'রাজকুলেশ্বর' সম্বোধন করে চিত্রাঙ্গদা তাঁর বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ আর বিদ্রোহকেই প্রকাশ করেছেন। রাবণের আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও তিনি আবেগ দিয়ে নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন।

মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এক সাহিত্যের ঐতিহাসিক বলেছেন—"কবির আগাগোড়া রচনায় নারীপ্রধান জীবন মূল্যবোধের কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে আছেন জননী জাহ্নবী, ... কোথাও ব্যক্তিত্বময়ী মর্মপীড়িতা নারীরূপে, কোথাও বা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রার্থিনী বিদ্রোহিণী রূপেও।" চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের ক্ষেত্রে অন্তত আমরা সমালোচকেব এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত।

এইসঙ্গে আরো একটা কথা ভেবে দেখার মতো। চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ আর প্রতিবাদ অবরোধের মধ্যে নয়—প্রকাশ্য রাজসভায় উচ্চারিত হয়েছে। মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেও অবরোধের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসার বিরোধিতা করেছিলেন রাধাকান্ত দেবের মতো সমাজ-সংস্কারকেরা। মধুসূদন যেন তার প্রতিবাদ করেই চিত্রাঙ্গদাকে এনেছেন অবরোধ থেকে রাজপথে। এই ঘটনাটি বাস্তবে ঘটলো ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর। প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি Mill-এর 'Subjection of Women' পড়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'স্ত্রী স্বাধীনতা' নামে pamphlet বার করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে পাঠালেন গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে। সমকালীন একটি পত্রিকা লিখলো—"ইতিপূর্বে কোনো হিন্দুরমণী গবর্নমেন্ট হাউসে যান নাই।" এইভাবে শুরু হলো অবরোধের বেড়ি ভাঙা।

এই প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদার আর একটি ভূমিকাও লক্ষ্য করার মতো। সন্তানের ওপর পিতার তুলনায় জননীর অধিকার বেশি। এই সত্যটিকেও অনেক আগেই মধুসূদন চিত্রাঙ্গদার দাবির মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। পাখি যেমন করে তরুর কোটরে তার শাবককে রাখে, চিত্রাঙ্গদাও তেমনিভাবে বীরবাহুকে রাবণের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ সন্তানের সঙ্গে বহুপত্নীক

রাবণের আত্মিক সম্পর্ককে চিত্রাঙ্গদা স্বীকার করেননি। যেহেতু সন্তানের লালন-পালন ও সম্প্রদানে চিত্রাঙ্গদারই পূর্ণ ভূমিকা—তাই সেই সন্তান মায়ের একার। উনিশ শতকের কাল্পনিক চরিত্র হলেও এক মহিলার কণ্ঠে এই ধরনের দাবি বুঝিয়ে দেয় মধুসূদন তাঁর যুগের তুলনায় কতখানি এগিয়ে ছিলেন।

অশিক্ষিতা হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে গড়ে নেওয়ার মতো মানস-প্রবণতা তাঁর ছিল না। কিন্তু শিল্পী হিসেবে উনিশ শতকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস-প্রতিমাকে নির্মাণ করে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। মধুসূদন মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে "pleasure of domestic life"-কেই রূপ দিলেন। প্রমীলাকে জাগাতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলেছেন—

"উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি, হে, জগতে
আমার।—নয়ন-তারা! মহার্হ রতন!" (৫ম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য, চরণ ৩৮৩ ৮৪)

নারী এখানে 'পূজার্হা গৃহদীপ্তি' নয়, প্রেরণাদায়িনী, মনোরঞ্জিনী। প্যারাডাইস লস্টের প্রভাবের কথা মনে রেখেও বলা যায় দাম্পত্য প্রেমেরই নিবিড় উচ্চারণে ইন্দ্রজিৎ উনিশ শতকের আদর্শ স্বামী। অন্যদিকে প্রমীলা শুধু তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা নয়, সে যৌথ পরিবারের বাধ্যবধূও বটে। তাই স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শাশুড়ীর আদেশ পালন করে তাঁরই কাছে থেকে যায়।

প্রমীলাকে প্রথম দেখা যায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গেই। তার প্রেমিকা রূপটি এই সর্গে ফুটে উঠেছে। ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ চললেন লঙ্কাপুরীতে, আর প্রমীলা কেঁদে বললেন : "কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী?"

দ্বিতীয় সর্গে পরিবেশ ও পটভূমি পৃথক। প্রমীলাকে আবার পাওয়া যায় তৃতীয় সর্গে। তৃতীয় সর্গের শুরুতে কবি যে বিরহ বিধুরা প্রমীলার ছবি এঁকেছেন তা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিণী রাধার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের জন্য মথুরায় যাত্রা করেন নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে তিনি পরকীয়া নায়িকা। তবু বলা যায়, মধ্যযুগ কেন উনিশ শতকের বাস্তব পরিবেশেও মহিলাদের পক্ষে প্রবাসী স্বামীর কাছে যাওয়ার একক প্রচেষ্টা কল্পনাতেও সম্ভব ছিল না। মধুসূদন তাঁর উনিশ শতকের 'বীরাঙ্গনা' কল্প-নায়িকাকে সেই মানসিক শক্তির অধিকারিণী করে তুলেছেন। সখী বাসন্তী শত্রু-সৈন্য পরিবেষ্টিত লঙ্কায় প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে প্রমীলাকে সচেতন করলে তার উত্তর এখন বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কিছু পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠেছে—

"কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

কিন্তু শুধু মানসিক শক্তি নয় প্রমীলার সাহস ও শত্রু-সৈন্যকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাঁর যুদ্ধাস্ত্রশোভিত আড়ম্বরময় প্রস্তুতি বর্ণনায় প্রকাশিত। যোদ্ধৃবেশিনী প্রমীলার বর্ণনায় কবি তাঁর সৌন্দর্য ও বীরত্বকে একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁকে তুলনা করেছেন মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী হৈমবতীর সঙ্গে। লঙ্কাযাত্রার আগে সখীবৃন্দের প্রতি প্রমীলার উক্তিটি তাঁর বীরত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ---

"পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি; জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে---যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!"

কিন্তু সেইসঙ্গে পরমুহূর্তেই এক সুন্দরী তরুণীর কৌতুকপ্রিয়তা চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে :

"দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;"

প্রমীলার এই বীরাঙ্গনা মূর্তি অঙ্কনে কবি দেশি বিদেশি নানা কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভার্জিলের 'Aeneid' মহাকাব্যের বীরনারী Camilla, তাসোর "Jerusalem Delivered" মহাকাব্যের Clorinda, গ্রীকপুরাণে বর্ণিত আমাজন রমণীগণ (বিশেষ করে কুইনটাস অব স্মার্না কর্তৃক চতুর্থ শতকে রচিত 'Where Homer Ends"-এর কথা মনে আসে), কাশীরামের 'মহাভারতের' প্রমীলা, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কবিকে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। তবে বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যে কলিঙ্গা, কানড়া ও লখা ডোমনীদের মতো বীরাঙ্গনা চরিত্রগুলির সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে 'জগদ্রামী রামায়ণ' তাঁকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। প্রমীলার মধ্যে কবি একই সঙ্গে প্রেম আর বীর্য, লাবণ্যময় কোমলতা আর খরোজ্জ্বল তেজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সে শ্বশুর রাবণ আর স্বামী মেঘনাদের মতোই বীরকাব্যের উপযোগী চরিত্র। প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা টাসোর নায়িকা ক্লোরিণ্ডার মতোই :

Clorinda on the corner town alone.
In silver arms like rising cynthia shone.
Her rattling quiver at her shoulders hung.
Therein a flash of arrows feathered weel.
In her left hand her bow was bended strong.
Therein a shaft headed with mortalsteel.
Sofit to shoot Latona's daughter stood,
When Niobe he killed and all her brood.

কাশীরাম দাসের মহাভারতেও প্রমীলা রাজ্যের রানীর মতো বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে—

"আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মোর ভয়ে কাঁপয়ে যতেক দেবগণে।।
পার্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী।।

যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোকপাল।।"

তবে এই বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে মধুসূদনের প্রমীলার পার্থক্যও স্পষ্ট। সে বীরাঙ্গনা, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার বীরত্বের পরীক্ষা হয় নি। যুদ্ধসাজে আর সাহসিকতায় তার অনন্যতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। তার নির্ভীকতা আসলে 'প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী' নারীর নিজেকে প্রকাশ। তাই এই সমস্ত প্রভাব নিতান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার। প্রমীলা ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ নারী প্রতিমা। তার বীরত্ব আর নির্ভীকতা পুরুষেরই জন্য। তাই রামচন্দ্র প্রমীলার দূতীকে বলেন—

"কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—"

প্রমীলার সহমরণ প্রসঙ্গ আমাদের একটু সংশয়ে ফেলে দেয়। মধুসূদনের মতো আধুনিক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সহমরণ প্রথাকে সমর্থন করতেন একথা বোধহয় কোনোমতেই বলা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়তো শিল্পী মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করতে বসে ভেবেছেন যে রাবণের ট্র্যাজিক হাহাকার, তার সর্বরিক্ত জীবনের অতলস্পর্শী শূন্যতা, 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্কের মহিমান্বিত মাধুর্যের উল্লাস এই সহমরণ ছাড়া সার্থক হবে না।

প্রমীলা মধুসূদনের মানসকন্যা। তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব, নিষ্পাপ তারুণ্যের দীপ্তি, মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, আর অশোকবনের বিষণ্ণ অন্ধকারে থেকে অশ্রুময়ী সীতা শেষপর্যন্ত মুক্তি পেয়েছেন। সীতা মধুসূদনের কাছে "ভারতীয় নারীর জীবনের দুঃখলাঞ্ছিত অপমানিত সত্তার প্রতিমূর্তি" (মধুসূদনের কবিমানস; শিশিরকুমার দাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড)। তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সীতার প্রসঙ্গ। ইউরোপে থাকার সময় তিনি সীতা চরিত্র অবলম্বনে ইংরেজিতে একটি কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকে অশোককাননে ক্রন্দনরতা সীতাদেবীর প্রসঙ্গ আছে। সীতাকে নিয়ে 'সীতা বনবাসে', 'রামায়ণ' ও 'সীতাদেবী'—এই তিনটি সনেট তিনি রচনা করেছেন। নারীত্বের ভারতীয় আদর্শের চূড়ান্ত পরিচয় সীতার মধ্যেই নিহিত। মধুসূদন তাঁকেই হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। সেই সঙ্গে লাঞ্ছিতা নারীর প্রতি সহানুভূতিও যুক্ত হয়েছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রথম সীতাকে দেখা যায় চতুর্থ সর্গে। লঙ্কাপুরীতে তখন উৎসবের উল্লাস। তারই মাঝখানে :

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!"

তবে মধুসূদন-কল্পিত সীতা চরিত্রের আর একটি অভিনবত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বনবাসিনী সীতার প্রকৃতি-প্রীতি তাঁর চরিত্রে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। রাজনন্দিনী হয়েও অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। অরণ্যের পশুকে দিয়েছেন মায়ের মমতা—

"অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।"

সীতার এই করুণা শত্রু রাবণের প্রতিও বিস্তৃত হয়েছে। সরমা সীতার সর্বনাশের জন্য রাবণকে অভিযুক্ত করলে সীতা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে বলেছেন—তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর অলঙ্কার খুলে ফেলেছেন। সুতরাং এজন্য যেন রাবণকে দায়ী না করা হয়। মেঘনাদের মৃত্যু সীতার মুক্তিকেই ত্বরান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু লঙ্কাপুরীর এই করুণ ঘটনাও সীতার সহানুভূতিতে সিক্ত: এমনকি ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করেছেন—"মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে"। মধুসূদনের সীতা চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি রাজপ্রাসাদের অবরোধ থেকে বেরিয়ে অরণ্য প্রকৃতির প্রসারিত মুক্তিতে জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। দাম্পত্য সম্পর্কের বাধাহীন মধুর বিনিময়ে গড়ে তোলা সেই স্বপ্নজগৎ। এও নারীর অবরোধ মুক্তির ইঙ্গিতবাহী।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আর এক নারী মন্দোদরী যেন বাঙালি যৌথ পরিবারের আদর্শ গৃহিণী ও জননী। তাঁর মাতৃত্বের সেই গৌরব মধুসূদনের উপমা নির্মিতিতে উজ্জ্বল—

"শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী;
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল ঈশ্বরী!"

পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহে কোথাও পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই পুত্রের অনুপস্থিতিতে পুত্রবধূকে দেখেই তিনি সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর মন্দোদরী চিত্রাঙ্গদার মতো রাবণের প্রতি কোনো তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করেননি। শুধু সপ্তম সর্গে রণোন্মত্ত রাবণের সামনে নীরবে এসে—'রাজপদে পড়িলা মহিষী'। এই মন্দোদরীর সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন 'শিশুশূন্য নীড়ের আকুলা কপোতী'-র। অভিমানে অনুযোগে নয়, নির্বাক বেদনায় তিনি তাঁর অপরিসীম পুত্রশোক প্রকাশ করেছেন, নীরবতা দিয়েই স্বামীকে যুদ্ধযাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। এই মন্দোদরী ঐতিহ্য-বাহিত ভারতীয় নারীত্বেরই প্রতীক। রাবণের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক পারস্পরিক সহমর্মিতায়, শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সার্থক। তাই পুত্র শোকাতুরা মন্দোদরীকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টাই রাবণ করেননি। বরং দু'জনের এই দুঃখের ভার দু'জনকেই বইতে হবে—অপূর্ব কারুণ্য আর মমতায় সস্নেহে তাঁকে সেই কথাই জানিয়েছেন—

"বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ।"

রাবণ চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কে এই পারস্পরিকতা নেই। চিত্রাঙ্গদার সংলাপে অবহেলিত নারীত্বের ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ নবজাগরণ-যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই তুলে ধরে। আর মন্দোদরী হয়ে ওঠেন ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্য-নির্মিত আদর্শ প্রতিমা। রাবণ-মহিষীর উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটেছে মন্দোদরীর এই নীরব শোকের অভিব্যক্তিতে।

মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার পাশে যে নারী চরিত্রটিকে মধুসূদন তাঁর সান্ত্বনার জন্য রেখেছেন তিনি সরমা। সীতা আর সরমার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন—

"সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ।"

সীতা তুলসীর মতোই পবিত্র, আর স্বর্ণলঙ্কার কুলবধূ বিভীষণ পত্নী সরমা উজ্জ্বল সোনার প্রদীপ, কিন্তু তাঁর উজ্জ্বলতা ভক্তিনম্রতায় ভাস্বর। সরমার চরিত্রটি মধুসূদন সৃষ্টি করেছেন সীতার বেদনাবিধুর একাকিত্বের সহমর্মী এক সখীরূপে। নারীর যে কল্যাণময়ী মমতা স্নিগ্ধ রূপ তিনি বাঙালি পরিবারে দেখেছেন সরমা তারই প্রতিভূ। মধুসূদন তাঁর সাহিত্যে অবরোধবাসিনীকে মুক্তির আকাশ যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তারই শুশ্রূষায় আর সমবেদনায় সংসারের মঙ্গলরূপের কথাও ভোলেন নি। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধারই পরিচয় আছে সরমা সম্পর্কে সীতার উক্তিতে –

"মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!"

মেঘনাদবধ কাব্যে দেবী পার্বতীর চরিত্রে গ্রীক পুরাণের দেবরাজ পত্নীর প্রভাব আছে—একথা সমালোচকেরা অনেক আগেই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সমালোচকদের অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি, দেবী পার্বতীর যে দুটি রূপ আমরা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে দেখেছি তার একটি কলহপরায়ণা দারিদ্র্যক্লিষ্টা বাঙালি বধূর আর অন্য রূপটি দানবদলনী মহাজননীর। মধুসূদন দেবীর এই দুই রূপকে বর্জন করে মোহময়ী রমণীর যে রূপ এঁকেছেন তা গ্রীক পুরাণ থেকেই পাওয়া। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই দেবী পার্বতীই আহত কার্তিককে দেখে ব্যাকুলভাবে বলেন—

"বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।"

এই ব্যাকুলতা এক সন্তান স্নেহাতুরা বাঙালি মায়ের।

এভাবেই মধুসূদন তাঁর চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী আর পার্বতীর মধ্যে শাশ্বতী-জননীর স্নেহাতুর মমতার্দ্র হৃদয়কে উন্মোচিত করেন। অথচ তাঁর আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্বতায় পৃথক ব্যক্তিত্ব হয়ে যান।

মেঘনাদবধ কাব্যে মূলত নারীর দুই রূপ। একদিকে আছেন দাম্পত্যপ্রেমের দুই ভিন্ন রূপ—প্রমীলা আর সীতা। আর অন্যদিকে মাতৃত্বের প্রতিমা-ত্রয়ী—মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা আর দেবী পার্বতী।

কিন্তু এছাড়াও মেঘনাদবধ কাব্যে নিতান্ত অল্প উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে আরও দুটি নারীচরিত্র। এঁদের একজন দেবী লক্ষ্মী আর একজন প্রমীলার সখী নৃমুণ্ডমালিনী। বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না দেবী লক্ষ্মীর প্রথম সংলাপে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত লঙ্কাপুরীর শোকার্ত নারীদের জন্য গভীর বেদনার প্রকাশ ·

"ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতিগৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী।"

দেবী লক্ষ্মীর এই সংলাপে শিল্পী মধুসূদন লক্ষ্মীর সহানুভূতি নয় তাঁর নিজের আর্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার ঠিক আগেই ঘটে গিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ। সেই অভিজ্ঞতাও হয়তো কাজ করেছে এখানে। যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব পুরুষের মৃত্যু ঘটায়, আর মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ অবস্থায় ফেলে যায় নারীকে। মধুসূদনের সময়ের বেশ কিছু দিন পর নজরুল লেখেন—

"কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে।
কত বধূ দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নেই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা।
বীরের স্মৃতির স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা।।"

এই পংক্তিগুলো থেকে মধুসূদনের উত্তরাধিকারী নজরুলকেই আমরা সনাক্ত করতে পারি।

তবে দেবী লক্ষ্মীর এই বেদনা সম্পর্কে কিছুটা সংশয় জাগে—যখন দেখা যায় লঙ্কাযুদ্ধে ষড়যন্ত্রী দেবতাদের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এমন কী ধাত্রীমাতার ছদ্মবেশে প্রমোদ উদ্যানের নিশ্চিন্ত আনন্দ থেকে মেঘনাদকে যুদ্ধের মাঝখানে তিনিই টেনে এনেছেন। আসলে দেবতা চরিত্রের এই অবনমন গ্রীক পুরাণের সমৃদ্ধ পাঠক মধুসূদনের পক্ষেই তো স্বাভাবিক!

নৃমুণ্ডমালিনী প্রমীলার সখীদের মধ্যে বিশিষ্ট। প্রমীলার লঙ্কাপুরী যাত্রার আয়োজনে সে-ই :

"সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে।"

লঙ্কাপুরীর পশ্চিমদ্বারে উপস্থিত প্রমীলাও তার নারীবাহিনীকে হনুমান পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নৃমুণ্ডমালিনীই সদম্ভে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। বীর হনুমানকে অনায়াসে বলেছে—

"কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?"

এই আত্মসচেতন অহঙ্কার আর তেজের সঙ্গে তার চরিত্রে মিশেছে সৌজন্য আর শিষ্টাচারবোধ। রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত নৃমুণ্ডমালিনী বলেছে—

"প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ডমালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।"

আসলে প্রমীলার শ্রেষ্ঠ সহচরীর এই উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে প্রমীলাকেই উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য। এই তৃতীয় সর্গেই কবি হনুমানের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন শুধু লঙ্কাপুরীর নারীদের চেয়ে নয়, প্রমীলা সীতার চেয়েও সুন্দরী। সৌন্দর্যের পর যোদ্ধৃবেশধারিণী প্রমীলার বর্ণনায় কবির অসামান্য উপমা নির্মাণে তার তেজ আর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকেও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপমার ব্যবহারেই :

"সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ররমণী।"

ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্যে তিন শ্রেষ্ঠ দেবীর মহিমা নিয়ে প্রমীলার এই অসামান্য রূপ নির্মাণের কারণ আবার মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক, মধুসূদনের favourite ইন্দ্রজিৎকেই মহিমাদান।

প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলার প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁদের চরিত্রে বিশেষত্ব সেভাবে নেই। মধুকবির কল্পনা পাশ্চাত্য প্রভাবকে মিলিয়ে কাব্যের প্রয়োজনে এই দুটি চরিত্রকে সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় সর্গে দেবী পার্বতী ছাড়া আছেন দেবরাজপত্নী শচী। ইন্দ্রজিৎ হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁরও সক্রিয় ভূমিকা আছে। তিনি স্পষ্টভাবেই দেবী কাত্যায়নীকে বলেছেন—

"নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;"

ইন্দ্রজিৎ-হত্যার ষড়যন্ত্রে আর একজন দেবীকেও যুক্ত করা হয়েছে। শিবের পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অস্ত্র নিয়েছেন। এই ঘটনায় হোমারের মহাকাব্যের ঘটনার প্রভাব আছে। হোমারের দেবী থেটিস দেবশিল্পী হেফাইস্টোসকে দিয়ে দিব্য অস্ত্র গড়িয়ে পুত্র আখিল্লেওসের কাছে দিয়েছিলেন হেক্টরকে বধ করার জন্য।

এরপরও দেবী মায়া প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্মণকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন :

"হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।"

ষষ্ঠ সর্গে মায়া তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পালনে চূড়ান্তভাবে বিশ্বস্ত। অসহায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞের শঙ্খ, ঘন্টা, উপহারপাত্র নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করলে—

"মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে!"

অষ্টম সর্গে দেবী গৌরীর আদেশে আবারও মায়াদেবী প্রেতপুরীতে রামচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মায়ারই সাহায্যে রামচন্দ্র দশরথের কাছে উপস্থিত হতে পেরেছেন। ভারতীয় হিন্দু পুরাণে মায়াদেবীর অস্তিত্ব নেই। গ্রীক পুরাণ থেকেই মধুসূদন এই দেবীর পরিকল্পনা করেছেন।

এইভাবে উনিশ শতকের শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক কৃত্রিম মহাকাব্যের নারী চরিত্র সৃষ্টিতে আমরা একই সঙ্গে খুঁজে পাই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল, নবজাগরণ যুগের প্রগতিচেতনার দিশারী আর ক্ল্যাসিক বিশ্বসাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক মধুসূদনকে। ❑

সুন্দর ও শ্রীমধুসূদন

তরুণ মুখোপাধ্যায়

"সোনার তরী" কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবির ধর্ম ও অভিপ্রায় কী, তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কবি জানিয়েছেন,

... শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে। ...

এই আনন্দবাদ কাব্যের শেষ লক্ষ্য কি না, এ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবু কবিতাপাঠে আমরা যে আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধে আপ্লুত হই, এতে সন্দেহ নেই। কারণ, কবি আমাদের সামনে সৌন্দর্যের জগৎ উন্মুক্ত করেন। কবি চান সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে। 'তোমায় চেয়ে বসে আছি পথের ধারে, সুন্দর হে'—এই আকুলতা যেমন প্রেমিকের, তেমনি কবিরও।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি সৌন্দর্যের পূজারী? তিনি কি রোমান্টিক? এমন সরল প্রশ্নের সামনে আমরা স্বভাবত একটু থমকে দাঁড়াই। কেননা, দীর্ঘদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি শ্রীমধুসূদন ক্ল্যাসিক কবি। গ্রীক আদর্শ তাঁর মনে ও রচনাতে প্রতিফলিত। এমন ধারণার মূলে আছে কবির স্বীকারোক্তি—একজন গ্রীকের মতো তিনি লিখতে চান। তাই গীতিকাব্যের বদলে বেছে নেন মহাকাব্য। সাধারণ বাঙালির কাছে তিনি মহাকবি মধুসূদন দত্ত। তবু সেই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। সনেট বা ওড রচয়িতা, খণ্ডকবিতা রচয়িতা মধুকবিকে কি অস্বীকার করা যায়? এমনকি তাঁর মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" কি শুধুই এপিকের গাম্ভীর্যে গড়া ভাস্কর্যমাত্র? তার ভিতরে কি নেই অশ্রুজলের রোমান্টিক, লিরিক সুর? নয়টি সর্গের অন্তত কয়েকটি সর্গ কি গীতিকাব্যিক হয়ে ওঠে নি? আর তাঁর চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব নির্মাণ শক্তি দেখে বিস্মিত যতই হই না কেন, অন্তত রাবণ চরিত্রে মধুকবির আত্মপ্রক্ষেপ যে ঘটেছে, তা বুঝে নিতে সহৃদয় পাঠকের দেরি হয় না। সুন্দর প্রসঙ্গে কেন এই লিরিক বা রোমান্টিকতার কথা বলা, কারো মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে। আসলে লিরিক কবি যে আত্মভাষণ রচনা করেন, যে আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত হন, সে তো ঐ সুন্দরকে পেতেই। আর রোমান্টিক যে, সে তো এই চলমান জীবনে ও জগতে কোনো সুষমা, সামঞ্জস্য না পেয়ে বারংবার স্বপ্নপ্রয়াণে আকুল হয়। সেই স্বপ্নই সুন্দরবেশে তাঁকে শান্তি দেয়, আশ্রয় দেয়। আবার সেই সুন্দরের অন্তর্ধানে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কবি আর্তনাদ করে ওঠেন—I fall upon the thorns of life, I bleed. কবি শেলির মতো মধুকবির কণ্ঠেও সেই আর্তি শুনি—'মজিনু বিফল তাপে অবরণ্যে বরি।' অন্যদিকে দৈবাহত শোকার্ত রাবণ বলেন—

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!

এই স্বেচ্ছানির্বাসন ও আত্মবিলাপের মূলে আছে সৌন্দর্য জগৎ থেকে তাঁর বিচ্ছেদ। নঞর্থক ভঙ্গিতে রাবণ যা বলেছেন, তা সেই সৌন্দর্যের ধ্যান—

কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?

তবু অন্ধকারই শেষ কথা নয়; আশ্রয়ও নয়। বাহ্য সম্পদে তিনি ধনবান নন জানেন 'I am not rich' বলেন। ইংরাজি সনেটে স্বীকার করেন—'There is no marble blushing on my floor'. কিন্তু কল্পনা-ধনে তিনি ধনবান। তাঁর মতে সেই তো যথার্থ কবি, কল্পনা-সুন্দরী 'যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন।' কাজেই রাবণের রাজসভা গৃহ চিত্রাঙ্কনে কল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে দেন। বাস্তব জীবনে যা চেয়েছিলেন, যা পান নি, সেইসব অপূর্ণতা ঢেকে দেন। স্বপ্নে, দীর্ঘশ্বাসে, রঙে, রূপে রসোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই রাজসভা :

ভূতলে অতুলসভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে
রতন সম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে! (১ম সর্গ)

একালের সমালোচকের মনে হতেই পারে, "লঙ্কার সভাগৃহটিও কবির তিলোত্তমা সৌন্দর্য-কল্পনার একটি অত্যুজ্জ্বল উদাহরণরূপে আমাদের দুর্লভ-মাণিক্য-দর্শনের অনভিজ্ঞতাপ্রসূত মধ্যবিত্ত হৃদয়ে এক স্বপ্নাতুর দীর্ঘশ্বাসজড়িত স্বর্গীয় জগতের প্রতিবিম্ব সঞ্চার করিয়া যায়।" (মেঘনাদবধ কাব্য/ভূমিকা ও সম্পাদনা : ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অরুণকুমার বসু/ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৭)

এই সুন্দরের সন্ধান মধুসূদন প্রথম করেছিলেন তাঁর "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে। বিশ্বকর্মার অপরূপ সৃষ্টি তিলোত্তমা সৌন্দর্যের সারাৎসার—যাকে পেতে সুন্দ-উপসুন্দ দুই দৈত্য ভ্রাতৃত্ব ভুলে পরস্পরকে সংহারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যে সুন্দর আদর্শ, মহৎ সে চিরকালই অধরা থেকে যায়। তাকে গৃহবন্দী বা তালুবন্দী করা যায় না। পুরাণে যেমন তা সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় তেমনি তা সত্য। নবকুমারও ব্যর্থ হয়েছে পরমা সৌন্দর্যকে মৃণ্ময়ী করতে। রসের স্রোতে যে রঙের খেলনা ভেসে যায় তাকে নিকটে টেনে আনাই মূঢ়তা। তাই তিলোত্তমা শুধু সৌন্দর্য-প্রতিমা, কামনার ধন নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে একালের শিশিরকুমার দাশ পর্যন্ত সকলেই মনে করেন—এই প্রথম শুরু হলো সুন্দরের সন্ধান এবং 'আদর্শ সুন্দরের জন্য দ্বিমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব।'

তবে এমন কোনো মানস-সুন্দরীর বন্দনা আমরা মেঘনাদবধ কাব্যে পাই না। কবির সৌন্দর্য পিপাসা কিংবা সুন্দর-অন্বেষা এক্ষেত্রে ঠিক তাত্ত্বিকভাবে প্রকাশিত হয় নি। কীট্‌সের মতো Truth is Beauty তিনি বলেন না। তাঁর ইংরাজি কবিতায় তাঁর সৌন্দর্যভাবনা এভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

(i) Comest thou as one in beauty's ray
To light the starless gloom
(ii) O. Night! Sweet Night! thy melancholy brow.
Wreath'd with those pensive stars, is beautiful!
(iii) I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be. O.
(iv) Lady! tho beautiful thou art.
Tho' Nature hath gi'en thee ev'ery grace.

বাংলা খণ্ড কিংবা গীতিকবিতায় এই রোমান্টিকতা, সৌন্দর্য ভাবুকতা সেইভাবে পাওয়া যায় না। হতে পারে প্রথম যৌবনের রঙিন উন্মাদনা ইংরাজি কবিতায় ছায়া ফেলেছিল। মহাকাব্য লেখার সময় পরিণত-মনস্ক মধুকবি পরোক্ষে এই সুন্দরের সন্ধান ও বন্দনা করেছেন। যা আবর্তিত, বিকশিত হয়েছে নারী প্রকৃতিকে ঘিরে। কখনো বা রাজসভাগৃহও হয়েছে কবির সৌন্দর্য সন্ধানের আধার। মধুসূদনের সৌন্দর্য সন্ধানের একটি দিক চমৎকার ভাবে নির্দেশ করেছেন অধ্যাপক ড. শিশিরকুমার দাশ। "মধুসূদনের কবিমানস" গ্রন্থে লিখেছেন—

"বাংলাদেশের রোমান্টিক আন্দোলনের নায়ক মধুসূদন। যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য জাতির চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারই প্রকাশ সেখানে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব সেদিনের সাহিত্য চিন্তায়, দর্শনে, সমাজভঙ্গীতে দেখা দিয়েছিল—আধুনিক কাল পর্যন্ত সে ধারাই চলেছে। সেই ব্যক্তিত্ব খুঁজেছে সুন্দরকে, রহস্যময়কে ঐশ্বর্যকে, রাবণের মতো elemental শক্তিকে।"

রবীন্দ্রনাথও মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে ভাবে, ভাষায় ও রচনা প্রণালীতে একটা বিদ্রোহ লক্ষ্য করেছেন। শক্তিমান রাবণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, "যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।"

জীবনটাকে সুন্দর ও সাবলীল করতে মধুসূদন চেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ ও যশ। দুইই পেয়েছিলেন; তবু তাঁর অন্তহীন প্রত্যাশার সঙ্গে তা সেতুবন্ধন ঘটায় নি। অন্তত আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে বারংবার তিনি পীড়িত হয়েছেন। তাঁর সেই ভাঙা স্বপ্নগুলিই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবে যা পান নি, সাহিত্যে তাকেই চরম প্রাপ্তিতে নিয়ে গেছেন। সেই মধুসূদন, যিনি অর্থকষ্টে পীড়িত কিংবা পাওনা মেটাতে না পারায় ফ্রান্সের জেলে যেতে প্রস্তুত, তিনি কলকাতায় এসে স্পেন্সার হোটেলে বিপুল ব্যয়ে থাকেন। তাই মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে গিয়ে তিনি মনোহরা পুরী রচনায় কল্পনার সমস্ত রত্ন নিঃশেষিত করে দেন। রেবেকার বদলে হেন্‌রিয়েটাকে পেয়ে সুখী বলে ঘোষণা করেন। সেই তৃপ্তি বিকীর্ণ হয় কাব্যের সৌন্দর্য সন্দর্শনে। 'কবির চিত্তফুলবন মধু' নিয়ে রচিত হয় মধুচক্র। যদি প্রথম সর্গে মেঘনাদবধ কাব্যের সেই সুন্দরকে আমরা দেখতে চাই, তবে বিস্মিত হয়ে দেখব, মধুকবির সৌন্দর্য-দর্শন ও প্রদর্শনের ব্যগ্রতা কেমন।

১. কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈম শিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।

২. ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা;

৩. কুসুমদাম-সজ্জিত-দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী!

৪. বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!

৫. হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃছটা
তরুরাজী।

৬. সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ়বাঁধে।

বস্তুর বর্ণনায় কবির সৌন্দর্যস্পৃহা এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে শোকার্তা জননী চিত্রাঙ্গদাকে রাজসভায় উপস্থিত করতে গিয়েও সুন্দরের বন্দনা করতে ভোলেন না।—

প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুম রতন হীন বন-সুশোভিনী
লতা। অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!

পূর্ণ/পর্ণ শব্দব্যবহারে যে ছেকানুপ্রাস তৈরি হয়েছে, তাতে দু'ফোঁটা অশ্রু যেন সজীব ও ছলছল করে উঠেছে। প্রথম সর্গে মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানের যে ছবি পাই তাও কবি-কল্পনার মাধুর্যে, সৌন্দর্যে ভরা :

কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্মরিছে পাতা
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।

বীরবাহুর মৃত্যু আর মেঘনাদের অভিষেক বর্ণনায় কবির কাম্য ছিল বীররস; কার্যত রোমান্টিক কবি মৃত্যু ও শৌর্য এড়িয়ে চোখ ফেরালেন সুন্দরের দিকেই।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় রামায়ণ থেকে আহরিত হলেও তা মধুসূদনের অপূর্বনির্মাণ প্রতিভায় শুধু মহাকাব্য নয়, যুগের কাব্যও হয়ে উঠেছে। যা একই সঙ্গে যুগাতীত ব্যঞ্জনাও সৃষ্টি করেছে। তবে আপাতদৃষ্টিতে মেঘনাদ হত্যায় ইন্দ্রের আগ্রহ এবং রাম-লক্ষ্মণের উদ্যোগই এই কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি সেক্ষেত্রে রাম নয় রাবণকে বরণীয় মনে করেছেন। তাঁর কাছে একজন দেশবৈরী, অন্যজন দেশপ্রেমিক; কিন্তু ভাগ্যহত। যেমন মধুসূদন নিজে নিয়তি-লাঞ্ছিত পুরুষ। তাঁর যে সত্তা সেই দৈব বা ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে চায়, তারই নাম মেঘনাদ। কিন্তু তাকেও অকালে অন্যায় ষড়যন্ত্রে মারা যেতে হয়। সেই চক্রান্তের খণ্ডদৃশ্য পাই দ্বিতীয় সর্গে। তাঁর 'ফেভারিট হীরো'কে মারার পরামর্শ বা আয়োজন যেখানে ঘটছে, সেখানেও কবি অকরুণ হতে পারেন নি। এখানেও আছে তাঁর সৌন্দর্য-দর্শন। দ্বিতীয় সর্গের শুরুই হয়েছে দিনাবসানের প্রশান্তিতে—

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতনভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখি পশিল কুলায়ে;

এরপর স্বর্গের সৌন্দর্য বর্ণনা—প্রথাসিদ্ধ। তবে দেবী পার্বতীর মোহিনীবেশ বর্ণনায় কবির সৌন্দর্য উপভোগের পরিচয় পাওয়া যায় —'প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে/নিত্ত বিকচিত ক'রে' যাঁকে দেখে স্বয়ং শিব ধ্যান ভঙ্গ করেন। সেই ধ্যানস্থ শিবের বর্ণনাও কি সুন্দর

দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানহত।

এর তুলনা একমাত্র 'কুমারসম্ভব' কাব্যে নিবাত নিষ্কম্প শিবে পেতে পারি।

শুধু রাজপুরী, স্বর্গপুরী, প্রকৃতি বর্ণনায় নয়, বীরমূর্তি বর্ণনায়ও মধুসূদন তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞান বিসর্জন দিতে পারেন নি। তৃতীয় সর্গে বীরাঙ্গনা প্রমীলা মূর্তি তারই দৃষ্টান্ত।

রোষে লাজ-ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বরী শিরে,
ইন্দ্রচাপ।.............
চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি শিখা!

বীরাঙ্গনারূপে যদি আমরা চমকিত, ভীত হই, তবে চতুর্থ সর্গে শোককর্ষিতা সীতার বিষাদিনীরূপে আমরা অন্য এক সৌন্দর্যের আভাস পাই।—

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে!

মধুকবির বাঙালিয়ানা তাঁর সৌন্দর্য চেতনায় কতখানি মিশেছিল, তাও বোঝা যায় এই চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার রূপ বর্ণনায়।

আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ।

বনবাস রাজ্য সুখভোগ অপেক্ষা কত ভালো, তা সীতার "ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে" ইত্যাদি বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। আরণ্যক জীবনযাত্রার অপূর্ব ছবি কবি এঁকেছেন, যা পড়তে গিয়ে শকুন্তলার কথা মনে পড়ে—

কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ;

চতুর্থ সর্গ পাঠশেষে পাঠকের মনে ও চোখে বিদ্ধ হয়ে থাকে সেই বিষাদময়ী, শোকাকুলা, স্মৃতিভারমন্থরা সীতার রূপ—'একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।'

ষষ্ঠ সর্গ এই কাব্যের চরম পর্যায়, যা লিখতে মধুসূদনকে অনেক চোখের জল ব্যয় করতে হয়েছে। বীরের মতো যুদ্ধ করে বীরের মতো ভূমিশয্যা নিয়েছে মেঘনাদ। এই অংশটি সত্যই 'হিরোয়িক্যালি টোল্ড'। কিন্তু রণ-রক্ত-অস্ত্র ঝংকারে এই সর্গ এই মৃত্যু অসহ্য হয়ে ওঠে নি। বরং কারুণ্যে, প্রেমে বিধুর হয়েছে। এও এক সৌন্দর্য—যা আনন্দ দেয় না, কিন্তু জাগিয়ে রাখে; অনুভবের সূক্ষ্মতন্তুকে বিদ্ধ করে—

লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

এই প্রয়াণচিত্র কি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপুর ছেড়ে মথুরা যাওয়ার চেয়ে মর্মান্তিক নয়? তাই তো সপ্তম সর্গে প্রিয়পুত্রের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুসংবাদে রাবণ হতচেতন হন। অজ্ঞাত ব্যাধের শরে নিহত সিংহের সঙ্গে তাঁকে কবি উপমিত করেন। আর তারপরই পুত্রহন্তার বিরুদ্ধে পিতা ও রাজা রাবণ যুদ্ধ ঘোষণা করেন :

রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!

না ভোলা যায় না। দৈবাহত রাবণ স্ত্রীকে, সৈন্যদলকে তাই খিন্নকণ্ঠে বলেন :

কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিণু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি, তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুকবির unlocked Heart-এর ছবিও এইরকম—

হৃদয় কাননে,
কতশত আশালতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা' কারে, কব তা' কেমনে! (নূতন বৎসর)

এই শোক, হতাশা ও বিষাদের পথ বেয়ে রচিত হয় নবম সর্গ। যুদ্ধশেষ; লক্ষ্মণের শোকে রাম মুহ্যমান। মৃতপুত্রের সৎকারের জন্য পিতা রাবণ ব্যস্ত। পুত্রবধূ প্রমীলা সহমৃতা হতে প্রস্তুত। এই হলো নবম সর্গ। যেখানে চোখের জল ও কষ্ট ছাড়া কিছু নেই। তবু শ্মশানযাত্রী প্রমীলার বেশভূষা বর্ণনায় কবি কুণ্ঠিত হন নি। একই চিতায় পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখে রাবণ হাহাকার করে ওঠেন—

হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

এরপর চিতা জ্বলে ওঠে। সাঙ্গ হয় দাহকার্য। ঘরে ফেরে লঙ্কাবাসী। কবিও।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

সুন্দর এখানে বহ্নিমান্; সুন্দর এখানে অনুধ্যেয়।

মধুসূদনের সৌন্দর্যচেতনা শুধু বর্ণনায় কিংবা চরিত্র-সৃজনে অভিব্যক্ত নয়, তার প্রকাশ তাঁর শব্দচয়নে, অলঙ্কার প্রয়োগে বা চিত্রকল্প রচনায়। সংস্কৃত, তৎসম কিংবা আভিধানিক শব্দ প্রয়োগে তাঁর আগ্রহ কেবল লোকদেখানো নয়। এখানে তাঁর শব্দরুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে তিনি পাঠককে সচেতন করেছেন। যেমন, "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের শুরুতে 'ধবল না যেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে' পংক্তিতে 'হিমাদ্রি'র পূর্বে 'হিমাচল' লিখেছিলেন। কিন্তু ধ্বনিগাম্ভীর্য বজায় রাখতে 'হিমাদ্রি' বসিয়েছেন। জীবনানন্দর যেমন ড্যাশ-চিহ্নে প্রীতি দেখি, মধুসূদনে তেমনি বিসর্গপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

১. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ।
২. যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে
৩. নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা

শোক, বেদনা, ব্যঙ্গ সবই এই বিসর্গের ধাক্কায় মঞ্জরিত হয়। বিকল্প শব্দ বা নতুন শব্দনির্মাণে তিনি ক্লান্তিহীন ছিলেন। বরুণানীর বদলে বারুণী, লক্ষ্মণের বদলে ঊর্মিলাবিলাসী, রাবণের পরিবর্তে নৈকষেয়, জটাধারী শিবকে কপর্দ্দী ইত্যাদি বলায় তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। যেমন অনুপ্রাসের লোভে ও ধ্বনি গাম্ভীর্য রাখতে লেখেন— 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে'। তাঁর লেখনীতে অনায়াসে লেখা হয়—ইরম্মদ, কোদণ্ড, কলম্ব, হর্যক্ষ, কঞ্চুক, মলম্বা, গরুত্মতী, কর্বুর ইত্যাদি। এগুলি কষ্টকল্পিত বা চয়িত নয়। কবি নিজেই বলেছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শব্দাবলী তিনি পান। (তাঁর পত্রাংশ—The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew.) বিশেষণে বাক্‌সৌন্দর্য নির্মাণ করেন এভাবে—কেশববাসনা (লক্ষ্মীদেবী), রাক্ষসকুলভরসা (মেঘনাদ), পাবকশিখারূপিণী জানকী, দ্বিরদগামিনী, লঙ্কার পঙ্কজ রবি ইত্যাদি। এসবই এক রোমান্টিক কবির শব্দপ্রীতি, শব্দরুচি ও সৌকর্যজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। একালের সমালোচক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, নায়ক নির্বাচনে বিশেষণ ব্যবহারে কবি কত সতর্ক।

"কবি তাঁহার কাব্য-নায়কের ক্ষেত্রে 'রাক্ষসভরসা' এবং তাঁহার নিধনকারীকে 'ঊর্মিলা-বিলাসী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—অর্থাৎ কাব্য সূচনাতেই বলিয়া দেওয়া হইল, একজন বীরযোদ্ধা, আর একজন প্রেমিকমাত্র।" (অরুণকুমার বসু/ তদেব)

উপমা, চিত্রকল্প রচনায় কাব্যকে তিনি সুন্দরের কণ্ঠমালা ক'রে তুলেছেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আমরা পাতার পর পাতা পড়ে যেতে পারি; দেখে যেতে পারি শব্দচিত্রমালা; তুলনার অপরূপত্ব।

১. যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে।
২. উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী!
৩. নয়ন-রমণীরূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা!
৪. শোকের ঝড় বহিল সভাতে।.....
মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার।

৫. পর্বত গৃহছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
৬. কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্য কাণ্ডে যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন অন্তে।
৭. কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!

প্রথমে শব্দচিত্রে, উপমায় রাবণের নিঃশক্তি ও নিঃসহায় রূপ ফুটে উঠেছে। পরে এসেছে চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত রূপ; প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তি আর মেঘনাদহীন লঙ্কার হতশ্রী রূপ—যা কৈলাসে শিবের ক্রোধ-ক্ষোভের হেতু হয়েছে। সবই মধুসূদন সুনির্বাচিত শব্দে, উপমায়, কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা এনেছে গতি, বেগের সৌন্দর্য। মেঘনাদবধ কাব্য পাঠে একালের পাঠক নিশ্চয় অতীতচারী হবেন না; কিংবা সিদ্ধরস বিচারে প্রবৃত্ত হবেন না। তিনি দেখবেন কবিপ্রতিভার শক্তি ও সৌন্দর্য। পৌরাণিক চরিত্র, কাহিনী প্রায় সার্ধশতবর্ষের প্রান্তে এসে কেমন জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, আমরা তাই দেখি। এই প্রাণশক্তির মূলে হয়ত অনেক কিছুই আছে; কিন্তু কবির রোমান্টিকতা, সুন্দরের ধ্যান যে শেষপর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠেছে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ❑

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাশৈলী

মঞ্জুলা বেরা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য হিসাবে বিবেচিত। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে দু'খণ্ডে এই কাব্যটি প্রকাশিত হয়। প্রাচ্যের মহাকাব্য রামায়ণের একটি বিশেষ ও ক্ষুদ্র অংশ এই কাব্যের মূল বিষয়। রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক লঙ্কারাজ রাবণের পুত্র মেঘনাদ নিধনই এর মুখ্য কাহিনী। রাক্ষসকুলভরসা-দেবত্রাস-ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে হত না হলে রাক্ষসরাজ রাবণকে রণভূমিতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মেঘনাদবধের প্রস্তুতি-পর্বে দেবকুলের সমস্ত দেবদেবীই পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মায়াদেবীর সহায়তায় লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হয়েছেন। এই কাহিনীতে একথা স্পষ্ট যে মধুসূদন দেবতাদের হেয় করে রাক্ষসকুলের রাবণ-মেঘনাদ প্রমুখকে অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। এতে অলঙ্কার শাস্ত্র মতে মহাকাব্যের গুণ কতখানি রক্ষিত হয়েছে সেদিকে কবি বেশি গুরুত্ব দেন নি। একথা ঠিক যে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ বা অ্যারিস্টটল মহাকাব্য সম্পর্কে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তার অনেক কিছুই এই কাব্যে লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার বেশ কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ বা পারোক্ষ ভাবনায় গৃহীত হয়েছে। তাই অনেক সমালোচকই কাব্যটিকে মৌলিক মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে মহাকাব্যের প্রকৃতি নিয়ে যেমন সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়, তেমনি কাব্যের ভাষা নিয়েও বিভিন্ন মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, শ্রুতিকটু ও দুরূহ আভিধানিক শব্দের বহুলতা, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, উপমার বহুল ব্যবহার, বাক্যগঠনে সরলতার অভাব, ক্রিয়াপদ গঠনে স্বেচ্ছাচারিতা, নামধাতুর প্রতুলতা, ব্যাকরণ না মানা, সাধু ও চলিতের একত্রে অবস্থান ইত্যাদি বহুবিধ অভিযোগ। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাব্যটিতে ছন্দ যেমন নতুন রূপ পেয়েছে, তেমনি কাব্যভাষাতেও নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। কবি মধুসূদন তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টিতে পূর্বসূরিদের কোনো ভাষাশৈলীকে গ্রহণ করেন নি। নিজের সৃষ্টির আনন্দেই ভাষাকে তৈরি করে নিয়েছেন। মহাকাব্যের বিস্তৃতি-বিশালতা, ওজস্বিতা-উদাত্ততা সৃষ্টিতে ভাষার কারণে তিনি কোনোরূপ অন্তরায় বোধ করেননি। শব্দচয়নে, শব্দনির্মাণে, বাক্যে শব্দের সংস্থাপনে, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে অনুপ্রাস গঠনে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তি প্রয়োগে, ব্যঞ্জনা-চিত্রকল্প গঠনে, চরিত্র অনুযায়ী বিশেষণ আরোপে মধুসূদন অভিনবত্ব এনেছেন। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা তৎকালীন সমস্ত সাহিত্যের ভাষা থেকে পৃথক। আসলে কবি তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমন্বিত ভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজ মনঃপ্রকৃতি অনুযায়ী শব্দ সংস্থাপিত করে ভাবের উপযুক্ত ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। সে ভাষা ব্যাকরণ-অনুসারী হতে পারে, নাও হতে পারে। এই অশ্রুত-অজ্ঞাত ভাষাকে সমালোচকেরা ভাল চোখে দেখেন নি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কবি এই কাব্যে অপ্রচলিত দুরূহ-শ্রুতিকটু শব্দযুক্ত ভাষার মাধ্যমে মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ভাব ও বীররসের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাই নানা ত্রুটি সত্ত্বেও কাব্যটি অনেক পাঠক ও সমালোচকের কাছে গৃহীত হয়েছে। এখন কাব্যটি থেকে ভাষার নিদর্শন তুলে ধরে কবির ভাষাগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

একথা বলাই বাহুল্য যে, মেঘনাদবধ-কাব্য সম্পর্কে সমালোচকরা যে ত্রুটির কথা বলেছেন অর্থাৎ শ্রুতিকটু-দুরূহ-অপ্রচলিত-ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ—এগুলি সত্য, কিন্তু এগুলি প্রয়োগের পিছনে কবির যে গভীর ধ্যান কাজ করেছিল তা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অভ্যস্ত চিন্তার পরিপন্থী

হওয়ায় বাহ্যিক ত্রুটি খুব দ্রুত ধরা পড়েছে। এই ত্রুটিগুলিই যে মহাকাব্যিক প্রকৃতি সৃষ্টিতে মূল অস্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা সহজে বোঝা যায় না। কাব্যটির মূল বিষয়ের গভীরে যত প্রবেশ করা যায় ততই তার অন্তর্রূপের ঐশ্বর্য ধরা পড়ে। প্রথমেই আলোচনায় আনা যাক শব্দচয়ন শব্দনির্মাণে কবির প্রবণতা এবং সেই শব্দের প্রায়োগিক নৈপুণ্যের মাধ্যমে বিশেষ মহাকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পরিচয়। কবি সংস্কৃত-তৎসম-যুক্তব্যঞ্জন সমন্বিত---দুরূহ-অপ্রচলিত-অব্যবহৃত শব্দের চয়নেই বেশি আগ্রহী। যেমন, বৃক্ষশোভা, শৃঙ্গবর, হৈমশিরে, জলধির কল্লোল, বিদ্যুৎঝলা, প্রভঞ্জনবৈরী, শিমূলশিম্বী, নিস্তেজাঃ, কেশরীপৃষ্ঠ, কুজ্ঝটিকা, শূন্যদেশভবাবাণী, রথীন্দ্রর্ষভ, বারণযূথ, খদ্যোতিকাদ্যোতি, আখণ্ডল ধনুঃ, পিককুলেশ্বরী, রক্ষোরাজ-রাজগৃহ, কর্বুরোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, ধূম্রাক্ষ রত্নাতিকরাজি, 'গরুত্মান' ইত্যাদি। তাছাড়া ইরম্মদ, কৌমুদিনী, কামধুক, পদ্মপর্ণ, নায়কী, রূপস, ভবিতব্য-দ্বার, মঞ্জুনাশিনী ইত্যাদি বহু ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তবে শব্দগুলির অন্তর্নিহিত ভাব-মাধুর্য এভাবে বাক্যের পদসমন্বয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি শব্দ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়ের সঙ্গে একীভূত হলে তবেই শব্দগুলির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। শব্দনির্মাণেও লক্ষ্য করা যায় কবির বিশেষ প্রবণতা। যদিও শব্দগঠনের প্রচলিত রীতিকেই অর্থাৎ সন্ধি-সমাস প্রত্যয় দ্বারা শব্দগঠনের রীতিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন তথাপি নিজস্বতা--স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, শরশয্যোপরি (শরশয্যা + উপরি), চরণারবিন্দ (চরণ + অরবিন্দ), শৃঙ্গধরোপরি (শৃঙ্গধর + উপরি), দশরথাত্মজ (দশরথ + আত্মজ), মেঘবরাসনে (মেঘবর + আসনে), জলদলেশ্বরী (জলদল + ঈশ্বরী), দেবদোলোৎসববাদ্য, হরকোপানলে, বিনতানন্দনাত্মজ, বেশভূষাসক্তা ইত্যাদি সন্ধিযুক্ত শব্দ যে প্রচলিত ধারা থেকে পৃথক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার শব্দনির্মাণ কৌশলে আর একটি অভিনবত্ব হল---পরপর দুই বা ততোধিক শব্দকে বসিয়ে বিশেষ ভাবপ্রশাসক একটি শব্দগুচ্ছ হিসাবে গঠন করা। যেমন, রাক্ষস-কুল-রক্ষণ, দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রক্ষঃ-কুল-হর্যক্ষ, দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা, রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, সুধাকর-কর-জাল, হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল, কর্বুর-গৌরব-রবি ইত্যাদি। আর একটি লক্ষণীয় শব্দনির্মাণ কৌশল হল বিভিন্ন চরিত্র, বস্তু ও স্থানের বিশেষণ সৃষ্টিতে--- যেমন, ঊর্মিলাবিলাসী, সতীসুমিত্রাসুত, বৈদেহীবিলাসী, বৈদেহীরঞ্জন, মিথিলানাথ, দশরথাত্মজ, বৈদেহীহর, মন্দোদরী-মনোহর, রক্ষোরাজানুজ, রাবণানুজ, রাক্ষসকুলকলঙ্ক, দশাননাত্মজ, অসুরারি-রিপু, লঙ্কার পঙ্কজরবি ইত্যাদি বিশেষণগুলি লক্ষ্মণ, রাম, রাবণ, বিভীষণ, মেঘনাদ চরিত্র সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এভাবে বিশেষণ প্রয়োগ পূর্বে দেখা যায়নি। পিতা বা মাতার নাম অনুযায়ী রাবণি, নৈকষেয়, সৌমিত্রী ইত্যাদি অপত্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া বিশেষণগুলির থেকে ঊর্মিলাবিলাসী, বৈদেহীরঞ্জন, মন্দোদরী-মনোহর, দশরথাত্মজ, দশাননাত্মজ ইত্যাদি বিশেষণগুলি যে প্রচলিত সমস্ত ধারাব পরিপন্থী ও কবির একেবারে নিজস্ব মনোপ্রকৃতি অনুযায়ী নির্মিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে মধুসূদনের শব্দচয়ন ও শব্দনির্মাণের বিশিষ্টতার পরিচয় বাক্যের মধ্যস্থিত পদসমন্বয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া সম্ভব নয়। কাব্যের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে ভাবপ্রকাশের সহায়ক হিসাবে শব্দগুলি প্রয়োগের যাথার্থ্য বিচার করতে হবে। মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য-ওজস্বিতা-উদাত্ততা-বিশালতা প্রকাশে সমালোচকের দৃষ্টিতে ত্রুটিযুক্ত শব্দগুলি কতখানি উপযুক্ত হয়ে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করা যাক্। যেমন :

> সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর-চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে

অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসকুলভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?

এই অংশটি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আরম্ভ অংশ। এখানে প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও শ্রুতিপথে অনুরণন তোলে তা হল চরিত্রের বিশেষণ। রাবণপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাক্ষসরাজ সেনাপতি পদে বরণ করে মেঘনাদকে পাঠিয়েছেন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ হত হয়েছেন। কিন্তু লঙ্কারাজ রাবণ কীভাবে মেঘনাদকে সেনাপতি হিসাবে রণে পাঠিয়েছিলেন এবং কেমন করেই বা লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল সেই অভাবনীয় কাহিনীটি শোনার জন্য কবি মধুসূদন দেবী সরস্বতীকে আবাহন করেছেন। এই আবাহন পাশ্চাত্যের অনুসারী। বাক্যবিস্তার কৌশল এবং অন্ত্যমিল ভেঙে দিয়ে ভাব-অনুযায়ী ছেদ, যতির প্রয়োগ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে যেভাবে দেবীকে আবাহন করলেন তা মহাকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তুলেছে। কাব্যের শুরুতেই চরিত্র ভিত্তিক বিশেষণগুলি মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ভাবকে ব্যক্ত করেছে। রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র বীরবাহু 'বীরচূড়ামণি' এবং রাবণ প্রকৃত অর্থে 'রক্ষঃকুলনিধি' আবার রাঘব অর্থাৎ রামচন্দ্রের শত্রু তাই 'রাঘবারি'। রাবণ ও মন্দোদরী পুত্র মেঘনাদ 'রাক্ষসকুলভরসা', তিনি 'ইন্দ্রজিৎ' ও 'অজেয় জগতে'; এমন একজন বীরশ্রেষ্ঠকে 'ঊর্মিলাবিলাসী' লক্ষ্মণ কীভাবে বিনাশ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে আশঙ্কামুক্ত করতে সক্ষম হলেন? দুটি প্রশ্নবোধক বাক্যের মধ্য দিয়ে যে বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে তার দ্বারা মহাকাব্যের বিশালরস কাব্যের প্রথমেই সৃষ্টি হয়েছে। আর দেবী সরস্বতীকে তিনি 'অমৃতভাষিণি' বলে সম্বোধন জানিয়েছেন। প্রতিটি বিশেষণ যে গতানুগতিক, পূর্ব প্রচলিত ধারাকে বর্জন করে বিষয়ের গুরু-গম্ভীর ভাবকে ব্যক্ত করতে ব্যবহৃত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিশেষণ প্রয়োগে কত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা কয়েকটি নিদর্শন থেকে বুঝে নেওয়া যায়।

অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর; —"কহরে সন্দেশ
কহ, কহ শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?" (প্রথম সর্গ)

এখানে 'মন্দোদরীমনোহর' রাবণ, 'দশাননাত্মজ' বীরবাহু এবং 'দশরথাত্মজ' রামচন্দ্র ব্যতিক্রমী বিশেষণের পরিচায়ক। এরূপ অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা যায়। দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীদের নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। লক্ষ্মীদেবী 'উপেন্দ্রপ্রিয়া পদ্মাক্ষী' 'পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী', শচীদেবী 'পুলোম-নন্দিনী', ইন্দ্র 'স্বরীশ্বর', (স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গ), শিব 'ত্র্যম্বক' [ত্রি অম্বক (নেত্র)] 'বৃষধ্বজ' 'বিরূপাক্ষ', উমা 'ভবেশ-ভাবিনী 'হর'-প্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণগুলি যে দেবদেবীর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও পিতা-মাতা-স্বামী-স্ত্রী দ্বারা সম্পর্কিত পরিচয়ের সাহায্যে সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই সমস্ত গুরুগম্ভীর ও ওজস্বীপূর্ণ ভাষা মহাকাব্যিক বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া স্বর্ণলঙ্কাকে 'বীরপুত্রধারী এ কনকপুরী' বা 'বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা', সমুদ্রকে 'চিরকোলাহলময় পয়োনিধি' রূপে বিশেষিত করার মধ্যেও ভাবের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে এবং মহাকাব্যের ভাবনার অনুসারী হয়ে উঠেছে।

কবির শব্দ নির্মাণের নতুন কৌশলে পাঠক সচকিত হয়। অপ্রচলিত-অশ্রুত শব্দ প্রথমে শ্রুতিপথে ধাক্কা খেলেও বিষয়ের সঙ্গে একীভূত করে অনুধাবন করলে শব্দগুলির ঐশ্বর্যগুণ ধরা পড়ে। যেমন :

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহী হর: (প্রথম সর্গ)

এই অংশে 'রাক্ষসেশ্বর', 'অস্ত্রীদল', 'শৃঙ্গধরোপরি', 'বৈদেহীহর' শব্দগুলির বিশেষত্ব ও ওজস্বীগুণ ধরা পড়ে। বীরবাহুর মৃত্যু রাবণকে শোকাকুল করে তুললেও বীর 'বৈদেহীহর' (বৈদেহী অর্থাৎ সীতা হরণকারী) রাবণ যুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি জানতে অধিক আগ্রহী। 'সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,/ হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে/ মহাসুর'—মেঘনাদের বীরশ্রেষ্ঠ ভাব প্রকাশ করতে 'রথীন্দ্রর্ষভ' ও 'বীর-আভরণ' শব্দদুটির প্রয়োগ মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে। শব্দনির্মাণের আরো কিছু মৌলিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। যেমন, উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু:/ কি ছার সে নর তারে ডরাও আপনি,/ রাজেন্দ্র?' —এখানে 'অসুরারি-রিপু' বলতে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে। অসুরের শত্রু ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের শত্রু মেঘনাদ। তাই 'অরি' ও 'রিপু' এই দুটি 'শত্রু'র প্রতিশব্দ ব্যবহার করে মেঘনাদের পরিচয় দেওয়ার মধ্যে চরিত্রগত ওজস্বীগুণ প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ শব্দগঠন ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পূর্বে বিরল। কাব্যে বিভিন্ন শব্দ কত বিচিত্র অর্থগৌরব নিয়ে সৃষ্ট তা আমাদের বিস্মিত করে। এগুলি যে আসলে মহাকাব্যের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করতে ব্যবহৃত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয় সর্গের 'উত্তরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে/ বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,/ হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী/ চারুনেত্রা। ..../ বাজিল চৌদিকে/ ত্রিদিব-বাদিত্র।' ---এই অংশে 'ত্রিদশ-আলয়' 'ত্রিদিব-বাদিত্র' ও 'পুলোম-নন্দিনী' অপ্রচলিত শব্দ। দেবতারা শুধু বাল্য, কৈশোর ও যৌবন দশা প্রাপ্ত হন বলে 'ত্রিদশ' বলা হয়; আর 'ত্রিদশ' যেখানে থাকেন তা 'ত্রিদশ-আলয়' অর্থাৎ স্বর্গ। আবার যেহেতু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন দেবতার আনন্দময় বাসস্থান স্বর্গ তাই স্বর্গকে 'ত্রিদিব' বলা হয়, 'বাদিত্র' অর্থ বাদ্য অর্থাৎ 'ত্রিদিব-বাদিত্র' হল স্বর্গীয় বাদ্য। 'পুলোম-নন্দিনী' হলেন ইন্দ্রের পত্নী শচী। শচী হলেন পুলোমা (পুলোমন্) নামক দানবের কন্যা। পুলোমাকে বধ করে ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন। পুলোমার কন্যা তাই শচী 'পুলোম-নন্দিনী'। এরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত কাব্যটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

কাব্যটিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন সমন্বিত ভাষার প্রয়োগ যে অধিক তা স্বীকার করে নিতে হয়। কাব্যের প্রায় প্রতি পংক্তির মধ্যে একটি-দুটি করে যুক্তব্যঞ্জন সমন্বিত শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে। তবে যেখানে এই ধরনের শব্দের আধিক্য এবং আধিক্যের কারণে পরিবেশ ভয়ঙ্কর ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে সেই উদাহরণগুলি তুলে ধরলে এ সম্পর্কে সমালোচকের অভিযোগ ও কবির অভিপ্রায় দুটিই অনুভব করা যাবে। যেমন, বীরবাহুর সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা তুলে ধরা যাক্ :

'অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ

নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে!' (প্রথম সর্গ)

এখানে আটটি পংক্তিতে একুশটি যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনি ও পনেরটি যুক্তব্যঞ্জনসমন্বিত শব্দ রয়েছে। কিন্তু এই আধিক্য অকারণ মনে হয় না। দুই বীর যোদ্ধার রণ কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তারাকাপে তারই ছবি ফুটে উঠেছে। মহাকাব্যের পক্ষে এটি একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয় সর্গে মেঘনাদপত্নী প্রমীলার প্রমোদকানন থেকে লঙ্কাপুরে প্রবেশের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে যুক্তব্যঞ্জনের ঝঙ্কার ও অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের ফলে বীরভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রটি এরূপ :

'...... .... উত্তরিলা
নারীদেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;---
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে। ঝক ঝক ঝকি
কাঞ্চন কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, উর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলা,
ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।

দানবনন্দিনী ও মেঘনাদপত্নী প্রমীলা রোষাবেশে স্বর্ণলঙ্কায় চেড়ীবৃন্দের মাঝে প্রবেশ করলে যেভাবে রণতূর্য বেজে ওঠে ও অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হয় তাতে রণের ভয়ঙ্করতা ফুটে উঠেছে।

অপ্রচলিত যুক্তব্যঞ্জন সমন্বিত ও গুরুগম্ভীরনাদযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে মহাকাব্যের দীপ্তি বা ওজঃগুণ বিভিন্ন বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, শিবের সঙ্গে লক্ষ্মণের সাক্ষাতের বর্ণনা পঞ্চম সর্গে----

কতক্ষণে উত্তরিয়া উদ্যান দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ দর্শন মূর্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষসম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে।

এখানে শিবের ভোলানাথ বা ভিখারি রূপ নয়; বিশাল ও ভীষণ আকৃতি, মহাসর্পের ললাটে উজ্জ্বল মণির ন্যায় লক্ষ্মণ-দৃষ্ট ভীষণ দর্শন মূর্তির কপালে চন্দ্রকলা, শিরে জটাজুট, তার মাঝে জাহ্নবীর ফেনপুঞ্জ যেন শরৎকালের রাত্রিতে মেঘের মধ্যে শুভ্র জোৎস্না, অঙ্গে বিভূতি অর্থাৎ ভস্মমাখা দেহ,

হস্তে ত্রিশূল—শিবের এই মূর্তি ভীষণতার প্রতীক। এখানে কবি শিবের শান্ত সমাহিত মঙ্গলময় মূর্তি আঁকেননি; কারণ নিজ পরম ভক্তকে, যিনি অমিত তেজা, নিষ্কলঙ্ক, তাঁকে যখন পিতার পাপের কারণে মৃত্যুর বিধান দিতে হয় তখন ভীষণতার মূর্তিই প্রকাশ পায়। কবি তাই লক্ষ্মণকে শিবের রুদ্র মূর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন।

কবি অপ্রচলিত শব্দের মাধ্যমে বর্ণনার গৌরব ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে মহাকাব্যের বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসকে প্রকাশ করেছেন। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদকে নিধন করতে লক্ষণ ও বিভীষণ মায়ার প্রভাবে অদৃশ্যভাবে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করে স্বর্ণলঙ্কার রক্ষণভাগকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই বর্ণনাটি নেওয়া যেতে পারে :

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভূকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়ণধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ়; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর অরি, গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয় বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত, চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম;—
আর আর মহাবলী দেবদৈত্য নর
চিরত্রাস!

বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর প্রভৃতি রাক্ষস সেনানীদের নাম উল্লেখ করে এবং লৌহাস্ত্রধারীকে 'প্রক্ষেবড়ণধারী', রথে আরূঢ় রথীকে 'স্যন্দনারূঢ়' শত্রুদের পক্ষে যমস্বরূপ অর্থে 'রিপুকুল কাল', দীর্ঘাকৃতি বোঝাতে 'তালবৃক্ষাকৃতি' শব্দগুলি ব্যবহার করে বর্ণনায় ভীষণতা ও গাম্ভীর্যকে প্রকাশ করেছেন যা মহাকাব্যের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে শব্দগুলি কণ্ঠোচ্চারিত অশ্রুত অপ্রচলিত বলে মনে হবে, কিন্তু বিশেষ পরিবেশ বর্ণনায় তা শব্দ-সংস্থাপনের উপযুক্ততাকেই প্রকাশ করেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাব্যভাষার মধ্যে আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে 'ঈনী' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের প্রাধান্য। যেখানে শুধু 'ঈ' বা 'ই' প্রত্যয়যুক্ত করলেই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হতে পারে সেখানে অহেতুক 'ঈনী' প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসৃষ্টি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। এখানে কবির এই ধরনের শব্দ প্রয়োগের প্রাধান্যে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। যেমন, 'বীরবাহু-শোকে/ বিবশা রাজমহিষী; বিহঙ্গিনী যথা,/ যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া/ শাবকে' (১ম সর্গ), 'উর্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,/ চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি/ নাচিলা শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব কুল মনঃ।' (২য় সর্গ), 'তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী/ শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।' (২য় সর্গ), 'ওই দেখ; আইল লো তিমির যামিনী,/ কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে/ বাসন্তি!' (৩য় সর্গ), 'নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,/ মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে।' (৩য় সর্গ) ইত্যাদি পংক্তিতে বিহঙ্গিনী, সুকেশিনী, মঞ্জুনাশিনী, ভুজঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী শব্দগুলি ছাড়াও আরো অনেক 'ঈনী' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ব্যবহার আছে।

তাছাড়া কবি মধুসূদন এই কাব্যে শব্দগঠনে নানান বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন বহুত্ববাচক শব্দের ক্ষেত্রে আবলী, যূথ, রাজি, দল, পাল, বৃন্দ, রাশি, কুল, শ্রেণী, মালা, দাম, পুঞ্জ ইত্যাদি পদ যুক্ত করে

বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের বহুত্ব প্রকাশের উপযুক্ত রূপ দিয়েছেন। যেমন, 'শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে/ সরস কমলকুল বিকশিত যথা/ শ্বেত, রক্ত, নীল পীতস্তম্ভ সারি সারি' (১ম সর্গ), 'বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে/ একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে/ নাশে বৃক্ষে,' (১ম সর্গ), 'মদকল করী যথা পশে নলবনে,/ পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে/ধনুর্ধর' (১ম সর্গ), 'পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ/ রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।' (১ম সর্গ), 'ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম/ ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে/ অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে।' (১ম সর্গ), 'মেঘশ্রেণী যেন/ অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা/ দৃঢ় বাঁধে!' (১ম সর্গ), 'মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু; (১ম সর্গ), ইত্যাদি। এক একটি বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুত্ববাচক পদ যুক্ত করায় বিষয়ের গৌরব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমন ভাষার ঐশ্বর্যও সৃষ্টি হয়েছে। এতে মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি এসেছে।

আবার মেঘনাদবধ কাব্যের মূল পটভূমিকা 'কাল সমর', তাই সেখানে বীরভাবনা ও রণশ্রেষ্ঠভাবনা মুখ্য বিষয় হবে এটাই স্বাভাবিক। কবি মুখ্য চরিত্রগুলির বীরত্ব ও রণনিপুণতা বোঝাতে বারে বারে 'বীর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি বীরবাহু', 'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে', 'পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে, ধনুর্ধর।' 'কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে সংগ্রামে?' 'ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী', 'মণিময় কিরীট, শীর্ষক, আর' বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।', 'রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে। এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,' (৬ষ্ঠ সর্গ), 'কহিলা লক্ষ্মণ শূরে, 'বীরকুলগ্লানি, সুমিত্রানন্দন, তুই!' ইত্যাদি পংক্তিতে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং মহাকাব্যিক বীররস সৃষ্টি হয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাব্যভাষা সম্পর্কে সমালোচকদের অভিযোগ যে এতে বাক্যে সরলতার অভাব আছে। এক্ষেত্রেও প্রথমেই অভিযোগ স্বীকার করে নিতে হয়, কারণ কাব্যটিতে সরল বাক্যের স্থান নেই। একাধিক বা ততোধিক বক্তব্যকে একাধিক সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ বাক্যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। সবক্ষেত্রে তা শ্রুতিমধুর বা সুসংগঠিত হয়েছে তা নয়; তবে মহাকাব্যিক ভাবনার প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রেই তা সুপ্রযুক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, কাব্যের শুরুতেই যে জটিল ও প্রশ্নবোধক বাক্যটি পাই তার আঙ্গিক লক্ষ্যণীয় :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি
রাঘবারি?

মোট পাঁচটি বক্তব্যকে পাঁচটি বাক্যে সাজিয়ে প্রতিটি চরিত্রে উপযুক্ত বিশেষণ যুক্ত করে এবং চরিত্রগুলি উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করে যে মূল কথাটি প্রকাশ পেল তাতে সরলতার অভাবের অভিযোগ থাকে না, বরং এই ভাবনা প্রকাশের জটিলতাই মহাকাব্যের বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছে। অথবা বীরবাহুর মৃত্যুতে মাতা চিত্রাঙ্গদা রাজসভাতলে এসে যেভাবে রাবণকে শোকাকুলতা প্রকাশ করেছেন—

একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি

কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী।

এখানেও বাক্য জটিল হলেও উপমা যুক্ত হয়ে বক্তব্যে স্পষ্টতা এসেছে এবং পুত্র শোকাতুরা মায়ের হৃদয় পরিস্ফুট হয়েছে। একথা বলাই বাহুল্য যে কাব্যটির মধ্যে উপমার আধিক্য বাক্যে জটিলতা এনেছে, আবার এই উপমাই জটিলতার মধ্য থেকে মূল বক্তব্যে স্পষ্টতা এনেছে এবং এর মাধ্যমে মহাকাব্যের গম্ভীর, তেজস্বী, দীপ্তিময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দেবী পার্বতী যখন কৈলাস শিখরে ধ্যানরত শিবের কাছে পৌঁছান মেঘনাদ নিধনের অনুমতি আদায়ের জন্য তখন সেই শিখরে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেটি এরকম—

অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জলকান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে: পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে! (২য় সর্গ)

এবং দেবীর আদেশে ধ্যানরত শিবকে ধ্যানভঙ্গ করতে মদন ফুল-শর নিক্ষেপ করলে শিবের যে রূপ লক্ষ্য করা যায়—

শিহরিলা শূলপাণি! নড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানির বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলি ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!

এই দুটি দৃষ্টান্তেই একথা স্পষ্ট যে উপমার প্রয়োগ বাক্যের জটিল রূপ সৃষ্টি করেছে এবং এই উপমার সাহায্যেই কৈলাশের পরিবেশ ও শিব চরিত্রকে ভয়ঙ্কর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এরূপ অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বাক্যে সরলতার অভাব এই অভিযোগও কবির নিজস্ব সৃষ্টি গুণের আলোকে খণ্ডন করা যায়।

কবি মধুসূদনের এই কাব্যে কাব্যভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো নামপদের ব্যবহার প্রতুলতা। এখন এই নামধাতুগুলির প্রায়োগিক সাফল্য কিছু আছে কিনা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। আমরা জানি নামপদকে ধাতু বা ক্রিয়া রূপে ব্যবহার করলে তা নামধাতু হয়। এই নামধাতুর প্রয়োগেও কবি একান্ত নিজস্বতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যখন 'আদেশিলা' ('এতেক কহিয়া রাজা, দূতপানে চাহি, আদেশিলা'), 'বিলাপিলা' ('এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস কুলপতি রাবণ'), 'আরম্ভিল' ('কেমনে, হে মহীপতি, পুনঃ আরম্ভিল ভগ্নদূত'), 'প্রবেশিলা' ('কতক্ষণ পরে, প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব')

ইত্যাদি নামধাতুর প্রয়োগ দেখি তখন নামধাতুর প্রয়োগের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। কিন্তু নিম্নোক্ত উদাহরণগুলির নামধাতুর প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক্ :

'কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?' (১ম সর্গ)

এখানে 'নিঃশঙ্কিলা' নামধাতু গঠনে ও প্রয়োগে মহাকাব্যের দীপ্তিগুণ প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় সর্গে মেঘনাদপত্নী প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশে বামাকুলের অবস্থান বর্ণনায় পাই—

ধীরে, ধীরে, বৈরিদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি,
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিনী,
বীরমদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!

এখানে বিশেষ করে 'টংকারিলা', 'আস্ফালিলা', 'উলঙ্গিলা' নামধাতুর প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয়। এরূপ 'আশ্বাসিলা,' 'আস্কান্দিল', 'আস্ফালিলা' ইত্যাদি বহু নামধাতুর প্রয়োগ পাওয়া যায় যা মহাকাব্যিক ওজস্বীগুণকে প্রকাশ করেছে।

সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা নিয়ে যেসমস্ত অভিযোগ শোনা যায় তার বেশির ভাগই মানা যায় না। আসলে কবির সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য আমাদের প্রচলিত ধারণায় ত্রুটি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কাব্যের প্রকৃতির ভিন্নতার কারণেই যে ভাষা এমন নূতন রূপ নিয়েছে এবং ছন্দের নতুনত্ব ও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তা ধরা পড়েনি। কাব্যের অন্তরূপ বিশ্লেষণে ভাবের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভাষার ঐশ্বর্য ধরা পড়েছে। এর ফলেই প্রাচীন মহাকাব্যের ধারা নয়, নূতন ধরনের মহাকাব্য যা সাহিত্যিক মহাকাব্য নামে খ্যাত সেই ধারার সার্থক নিদর্শন রূপে মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য : শৈলীর সূত্র

শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বিশেষ্যবাচক রীতি, ক্রিয়াবাচক রীতি

বর্ণনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে রুলোন ওয়েলস (Rulon Wells) একটি ভাষিক সূত্রে শৈলীকে দু'ভাগে আলাদা করেছেন। বাক্য বা Sentence হল শৈলীর মৌল উপাদান। প্লেটো (Sophist) এবং আরিস্ততল (De interpretatione)-এর মতো প্রাচীন দার্শনিকদের সাক্ষ্যে দেখিয়েছেন যে বাক্যের প্রধান দুটি অংশ হল বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ। যাকে সাংগঠনিক ভাষা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায়: S→NP + VP; বাক্যে অন্যান্য উপাদান সাধারণভাবে এ দুটি অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

রুলোনের ভাষায় : 'The elementary fact of syntax that prepositions and adjectives go with nouns, conjunctions and adverbs with verbs'; বাক্যের এই দুটি উপাদানকে ভর করে তিনি শৈলীদল দুটিকে চিহ্নিত করেছেন বিশেষ্যবাচক রীতি (Nominal style) এবং ক্রিয়াবাচক রীতি (Verbal style) রূপে। বিশেষ্যবাচক রীতি এবং ক্রিয়াবাচক রীতি উভয় ধরনের শৈলীকে দেখা হয়েছে শব্দের নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অর্থাৎ 'style as a choice between alternative expression' তত্ত্বের আলোকে। এই বৈকল্পিক বা প্যারাডিগমেটিক নির্বাচনে মৌল প্রশ্ন হল কোন্‌টির বদলে কোন্‌টি বেশি পছন্দ করছেন কবি। বিশেষ্যবাচক রীতির ক্ষেত্রে 'the tendency to use nouns inpreference to verb'; আর ক্রিয়াবাচক রীতির ক্ষেত্রে 'tends to use verb rather than nouns'; শৈলীতে বিশেষ্য বেড়ে উঠছে না, ক্রিয়া বেড়ে উঠছে সেটি ধরে নেওয়া যাবে দু'ভাবে। এক, আয়তন বা সংখ্যার দিক থেকে। অর্থাৎ Noun Verb Quotient ration বা NVQ-এর সাহায্যে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিশেষ্যময়তা বা ক্রিয়াময়তা আসলে 'matters of continuous degree' বা মাত্রার তফাৎ। দুই, বাক্যের সংগঠনকে বিশেষ্যমুখী করে তোলা হচ্ছে না ক্রিয়ামুখী রূপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও রুলোন কখনোই শৈলীর নির্বাচনের সমস্যাটিকে পার্শ্বিক বা সিনট্যাগমেটিক উপাদানের উপর জোর দেননি। কারণ বিশেষ্যীভবন প্রকরণটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সিন্‌থেটিক ভাষায়। সিন্‌থেটিক ভাষায় শব্দের পার্শ্বিক নির্বাচন স্থির নয় বলেই তার ভূমিকা তুলনায় গৌণ।

মহাকাব্যিক শৈলী

মহাকাব্যের জগৎটা বিশাল ব্যাপ্ত, দৈর্ঘ্য-বিস্তৃত উচ্চ। এবং মহত্ত্বময়। এ কারণেই মহাকাব্যের শৈলীকে বলা হয়েছে Grand style. Grand style-এর প্রধান লক্ষণগুলি হল কাব্যিক উচ্চাবচকতা বা poetic heightening নির্মাণ। অর্থাৎ sublimity, gigantic loftiness এবং grandeur-এর মাত্রাগুলি স্বতন্ত্র প্রস্বর হিসেবে কাজ করে। নানা প্রকরণ প্রক্রিয়ায় মহাকাব্যিক শৈলীতে Epic decorum গড়ে তোলা হয়। বাক্যের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রসারিত করে, বাক্যবন্ধ এবং সমাসের সংবদ্ধরূপ তৈরি করে, পদরূপগত মাত্রায় নানা বিচ্যুতি ঘটিয়ে। রুলোন ওয়েলস-এর সূত্রানুসারে এই প্রকরণ প্রক্রিয়ার ভরকেন্দ্রে কাজ করছে বিশেষ্যপদগুচ্ছ বা Nominal Group

আসলে সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় সংশ্লেষধর্মী চরিত্রে বিশেষ্যীভবনের শক্তি ও সম্ভাবনা উল্লিখিত ছিল। মহাকাব্য এবং আখ্যান কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিবেশে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে। প্রশ্ন উঠবে রুলোনের এই তত্ত্বটি সংশ্লেষধর্মী ভাষার শর্তে সীমাবদ্ধ থাকবে কি না? বিশ্লেষধর্মী ভাষায় রচিত শিল্পিত মহাকাব্যে তত্ত্বটি কতদূর গ্রহণযোগ্য হবে? এটা ঠিক মিল্টন তাঁর Paradise Lost কাব্যের ভাষাকে ঘুরিয়ে ধরেছিলেন লাতিনের দিকে। মধুসূদনও সংস্কৃতমুখী হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের সংস্কৃত-মুখিতা

বা লাতিন-মুখিতা মূলত শব্দগত বা lexical; অন্বয়গত বা syntactical নয়। অন্বয়ের সংগঠনে মুখের ভাষার স্পন্দের দিকে এগিয়ে গেছেন মধুসূদন। মিল্টনের কাব্যভাষায় মুখের ভাষার স্পন্দের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলেও ভাষার প্রমুখণ গড়ে উঠেছে প্রধানত শব্দের অবস্থানগত বিচ্যুতির মধ্যে দিয়েই। ফলে এদের কাব্যভাষায় রূপগত এবং অন্বয়গত দ্বিমুখী নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য গড়ে উঠে। লক্ষণীয় এই দ্বৈত চরিত্রের টানাপোড়েন শিল্পিত মহাকাব্যে কোনো মিশ্ররূপ গড়ে তুলছে কি না?

মিশ্ররীতি

শিল্পিত মহাকাব্যে যে মিশ্ররীতির সম্ভাবনা দেখা হচ্ছে, তা থেকে বাংলা কাব্যভাষার মিশ্র ডায়লেক্টের নন্দনতত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। শিল্পিত মহাকাব্যে বিশেষত মধুসূদনের কাব্যভাষায় এই বিমিশ্রণটা সংরূপগত : অর্থাৎ 'Epic' এবং 'Lyric' শৈলীর যৌগযুক্ত রূপ। কবির নিজের উচ্চারণেই দ্বৈতাভাস বেরিয়ে এসেছে : 'I could have made a regular Iliad of the death of Meghnand.' এবং 'I have a tendency in the lyrical way.' এবং এই বিমিশ্রণ উনিশ শতকীয় যুগভূমির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ্যবাচক রীতি প্রধানত মহাকাব্য এবং আখ্যান কাব্যের সঙ্গে যুক্ত। আর ক্রিয়াবাচক রীতির মূল ভরকেন্দ্রই হল গীতিকবিতা। এবারে লক্ষ্য করা যাক্ মধুসূদনের কাব্যভাষায় এই দুই রীতির কি কি মুদ্রা প্রকাশ পাচ্ছে। এবং এদের মধ্যে কোন্ আদলটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে। দ্বিতীয়ত এই লক্ষণগুলি কি পাশাপাশি কাজ করছে না যুগলবদ্ধ হয়ে মিশ্ররূপের অবয়ব ধারণ করছে। নিচে বিশেষ্যবাচক ও ক্রিয়াবাচক রীতির প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলি সাজিয়ে দেওয়া হল :

এক: বিশেষ্যবাচক রীতি

ক. বিশেষ্যবাচক রীতির প্রধান প্রবণতা হল বাক্যের বিশেষ্যীকৃত বা Nominalized রূপটি প্রধান হয়ে উঠবে। বিশেষ্যীকৃত রূপটি বাক্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয় দুভাবে। এক. ক্রিয়া অংশটি গৌণ করে। যেমন, নাশিল সৌমিত্রি / দেব দৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে। পঙ্‌ক্তিটির বিস্তার ঘটেছে বিশেষ্যদলের, ক্রিয়াদল এখানে সঙ্কুচিত। দুই. ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়াগুচ্ছের বিলোপন ঘটিয়ে। অবশ্য এই বিলোপন প্রক্রিয়াটি ঘটেছে বাক্যের উপরিতলে (Surface level); যেমন, ধবন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি / ভাগ্যদোষে; অবতলে (deep structure) ক্রিয়ারূপটি উঁকি দেয়। মধুসূদনের কবিতায় বিশেষ্যবাচক এবং ক্রিয়াবাচক বাক্যের অনুপাত ২ : ১;

খ. ক্রিয়াপদটিকে বিশেষ্যগুচ্ছের (NP) দিকে টেনে আনতে গিয়ে উপসর্গ, পরসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় জুড়ে পদগঠনের দিকে ঝোঁক বিশেষ্যবাচক রীতিতে প্রবলভাবে দেখা দেয়। এটি ভাষার সংশ্লেষধর্মী চরিত্র। ফলে রূপগত স্তরে কাব্যভাষায় নানা মাত্রিক বিচ্যুতি স্বলক্ষণযুক্ত চরিত্র নির্মাণ করে। যেমন 'বীরত্ব' না লিখে মধুসূদন সাজালেন 'বীরবাহুর বীরতা'। ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষণে ত্বরান্বিত করতে জুড়ে দেন অতিরিক্ত এ বিভক্তি। যেমন —'মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি' কিম্বা বাড়তি -এ বিভক্তি বিশেষ্যে গেঁথে সমগ্রতা ও ব্যাপ্তির বোধ গড়ে তোলেন মধুসূদন। যেমন : 'মুদিব অক্তিমে: আবরি অম্বরে'।

গ. কাব্যভাষাকে ঘনাপিনদ্ধ সংবদ্ধতায় বেঁধে দেয় বিশেষ্যবাচক রীতি নানা দৈর্ঘ্যের সমাসের বিপুল আয়োজন ঘটিয়ে। ধ্বনিসৌন্দর্য এবং অর্থগর্ভতায় কাব্যিক সন্নিধান গড়ে তোলে। যেমন, 'কাঞ্চন-কঞ্চুক বিভা,' 'সৌব-খরতর-কর-জাল-সংকলিত'; মধুসূদনের কাব্যে সমাসবদ্ধ শব্দ মোট নির্বাচিত শব্দের এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করে রয়েছে। শুধু বর্ণনার সংবদ্ধতা নয়, ধ্বনির সৌষম্য ও নান্দনিক বিভা তৈরি করছে যৌগ শব্দদল।

ঘ. দীর্ঘদৈর্ঘ্যের বাক্যপুঞ্জের শৃঙ্খল তৈরি করে বিশেষক রীতিতে বাক্‌-বিস্তার ঘটানো হয়। পারিভাষিকভাবে একে বলা হয় প্যারাট্যাক্টিস পদ্ধতি। এই যূথবদ্ধ গঠনের কৌশল হল বাক্যের ক্রমান্বয়গত শৃঙ্খলটিকে পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে সাজানো হয়, সংযোজক বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয় না। যেমন—'ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িল ভূতলে / শোনিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিল বসুধা; গর্জিলা উথলি সিন্ধু!' টুক্‌রো টুক্‌রো বাক্যমালা আসলে চিত্র কোলাজ গড়ে তোলে সমগ্রতা ও ব্যাপ্তির বোধকে বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ করে দিতে। জটিল যৌগ বাক্যের বিকল্প রূপ হিসেবে এদের নির্বাচন করা হয়।

ঙ. বিশেষক রীতিতে বাক্যের ক্রমিক শৃঙ্খলের সঙ্গে বিন্যাসের জটিল আবর্ত রচনা করা হয় প্রধানত তিনটি প্রকরণ পদ্ধতির সাহায্যে। ক. অন্বয়গত বিপর্যাস (inversion). খ. অন্তর্বাক্য বন্ধের সংযোজন (Parenthesis). গ. দূরান্বয়। মধুসূদনের কাব্যভাষায় এই তিনটি প্রকরণই প্রধানভাবে অন্বয়ের স্তরে প্রমুখণ ঘটায়। এবং তার শৈলীতে বহুকৌণিক স্তর যুক্ত বিভার সঞ্চার ঘটায়।

চ. বিশেষ্যবাচক রীতি যেহেতু মুখের ভাষার বাক্‌ বন্ধ থেকে দূরবর্তী তাই এর একটি গৌণ প্রবণতা হল প্রাচীন শব্দ (archeism) এবং নব্যশব্দ প্রকরণের (neologism) প্রতি আসক্তি। মধুসূদন এবং মিল্টন উভয়েই কাব্যে ধ্রুপদী পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে প্রকরণ দুটির আশ্রয় নেন।

দুই. ক্রিয়াবাচক রীতি

ক. বিশেষ্যবাচক রীতি যেমন বাক্‌বিস্তারের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্তির বোধ জাগানো হয় তেমনি ক্রিয়াবাচক রীতির প্রধান শর্তই হয়ে উঠে মিতকথন, বিচ্ছুরিত প্রতিভাস নির্মাণ। ভাষা এই স্তরে মেটাফরধর্মী রূপ নেয়। মধুসূদনের কবিতায় টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে মেটাফোর সন্নিবেশের প্রযত্ন আছে কিন্তু মেটাফোরিক ভাষার নানা তলের অর্থগত প্রমুখণ সেখানে নেই। বিকিরণগত প্রভার চেয়ে স্থাপত্য সংবদ্ধতা তার মৌল লক্ষণ।

খ. মধুসূদন পদগত সংগঠনে ব্যাপক বিচ্যুতি ঘটান বিশেষ্যগুচ্ছকে (NP) ক্রিয়াগুচ্ছে (VP) রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ নামধাতুর সংগঠনে। মোহিতলাল মজুমদার দেখিয়েছেন মহাকাব্যে দীর্ঘপদ যোজনায় বাংলা ক্রিয়াপদগুলি বাধা হয়েছিল। শব্দের গাঢ়তা এবং ধ্বনির উপলরূপ নির্মাণের জন্যই মধুসূদনের কাব্যভাষায় অর্ধেকেরও বেশি আয়তন জুড়ে আছে নামধাতু। যেমন প্রফুল্ল→প্রফুল্লিল, আঁধার→আঁধারিল, বিলাপ→বিলাপিল ইত্যাদি। ক্রিয়াবাচক রীতির উন্মেষ সম্ভাবনায় এর মুদ্রণ জোরালো।

গ. ক্রিয়াবাচক রীতিতে বাক্যের বিচ্যুতি ও প্রমুখণ গড়ে তোলা হয় ক্রিয়াগুচ্ছ উপাদানকে ঘিরে। বিশেষ্যবাচক রীতিতে এই বিচ্যুতি ঘটানো হয় রূপগত বা ব্যাকরণগত স্তরে। ক্রিয়াবাচক রীতিতে প্রমুখণটি ঘটে শব্দ বা পদগুচ্ছের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ অন্বয়গত স্তরে। কিন্তু সেখানে পদবন্ধের অন্তর্গত সন্নিধানগত শৃঙ্খল বিপুলভাবে বিপর্যস্ত করা হয় না। মুখের ভাষার স্পন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি ভারসাম্যের সংহতি রক্ষা করা হয়ে থাকে। মধুসূদন বিশেষণ+বিশেষ্য, বিশেষ্য+ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ+ক্রিয়াপদের বিপর্যাস ও দূরান্বয়ের মধ্য দিয়ে যে প্রমুখণ ঘটান সেখানে আপতিকভাবে মনে হতে পারে প্রায়ই এই ভারসাম্য শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু মূল আলোচনায় দেখানো হয়েছে এই দুটি স্তরের মধ্যে কীভাবে মধুসূদন সূক্ষ্ম সমতা রক্ষা করেন। দূরান্বয়ের অভিঘাত যেখানে প্রবল শৈলী সেখানে বিশেষ্যবাচক রীতির কাছে সমর্পণ করে। বিপর্যাস যেখানে মুখের ভাষার স্পন্দের অভিমুখী সেখানে ক্রিয়াবাচক রীতির সম্ভাবনা জেগে উঠছে।

ঙ. ক্রিয়াবাচক রীতিতে অন্বয়গত প্রমুখণ স্তরে স্তরে সঙ্গীতের (music) দিকে এগিয়ে যায়। অর্থের role-এর চেয়ে প্রধান হয়ে উঠতে থাকে ধ্বনির role; বিশেষ্যবাচক রীতিতে music-টা

শব্দনির্ভর; অর্থাৎ তা ট্রোপির স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। ক্রিয়াবাচক রীতিতে তা সম্প্রসারিত হয় অন্বয়ের স্তরে যাকে ডোনাল্ড ডেভি বলেছেন 'syntax as music'. মধুসূদনের কাব্যভাষায় ধ্বনি সংগঠন স্বর ও ব্যঞ্জন সাম্যের সুষমায় যুক্ত ব্যঞ্জনের অভিঘাতে যমক ও অনুপ্রাসের টানাপোড়নে শুধু শ্রুতি সুভগতা বা স্মরণযোগ্যতার স্তরে নিঃশেষিত হয়নি। তাঁর অন্বয়ের বিন্যাসের মূলেই কাজ করেছে সাংগেতিক শর্ত। একেই মোহিতলাল phrasal music রূপে চিহ্নিত করেছেন। ফলে ধ্বনির মাত্রা প্রকরণের স্তর থেকে নান্দনিক স্তরে পৌঁছয় মধুসূদনের কবিতায়।

এবারে ফিরে আসা যাক রুলোন ওয়েলস এর Noun Verb Quotient বা NVQ তত্ত্বে। রুলোনের তত্ত্বটিকে ভেঙে নিলে দাঁড়ায় বিশেষ্যবাচক এবং ক্রিয়াবাচক রীতিব পার্থক্যটা একরৈকিক বা linear অর্থাৎ আয়তনের দিক থেকে বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছ স্থান বদল করে নিলেই স্টাইলের চরিত্রে হেরফের ঘটে যাবে। মধুসূদনের কাব্যভাষায় মোট শাব্দিক আয়তনের ৬৯.৯% বিশেষ্যদলের অন্তর্গত; আর ক্রিয়াদলকে সাজানো হয়েছে ২০.৫% শব্দ। শুধু নিরূপিত আয়তনের দিক থেকে নয় শিল্পিত মহাকাব্যে মুদ্রণ ও প্রবর্তনার দিক থেকেও অর্থাৎ ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত এবং অন্বয়গত তিনটি স্তরেই বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছের যৌগ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এদের বিমিশ্রণটা ঘটছে দুভাবেই অর্থাৎ পার্শ্বগত ও তলগত উভয় স্তরেই। তবে এদের মধ্যে নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠেছে বিশেষ্যপদগুচ্ছ।

বিশেষক রীতি

শিল্পিত মহাকাব্যে মিশ্ররীতির ব্যাকরণে লক্ষ্য করা গেল বিশেষ্যবাচক ও ক্রিয়াবাচক রীতির বিমিশ্রণ ঘটেও বিশেষ্যবাচক রীতির চাপটাই মুখ্য। তাহলে রুলোনের Quotient তত্ত্বের সূত্র ধরে একে কি বিশেষ্যবাচক রীতি রূপেই চিহ্নিত করা হবে? রুলোন বিশেষ্য, বিশেষ্যগুচ্ছ, সর্বনাম এবং বিশেষণ সব কটি পদরূপকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। সাংগঠনিক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পদরূপ শ্রেণীর এই চরিত্রায়ন সঠিক। কিন্তু লক্ষ্য বা Function-এর দিক থেকে দুয়ের ভেদ রেখা স্পষ্ট। বিশেষ্য প্রধানত অভিপ্রায় বা intention নির্ভর, বিশেষণের নিগূঢ় লক্ষ্যই হল ব্যাপ্তি বা extension-এর। বিশেষ্যবাচক রীতির মূল ভরকেন্দ্রটি দাঁড়িয়ে আছে ভাষার বর্ণনাবিস্তারী সম্প্রসারণধর্মী চরিত্রের উপর। ফলে আয়তনের দিক থেকে বিশেষ্যের পাল্লা ভারী হলেও role বা ভূমিকার দিক থেকে বিশেষ্যবাচক রীতিতে বিশেষণের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিশেষত মহাকাব্যিক শৈলীতে বর্ণনা-বিস্তারের প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠে বিশেষক (epithet) এবং বিশেষণ। হোমরের ইলিয়ড, ওডেসি, বাল্মীকির রামায়ণ, এমনকি বাণভট্টের কথাকাব্য কাদম্বরী এবং জয়দেবের আখ্যানকাব্য গীতগোবিন্দের ভাষা সংগঠনে এ লক্ষণটি প্রকট। ফলে তত্ত্বগতভাবে রুলোন যাকে বলেছেন বিশেষ্যবাচক রীতি, লক্ষ্য বা Function অভিপ্রায়ের দিক থেকে তাকে বিশেষক রীতি বা Epithetical style বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সূক্ষ্মভাবে বিশেষক রীতির সংগঠনেই একটি মিশ্রক্রিয়া থেকে যায়। কারণ বিশেষক বা বিশেষণের গঠন প্রকরণের ভিত্তিতেই কাজ করে বিশেষ্যমূল (Noun stem) এবং ক্রিয়ামূল (Verb-stem)। দ্বিতীয়ত অবস্থানের বিন্যাসের দিক থেকেও বিশেষণের অন্বয়গত সংগঠনে মিশ্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। বাক্যের উপরিতলে (Surface structure) বিশেষণ মুক্ত অবস্থান (bound position) এবং রুদ্ধ অবস্থানে (free position) দুই জায়গাতেই বসতে পারে। কিন্তু বাক্যের অবতলে (deep-structure) বিশেষণযুক্ত থাকে ক্রিয়া অংশের সঙ্গে। সংবর্তনের ভিতর দিয়ে তা বিশেষ্যগুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে মিশ্ররীতির সংগঠনের সঙ্গে বিশেষক রীতির সংগঠনের সমান্তরাল চরিত্র দেখা যাবে। এ কারণেই মধুসূদনের

কাব্যভাষায় বিশেষক ও বিশেষণ স্বতন্ত্র আয়াম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিচে এদের সলক্ষণযুক্ত feature বা বৈশিষ্ট্যগুলি সাজিয়ে দেখানো হবে কোথায় এবং কীভাবে মধুসূদন বিশেষ্যবাচক রীতির স্তর অতিক্রম করে বিশেষকবাচক রীতির উপর কাব্যভাষাকে দাঁড় করাচ্ছেন।

ক. মহাকাব্যের বহু বিস্তৃত বহু বিভক্ত দূরবর্তী জগৎকে একটি সূত্রে গেঁথে তোলাই বিশেষকরীতির মৌল লক্ষ্য। এর গূঢ় মুদ্রাটি হল আয়তন ও মাত্রার দিক থেকে বর্ণনার সম্প্রসারণ বা extension; বিশেষক রীতিতে বর্ণনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বিশেষ্য। বিশেষ্যের অর্থের মাত্রা স্থির বলে সম্প্রচার নেই। সচলতা আনে বিশেষণ। মধুসূদনের কবিতায় বিশেষণের দ্বিমাত্রিক চিত্রায়ণের দিকে ঝোঁক বেশি।

গড়ুক স্বপন দেবী মায়ার পৌলোমী-
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে কৃশোদরী মে ১।২৬৮ ৬৭

খ. বর্ণনার সম্প্রসারণে মধুসূদনের কবিতায় বিশেষক ও বিশেষণগুলি অলঙ্কারের বিকল্প ভূমিকা গ্রহণ করে। নান্দনিক মাত্রায় বিশেষণ ও অলঙ্কারের লক্ষ্য এক। অর্থের প্রমুখণের ভিতর দিয়ে জ্ঞাপনের স্তর অতিক্রম করে প্রকাশন স্তরে পৌঁছনো। মহাকাব্যিক শৈলীতে অলঙ্কারের মতোই বিশেষণ প্রতি তুলনায় নিজেকে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করছে। বিষয়কে বিষয়ের বাইরে টেনে নিয়ে অন্তর্গত নানা স্তরকে উন্মীলিত করছে। যেমন—ক, পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি / আনিনু এ হৈম গেহে? খ. উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল / এ মোর সুন্দরী পুরী! গ, দুপাশে তরঙ্গ-নিশ্চয়, / ফেণাময় যথা ফণিময়. ... ইত্যাদি। অবশ্য এর বাইরেও মধুসূদনের কবিতায় বিস্তীর্ণ আয়তন জুড়ে উপমাশ্রয়ী বিশেষক নির্বাচিত হয়েছে যেখানে বর্ণনা, সতেজ স্ফূর্ত হয়েও স্থিতিশীল।

গ. বিশেষকগুলি যেখানে বিস্তারমুখী ও দ্বি-মাত্রিক সেখানে উপমার বিকল্প ট্রোপি রূপে উঠে আসে আর যেখানে বিশেষকগুলি অন্তর্মুখী 'intensive role'-এ আত্মপ্রকাশ করে সেখানে বর্ণনা দ্বিমাত্রিক স্তর অতিক্রম করে ত্রিমাত্রিক স্তরে পৌঁছয়। অর্থাৎ বিশেষকগুলি প্রসারিত হয় মেটাফরের দিকে। বর্ণনার দেহ সম্প্রচারের চেয়ে বেড়ে উঠতে থাকে প্রভা বিচ্ছুরণের ঝোঁক। মধুসূদনের কবিতায় এই প্রবণতা সুনির্দিষ্ট উপলক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন—

ক. ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে / সাগর-মকরালয়। মে।১।২৮৭
খ. আভরণহীন দেহ হিমানীতে যথা
কুসুমরতনহীন বনসুশোভিনী / লতা। মে।১।৩২৮ ৩০

ঘ. মহাকাব্যের শৈলীর একটি সুনির্দিষ্ট প্রকরণ হল বিশেষণ পদগুলিকে বৈকল্পিক নির্বাচনে বিশেষ্য বা নামপদের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। আরিস্ততল সমার্থক শব্দের সংগঠনে কাব্যভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছেন। যেমন, লক্ষ্মণ না বলে বলা হল 'উর্মিলাবিলাসী', সমুদ্রের বিকল্পে বসানো হল 'যাদঃপতি' বা 'নীলাম্বুস্বামী'র মতো শব্দদল। হোমরেও দেখা যাবে Eggle-এর পরিবর্তে নির্বাচিত হচ্ছে 'Winged hound'-এর মতো চরিত্রবিচ্ছুরিত শব্দ।

আসলে মৌখিক রীতিকে (oral style) 'formulaic expression'-এর ফ্রেমে ধরবার জন্য নানা অক্ষর দৈর্ঘ্যে শব্দদল নির্বাচিত হতো; এতে মাত্রার ও ধ্বনির মিল অমিলের বিন্যাস গড়ে তুলতে কবিরা বাড়তি স্বাধীনতা পেতেন। মধুসূদনের কাব্যভাষায় এই প্রকরণের প্রয়োগ একটু ব্যাপক। ৭০.২% নির্বাচিত বিশেষ্যগুচ্ছের অর্ধাংশের বেশি আয়তন জুড়ে আছে বিশেষক দল। এবং বাক্যের সংগঠনে কর্তৃপদ রূপে উঠে আসে দুই তৃতীয়াংশের বেশি বিশেষক বা বিশেষণ শ্রেণীর শব্দগুচ্ছ। যেমন—ক. মৃণাল ভুজ আনন্দে অন্দোলি চন্দ্রাননা' মে।১।৪৯ ৫০, খ. হায়, শোকাকুল আজি, রাজকুলমণি

/ নৈকষেয় মে:১।৭৫-৭৬ ;

ঙ. স্বরসাম্যে ধ্বনিসুভগতা নির্মাণের জন্য ক্রিয়াবিশেষণগুলিতে অতিরিক্ত বিভক্তি জুড়ে দেন মধুসূদন। ফলে এগুলির মধ্যে বিশেষণের force বেড়ে উঠতে থাকে। ব্যাকরণগত মাত্রায় ক্রিয়াসম্পর্কিত হয়েও অর্থগত মাত্রায় সন্নিধান ভেঙে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থাৎ উপরিতলে এগুলি ক্রিয়াবিশেষণ; কিন্তু অবতলে বিশেষণমুখী হয়ে উঠছে। যেমন—ক. 'চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্র শোকে বিকলা'। খ. 'কাঁদে রক্ষঃরথী-হতজ্ঞান'! ... ইত্যাদি।

চ. এর ঠিক বিপ্রতীপ সংগঠন লক্ষ্য করা যাবে মধুসূদনের কবিতায়। সেখানে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও অর্থকে সংহত করতে বিশেষণপদগুলিকে বিশেষ্যের সন্নিধান থেকে সরিয়ে এনে ক্রিয়াগুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে! যেমন—'নাদিল গম্ভীরে,' 'দাঁপে উজ্জ্বলে' ...ইত্যাদি। ব্যাকরণগত বিচ্যুতির এই দুটি প্রবণতাই হল মিশ্ররীতির লক্ষণ।

উপসংহার

মধুসূদনের কাব্যভাষায় বিশেষণের রূপ ও সংগঠনের বিশ্লেষণ থেকে শৈলীর দুটি তাত্ত্বিক সূত্র বেরিয়ে আসে। এক. শুধু বিশেষণ বিশেষকের নির্বাচন ও বিন্যাসে নয়, সমগ্র কাব্যভাষার উপাদানকে নিরূপিতভাবে অর্থের চেয়ে ধ্বনির প্রমুখণের উপর দাঁড় করান মধুসূদন। ধ্বনির অতিরেকের (redundancy) সাহায্যে তাঁর কাব্যভাষা জ্ঞাপনের স্তর অর্থাৎ L_1 থেকে প্রকাশন স্তর L_2-র দিকে এগিয়ে যায়। ধ্বনির এই প্রমুখণ ট্রোপির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্রমশ তা অন্বয়ের স্তরে পৌঁছে যায়। অন্বয় (Syntax) স্তরে স্তরে সঙ্গীতে (music) রূপান্তরিত হতে থাকে। ফলে অর্থের আয়াম পুরোপুরি ধ্বনির আয়ামের শর্তাধীন হয়ে যায়। 'হেক্টরবধ' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পার্শ্বিক অবস্থান লক্ষ্য করলেই সূত্রটি স্পষ্ট হবে। হেক্টর বধে 'মহাবাহু আকিলীস্'-এর বিশেষণ সার্বিকভাবে অর্থগত শর্তে নিয়ন্ত্রিত। মেঘনাদবধ কাব্যে 'বীরবাহু বীরচূড়ামণি' বিশেষণ বিশেষ্যের এই সন্নিধান পুরোপুরি ধ্বনি শর্তমুখী। হোমরও ধ্বনির শর্তকেই সামনে রেখেছেন। 'Alloi Axaioi' বা Megathumoi Axaioi-এর মতো বিশেষণ-বিশেষ্যের পার্শ্বিক অবস্থানে ধ্বনিই প্রধান শর্ত হয়ে উঠে।

শৈলীর দ্বিতীয় মাত্রাটি হল মধুসূদনের কাব্যভাষায় মিশ্ররীতির আবর্ত লক্ষ্য করা যায়। রীতির মিশ্র বিন্যাসে আয়তন ও প্রবর্তনায় বিশেষ্যগুচ্ছের চাপটা বেশি। কিন্তু বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে মহাকাব্যিক শৈলীতে, রুলোন ওয়েলস যাকে বিশেষ্যবাচক রীতি বলে নির্দিষ্ট করেছেন, অভিপ্রায় প্রবর্তনা এবং প্রকরণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে তা হল বিশেষক রীতি বা Epithetical style। বিশেষক রীতিতে সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল থাকে মিশ্ররীতির উপাদান। এ কারণেই মধুসূদনের কাব্যভাষায় বিশেষক রীতির প্রতি সংসক্তি এত প্রবল। বিশেষক রীতির এই তাত্ত্বিক ছকটি শুধু মহাকাব্যিক শৈলী নয় গোটা আখ্যান শৈলীর (Narrative style) সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে যায়। ❑

বাঙলা ছন্দের স্রোতধারা ও মধুসূদন

সুহৃদকুমার ভৌমিক

বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে মধুসূদনের দ্বারাই। চিরাচরিত পথে মধ্যযুগ থেকে মধুসূদনপূর্ব পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের যে স্রোতধারা প্রবাহিত ছিল তিনি তার মোড় ঘুরিয়ে ভগীরথের মতো আধুনিকতার দিকে সঞ্চারিত করেছিলেন। ফলে বাঙলা ভাষাও সাহিত্যের ক্ষেত্রটি পরবর্তীকালে শুধু শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছিল তা নয় বিচিত্র ফুল ও ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বাঙলা গদ্যের তিনি কত শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন তাঁর নাটকের ভাষা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে ব্যবহৃত অমার্জিত ও অশালীন শব্দের দক্ষ ব্যবহার প্রমাণ করে তিনি খুবই সতর্ক লেখক ছিলেন। তাঁর কাব্য নাটক ও প্রহসনের আঙ্গিক দিক ছাড়া আত্মিক অংশটিকেও তিনি চিরাচরিত স্রোতধারা থেকে আধুনিকতার দিকে উন্নীত করেছিলেন।

তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় ট্র্যাজেডি লেখক। ভারতীয় দর্শন ও জীবন য়ুরোপীয় আদর্শে রচিত ট্র্যাজিক চেতনাকে স্বীকার করে না। ভারতীয় মনের অন্তরালে জন্মান্তরবাদ (sense of rebirth) ট্র্যাজেডির গভীর হাহাকারকে অনেকখানি মলিন করে দেয়। মধুসূদন রামায়ণের পটভূমিকায় ভারতের মাটিতে বিশুদ্ধ গ্রীক ট্যাজেডির অনুকরণে রাবণ চরিত্র অঙ্কন করলেন। গ্রীক ধারণায় অদৃশ্য ভাগ্যলিপির অপরিবর্তনীয় পথেই রাবণ চরিত্র ধীরে ধীরে তার সমস্ত পৌরুষ ও সত্যনিষ্ঠা নিয়ে ট্র্যাজেডির মহাসমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। নবজাগরণের ফলশ্রুতি স্বরূপ নারী চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। বিশেষত চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যের উজ্জ্বল তারকা। মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনও গ্রীক নায়কের মত আকর্ষণীয় এবং প্রতিভায় ভাস্বর।

তাঁর সাংবাদিকতা ছিল সে যুগের অতি উচ্চমানের। Hindu Chronicle-এর দক্ষ সম্পাদক মধুসূদনের কোনো কোনো প্রবন্ধ একাধিক পত্রিকা পুণর্মুদ্রণ করত। সংবাদপত্র যে দেশ গঠনের সহায়ক তা তিনি প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতেন। তাঁর পত্রিকায় থাকত :

'Where journals are numerous the people have power, intelligence and wealth, where journals are few, the many are really slaves.' মধুসূদনকে মাদ্রাজ অঞ্চলে সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর বিশাল প্রতিভার বৈচিত্র্য ও গভীরতার কথা প্রায় দেড় শত বৎসর ধরে নানাভাবে আলোচিত হয়ে এসেছে। তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ বিষয়েও নানা আলোচনা হয়েছে। তবুও বাংলা ছন্দের বিবর্তনে ও গতিধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুরুত্ব কতখানি তা দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনাগুলিতে সমালোচকগণের অভ্রান্ত ও উদার ধারণা ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় বলেন যে, পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় মধুসূদনের ছন্দ-বোধ শিথিল ছিল (1862)। "বোধহয় যেন তিনি [মধুসূদন] পদবিন্যাসকালীন তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি প্রয়োগ করা আছে। সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। ...." (মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধ-সমালোচনা, গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর প্রবন্ধে ব্যবহৃত; চতুষ্কোণ ১৩৮০)। বঙ্কিমচন্দ্রও মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে "While admitting his considerable merits, we are not prepared to rank him among great

poets. He has incurred much hostile criticism by his innovations in language and by his introduction into Bengali of the use of Blank Verse........" (The Calcutta Review—1871. পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যবহৃত) বঙ্কিমচন্দ্র ছন্দবিষয়ে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রকে অনেকখানি মর্যাদা দিয়েছিলেন। "মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশি প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন।" রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্যের চমৎকার আলোচনা করেন, কিন্তু ছন্দ বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। বরং অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি জানতে চাইলে মধুসূদন তাঁকে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of the accent and quantity, is an 'apostate', that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Falimily-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise-Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language. My advice is Read, Read, Read.Teach your ears the new tune and then you will find out what it is."

এই চিঠি থেকে জানতে পারি ঐ সময় বাঙলা ছন্দের বিচার বিন্দুমাত্র শুরু না হলেও তাঁর মনে ছন্দ-চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। বাঙালির স্বাভাবিক বাগ্‌রীতির (speech-habit) বিষয়েও তিনি মনোযোগী ছিলেন। বীর রসের উপযুক্ত ছন্দ সৃষ্টির পক্ষে বাঙালির স্বাভাবিক বাগ্‌রীতি যে যথেষ্ট শক্ত বা উপযুক্ত নয় তা তিনি জানতেন। ফলে তিনি বহুবার বহুজনকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়ে মনোযোগী করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকেই সম্ভবত মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ বিষয়ে প্রথম অবহিত করেন। প্রথম সর্গ রচনার পরই তিনি এই চিঠি লেখেন—

"I have finished the fist Book of Meghnad. You will have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you". (হরফ প্রকাশনী : মধুসূদন রচনাবলী : Letters-p. 319)

পয়ারের বেড়ি ভেঙে মধুসূদন যে নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। জানতেন কাব্যের বাহন হল ছন্দ; এর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য চাই শৃঙ্খল মুক্তি। চীনা বাজারের একটি দোকানে বসে এক পাঠক মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করছিলেন। মধুসূদন থমকে দাঁড়িয়ে যান এবং কিভাবে আবৃত্তি কবতে হয় তা তিনি পড়ে শোনান। 'I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend.'

বোঝাই যায়, ঐ সময় বাঙলা কাব্য জগতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণ খাপছাড়া ছিল। কিন্তু

সামান্য পরেই তা স্বীকৃতি পেতে থাকে। বাঙালির ছন্দ-চেতনার স্বাভাবিক গতি ও ক্রমবিকাশের ধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের লেখা মেঘনাদ বধের বিরুদ্ধ আলোচনা ও পরিণত বয়সে এই কাব্যের মহান বৈশিষ্ট্য সমূহ লক্ষ্য করে তাঁর রচনা, এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতে ছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"—বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ আলোচনার প্রধান দিক হল ছন্দ। 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"আধুনিক বাঙলা কাব্য সাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথম ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ... এ কথা সত্য, বাঙলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ মাইকেল বাংলা ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন, যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটি মাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাঙলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি।" এবার আমাদের মধুসূদনের ছন্দ চেতনার বিশালতা ও গভীরতার দিকে অগ্রসর হতে হবে।

মধুসূদনের ছন্দবিচারে বাঙলা ছন্দের উৎস কি এবং তার বিবর্তন ও প্রধাবণের শক্তি কোথায় জানতে হবে। মধুসূদনের সময় বাঙলা ছন্দের ব্যাকরণ ও বিশ্লেষণ, এর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ, বাঙালির বাগ্-রীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা শুরুই হয়নি। আবার অতি অল্প সময়ের জন্য বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছিলেন। বলতে গেলে ভারতচন্দ্রের পরেই তিনি ছন্দ-সচেতন কবি। অথচ তিনি ভারতচন্দ্রের মত সংস্কৃত ছন্দের চর্চা ও প্রয়োগের কথা ভাবেন নি। তাঁর কবি মন 'বীররস'-এর উপযুক্ত বাহন হিসাবে বাঙলার সর্বাধিক জনপ্রিয় ছন্দ-রীতি মিশ্রবৃত্ত বা পয়ারকেই অবলম্বন করেছিল এবং Blank verse-এর অনুকরণে করেছিল কাব্যের শব্দানুশাসন।

পর্ববিন্যাসে মধুসূদনের নতুনত্ব

ছন্দের স্থাপত্য দাঁড়িয়ে আছে পর্বের উপর আর তার ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম কাজ মাত্রানুপাতিক পর্ব বৈচিত্র্যে। এক ঝোঁকে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণের পর সামান্য থেমে আবার সেই মাপের শব্দগুচ্ছ আবৃত্তি করলেই ছন্দ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে। পর্বগুলি সমমাত্রিক হওয়ার ফলে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে ছন্দের দোলা এসে যায়—এবং সেই ছন্দ রক্ষা করে আবৃত্তি এগিয়ে চলে। কবিতায় তালের দিক লক্ষ্য রেখে এক ঝোঁকে যতগুলি শব্দ লঘু যতি বা পূর্ণ যতি পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় তাই পর্ব। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে লঘু যতির দ্বারা খণ্ডিত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম পর্ব (foot)।

পর্বই হল ছন্দ সৃষ্টির মূল শক্তি। পর্বের মাধ্যমে ছন্দ স্পন্দিত হয়। বাঙলায় পর্ব সমমাত্রিক বলে সমান সময় অন্তর পর্বের প্রস্বর (ঝোঁক) ও বিরতি। বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন মাপের পর্ব থাকে। সাধারণত ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব বিভিন্ন রীতিতে গঠিত হয়। শুধু দলবৃত্ত ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে চার মাত্রার পর্বেই আবদ্ধ।

মধুসূদনই বাঁঙলা ছন্দে পর্ববিন্যাসে নতুনত্ব আনলেন। তিনি ৮।৬ মাত্রার দ্বিপদী বা পয়ারকে অবলম্বন করেই শব্দানুশাসনে নতুনত্ব দেখালেন। ফলে চিরাচরিত পর্বোচ্চারণ ও ঝোঁক গেল হারিয়ে। পয়ারের আদলে গঠিত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভিন্ন জাতের ছন্দ বলেই মনে হল। শুধু তাই নয় ছন্দ-

স্রোতের বাধা সমূহ বিদূরিত হয়ে কাব্যকাননকে সিঞ্চিত করল। এইজন্য মধুসূদনকে ছন্দ প্রবাহের ভগীরথ বলেই মনে হয়েছে।

পর্ব ও গণ

মধুসূদনের অবিন্যস্ত পর্ব ব্যবহারে অথবা অর্থের তাগিদে সুবিধা মত যত্রতত্র যতির ব্যবহারের জন্য তাঁকে ছন্দানুসারী নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলে প্রথম যুগের সমালোচকগণ দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, এমনকি কিশোর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। কিন্তু কোন্ প্রসাদগুণে মেঘনাদবধ কাব্য অপাঠ্য হয়ে উঠল না, বাঙালির মগ্নচৈতন্যের কোন্ ছন্দোশ্রুতি ঐ যথেচ্ছ যতি ও পর্ব ব্যবহারের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলায়িত শব্দের মিছিল দেখেছিল আমাদের ভাবতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে ছন্দের ব্যাকরণ বহির্ভূত মনে হলেও অনেক কাব্যের মাধুর্য অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে যায় না—তার কারণ আমাদের ব্যাকরণের সীমা, ঐ সৃষ্টির নাগালে আসে না। এ বিষয়ে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের বাংলা ছন্দে রীতি লঙ্ঘন (কবি ও কবিতা ১৩, ৭৬ আশ্বিন) এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ-পরিচয় প্রবন্ধ (বাঙলা ছন্দের বিবর্তন পুস্তকের অনুষঙ্গ, ১৯৭৮ জুলাই) স্মরণীয়। যেহেতু কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত চারমাত্রার পর্বে গঠিত সেই হেতু মিশ্রবৃত্তরীতির ছন্দ অর্থাৎ পয়ার বা দ্বিপদী সমূহও চারমাত্রার পর্বে গঠিত হবে। পয়ার বা দ্বিপদীর পদ দুটি ৮।৬ মাত্রার উপর গঠিত অর্থাৎ ৮ মাত্রার পদটি ৪+৪ ও ৬ মাত্রার পদটি ৪+২ মাত্রার পর্ব দিয়ে গঠিত; কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে চার মাত্রার পর যতি নেই বলে কিংবা যতির মূল্য না দিয়ে আমরা একেবারে ৮ মাত্রার পর থামি। পয়ারের উৎস চার মাত্রার পর্ব থেকে আগত বলেই সর্বদা জোড়মাত্রিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে পয়ারে। সত্যেন্দ্রনাথ এই জন্য বলেছিলেন—বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ। জোড়েগাঁথ জোড়।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—দ্বিপদীটিতে মরিতে চা / হিনা আমি // সুন্দর ভু / বনে। এই পদটিতে প্রচ্ছন্নভাবে এই রকম পর্ব বিভাজন রয়েছে। খুব ভারি তত্ত্ব বা কাহিনী বহনের পক্ষে পর্বের তাল ঠুকে ঠুকে যাওয়াকে বাদ দিয়ে একেবারে আট মাত্রার শেষে যতি দিয়ে পূর্ণ পদ তৈরি পয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই এর গাম্ভীর্য ও শোষণ ক্ষমতা।

সংস্কৃত কাব্যে ঝোঁক দিয়ে পর্ব শুরু ছিল না। ঝোঁক বা প্রস্বর এর প্রয়োজন হয়নি কারণ সংস্কৃতে সমমাত্রিক 'পর্ব' ছিল না। সেখানে প্রতিটি পংক্তিতে যতি দ্বারা বিভাজিত অংশের নাম ছিল 'গণ'। 'গণ' মানে বহু বা গুচ্ছ। এখানে শব্দগুচ্ছ। কাজেই প্রতিটি গণের অক্ষর (syllable) সংখ্যা এবং শব্দ সংখ্যা সমান হবে তা নয়—শুধু ছন্দ সৃষ্টির জন্য যতি অনুসারে থামা। আবার প্রতিটি 'গণে' লঘুগুরু ভেদে বিভিন্ন নাম এবং লঘুগুরুর অবস্থানও নির্দেশিত। ফলে শ্লোকের পর শ্লোক পাঠেও কোনো এক-ঘেঁয়েমি দেখা যেত না। পাঠকও থাকতেন সচেতন।

সংস্কৃত ছন্দ কত বৈচিত্র্যময় একটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে।

২ ২ ২২ ১১১১১২ ২১২২ ১২২ = মাত্রা ৮/৭/১২
কশ্চিৎ কান্তা / বিরহগুরুণা / স্বাধিকার প্রমত্তঃ = বর্ণ (syllable) ৪।৬।৭

২ ২ ২২ ১১১ ১১২ ২১২ ২১ ২২ = মাত্রা ৮/৭/১২
শাপে নাস্তং / গমিত মহিমা / বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ = বর্ণ (syllable) ৪।৬।৭

এই বিশেষক্রমে বিন্যস্ত সতের বর্ণের পংক্তি নিয়ে গঠিত ছন্দকে বলা হয় 'মন্দাক্রান্তা'। মন্দাক্রান্তার আর একটি লক্ষণ এই যে, এর প্রথম চার বর্ণের পর একটি, পরবর্তী ছয় বর্ণের পর আর একটি যতি থাকার ফলে প্রত্যেক পংক্তি তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি ভাগের নাম 'গণ', পর্ব নয়।

কারণ পর্বে মাত্রা সংখ্যা সর্বদাই সমান থাকে। ফলে ঝোঁক যুক্ত পর্বকে স্বীকার করে নিয়ে 'বীররসের' কাব্য রচনা করা অসম্ভব।

বাঙালির ছন্দ-বোধের কথা রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা সাধারণত বাক্য বা পর্বের প্রথমে ঝোঁক বা প্রস্বর দিয়ে ছেদ বা যতি পর্যন্ত গড় গড় করে পড়ে যাই। প্রতিটি শব্দের যে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বা ওজন আছে, সেগুলির কোনো মূল্য থাকে না। অর্থাৎ বাঙলা শব্দ, উচ্চারণগত মূল্য পায় না, পায় তার অবস্থান ভেদে। এতে কোনো মতেই বীর রসের কাব্য গড়ে উঠতে পারে না। ফলে মধুসূদন পয়ারে প্রবহমানতা আনতে বাধ্য হয়েছিলেন পর্ব-নির্ধারক যতিকে অস্বীকার করে।

বাঙালির চিরাচরিত ছন্দ চেতনায় 'পর্ব' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ-ব্যাকরণে 'পর্ব' শব্দের পরিবর্তে 'গণ' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। পরিভাষা হিসাবে 'পর্ব' শব্দটি বিজ্ঞান-সম্মত। মনে হয় দেশি 'পাব' শব্দ থেকেই পর্ব শব্দের সৃষ্টি। আমরা যে আখের পাব, নল-খাগড়ার পাব বাঁশের পাব ইত্যাদি বলি সেই ধারণা থেকেই। দুটি গাঁঠের মধ্যবর্তী অংশকে আমরা পাব বলি। পাব গুলি সমান মাপের। এই পাব শব্দকে সংস্কার করে আমরা 'পর্ব' বলে থাকি।

কিন্তু এই চমৎকার অর্থবহ সংজ্ঞা 'পর্ব' ছন্দ-বিচারের ক্ষেত্রে কে প্রথম ব্যবহার করলেন জানবার বিষয়। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের কথায়, "বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক উচ্চারণ বিভাগ অর্থে 'পর্ব' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় বোধ করি রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ছন্দ' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত (শ্রাবণ—১৩২১, ইং ১৯১৪) এই প্রবন্ধটির একস্থানে আছে, (ছন্দ, ৩য় সংস্করণ পৃ-৩২) যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বে ঝোঁক দিয়া থাকি।" রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ সরস্বতী বইতে পর্ব শব্দ ব্যবহার করেন। আজ ছন্দ ব্যাকরণে 'পর্ব' সর্বাধিক জনপ্রিয় শব্দ।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখা যায় পর্বানুসারী ছন্দ সৃষ্টি। পজ্ঝটিকা তার প্রথম দৃষ্টান্ত। পজ্ঝটিকার পর্ব মাত্রই চার মাত্রার। শুধু তাই নয় 'পঞ্চকল গণ' বা পাঁচ মাত্রার পর্ব জয়দেবে যথেষ্ট পরিমাণ জনপ্রিয়। যেমন—

| | | | | ‖ | | | ‖ | | | ‖ | ‖
বদসি যদি / কিঞ্চিদপি // দন্তরুচি / কৌমুদী
| | | | | | | | | | | | |
হরতিদর / তিমির মতি / ঘোরম্

বাঙলা পয়ারে যেমন ৮।৬ মাত্রার পদগুলিতে ৪ মাত্রার পর্বই রয়েছে, তীব্রভাবে চারমাত্রার পর যতি এবং ঝোঁক দিয়ে নতুন পর্ব শুরুকে ক্ষীণ করা হয়েছে তেমনি সংস্কৃত ভাষাতেও দ্রুতপদে ছুটে চলার পজ্ঝটিকা ছন্দেও চার মাত্রায় পর্ব বিভাজনকে অস্পষ্ট করে বৃহৎ যৌথ পরিবারের মত দীর্ঘ পজ্ঝটিকাতে পরিণত করার প্রয়াস রয়েছে।

| | | ‖ | | ‖ | | | | | ‖
যদি হরিস্মরণে সরসং মনো = ১৬
| | | ‖ | | ‖ | | ‖ | | |
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্ = ১৬
| | | | | | ‖ | | ‖ | ‖
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং = ১৬
‖ ‖ | ‖ | | ‖ | | ‖ | ‖
শৃনু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।। = (১৬+২) ১৮

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের বহনক্ষমতা বাঙলায় তিন রীতির মধ্যে সর্বাধিক। চার মাত্রার পজ্ঝটিকা বা

কলাবৃত্ত ঝর্ণার মত 'তরলিত চন্দ্রিত চন্দন বর্ণা' হয়ে কেবলই ছুটে চলে—বড় জোর ছিপখান তিন দাঁড় তিন জন মাল্লাকেই তা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশাল ভারবাহী বড় নৌযান তাতে যেতে পারে না। এর চেয়ে সামান্য কম ক্ষিপ্র দলবৃত্ত—চার মাত্রার—বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান—জোয়ারে উচ্ছ্বসিত প্লাবনের নদীর মত—ভারি তৈজসপত্র বহনকারী নৌযানের ক্ষেত্রে ঠিক নাব্য নয়। এরপরই মিশ্রবৃত্ত বা পয়ার-এর গতি ধীর স্থির, পাল তুলে অর্ণবযানের যাত্রা চলে—তরঙ্গ ভঙ্গ করে ভারি ভারি ভাব, কাহিনী ও চিত্রের পসরায় তা পূর্ণ। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের জন্য মিশ্রবৃত্তকেই গ্রহণ করেছিলেন। অথচ দলবৃত্ত ছন্দের ব্যাকরণ তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্বল্পায়তন কাহিনীর ক্ষেত্রে বা ব্যঙ্গচিত্রের পক্ষে দলবৃত্তের প্রয়োগ স্বাভাবিক। যেমন তাঁর প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে সার্থক দলবৃত্তের ব্যবহার আছে।

বাইরে ছিল / সাধুর আকার //
মনটা কিন্তু / ধর্ম্ম ধোয়া //
পুণ্য খাতায় / জমা শূন্য //
ভণ্ডামিতে / চারটি পোয়া //

মধুসূদন মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদীকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছন্দ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত উভয় বৃত্তেরই প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মিশ্রবৃত্তে বিদ্যমান। বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ড. অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী প্রণীত বৈদিক ও লৌকিক ছন্দে পিঙ্গল পুস্তকে (পৃঃ-৪২) একটি চমৎকার আলোচনা আছে। "বিরাট ছন্দের ভূয়সী প্রশংসা ভিন্নভাবে শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ছন্দের শক্তি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। এই বিরাট ছন্দঃ পঞ্চবিধ বীর্য যুক্ত।" তিনি দেখিয়েছেন পাদত্রয় বিশিষ্ট বিরাট ছন্দ গায়ত্রী ও উষ্ণিক ছন্দের গুণবিশিষ্ট অক্ষর সংখ্যার দিক দিয়ে অনুষ্টুপ ছন্দের সদৃশ এই বিরাট ছন্দ। তা ছাড়া বিরাট ছন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রীর মতে, "এইভাবে গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ ও বিরাট—এই সব ছন্দের বীর্য্য এই বিরাট নামক ছন্দে আছে।" সেই রকম মিশ্রবৃত্ত ছন্দে দলবৃত্তের মত রুদ্ধদলের জন্যও (closed syllable) একমাত্রা (শব্দ-মধ্য-রুদ্ধদল) আবার কলাবৃত্তের মত রুদ্ধ দলের জন্যও দুই মাত্রা (শব্দান্তের রুদ্ধ দল) গৃহীত। এ ছাড়া পদগঠনকালে পর্ব বিভাজনে যথেষ্ট পরিমাণ শিথিলতা। মধুসূদন বীররসের কাব্য রচনা করতে গিয়ে বিচিত্রভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর মত বহু অনিয়মকে এই মিশ্রবৃত্ত পয়ার আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কতকগুলি প্রযুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলি মধুসূদন খুব সচেতন ভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন।

ক) পয়ারের অন্ত্যমিলকে তিনি ব্যবহার করলেন না। কারণ তিনি জানতেন, বীররসের কাব্যের গতি হবে সৈন্যদলের চলার মত। যোদ্ধারা পেছন ফিরে তাকাবে না। পয়ারের অন্ত্যমিলের বৈশিষ্ট্য হল শেষ চরণের মিল পেছন ফিরে দেখে প্রথম চরণের মিলের সঙ্গে মিলছে কিনা। যুদ্ধের বর্ণনা ও বীররস সৃষ্টির জন্য তিনি অন্ত্যমিলকে ক্ষতিকারক মনে করলেন।

খ) ৮।৬ মাত্রার পদ-বিন্যাস এসেছে ৮।৮ এর পজ্ঝটিকা বা পাদাকুলক থেকে। বাঙলা ছন্দ যতি ও পর্বের উপর দাঁড়িয়ে এবং পর্বের শুরুতে থাকে ঝোঁক বা এ্যাক্সেন্ট্। মধুসূদন দেখেছিলেন পর্ব বা পদের শুরুতে ঝোঁক বীর রস প্রকাশে সক্রিয় হবে না। পদান্তের পূর্ণযতি শ্বাস, প্রশ্বাস ও বিশ্রামের উপযুক্ত হতে পারে কিন্তু ক্রমাগত সম্মুখে চলার প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ হবে। তিনি অর্থানুসারী প্রবহমানতা, চরণের পর চরণে সঞ্চারিত করলেন।

গ) এর ফলে ঝোঁক বা তাল ঠুকে পর্ব শুরু হল না। বরং খাপছাড়া ভাবে তিনি এমন একস্থানে অর্থ-যতির অবস্থান ঘটালেন যা চিরাচরিত ছন্দ চেতনাকে আঘাত দিল। সেই সঙ্গে অর্থ প্রকাশক গম্ভীর শব্দও পয়ারের সুরে হারিয়ে গেল না। এই কাব্যে ছন্দ ও ভাবের মিলন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

"পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। তার আরম্ভেই বীরবাহুর বীর মর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু';তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে—'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি'; তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো, এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল—'কোন্ বীর বরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি রাঘবারি।"—(৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা, ছন্দ)

মধুসূদনের প্রভাব

পরবর্তী ছন্দ-ধারায় মধুসূদনের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর পূর্বে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতির ব্যবহার বাঙলায় ছিল না। ক্লাসিক ছন্দ-রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু কিছু পণ্ডিত কবি বাঙলাতে নয়, ব্রজবুলিতে পদরচনা করেছিলেন কিন্তু দেখা যায় তাঁরা ছন্দের ব্যাকরণ সর্বত্র মানতে পারেন নি। দলবৃত্ত যা বাঙলার লৌকিক ছন্দ পূর্বেই বলেছি এটি অস্ট্রিক জাতি সমূহের সর্বাধিক জনপ্রিয় ছন্দ, তার বিকাশ ঘটতে থাকে সাধারণ মানুষের দ্বারা যারা সামান্য পূর্বেই কোল ভাষা গোষ্ঠীর ছিল। এই ছন্দের শক্তি ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আসে না।

তবুও মধুসূদন সাহিত্যে এর ব্যবহার করেননি। তিনি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হিসাবে মিশ্রবৃত্তকেই কাব্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মিশ্রবৃত্তের সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎস কিন্তু মধুসূদন; আমরা ধীরে ধীরে এই আলোচনায় অগ্রসর হব।

১) গৈরিশ ছন্দ : মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাত ধরেই গৈরিশ ছন্দের আবির্ভাব। আমাদের সাধারণ ধারণা সেযুগের নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক ও ধর্মাশ্রিত নাটকের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই ছন্দকে অদ্বিতীয় মনে করেছিলেন। এতে অর্থ অনুযায়ী যতি ব্যবহৃত হয়েছে তবে ৮।৬ মাত্রার অনুশাসন মানা হয়নি। গিরিশচন্দ্রের ছন্দ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) তাঁর গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প পুস্তকে (পৃ-৫৪) বলেছেন, "মাইকেলের কাব্যে যেমন একটি সজীব তেজঃপূর্ণ ভাব আছে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যের ভিতরেও ঠিক সেই রূপ গম্ভীর, স্থির, ধীর ও তেজঃপূর্ণ ভাব রহিয়াছে। সময়োপযোগী জাগ্রত ভাবরাশি তিনি মুক্ত হস্তে জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। জাতি যতটুকু সহ্য করিতে পারিবে ততটুকু জীবন্ত ভাবসম্পদ্ তিনি দিয়াছিলেন। অধিক মাত্রা হইলে বিপর্যস্ত ভাব হইবে, সেইজন্য নিক্তিতে মাপ করিয়া তিনি শব্দ ও ভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই হইল গৈরিশ ছন্দ।" মহেন্দ্রনাথ দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও গৈরিশ ছন্দের তুলনা করেছেন। "মাইকেল মধুসূদনের ছন্দও চৌদ্দ অক্ষরের; ইহা আট ও ছয় অক্ষরে ভাগ হইয়াছে এবং পংক্তি বা চরণ কখন বা প্রধাবিত অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরেই ভাব প্রকাশ

পাইল, কখন পরবর্ত্তী পংক্তির আরো চার অক্ষর লইয়া যোল অক্ষরে পরিপূর্ণ হইল, এবং অপর চরণটি দশ অক্ষরে হইল।" এই আট ছয় মাত্রা থেকে মুক্তি নিয়ে গিরিশচন্দ্র নাটকের ভাষাকে আরও সাবলীল করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথের কথায়, "ইহা আকাশের ন্যায় মুক্ত। কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে এমন সুনিয়ম আছে যে সহজেই ছন্দে আনা যায়।" এক কথায় ৮।৬ মাত্রার পদবিভাজন থেকে মুক্তি পাওয়ার ফলে প্রবহমানতা অনেক শক্তিশালী হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় কৌশলে এই ছন্দ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বলেই তা আজ গৈরিশ ছন্দ নামে পরিচিত।

"চিন্তামণি—কভু এলোকেশা—
উলঙ্গিনী ধনি,
বরাভয়করা, ভক্ত-মনোহরা
শব 'পরে নাচে বামা
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত ভূধর—
দিগম্বর জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে বববম বলি গালে। -বিল্বমঙ্গল

মহেন্দ্রনাথের মতে ৮।৬ মাত্রার দ্বিপদীতে পংক্তিগুলি বিভক্ত নয় সত্য—তবে মিশ্রবৃত্ত রীতির যে প্রধান বৈশিষ্ট্য জোড়মাত্রিক পংক্তি গঠন এবং বিজোড় শব্দ থাকলে বিজোড় দিয়ে জোড় করে নেওয়ার বিষয়ে গিরিশচন্দ্র অনেক বেশি সচেতন ছিলেন।

এই গৈরিশ ছন্দের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মুক্তক বন্ধের বীজ। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন—মুক্তবন্ধ দুরকম—সমিল আর অমিল মুক্তক। অমিল মুক্তক মূলত গৈরিশ ছন্দেরই আধুনিক রূপ—

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্যনহে যে মানব।
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে নিশিথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও কেড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ তার সৌন্দর্য-বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালবাসো, প্রেমে হও বলি,
চেয়ো না তাহারে।

আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের। 'মানসী', নিষ্ফল কামনা (১৮৮৭)

এই কবিতায় অন্ত্যমিল থাকলেই হয়ে যাবে তা মুক্তক।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে। বলাকা

কিন্তু মধুসূদনের কিছু কিছু কবিতায় মুক্তকের আভাস দেখা যায়।

ময়ূর কহিল কাঁদি গোরার চরণে
কৈলাস ভবনে
অবধান কর দেবী
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ আসনে
রথী যথা দ্রুত রথে
চলেন পবন পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি
তবু মাগো, আমি দুঃখী অতি।। 'ময়ূর ও গোরা'

গৈরিশ ছন্দের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে বলতে হয় গৈরিশ ছন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলায় এত প্রকার ছন্দ-বন্ধ আবির্ভূত হলেও মূলত গৈরিশ ছন্দ গড়ে ওঠার পেছনে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা বিশেষ কিছুই নেই। এটিও মূলত মধুসূদনের সৃষ্টি।

"মেঘনাদবধের ছন্দ অমিত্রাক্ষর হলেও পয়ার ছন্দের ছাঁচে ঢালা। রাবণবধের ছন্দও অমিত্রাক্ষর, কিন্তু পয়ারে ছাঁচটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাই এ ছন্দকে বলা হয়েছে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর'। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের ছন্দেও পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধকে খাতির করা হয়নি। এই মুক্তবন্ধ রূপটাই উভয় গ্রন্থের ছন্দোগত প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, মিল রাখা বা না রাখা নয়। সম্ভবত এজন্যই সন্ধ্যা সঙ্গীতের ভাঙা-ছন্দ রচয়িতা তরুণ কবি রাবণবধের ভাঙা ছন্দের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে বলেছেন, 'গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।'

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাঙলা সাহিত্যে ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য নয়, সে কৃতিত্বের যথার্থ অধিকারী কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন।"—(প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইয়ের ২৮৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা।) প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন, ১৮৬০ খৃস্টাব্দে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেন সর্বপ্রথম। তার বহু পরে 'রাবণবধে' ১৮৮১ খৃস্টাব্দে এই ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন গিরিশচন্দ্র।

মধুসূদনের দ্বারা মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রায় সমস্ত রকম পরীক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'তে দেখা যায় প্রবহমান পয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘটনা ও চিত্র বহনের প্রধান ছন্দ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ আর কিছুই নয়—অমিল প্রবহমান পয়ার। রবীন্দ্রনাথ ৮।৬ মাত্রাকে মেনে অন্ত্যমিল রেখে ভাব প্রকাশে প্রবহমানতা আনলেন—

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে

তীর্থস্নান লাগি। সাঁদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে। দেবতার গ্রাস।

৮।৬ মাত্রার পয়ার পরবর্তীকালে আরও বিশাল আকার ধারণ করে ৮।১০ মাত্রার পয়ারের রূপ নিল। পয়ারের ৮।৮ মাত্রার বিকাশ দেখা গেল সেই সঙ্গে।

যেই দিন ও চরণে।। ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন।। করিয়াছি বিসর্জন
হাসিবার কাঁদিবার।। অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনম-ভূমি।। মা আমার মা আমার। কামিনী রায়, আলো ও ছায়া।

৮।১০ মাত্রার মহাপয়ার আজকের দিনের জনপ্রিয় ছন্দ। প্রবহমানতা এসে সনেট ও আধুনিক কবিতায় জোয়ার এসেছে মহাপয়ারের মাধ্যমে।

কিন্তু মধুসূদনের অন্ত্যমিল তুলে দেওয়ার মানসিকা আধুনিক বহু কবির মধ্যেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সার্থক নতুনত্ব আনলেন জীবনানন্দ। ত্রিপদীবন্ধের ৮।৮।৬ বা ৮।৮।১০ এর প্রথম দুটি পদের অন্ত্যমিল উৎখাৎ করে দিয়ে এক নতুন স্বাদ আনবার চেষ্টা করেছিলেন জীবনানন্দ।

৮।৮।৬ মাত্রার প্রচলিত ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত--

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা—কল্পনা, অশোক

প্রথম দুটি পদের অন্ত্যমিল তুলে প্রবহমানতা আনলেন জীবনানন্দ—ত্রিপদীতে (৮।৮।৬ মাত্রার)

হাজার বছর ধরে
আমি পথ হাঁটিতেছি
পৃথিবীর পথে।
সিংহল সমুদ্র থেকে
নিশীথের অন্ধকারে
মালয় সাগরে—

এইরকম ৮।৮।১০, কোথাও ৮।৮।২ মাত্রার সংযোগে তিনি মিশ্রবৃত্তের আদলটি রেখে দিয়েছেন। যেমন--

ক) চুল তার কবেকার/ অন্ধকার বিদিশার/ নিশা ৮।৮।২

খ) সবুজ ঘাসের দেশ/ যখন সে চোখে দেখে ৮।৮
দারুচিনি দ্বীপের ভিতর ১০
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে ৮।৮
এতদিন কোথায় ছিলেন ১০

রূপসী বাংলার প্রায় সব কবিতাই এই আদর্শে লেখা। দু-এক জায়গায় সামান্য ব্যতিক্রমও আছে।

বাঙলার মুখ আমি/ দেখিয়াছি, তাই আমি/ পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর/ অন্ধকারে জেগে উঠে/ ডুমুরের গাছে।
চেয়ে আছি।

এসব কবিতাকে আমরা প্রবহমান ত্রিপদী বলতে পারি।

চিরাচরিত প্রথায় গড়া ৮।৬ মাত্রার পয়ারে মধুসূদন তিন রকম পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। (১) প্রবহমানতা, (২) অন্ত্যমিল তুলে দেওয়া, (৩) শুধু ভাব অনুসারী যতি নয় অনিবার্যভাবে যতি প্রয়োগ: প্রয়োজন বোধে তিন মাত্রার পর্ব তৈরি করে থেমে যাওয়া। জীবনানন্দ প্রবহমানতার ক্ষেত্রে অসাধারণ সুন্দর ও স্বাভাবিক ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই প্রবহমানতা মিশ্রবৃত্তে যতখানি সুন্দর ও মানানসই দলবৃত্ত বা কলাবৃত্তের ক্ষেত্রে তা হয় না। রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত রীতিতে যে মুক্তক বন্ধ রচনা করেছেন তাতে দলবৃত্তের চারমাত্রার যতি বা পর্ব বিভাজন যথেষ্ট স্পষ্ট বা তীক্ষ্ণ।

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রীশালায়
মনে হল এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, কেন, এইতো বেশ।'
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা
আনন্দে তাই এক হল তার পৌছনো আর চলা। ফাঁকি পলাতকা

তাল ঠুকে ঠুকে তৈরি চার মাত্রার পর্বকে গম্ভীর করে তোলা যায় কলাবৃত্তে এবং মিশ্রবৃত্তে একেবারে আট মাত্রার পদ দিয়ে। তেমনি একেবারে আট মাত্রায় দুটি পর্ব রেখে পদ তৈরি করা যায় দলবৃত্তে। সেখানে চার মাত্রার পর যতি অপ্রত্যাশিত। পরীক্ষা স্বরূপ ৮।৬ মাত্রার দলবৃত্ত রীতিতে রচিত দ্বিপদীর উদাহরণ রাখা গেল—

আকাশ ভেঙেছে তাই তুমি/ আসনি তা জানি।। ৮।৬
একা স্বপ্নের জাল বুনে ঘরেতে/ আমি বন্দী মানি।। ৮।৬
তবু গোধূলি লগনে/ যারা প্রদীপ জ্বালে।। ৮।৬
এখন তারাই দেখি আঁধার তাড়ায়/ নাচের তালে তালে।। ৮।৬

দলবৃত্তের আদিম প্রবৃত্তি চার মাত্রার পর প্রবল আঘাত বা শ্বাসাঘাত এখানে এলে চলবে না। শুধু শেষ চরণে এটি যে চার মাত্রার দলবৃত্ত তার স্পষ্ট প্রকাশ রাখা আছে। অন্ত্যমিলহীন দীর্ঘ দ্বিপদী বা পয়ার, ৮+১০ মাত্রার পদে বিন্যস্ত দলবৃত্ত রীতিতে লেখা—এই দৃষ্টান্তটি

গুরুচরণ কামার মরে/ গেলে পর তার সুপুত্র নিধিরাম
দোকান বিক্রি করে হাপর আর হাতুড়ি নিয়ে চলে গেল
শ্বশুর বাড়ি/ সেখানে সে শালাদের সঙ্গে বানাতে থাকে
বঁটি, ধারালো লাঙ্গল আর// গোপনে তলোয়ারও, জঙ্গীরা
কিনবে বলে/ পুলিশ এসে একদিন তাকে আর শালাদের ধরে
নিয়ে গেল।

মিশ্রবৃত্ত রীতির সমস্ত প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাঁধন ভাঙার কাজ মধুসূদনই শুরু করেছিলেন। তার পূর্ণ বিকাশ পরবর্তী রবীন্দ্র কাব্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত। এখানে দলবৃত্ত রীতির মত কলাবৃত্ত রীতিতেও ব্যাকরণ স্বীকার করে চিরাচরিত ছন্দস্রোতে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া

গেল। এই বন্ধন মুক্তি মূলত মধুসূদনের অবিন্যস্ত পর্ব ও যতি প্রয়োগের ফলশ্রুতি স্বরূপ।

এখানে বলে রাখা ভালো, মধুসূদন শৃঙ্খল ভাঙা দিয়ে কাব্য শুরু করেছিলে বলে তিনি যথেচ্ছভাবে এই নিয়ম ভেঙে ছিলেন তা নয়। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে মোট ৭৮৫টি পঙক্তি আছে। তার মধ্যে মাত্র অনিয়মিত পর্বগঠন ৯টি ও ৪টি অনিয়মিত পদ-গঠন। ঐ চারটি পদ-গঠনে দেখা যায় দুটি পদ মিলে মোট ১৪ মাত্র, ৮-৬ মাত্রায় সজ্জিত নয়, ৭।৭ মাত্রার দুটি পদে গঠিত। যেমন

১. ডোবে শোক সাগরে ।। মৃণাল যথা জলে।। ১৩৭।১

২. রুদ্ধ এবে হেরিলা ।। বৈদেহী হরতফ।। ২২২।১

৩. ভীমা সমা! অদূরে।। হেরলা রক্ষঃপতি।। ২৪৩।১

৪. ঘোর রোলে! হেমাঙ্গী ।। সঙ্গিনী দল সাথে।। ৩২৫।১

৮।৬ মাত্রার পদে সাজানো তবে শব্দ ব্যবহারে পয়ারের প্রচলিত 'আড্ডা' ভেঙে গেছে।

১. বাজিলে কাঁদে নীরবে । করযোড় করি ৬৬।১

২. রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সূর্পণখা ৯৯।১

৩. পাবক শিখা রূপিণী জানকীরে আমি ১০৩।১

৪. কুসুম-দাম-সজ্জিত দীপাবলীতেজে ১০৭।১

৫. রাক্ষস কুল শেখর, ক্ষম এ দাসেরে ১২২।১

৬. পশিলা বীর কুঞ্জর অরিদল মাঝে ১৪৭।১

৭. দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম। তুমি ৩৫৩।১

৮. প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতিগৃহে কাঁদে ৫৪৩।১

৯. রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি বৎস। তুমি ৭৩৮।১

ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এখন কমেই গেছে। আধুনিক কবিতায় ভাবের গভীরতা, তীব্র অনুভূতি সেই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা যুক্ত থাকায় কবিতা ছন্দের অভাব বেশি অনুভূত হয় না। কিন্তু স্পষ্ট ছন্দ-প্রযুক্তি কবি-প্রতিভার মহীরুহকে মাটির তলায় অদৃশ্য শেকড়ের মত শুধু দাঁড় করিয়ে রাখে না বর্ণগন্ধ পুষ্পের বাহার ঘটায়। একেবারে নবীন কবিরা গদ্যকবিতায় সিদ্ধ হস্ত। তাঁরা ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু গদ্য কবিতার ভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আগে ছন্দের ব্যাকরণ সামান্য জানা দরকার। আমাদের যাঁরা জনপ্রিয় কবি তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ছন্দ সচেতন। আজকের দিনে বিশেষত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ এবং সামান্য পূর্বে অলোকরঞ্জনের কবিতায় ছন্দ-সচেতন পদযাত্রা আমরা লক্ষ্য করেছি। হয়ত আরও অনেকে আছেন। নতুনরাও আসছেন। কবিতায় ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই। মধুসূদন যে সাহসিকতা নিয়ে আমাদের স্বাভাবিক ছন্দ-চেতনায় নাড়া দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। ❑

হরকোপানলে না পুড়ে যেন রে কাম!

বিশ্বজিৎ রায়

মধুসূদন তাঁর চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর 'কবি' শীর্ষক সনেটটিতে কবির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে :

সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

লক্ষণীয় এই উপমানটি। কল্পনা অস্তসূর্যের কিরণসদৃশ। অস্তসূর্যের বিভায় আলোকিত হচ্ছে কবির মনঃকমল। এই উপমানটি আমাদের চকিতে মনে করিয়েও দিতে পারে মেঘনাদবধ কাব্যের আরেকটি উপমানের কথা। ষষ্ঠ সর্গে অন্যায় সমরে নিহত হয়েছেন ইন্দ্রজিৎ। মধুসূদন লিখেছেন :

লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি মহাবল রহিলা ভূতলে।

বাল্মীকি রামায়ণের মেঘনাদ মধুসূদনের কাব্যে নতুনভাবে নির্মিত। এই নতুন নির্মাণের পেছনে রয়েছে কল্পনার ভূমিকা। সেই সূত্রে দুই সদৃশ উপমানকে পাশাপাশি রাখাই যায়। কল্পনা সুন্দরী কবিমনকে আলোকিত করছেন আর লঙ্কার পঙ্কজরবি ইন্দ্রজিতের মৃত্যুদৃশ্য পাঠক হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার ঘটাচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে এই বেদনা জাগ্রত হয় না অথচ মধুসূদনের কাব্যে পাঠক প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবির নব নির্মাণ কৌশলেই তা সম্ভব হচ্ছে। অথচ মধুসূদনের সমালোচকরা অনেক সময়েই ধরতে পারেন না কবি কল্পনার মাহাত্ম্য। তীব্র অভিযোগ করেন, 'প্রকরণের অভিনবত্ব বাদ দিলে' মেঘনাদবধ কাব্যে 'অপূর্ব্ব পরিবর্তন বা বিদ্রোহ কিছুমাত্র নেই।'[১] এমন কী মেঘনাদবধ কাব্যের পরিণতির অসামঞ্জস্যটুকু ধরিয়ে দিতেও পিছপা নন বুদ্ধদেব : '...শেষ পর্যন্ত আমরা তো এই দেখলুম যে মেঘনাদ-প্রমীলা পাশাপাশি বসে রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন, আর মৃত্যুর পরে এতই যদি সুখ তাহলে আর মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করব কেন, আর রাবণের জন্যই বা দুঃখ কিসের।'[২] বুদ্ধদেব 'প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী' আর 'দুর্মরতম কুসংস্কার' ঘোচানোর জন্য কলম ধরেছিলেন। অথচ এখন বুদ্ধদেবের লেখাটি পড়তে গিয়ে আমাদের মনে হয় মেঘনাদ-প্রমীলার স্বর্গারোহণের দৃশ্যটিকে তিনি নিতান্তই সংস্থানচ্যুত করে দেখেছেন। এই সংস্থানচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করা যায় রবীন্দ্রনাথকেও। 'ভারতী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাটিকে বুদ্ধদেব চিহ্নিত করেছেন 'তারুণ্যের সত্যভাষণ' হিসেবে। এই তারুণ্যের সত্যভাষণে অন্যান্য অভিযোগের পাশাপাশি দুটি অভিযোগ লক্ষ্য করার মতো। দুটিই পুরাণপ্রয়োগ সংক্রান্ত।

ক. 'বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবে তো রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রইল না।'[৩]

খ. রতি মদন সংক্রান্ত অন্য আপত্তির খোঁজ পাওয়া যাবে শিবের ধ্যানভঙ্গ প্রসঙ্গে। ধ্যানস্থ শিবকে কামকলায় পরিতুষ্ট করে রাবণপক্ষ থেকে রামপক্ষে নিয়ে আসতে চান পার্বতী। তাঁর এই কাজে সহায়ক রতিপতি মদন।

চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যেথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা চল ত্বরা করি।

এই 'বাছা' সম্বোধনটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। বাছার সঙ্গে মাতার শৃঙ্গার রসাত্মক বাক্‌বিনিময় তাঁর কাছে চূড়ান্ত রসাভাস। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের টিপ্পনী, 'বাছার সহিত মাতার কী চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন?'

আপাতভাবে বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা নিতান্ত অসার বলে মনে হয় না। এমন কী মধুসূদনের কাব্যের যে মনোযোগী পাঠক তাঁরা, তাও স্বীকার্য। কিন্তু অনেক সময়েই তো কোনো পাঠের খণ্ডতায় ঢাকা পড়ে যায় অন্যতর সম্ভাবনা। যদি সেই অন্যতর সম্ভাবনা আবিষ্কার করা যায় তখন প্রতিকূল যুক্তিগুলিকে সাজিয়ে ফেলা যায় গভীরতর আনুকূল্যে। এখন তত্ত্বগতভাবে লেখকের মৃত্যু ঘটে গেছে। অবিনির্মাণের দাপটে টীকাব্যাখ্যাও প্রায় বাতিল। তবু মেঘনাদবধ কাব্যের একটি পাঠ সম্ভাবনাকে স্পর্শ করতে চাইছি আমরা। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের প্রতিকূল সমালোচনা সেই পাঠ নির্মাণের আয়ুধ। তাঁদের সমালোচনাকে বিশেষ একটি সংস্থানে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অভিষ্ট। এটা পরম কৌতুকের যে, কোনো প্রতিকূল সমালোচনা বিশেষ সংস্থানে অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের সাহিত্য জীবন থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'যোগিয়া' (কড়ি ও কোমল) কবিতার মিঠে ও কড়া প্যারোডি করেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। 'মানুষের মনে মনে/এতদিন ছিলে ভাল।/কেন রে পুলক আজ/তোমার এ দশা হলো?.../নাচিতেছ কোন্ গাছে,/কোথায় সে গাছ আছে?/না জানি কেমন গাছ—হায়রে কপাল!/শেওড়া কি সহকার/ ঠিক করে সাধ্য কার?/তাল নারিকেল কিংবা খর্জ্জুর কাঁটাল!' কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনাময় রোমান্টিক কবিভাষার কাব্যসংস্থানটি ধরতে পারছেন না বলেই পুলককে শেওড়া গাছে তুলেছেন। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি 'যোগিয়া' কবিতায় 'পুলক নাচিছে গাছে গাছে' এই কাব্যপঙ্‌ক্তিটির কবিভাষাগত স্বাতন্ত্র্য কালীপ্রসন্ন লক্ষ্য করেছেন কিন্তু পুরো কবিতাটির সঙ্গে পঙ্‌ক্তিটি কোন্ অন্তর্লীন সামঞ্জস্যে যুক্ত তা বুঝতে পারেন নি। অথচ কবিতাটির মধ্যে ছিল 'গাছপালা চারিভিতে/সংগীতের মাধুরীতে/মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নচ্ছবি।/এ প্রভাত মনে হয়/আরেক প্রভাতময়/রবি যেন আর কোনো রবি।'—এর মতো পঙ্‌ক্তি। রবীন্দ্রনাথ বস্তুপুঞ্জের বিন্যাসকে কেন ভাঙছেন বোঝা যায়, অবশ্য কালীপ্রসন্ন বোঝেন নি। একই ভাবে সজনীকান্ত দাস যখন জীবনানন্দের কবিভাষাকে সংস্থানচ্যুত করে তাঁর মধু ও হুল-এর বিষয় করে তুলছিলেন তখন স্বয়ং বুদ্ধদেব জীবনানন্দের পক্ষে লেখনী ধারণ করেছিলেন, বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন জীবনানন্দের উপমানের যথার্থ সংস্থান। তাই বিরুদ্ধ সমালোচনার সূত্র ধরেই স্পর্শ করা যেতে পারে অনুকূল প্রতিবেশ, সেক্ষেত্রে শুধু আবিষ্কার করতে হবে যথার্থ সংস্থানটি। অবশ্য কবিতে কবিতে সামর্থ্যের পার্থক্য আছে। ভাব ও প্রকাশ সব কবির রচনাতেই যথার্থ সমন্বয় লাভ করবে এমন ভাবনা অনর্থক। তবে কবি হিসেবে মধুসূদন ব্যর্থ, 'তাঁর নাটকাবলি অপাঠ্য' 'মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দ্দশ-পদাবলি বাগাড়ম্বর মাত্র' এই বৌদ্ধ-ভাবনা আমরা স্বীকার করি না। কেন করি না তা বোঝানোর জন্যই 'ইন্দ্রজিৎ' এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির বিন্যাসকে আমরা নতুন করে তুলে ধরতে চাইছি। কোনো একটি কেন্দ্রীয় উপমান দিয়ে গোটা মহাকাব্যকে হয়তো পড়া যায় না কিন্তু মহাকাব্যটির কোনো একটি সম্ভাবনাকে স্পর্শ করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যে মদন-রতি পুরাকাহিনীটি এক বিশেষ উপমান পরম্পরায় আবর্তিত হয়েছে। না: স্কন্দপুরাণ, সৌরপুরাণ বা পদ্মপুরাণের চেনা সরল চেহারায় 'মদনভস্মকাহিনী' এখানে পুনরাবৃত্ত

হয়নি। তার সংগঠন বদলে গেছে—তৈরি হয়েছে পুরাণের নতুন রূপ। পুরাণের এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে পড়ে ফেলা যায় মেঘনাদবধ কাব্য। যে রবীন্দ্রনাথ 'মানময়ী' নাটকে মদন সেজেছিলেন, 'বিজয়িনী' কবিতায় পরাজিত মদনের নতুন পুরাণ নির্মাণ করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই অল্পবয়সের উত্তেজনায় পূর্বজ কবির মদন কাহিনীর নতুন নির্মাণকে ধরতে পারেন নি। আর বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত, '... আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম মাইকেল ঘটান নি, ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ...।' সত্যি কি বলা যাবে একথা?

আমরা তা বিচার করব। বুঝতে চেষ্টা করব মেঘনাদ ও প্রমীলার স্বর্গযাত্রার ঘটনাটিও পুরাণপ্রয়োগের বিন্যাসে বিচার করা যায় কি না? অর্থাৎ পুরাণপ্রয়োগের সংস্থান ও কাব্যটির সংরূপসংক্রান্ত আলোচনাকে হয়তো পাশাপাশি রাখা যায়। এরই সঙ্গে এসে যাবে কবির অভিপ্রায় প্রসঙ্গ। লেখকের মৃত্যুতত্ত্বে আমরা কবির অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিই না। অথচ এই লেখাটির অন্যতর এক রাজনীতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জ্ঞানলব্ধ নবজাগরণের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে অব্যবহিত পূর্ববর্তী মধ্যযুগের সাহিত্যধারাটিকে আমরা অনেক সময়েই বিস্মৃত হই। নবজাগরণের সূত্র ধরে সংস্কৃত সাহিত্যধারাটিও আলোচিত হয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে নিশ্চুপতাই গ্রাহ্য সাহিত্য সমালোচনার আদিকল্প। অবশ্য মধুসূদনের কাব্য সমালোচনায় বিরল একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ এক্ষেত্রে না করলে অন্যায় হবে। বিষ্ণু দে তাঁর 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, 'রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী যশোর-খিদিরপুরের ছেলেরও রক্তের মধ্যে অমর হয়ে রইল।' অবশ্য এই মন্তব্যের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট উদাহরণ প্রবন্ধটিতে নেই। আমরা ধরে নিতে পারি কবি-প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন মধুসূদন সম্বন্ধে অনালোচিত একটি অধ্যায়। উত্তরাধুনিক কালপর্বে আজ আমরা যখন ইয়োরো-কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করছি তখন উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারার সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন সাহিত্যপাঠের যোগ্যতর অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে পারে। এর পেছনে অন্য আদিকল্প[৮] আছে। আর আমাদের এই নতুন আদিকল্পের প্রতিষ্ঠায় কবির সঙ্গে বোঝাপড়া প্রয়োজন। কবির নির্মাণপূর্ব প্রস্তুতির জগৎকে আমরা যেমন স্পর্শ করব তেমনই পুনরাবৃত্ত উপমাপুঞ্জ থেকে বুঝে নিতে চাইব কবির অভিপ্রায়। এই আদিকল্প নির্মাণের রাজনীতির সূত্রেই লেখকের মৃত্যুর তাত্ত্বিকতাকে আমরা সম্পূর্ণ মানছি না।

২

রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের সমালোচনাকে খারিজ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে মদনভস্মের প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীটি কী ছিল। দেবতাদের নির্বন্ধে কামদেব মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ মহাদেব ধ্যানভঙ্গকারী মদনকে ভস্মীভূত করেন। পরে রতিবিলাপে তুষ্ট মহাদেব অনঙ্গকে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। অনঙ্গ মদন বায়ুর মতো অপ্রতিহত গতিতে ধনুর্বাণ ধরে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন।

পৌরাণিক মদনভস্মের কাহিনী কালিদাসের কুমারসম্ভব-এ অসামান্য শিল্পরূপ লাভ করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মদনভস্মের পৌরাণিক কাহিনীটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও মধ্যযুগের কাব্যধারায় সুদর্শন পুরুষমাত্রেই মদনরূপে উপমিত। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে মদন প্রসঙ্গ প্রথম ব্যবহৃত হল অনেকটাই মধ্যযুগের সাহিত্যধারার অনুসরণে। রাবণের সভাবর্ণনা প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখেছেন,

ধরে ছত্র ছত্রধর—আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে!

সৌন্দর্যমূর্তি মানেই মদনমূর্তি মধ্যযুগের সাহিত্যে এই উপমান সুপ্রচলিত। অবশ্য খোদ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-এ সুন্দরকে বর্ধমানের নারীগণ মদনের থেকেও মোহময় বলে মনে করেছিল। আর কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর-এ কাঞ্চনপুরের মেয়েরা সুন্দরকে দেখে বলেছে :

আর ধনী বলে এই তরুতলে
নিশ্চয় মদন রায়।
পোড়াইল হর নাহি পঞ্চশর
আর ধনী বলে তায়।[৮]

লক্ষণীয়, সুন্দরের পরিচয় নিয়ে দুই নারীর মতভেদ। একজনের দৃষ্টিতে সুন্দর সাক্ষাৎ মদন, অন্যজন মনে করিয়ে দিয়েছে মদনকে পোড়াইল হর। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে ছত্রধর যেন মদন। এই 'যেন'র মধ্যে উৎপ্রেক্ষা আভাসিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রচলিত মদনকাহিনীকে স্মরণে রেখেই মধুসূদন এখানে উৎপ্রেক্ষাটুকু যোজনা করছেন। মধুসূদনের কাব্যপঙ্ক্তিটিতে ছত্রধর উপমেয়, মদন উপমান। উৎপ্রেক্ষায় উপমান অর্থাৎ পরাত্মাকেই বাস্তব বলে মনে হয়। এখানে যেন মদন হরকোপানলে ভস্মীভূত হননি। মেঘনাদবধ কাব্যের পরবর্তী সর্গে আর উৎপ্রেক্ষা নয়, মদনের ভস্মীভূত না হওয়ার কাহিনীটি সত্যিই সম্ভাবিত হল। সেই কাহিনীটি নির্দেশ করার আগে আমরা একবার খেয়াল করবো কবি মধুসূদনের পড়াশোনার বিস্তার।

মধুসূদনের জীবনীকাররা জানাচ্ছেন আট দশ বছরের মধু মহিলামহলে কাব্যপাঠ শুনতেন। মহিলামহলের কাব্য বলতে তখন বোঝাত রামায়ণ, মহাভারত—সংস্কৃত মহাকাব্য নয়, বাংলাদেশের পাঁচালি কাব্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'মধুসূদনের কবিত্বশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ এবং মহাভারতের নাম তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত। কিন্তু এই রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে বাল্মীকি এবং বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের এবং কাশীদাসেরই নিকট তিনি সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্য সমূহের ব্যক্তি নির্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষাশিক্ষা, বর্ণনানৈপুণ্য এবং পুরাণান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক বিষয়, তিনি কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনার অনেকস্থলেই সেইজন্য ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে।'[১০] মধু মাইকেল মধুসূদন ডাট হলেও মধ্যযুগের কাব্যস্মৃতিকে ভুলে গিয়েছিলেন এমন মনে করার কারণ নেই। বরং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পড়লে বোঝা যাবে কৃত্তিবাস কাশীরামের বাইরেও তাঁর পাঠ্যপরিধি বিস্তৃত। মধুসূদনের কাশীরাম দাস কবীশদলে পুণ্যবান্-ভারতরসের স্রোত এনে সেই বিমল জলে তিনি গৌড়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। কৃত্তিবাস মধুসূদনের কবিতায় কবিপতি। তাঁর বিশ্বাস 'অন্নদামঙ্গলে/ যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।' (অন্নপূর্ণার ঝাঁপি)। কমলে কামিনী আর ঈশ্বর পাটনী তাঁর কবিতার বিষয়। মধুসূদনের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে আমরা বহুকথা ব্যয় করি, কেউ কেউ সংস্কৃত প্রভাবের কথাও বলেন, অথচ 'ব্রজাঙ্গনা'র কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক একথা অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার বহন করা যে মধুসূদনের পক্ষে অসম্ভব নয় তা বোঝানোর জন্যই পাঠকদের সামনে এই কয়েকটি কথা তুলে ধরতে হল। মদন কাহিনীর বিশ্লেষণে এই প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব আছে।

রাবণের সভাবর্ণনায় মদনসদৃশ ছত্রধরকে দেখেছি আমরা। রাবণের এই শোভাময় রাজসভা অবশ্য শেষপর্যন্ত এমন আনন্দময় থাকবে না। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অন্যায় সমরে পরাজিত হবেন। মেঘনাদ ও রাবণকে পরাজিত করার জন্য দেবতারা ষড়যন্ত্র করবেন। মদন এই ষড়যন্ত্রের সহায়ক। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে দেবষড়যন্ত্রের কথা। রাবণকে পরাজিত করার জন্য পার্বতী শিবের কাছে গেছেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ করে পশুপতির কামপরিতৃপ্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কাম পরিতৃপ্ত শঙ্কর রাবণপক্ষ ত্যাগ করলে দেবতারা নিশ্চিন্ত হন। পার্বতীর এই অভিসারে সহায়ক মদন। মদন পার্বতীকে বলেছেন—'স্মরিলে পূর্ব্বের কথা মরি মা তরাসে।' মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠক পূর্বের সেই পুরাকাহিনীটি জানেন। দক্ষদোষে সতী প্রাণত্যাগ করলেন। বিরহী শিব বিশ্বভার ত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন। তখন ইন্দ্রের আদেশে কুলগ্নে শিবের ধ্যান ভাঙাতে গেলেন মদন। ধ্যানভঙ্গ হলে 'গ্রাসিলা' কামেরে 'আসি রোষে বিভাবসু'। মেঘনাদবধ কাব্যে অবশ্য শঙ্করী অভয় প্রদান করেছেন, 'চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে অনঙ্গ।' এই ভরসা দান ব্যর্থ হয়নি। পরম রঙ্গে মধুসূদন ভারতীয় পুরাকাহিনীকে নতুন ভাবে নির্মাণ করেছেন।

পার্বতী মদনকে নিয়ে শিবের কাছে গেলে পশুপতির ধ্যানভঙ্গ হল। ক্রুদ্ধ শিবের রোষাগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তখন মদন কী করলেন? মধুসূদন লিখেছেন,

ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে কেশরিণী কোলে

ভবানীর বক্ষঃস্থলে আত্মগোপন করে বাছা মদন আত্মরক্ষা করেছেন। পার্বতীর সঙ্গে বৎসলতার সম্পর্ক না থাকলে ভবানীর বক্ষঃস্থলে কেমন করে আশ্রয় নেবেন মদন? আর এই আশ্রয়লাভ না করলে তো ষড়যন্ত্র সফল হবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বৎসলতাকে রসাভাস বলে মনে করেছিলেন সেই বৎসলতাটুকু জরুরি। পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যে মদন শিশু না হলেও রোমক পুরাণের ভালোবাসার দেবতাটি শিশু। কিউপিড (Cupid) দেবশিশু পিঠে ডানা, হাতে তীরধনুক। মধুসূদনের বাছা মদন এই কিউপিডের আদলে গঠিত। রবীন্দ্রনাথ তা খেয়াল করেন নি। অথচ ভারতী পত্রিকায় মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনার আগেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'-তে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা গদ্য 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। সেখানে হেরিক (Herrick)-এর 'The Wounded Cupid' কবিতার অবসরসরোজিনী-কার-কৃত অনুবাদ 'মধুমক্ষিকা দংশন'-এর আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিউপিড ভাষান্তরে হয়েছে মদন। মেঘনাদবধ কাব্যে অবশ্য রতিপতি মদন কিউপিডের আদলে বাছা মদনে রূপান্তরিত। আবার শুধু কিউপিড নয় পাশ্চাত্য পুরাণের অন্যসূত্রও মধুসূদনের স্মরণে ছিল। রাজনারায়ণকে চিঠিতে জানাচ্ছেন মধুসূদন, 'As a reader of the Homaric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupitar on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible.'[১১] ইলিয়াড-এ জুপিটার ট্রোজানদের পক্ষে। ঈর্ষাপরায়ণা জুনো মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এবং ভিনাসের বিশ্ববিমোহন কটিবন্ধ ধারণ করে Ida পর্বতে গেলেন। বিমোহিত জুপিটার নিদ্রা গেলেন। ট্রোজানদের সর্বনাশ হল। মধুসূদন মদনভস্মের কাহিনীকে ইলিয়াড-এর উপাখ্যান দিয়ে ভেঙেছেন। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, 'মধুসূদন ইলিয়াডের ঘটনার সঙ্গে কুমারসম্ভবের মদনভস্ম বৃত্তান্ত পরিবর্তিত আকারে সম্মিলিত করিয়া মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ রচনা করেছিলেন।'[১২]

রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ হলেও মধুসূদনের সমকালীন পাঠকেরা এই অংশটি পড়তে গিয়ে কবির প্রতি বীতরাগ হননি তার প্রমাণ কবির চিঠিতে আছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যের এক মগ্নপাঠকের। 'He read out of Book II that part wherein Kam returns to Rati. standing at the ivory gate of the place of Siva. and Rati says to him.

বাঁচালে, দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।'[১১]

দ্বিতীয় সর্গে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য পুরাণের সম্মিলন কেমনভাবে মধুসূদন ঘটিয়েছিলেন সেই চেনা-জানা আলোচনাটা আমরা বেশখানিক করেছি। এতে আমাদের পাঠকরা চটতে পারেন। কারণ মদন কাহিনীর সংস্থানটি ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার ক্ষেত্রে কী ছিল তা দেখানোই আমাদের অভিষ্ঠ। পাশাপাশি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের যোগস্থাপন করব এমন ঘোষণার ঘটাও আমাদের প্রতিপাদ্যে ছিল। আসলে এই মুখ্য প্রতিপাদ্যে আসার জন্য এই চেনা আলোচনাটি সাজিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। কারণ যে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন, 'You must weigh every thought. every image. every expression. every line and all this can not be done in an hour.'[১৪] সেই মধুসূদনের কাব্যে প্রতিটি ভাবনাই সম্পৃক্ত। মদনকাহিনী তাই দ্বিতীয় সর্গেই শেষ হল না। পুরাকাহিনীর ভাঙাগড়ার পরম্পরাটি কাব্যের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। কিন্তু কেমন ভাবে?

দ্বিতীয় সর্গে শিবের রোষ থেকে রতিপতি মদনের প্রাণরক্ষা হলেও দেবষড়যন্ত্রে আরেকজনের মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তিনি ইন্দ্রজিৎ। আমরা বলতেই পারি শিবের রোষেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হলেন। অবশ্য শিবের এই রোষ ছদ্মরোষ। পার্বতীর কামকলায় বাধ্য হয়ে শিব রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ পক্ষ ত্যাগ করেছেন। এই পক্ষত্যাগের অনুশোচনা টের পাওয়া যাবে ইন্দ্রজিৎ বধের পর। শিব পক্ষে থাকলে যুদ্ধ কেমন হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য রামপক্ষীয়রা তা টের পেয়েছিলেন। আমরা অবশ্য পাঠকদের এই ছদ্মরোষটুকু খেয়াল করতে বলব। কারণ এই ছদ্মরোষের সূত্রে মদনকাহিনী সম্প্রসারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে কুমারসম্ভবের মদনকাহিনী পূর্বস্মৃতি। পরবর্তী সর্গে কিন্তু এই আদত মদন কাহিনী আলগাভাবে পুনরাবৃত্ত হল। অবশ্য এই পুনরাবৃত্তিকে নিছক পুনরাবৃত্তি বলা যাবে না। সেখানেও কাহিনীর নবনির্মাণের ধারাটি লক্ষণীয়।

আমরা বলেছি শিবের পক্ষত্যাগে অর্থাৎ শিবের ছদ্মরোষে মেঘনাদের মৃত্যু হল। রোষাগ্নিতে মৃত্যু মেঘনাদবধ-কারকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে মদনকাহিনী। মেঘনাদের উপমান মদন আর প্রমীলার উপমান রতি। মধুসূদন লিখেছেন,

ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর চলিলা কুলগ্নে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান, হায়রে তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন, কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী
রাক্ষস কুল ভরসা অজেয় জগতে।

রাত্রির মিলন শেষে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার কাছে বিদায় নিয়ে গেছেন যজ্ঞাগারে। এই যজ্ঞাগারে শিবপ্রসাদরিক্ত ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হয়েছে। বিদায় বিবরণে সেই মৃত্যুই আভাসিত হল। একেই আমরা বলছি মদনকাহিনীর পুনর্নির্মাণ। অবশ্য এই নির্মাণের মধ্যে রয়ে গেছে ভাঙারও এক সূত্র।

সংস্থানের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম প্রতিকূল সমালোচনাই হতে পারে অনুকূল আলোচনার আয়ুধ। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলাকে মদনরতি করে তোলায় বিচলিত হয়েছিলেন। এখন আমরা বুঝতে পারি সেই বিচলন অনর্থক। তলিয়ে দেখলে একথাও বোঝা যাবে মধুসূদন কিন্তু ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার কাহিনীকে খাপে খাপে রতি-মদন কাহিনীর সঙ্গে মেলাননি। আর সেই না মেলানো অংশের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার স্বর্গারোহণের একটা যোগ আছে। লক্ষণীয় ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার স্বর্গারোহণের বিষয়টি আবার বুদ্ধদেবের কাছে আপত্তিজনক। অথচ বুদ্ধদেবের এই আপত্তি কিন্তু যথেষ্ট ঘাতসহ নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের 'উদ্যোগ' শীর্ষক পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ-প্রমীলাকে মদন-রতির উপমানে উপমিত করা হয়েছে। এর আগেই কিন্তু মেঘনাদ-প্রমীলার পরিণতি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে শঙ্করী বলেছেন—

পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এপুরে, শিবের সেবা করিবে রাবণি
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।

শঙ্করীর এই সিদ্ধান্তই মেঘনাদবধ কাব্যে অনুসৃত। কু-লগ্নে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে ছেড়ে যাত্রা করলেন। এই যাত্রা তাঁর শেষ যাত্রা। রামায়ণ কাহিনী অনুসারে লক্ষ্মণের কৌশলী যুদ্ধে এরপর মেঘনাদ নিহত হয়েছেন। মধুসূদন রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার স্বর্গলাভ অংশ অতিরিক্ত যোগ করেছেন। ইন্দ্রজিতের দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে নবম সর্গে। প্রমীলাসতী চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সেই প্রাণ বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে স্বর্গীয় আগ্নেয় রথ। সেই রথে বাসববিজয়ী দিব্যমূর্তি ইন্দ্রজিৎ ও অনন্ত যৌবনকান্তি প্রমীলারূপসী স্বর্গে গেছেন। অর্থাৎ তৃতীয় সর্গের দেবীর অভিপ্রায় নবম সর্গে পরিণতি লাভ করল।

এখানে আমাদের মনে পড়বে আত্মাহুতি দানের বা সৎকার লাভের পর স্বর্গলাভ মধ্যযুগীয় আখ্যানকাব্যের সুপ্রচলিত ছক। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের পরিণতি স্মরণযোগ্য—

রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠভুবন।।[১৭]

গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দর আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গে গেছে।

এতেক শুনিয়া বিদ্যাসুন্দরের তুণ্ডে।
অগ্নি নমস্কার করি পড়িলেক কুণ্ডে।।
হেনকালে দেবরথ আইল ততক্ষণ।
দেব আজ্ঞায় দেবরথে চড়ে দুইজন।[১৮]

মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি স্মরণে রাখলে মনে হয় ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার পরিণতি বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব নয়, বরং মধ্যযুগীয় আখ্যানকাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পূর্বজ সমালোচকরা এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেননি। অবশ্য আমরা শুধু সাদৃশ্য বিচারেই থেমে যাব না, নিহিত বৈসাদৃশ্যও তুলে ধরব। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ প্রচ্ছন্ন রামভক্ত। বৈষ্ণবভক্তি প্রচার কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্য। মধুসূদন কিন্তু তাঁর কাব্যে সিদ্ধরসকে ভাঙছেন, ভক্তিপ্রচারের দায় তাঁর নেই। তাই লক্ষ্য করতে হবে, যে শঙ্করী ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন সেই শঙ্করীই কিন্তু ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করছেন। ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলা মঙ্গলকাব্যের স্বর্গভ্রষ্ট চরিত্র নন। শঙ্করীর পূজা প্রচারে কোনো সাহায্য তাঁরা করেননি। এমন

কী স্বর্গলাভের প্রার্থনাও তাঁদের নেই। বরং দেবতারাই অযাচিতভাবে অনন্ত স্বর্গ প্রদান করেছেন তাঁদের। এখানেই মধুসূদনের কাব্য মধ্যযুগের পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এখানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পালার উল্লেখ করব। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-এ স্বর্গারোহণ নিয়ে চমৎকার কৌতুক আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পালার যে সব পুথি পাওয়া যায় তাতে কাহিনীগত দিক দিয়ে দুটি ভিন্ন রূপকে চিহ্নিত করা যায়। কোনো কোনো পুথিতে বিদ্যা-সুন্দরের সঙ্গে স্বর্গের কোনো পূর্ববর্তী যোগাযোগ দেখানো হয়নি। অথচ কাহিনীর শেষে কালিকা তাদের স্বর্গধামে নিয়ে যাচ্ছেন। পড়ে মনে হয় কালিকার পূজাপ্রচার নয়, বিদ্যা-সুন্দরের বিদগ্ধপ্রণয় বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। শেষে যেন নিছক কৌতুকেই স্বর্গলাভের কিস্যা যোগ করে দিচ্ছেন। কোনো কোনো পুথিতে বিদ্যা-সুন্দরের পূর্ববর্তী স্বর্গজীবনের কথা আছে বটে কিন্তু সেটাও আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের মতো নয়। সেখানে অন্য মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকার মতো বিদ্যা সুন্দর স্বর্গবাসী নয়। তারা মর্ত্যবাসী, সাধনায় স্বর্গলাভ করেছে। সাধনভ্রষ্ট হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে এসেছে বিদগ্ধ প্রণয় সম্পাদনের জন্য। এর মধ্যে কোন্ পাঠটি ভারতচন্দ্রের সেই চুলচেরা বিতর্কে আমরা যাচ্ছি না। শুধু বলছি স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গলাভ ভারতচন্দ্রের কাব্যেই কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার শতাধিক বছর পরে মধুসূদন তাঁর কাব্যরচনা করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে দেবতারা যখন কোনো প্রার্থনা ছাড়াই অযাচিতভাবে ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলাকে স্বর্গপ্রদান করেন তখন আমাদের মনে হয় অন্যায় সমরে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেছেন বলেই এই স্বর্গপ্রদান দেবতাদের প্রায়শ্চিত্ত। মৃত্যুর পরে সুখ এই বাণী প্রচারের জন্য নয়, দেবতাদের অন্যায়কে চিহ্নিত করার জনাই মধুসূদন এই স্বর্গারোহণ পর্বকে তাঁর কাব্যে সংযোজিত করেছেন। মধ্যযুগের কাব্যের সঙ্গে এই সংগঠনের সাদৃশ্য বাইরের। অর্থাৎ মধুসূদন মধ্যযুগীয় কাব্যের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করে তাকে ভিন্নার্থে সম্প্রসারিত করেছেন।

বস্তুত পক্ষে তাঁর এই বিন্যাস সচেতন কবি কল্পনার প্রকাশক। পুরাণে মদনবিরহী রতি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। প্রমীলা পুরাকাহিনীর রতির মতো আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে দেবপ্রসাদে মদনরূপী ইন্দ্রজিৎকে পুনর্জীবিত করে তোলেন নি। বিধবা সতী প্রমীলা চিতায় আরোহণের সংকল্প করেছেন। প্রমীলার সংকল্প শুনে সুবচনী সরমার প্রশ্ন,

হর কোপানলে
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিল পুড়িয়া
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথ লয়ে?

না, পুরাকাহিনীতে রতি চিতায় প্রাণত্যাগ করেননি। রামমোহনের সহমরণ প্রথা রদ করার জন্য সফল আন্দোলনের পরেও মধুসূদন তাঁর কাব্যে সহমরণ বিবৃত করেন দেবতাদের অযাচিত স্বর্গপ্রদান কাহিনীকে তুলে ধরার জন্যই। এখানে রতি-মদনের পুরাকাহিনী দ্বিতীয়বার ভেঙে যায়। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব দুজনের কেউই পূর্বজ কবির এই কাব্য সংস্থানটি লক্ষ্য করেননি।

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মেঘনাদ-প্রমীলার স্বর্গলাভে আমাদের বেদনা প্রশমিত হয় না। শুধু লঙ্কাপুরীই সপ্ত দিবানিশি বিষাদে কাঁদেনি আমরাও কেঁদেছি। দশমী দিবসের বিসর্জন কি বেদনাদায়ক নয়? উমার কৈলাসযাত্রা কি বেদনার সঞ্চার ঘটায় না? কাজেই ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার স্বর্গলাভকে বুদ্ধদেব সংস্থানচ্যুত ব্যবহারে প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী ভাঙার চেষ্টা করলেও আমরা

তাঁর সঙ্গে একমত নই। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে যাঁর অভিষেক হল নবম সর্গে তাঁরই সংক্রিয়া সম্পন্ন হল। আর এই অভিষেক থেকে সংক্রিয়া সব কিছুর সাক্ষী রাবণ। এই একাকী নিঃসঙ্গ পিতার জন্য কি আমরা শোক করব না?

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠ প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক বিচার নিয়ে অগ্রজ সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর আছে। সে আলোচনা ভিন্ন বিবেচনার বিষয়। আমরা শুধু মদন-রতি পুরাকাহিনীর ভাঙাগড়ার সূত্রে এই মহাকাব্যের বিশেষ একটি সম্ভাবনাকে স্পর্শ করতে চেয়েছি।

তথ্যসূত্র

১ বসু বুদ্ধদেব, মাইকেল, সাহিত্যচর্চা, ১৯৮১।

২ তদেব।

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'মেঘনাদবধ কাব্য', রবীন্দ্রবচনাবলী, ঊনত্রিংশখণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৯৭, পৃ. ৮২-১১৫।

৪ তদেব।

৫. কাব্যবিশারদ কালীপ্রসন্ন, 'মিঠেকড়া', ১৭ নভেম্বর ১৮৮৬।

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'যোগিয়া', কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ১৫৩।

৭ বসু বুদ্ধদেব, মাইকেল, সাহিত্যচর্চা, ১৯৮১।

৮ Kuhn, Thomas, The structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Third Edition 1996, বইটিতে আদিকল্পের (paradigm) রূপান্তর ও নির্মাণ নিয়ে আলোচনা আছে। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন।

৯ পাল প্রফুল্লচন্দ্র সম্পাদিত, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী, কৃষ্ণরাম বিরচিত বিদ্যাসুন্দর, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, গ্রন্থাবলী সিরিজ, পৃ ৯।

১০ বসু যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, হেয়ার প্রেস ও ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৮৯৩, পৃ ১৪-১৫।

১১. গুপ্ত ক্ষেত্র সম্পাদিত, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, গ্রন্থনিলয়, বৈশাখ ১৩৭০, পৃ ১৪২।

১২. বসু যোগীন্দ্রনাথ, পৃ ২৯২।

১৩ গুপ্ত ক্ষেত্র, পৃ ১৫২।

১৪. তদেব, পৃ. ১৫২।

১৫ মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯৮।

১৬ পাল প্রফুল্লচন্দ্র পৃ. ২৯। ❑

দেবলোক থেকে প্রেতপুরী : একটি পরিক্রমা

শ্রাবণী পাল

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিলোকে প্রসারিত হবে মহাকাব্যের সঞ্চারপথ, এমনই নির্দেশ অলঙ্কারশাস্ত্রের। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মধুসূদন সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেননি। লঙ্কাপুরীতে, 'ভূতলে অতুল সভা' রাবণের; দেবলোকে অস্ত্রসংগ্রহে তৎপর (দ্বিতীয় সর্গ) এবং রামচন্দ্রের প্রেতপুরী পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে মধুসূদন প্রস্থাবিক সর্গ এবং ত্রিভুবন বর্ণনার পথটি সম্পূর্ণ করেছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে দাশরথি লক্ষ্মণের হাতে রাবণপুত্র মেঘনাদের নিধন—মেঘনাদবধ কাব্যের মূল এই বিষয়টি রামায়ণ থেকে নিলেও মধুসূদন বেশ কিছু পরিবর্তন করেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গই প্রধানত রামায়ণ প্রেরিত, অন্যত্র, বিশেষত দ্বিতীয় ও অষ্টম সর্গে দেবলোক এবং প্রেতপুরী বর্ণনায় মধুকরী কল্পনার অবাধ পক্ষবিস্তার। আরো স্মরণীয়, এই সর্গদ্বয় কবির প্রতীচ্য মহাকাব্য তন্নিষ্ঠ অধ্যয়নের ফল। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে দ্বিতীয় সর্গের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে মধুসূদন লিখেছিলেন : "As a reader of the Homeric epos, you will no doubt, be reminded of the fourteenth Iliad and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the episode as thorough a Hindu air as possible."

ষষ্ঠ এবং সপ্তম সর্গ শেষ করার পর তাঁকেই আর একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন মধুসূদন : Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

এইভাবে দেশীয় বিষয়কে কখনো বিজাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে প্রতিস্থাপনের একটি গূঢ় প্রবর্তনা সেদিনকার ঔপনিবেশিক জীবন-সম্ভূত অভিলাষ। পরাধীন জীবনে অপ্রাপ্তি আর নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অনেকেরই। শ্বেতদ্বীপের জন্য দুর্মর বাসনা বুকে নিয়ে আপ্লুত মধুসূদন সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন : "Who is this stranger that has come to our dwelling?" এই অভিভবেই তাঁর মনে হয়েছিল "…. as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism." অথচ একথাও ভুললে চলবে না যে, এই খ্রিস্টান যুবকই বলছেন, "I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it." এই ধরনের স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত সেযুগের প্রায় সব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, মধুসূদনের মতো প্রবল প্রাণে তার প্রকাশ কিছু বেশিই। স্বভাবতই, এই মধুসূদন যখন ভারতীয় মহাকাব্যের সূত্র নিয়ে কাব্য রচনা করবেন, মহাকবি হবার স্বপ্ন দেখবেন, তখন তাঁর কাব্যে প্রতীচ্যের মহাকবিও অনুপস্থিত থাকবেন না। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাবে-ভাষায়-চিত্রকল্পে হোমার-ভার্জিল-মিল্টনকে সন্ধানের প্রয়াস ও পরিশ্রম দীর্ঘদিনের, আমরা সে পথে হাঁটব না। শুধু বুঝে নিতে চাইব দেবলোক আর প্রেতপুরী সর্গ-পরিকল্পনার উৎসে সক্রিয় কবির মনোজগতটি—মধুসূদন কি কেবলমাত্র মহাকাব্যের ঘটনাক্রমকে ত্রিলোকে বিস্তৃত করবার জন্যই দেবলোক আর প্রেতপুরীর অবতারণা করেছিলেন? এর মধ্যে কি ছিল নিছকই বুদ্ধিচর্চার আনন্দ? না কি এর সঙ্গে মিশেছিল ঔপনিবেশিক কবির অবসাদ আর সেই গ্লানি থেকে উত্তরণের আকুতি!

'অস্ত্রলাভ' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গের সূচনা আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে—

অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। …

আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।

লক্ষণীয়, অষ্টম সর্গও শুরু হয়েছে সমাগত রাত্রির বর্ণনায়—

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।

'বিরাম' শব্দটি উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম দৃষ্টান্তে নিশ্চিত নির্ভয় আশ্রয় বোঝালেও পরবর্তী দৃষ্টান্তে শব্দটি চিরবিশ্রাম তথা মৃত্যুর অর্থই প্রচ্ছন্নভাবে দ্যোতিত করছে, বিশেষত আহত অচেতন লক্ষ্মণের উদ্দেশে রাম যখন বলেন 'লভিছ ভূতলে বিরাম', তখন 'বিরামমন্দির' শব্দের আয়রনি অপ্রকট থাকে না। তারপর কবি যখন বলেন 'শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে/রণক্ষেত্রে' তখনও অব্যবহিত পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির 'শান্ত সুধানিধি'র আবির্ভাব বিচলিত হয়ে যায়। আমরা জানি, দ্বিতীয় ও অষ্টম সর্গ পুরোপুরি কবি-কল্পিত। এবং এই দেবলোক বর্ণনায়, তার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর বর্ণনায় মধুসূদনের কল্পনা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দবিহারী। রাক্ষসকুললক্ষ্মীর সঙ্গে কবিও এসেছেন স্বর্গপুরীতে, দেখছেন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট, 'বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী চারুনেত্রা', আর—

আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী-সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!

আসন্ন সন্ধ্যার প্রেক্ষিতে ইন্দ্রসভার আড়ম্বর কবিকল্পনায় ধরা পড়েছে। মেঘনাদকে হত্যার জন্য দেবতারা অস্ত্রসংগ্রহে তৎপর—মর্তবাসী এক 'রাক্ষসে'র ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন দেবাদিদেব মহাদেব, ভবানী, ইন্দ্র, শচী, লক্ষ্মী, রতি, মদন এবং মায়া, গন্ধর্বপতি চিত্ররথ সেই রাত্রেই অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছেন রামচন্দ্রের শিবিরে। দ্বিতীয় সর্গের এই ঘটনা একদিক থেকে মেঘনাদের বীরত্বকেই সপ্রমাণ করছে, সমগ্র দেবকুল যার জন্য এত সচেষ্ট, সে 'রাক্ষস' কত বড় বীর! রাবণের আত্মশক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে দেবতাদের হীন ষড়যন্ত্রের কাছে, এতে বেদনা আছে মধুসূদনের; তবু স্বর্গ বর্ণনায় তাঁর কল্পনা শিখর স্পর্শ করেছে। ইন্দ্রজিৎ নিধনের অস্ত্রের সন্ধান মহাদেবের কাছ থেকে জেনে নেবার জন্য ইন্দ্র প্রথমে ভবানীর কাছে উপস্থিত— সেই স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলছেন :

মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!

সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্গ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!

মনে হয়, এই বর্ণনায় কবি যেন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনাকে উজাড় করে দিয়েছেন। শিবসমাগমের জন্য মদনপ্রিয়া রতি 'বিবিধ ভূষণে' সাজিয়ে দিয়েছেন ভবানীকে, তারপর পুষ্পধন্বা মদনকে আহ্বান করেন দেবী আর রতির কণ্ঠে প্রিয়নাম শুনে মদনের দ্রুতগমনের ছবিটিতে মধুসূদন ব্যবহার করেন সমকালসম্ভূত একটি প্রতিমান—

আইলা ধাইয়া
ফুল ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী:
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!

হয়তো, প্রবাস থেকে বাংলাদেশে মাতৃভূমিতে কবির প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি এখানে এইরকম উপমা রচনায় তাঁকে প্রবর্তিত করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্রে বহুবার এই ভাবনা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে যে, দেশবৈরী রাম-লক্ষ্মণের নিধনের জন্য রাবণের রণসজ্জা, ইন্দ্রজিতের আত্মদান, রাক্ষসবীরদের প্রাণপণ যুদ্ধ। ঔপনিবেশিক কবির পক্ষে তাই 'স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি'তে উল্লসিত প্রবাসীর ছবিটি রচনা সহজ হয়েছে। সুসজ্জিতা ভবানীর মদন-সমভিব্যাহারে যোগাসন শৃঙ্গে ধূর্জটি-গমনের কাহিনীতে সচেতনভাবে মধুসূদন ইলিয়াডের অনুসরণ করেছেন, আইডা পর্বতশিখরে জুপিটারের কাছে জুনোর অভিসার তাঁর মনে ছিল। তবে কালিদাসের কুমারসম্ভবের মদনভস্ম কাহিনী এর সঙ্গে মিশে গিয়ে কবি-কথিত Hindu air এসেছে। আর 'তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞান হত' মহাদেব কামশরে বিদ্ধ হয়েছে ঈশানীকে দেখে 'মোহিত মোহিনী রূপে'। এই মোহের জন্যই নিজেও 'মোহন মূরতি ধরি' 'প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী' এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে রাবণ তাঁর পরমভক্ত, তার পুত্রের হত্যার উপায় বলে দিলেন। 'পরম ভক্ত মম নিকষানন্দন' একথা শিবের, অথচ 'নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি' বলেনও তিনি। অর্থাৎ স্বয়ং দেবতাকেও বলতে হয় 'কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?' 'কর্মফল' বা 'প্রাক্তনের গতি'-পথ কোথাও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। সপ্তম সর্গে যে শিব পুত্রশোকাতুর রাবণের সমব্যথী তার সঙ্গে দ্বিতীয় সর্গে তাঁর এই আচরণকে মেলানো যায় না। দ্বিতীয় সর্গের মুগ্ধ সম্মোহিত পশুপতি যেন কিছুটা শোচনার সুরেই পরে বলেন—

তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
.... কি কবে রাবণ; সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।

এইভাবে দেবচরিত্রে একটা সঙ্গতি বজায় রাখতে চেয়েছেন মধুসূদন। নতুবা দেবলোক তথা স্বর্গবর্ণনা নিছক প্রথানুগ বর্ণনায় পর্যবসিত হত মাত্র। বস্তুত মহাকাব্যের প্রথা মেনে মধুসূদন যখন স্বর্গ বর্ণনা করেছেন তখন তাঁর উচ্ছ্বসিত কল্পনার ব্যাপ্তি চোখে পড়ে, স্বর্গের যাবতীয় সৌন্দর্য-পরিপূর্ণতার মাঝখানে দেবদেবীদের হীন ষড়যন্ত্র একটা বৈপরীত্যও তৈরি করে। একদিক থেকে মানব-বাঞ্ছিত স্বর্গলোক হয়তো কবিরই মানসপুর, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে নিত্য সংঘাতে বারবার ভেঙে যাওয়া সেই

আদর্শায়িত ভুবনের প্রতিমাই প্রাণ পেয়েছে দ্বিতীয় সর্গ বর্ণনায়। ঔপনিবেশিক জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-দোলাচলতা হয়তো এই আড়ম্বর আর চক্রান্তের বিপ্রতীপতার মধ্যেই একভাবে নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে।

দেবলোকের এই ছবির পাশাপাশি মধুসূদন মর্তে মানবের (রাক্ষসকুল যে৷ কবিকল্পনায় মানুষরূপেই প্রতিভাত) প্রয়াস ও সাধনা দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন বিরূপ ভাগ্যের কাছে শেষপর্যন্ত অসহায় তার আত্মবিসর্জনকে। মধুসূদন যে যুগের কবি, সেযুগে তিনি দেখেছেন বাসনার সঙ্গে সিদ্ধির ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে। করতলগত বিজয় যে কখনো পরাভব মেনে নেয়, আত্মশক্তি নির্জিত হয়ে যায় পেশীশক্তির কাছে, 'দেবতা'র অনুগ্রহ ম্লান করে দেয় মনুষ্যত্বের মহিমা---সাগরপারের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের শাসনে নিষ্পিষ্ট বাঙালির আর্ত-ক্রন্দন সেদিন প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কাব্যে প্রকাশ পেয়েছিল। মধুসূদনে সেই বন্দী মানবাত্মার অস্থিরতা--রাবণ বুঝতেই পারে না কেন তার স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়ে যাচ্ছে; অন্যায়-যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা করল লক্ষ্মণ, অথচ শক্তিশেলাহত সেই লক্ষ্মণই দেববলে পুনর্জীবিত হচ্ছে! তাই বারবার তার অসহায় উচ্চারণ "কি পাপে লিখিলা/ এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?" স্বয়ং যোগীশ্বর মহাদেব যখন পূর্বজন্ম কর্মফল প্রাক্তনের অমোঘ গতির কথা বলেন সেখানে রাবণও শেষপর্যন্ত মনে করে 'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?' অর্থাৎ সমুন্নত বীর-পুরুষের পতনই যেন সেযুগের অনিবার্য নিয়তি মেঘনাদবধ কাব্যে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

আর স্বর্গের আড়ম্বর-মহিমা, মর্তের প্রয়াস ও পরিণামী ব্যর্থতার পাশাপাশি নরক-বর্ণনায় কবি দেখালেন ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবনের দিককে, যন্ত্রণা আক্ষেপ আর প্রায়শ্চিত্তের ছবিকে। অষ্টম সর্গের প্রেতপুরী বর্ণনা সেদিক থেকে চিহ্নিত হয়ে রইল ঔপনিবেশিক পীড়িত অসুস্থ জীবনের প্রতীক হিসেবে। পুত্রশোকে আতুর রাবণ বারবার শিরে করাঘাত করেছে, রামচন্দ্রকে এধরনের কোনো যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। সীতাবিরহে তাঁর কাতর বিলাপ মাঝেমধ্যে শোনা গেলেও আহত অচৈতন্য লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে সীতাকে উদ্ধার না করেই ফিরে যাবার কথা। রামচন্দ্রকে সশরীরে নরক-দর্শন করিয়ে কবি তাঁকে কোনোভাবে শাস্তি দিতে চাননি তো! অনৃতভাষণের জন্য মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরকে আসতে হয়েছিল নরকের দ্বারপ্রান্তে, ভিতরে প্রবেশ করতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত বিষয়ে—লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের উপায় জানতে মধুসূদন রামকে পাঠালেন প্রেতলোকে— যেখানে ছড়ান রইল বিভিন্ন নরকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বীভৎস চিত্র।

ভার্জিলকে সচেতনভাবেই এখানে অনুসরণ করেছিলেন মধুসূদন, এই অনুসরণের গতিপ্রকৃতি যোগীন্দ্রনাথ বসুর ভাষাতেই উল্লেখ করা যায়---"ইনিয়াডের ষষ্ঠ সর্গের আদর্শে কবি ইহা রচনা করিয়াছেন। বীরবর ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও গভীর সুড়ঙ্গপথে প্রেতপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার পরলোকগত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনিয়াডের প্রেতনগরের বহির্দেশে ভীষণকায় কামরূপী মূর্তিসমূহের অবস্থান বর্ণিত আছে। মেঘনাদবধেও প্রেতপুরীর বহির্দেশে তেমনি বিবিধ মূর্তির যমদূত ও যমদূতীগণের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইনিয়াডের 'Acheron' (আকিরন) বা 'Styx' মেঘনাদবধের বৈতরণীরূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং তাহার 'Sybil' (সাইবিল) হইতে মায়াদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। 'Styx'-এর নাবিক 'Charon' (ক্যারন) ইনিসকে পথপ্রদানে অসম্মত হইলে সাইবিল যেমন তাহাকে আপনার মায়াদণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন মায়াদেবীও বৈতরণীরক্ষক যমদূতকে পথপ্রদানে অনিচ্ছুক দেখিয়া তেমনিই শিবের ত্রিশূল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও আপনার পূর্বপরিচিত বহু ব্যক্তিকে প্রেতপুরীতে দর্শন করিয়াছিলেন। এইসকল বিষয় ব্যতীত কামুক নারীগণের অতৃপ্তিজনিত দণ্ড, বজ্রনখ, মাংসাহারী পক্ষিগণ কর্তৃক অন্ত্র বিদারণ, প্রেতক্রিয়া না হইলে

যমপুরীতে গমনের প্রতিষেধ ইত্যাদি আরও অনেক কথা কবি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের আদর্শে মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে সমাবেশ করিয়াছেন।" এই পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের মধ্যে দান্তের ডিভাইন কমেডির Inferno বা নরকবর্ণনা এবং মিল্টনের Paradise Lost-এর নরকচিত্রও মধুসূদনের কল্পনাকে অল্পবিস্তর বিচলিত করেছিল। পাশাপাশি আমাদের ভারতীয় পুরাণ-বর্ণিত নরক-কল্পনাকেও কবি বিস্মৃত হননি। ভার্জিলের Mourning Fields-এর অনুসরণে বিলাপধ্বন, প্রেতলোকদ্বারে বীভৎস সব ব্যাধির সাক্ষাৎ মধুসূদন গ্রহণ করেছেন। ঈনীও কাব্যে রয়েছে--"Just before the porch and in the opening of the jaws of Orcus, grief and avenging pains have set their couch, and there ghastly Diseases dwell, and joyless Old Age and Fear and Hunger that impel to crime. ..next Sleep, Death's own brother and the bad Delights of the mind and war fraught with doom, in the threshhold before the eye."

আর মধুসূদন লিখেছেন :

অস্থিচর্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল উদর বসে উদরপরতা;—
...........তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! ....
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি,
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয় রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ, ...
অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। ... কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে,
.... হাব ভাব আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!

এই কদাকার রোগের বীভৎস যে বর্ণনা মধুসূদন করেছেন, সমগ্র কাব্য-বিষয়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র

কোথায়? কাব্যের অন্যত্র কবি সৌন্দর্যমুগ্ধ, বলিষ্ঠ মুক্ত প্রাণের স্তুতিকার, কিন্তু প্রেতপুরীতে তিনি দেখালেন জীবনের যাবতীয় কদর্যতা, অন্ধকারকে—এইভাবে শুধু মহাকাব্যের শর্ত নয়, যেন জীবনেরই বেঁচে থাকারও একটা শর্ত পূরণ করলেন মধুসূদন। নয়তো এই সর্গরচনা নিছকই বিন্যাসগত কৌশলে পর্যবসিত হয়। জীবনের এই ছবি দেখানোর জন্যই হয়তো এখানে বাল্মীকি রামায়ণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন মধুসূদন।

মূলে রয়েছে যে, রামকে ব্যাকুল ভাবে বিলাপরত দেখে বানরবৈদ্য সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করে জানালেন, 'শ্রীমান লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। তাঁর মুখশ্রী উজ্জ্বল ও প্রসন্ন, তা বিকৃত ও শ্যামবর্ণ হয়নি। তাঁর করতল পদ্মপাতার মতো রক্তিম এবং চোখ জ্যোতিষ্মান। মৃত ব্যক্তির রূপ কখনো এরকম দেখা যায় না। আপনি শোকতাপ দূর করুন। লক্ষ্মণ প্রসারিত দেহে শুয়ে আছেন; তাঁর হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়, শ্বাসক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।' এরপর সুষেণ হনুমানকে ঔষধি পর্বতের দক্ষিণ শিখর থেকে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চারপ্রকার ঔষধ অতি দ্রুত আনতে বললেন। হনুমান ঔষধি পর্বতে গিয়ে ঔষধ চিনতে না পেরে পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করে নিয়ে এলে সুষেণ সেই ঔষধি পেষণপূর্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করালেন, সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে লক্ষ্মণ গাত্রোত্থান করলেন।—এই ঘটনাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন মধুসূদন। হয়তো সুষেণের চিকিৎসায় সুস্থ হলে রাবণের শক্তিশেলের গুরুত্ব কমে যায়, বানরবৈদ্যকে এতটা গুরুত্ব দিতে রাজি হননি মধুসূদন। অথচ লক্ষ্মণের পুনর্জীবনে রাবণের ট্র্যাজিক হাহাকার আরো বেশি মাত্রা পেয়ে যায়। তাই রামকেই নরকসন্দর্শনে পাঠালেন মধুসূদন। তাঁর কাব্যে শিব পার্বতীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন মায়াদেবীকে সঙ্গে দিয়ে রামকে নরকে দশরথের কাছে পাঠান। সেখানে দশরথই রামকে লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবনের উপায় বলে দেবেন। দশরথ আবার এই উপায় জেনেছেন যমের কাছ থেকে। এইভাবে সর্পিলগতি কাহিনী যোজনায় অষ্টাধিক সর্গনির্দেশ, মহাকাব্যিক বিস্তৃতি তথা ত্রিলোকব্যাপী কাহিনী নির্দেশ রক্ষিত হল ঠিকই, তবে জীবনে এবং কাব্যেও পাপ-পুণ্যের প্রতি আগাগোড়া উদাসীন মধুসূদন ঠিক কোন্ প্রেরণায় এই অষ্টম সর্গে বিষয়টি প্রাধান্য দিলেন তা নিয়ে একটা সংশয় থেকেই যায়। সমগ্র কাব্যে এক অন্ধ অমোঘ নিয়তির অদৃশ্য দণ্ড, আর এখানে রৌরব-কুম্ভীপাক-অন্ধতম নরকের বর্ণনায় স্বকর্মফল-ভোগের নীতিবাদ। অগ্নিময় রৌরব হ্রদে ভাসমান 'কোটি কোটি প্রাণী ছটফটি হাহাকারে', তাদের উদ্দেশে শূন্য থেকে বজ্রকণ্ঠে ধিক্কার শোনা যায়—

বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্মে ভুলিলি কি হেতু?

মায়াদেবী আরো বলেন— পরধন হরে যে দুর্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।

পূতিগন্ধময় কুম্ভীপাক নরকে 'তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে পাপীবৃন্দে', এই ভীষণ করুণ পরিণতি দেখে সভয়ে রামচন্দ্রও আর কোনো নরক দর্শন করতে চাননি। বাস্তবিক, উগ্র কামের যে বিকার মধুসূদন এখানে দেখিয়েছেন তা ভয়াবহ—মোহিনী নারী এবং 'রূপস পুরুষদল' পরস্পর

কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি

বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।

কামপীড়িত নাগর-নাগরীর এই নিষ্ফল সঙ্গম-সংঘাতের পর দার্শনিক উদাসীনতায় কবি জানিয়ে দেন-- 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী'। শ্বাসরোধী বীভৎস অন্ধকার এই নরক থেকে এবার বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন রামচন্দ্র, দশরথের দেখা পাবার জন্য উদগ্রীব তিনি। এবার মায়াদেবী তাঁকে নিয়ে এসেছেন পূর্ব-দ্বারে—যেখানে 'সুখে পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা সাধ্বীকুল'; এখানে এসে কবি-কল্পনা যেন স্বস্তি পেয়েছে, উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে প্রাণের আশ্বাসে –

স্বর্গে, মর্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!

নরকের মধ্যেই এই পরিপূর্ণ জীবন-সম্ভোগের ছবি এঁকে যেন তৃপ্ত হয়েছেন কবি---

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেশ্বাস, সদা ফলবতী।

লক্ষ যোজন বিস্তৃত যমপুরীর বিভিন্ন দিক পরিক্রমণ করে রামচন্দ্র উপস্থিত হয়েছেন সঞ্জীবনী পুরীর দ্বারপ্রান্তে, সেখানে সম্মুখ-সমরে নিহত মহারথী যশস্বীদের বাস, সেই 'পূণ্যভূমে বিধাতার হাসি/চন্দ্র সূর্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ/উজ্জ্বলে।' অর্থাৎ নরকের তমসা অপসৃত, রুধিরস্রোতের ভীষণতা আর নেই বরং স্বর্ণময় লঙ্কানগরীর মতো এখানেও—

কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিনী ঝরি!
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে!
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।

এখানে পূর্বপুরুষদের পদবন্দনার পর বৈতরণীতীরে অক্ষয়বটমূলে দশরথের দেখা পেয়েছেন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের চৈতন্যলাভের উপায় জেনেছেন, তবু ঈনীসের মতো রামও পিতার ছায়াশরীর স্পর্শ করতে পারেননি। ভাবতে অবাক লাগে, যে রাম ও তাঁর বানরসেনাদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কবি পত্রে-কাব্যে অন্তত ঘোষণাই করেছেন, এখানে কিন্তু ঐ প্রেতপুরী থেকে দশরথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে রামচন্দ্রের যশের কথা এবং সমগ্র ভারতে সেই যশ বিস্তৃত হবার কথা—

পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধময় যথা

সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!

নরকের অনুতাপ আর অনুশোচনার অন্ধ গহ্বর থেকে উচ্চারিত এ আশীর্বাদ হয়তো কবিরও একেবারে অনভিপ্রেত নয়। 'বিধির বিধি' নয়, দশরথ এখানে নিজকর্মফলের কথা বলেছেন 'মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে'। অর্থাৎ 'মরে পুত্র জনকের পাপে'—মধুসূদন মেঘনাদবধে অশ্রুবিসর্জন করেছেন, রাবণ তার কোনো অন্যায় স্বীকারই করতে চায়নি। কিন্তু দশরথের স্বীকারোক্তিতে পুত্রের দৈবানুগ্রহের 'অপরাধ'কেও যেন মার্জনা করেছেন কবি, সযত্নে চয়ন করেছেন রামের যশস্বী হবার স্বপ্ন। 'প্রণমি বিস্ময়ে পদে' ফিরে এসেছেন রাম, কবি তার প্রত্যাবর্তনের বিশদ বর্ণনা দেননি, তার আর প্রয়োজনও ছিল না। সেই রাত্রির মধ্যেই রামের প্রত্যাবর্তন –'যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী'।

এইভাবে দেবলোক থেকে প্রেতপুরী, জীবনের স্বপ্ন থেকে নরকের দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করলেন মধুসূদন। প্রতীচির মহাকাব্য আর প্রাচ্যপুরাণ নানাভাবে ব্যবহৃত হল আর আলঙ্কারিক নির্দেশ মান্য করার সূত্রেই কবি তাঁর কল্পনাকে দূরপ্রসারিত করার সুযোগ পেলেন। স্বর্গবাসী দেবতারা কাহিনীতে অংশ নিয়েছেন সক্রিয়ভাবে, পাপ-পুণ্যের বিচারবোধে নরকের প্রায়শ্চিত্তের কথা—কবি তাঁর কল্পনাকে স্বর্গ থেকে নরকে বিস্তৃত করে দিলেন এবং এইভাবেই তাঁর সময়কে অতিক্রম করে তিনি স্পর্শ করতে পারেন স্বপ্নের ঐশ্বর্যের সুউচ্চ শিখর, অবতরণ করতে পারেন পাতালে অন্ধতম নরকে—মধুসূদন তা-ই করেছেন। রামায়ণ-বহির্ভূত সূত্র ধরেও তিনি দেবলোক আর প্রেতপুরী সর্গ দুটি যুক্ত করেছেন, কল্পনাকে অবাধে মুক্তি দিয়েছেন, উপনিবেশ-পীড়িত জীবনে—সাধ আর সাধ্যের ব্যবধান যখন অদৃশ্য নিয়তির আঘাতে আরো বাড়তে থাকে তখন স্বদেশবাসীর যূথবদ্ধ ক্রন্দন-আলোকিত মর্তভুবনের জন্য আকুলতা ধরা পড়ে প্রেতপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে। আর স্বপ্নপূরণের জন্য কবি নির্বাচন করলেন দেবভূমি—সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণতার লীলাক্ষেত্র—জীবনের প্রবল বাসনা যেখানে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়—এইভাবে মধুসূদন বিতত জীবনের সমস্ত প্রান্ত স্পর্শ করে তাঁর কাব্যকে দিলেন সমুন্নতি—বিশালত্বের এক মহিমময় ব্যঞ্জনা। ❑

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন : "I find there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful"

এই পত্রাংশটি যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' গ্রন্থে সংকলিত ৪৪-সংখ্যক পত্র থেকে গৃহীত।[১] এই চিঠিতে কোনো তারিখ উল্লিখিত নেই। তার পরের ৪৫-সংখ্যক চিঠির, রাজনারায়ণ বসুকেই লেখা, তারিখ : খিদিরপুর ২৯ আগস্ট ১৮৬১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে যেভাবে ৩৫-সংখ্যক থেকে ৪৪-সংখ্যক পত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, এই চিঠিগুলিতে কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। ৩৪-সংখ্যক চিঠিতে অবশ্য তারিখ আছে : ১৬ জানুয়ারি ১৮৬১। ৩৪-সংখ্যক ও ৪৫-সংখ্যক চিঠির তারিখের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, এই চিঠিগুলি ১৬ জানুয়ারির পর থেকে ২৯ আগস্টের মধ্যে লেখা এবং উদ্ধৃত পত্রাংশটি অর্থাৎ ৪৪-সংখ্যক চিঠিখানি এই পত্রধারার শেষে রচিত ব'লে অনুমান করা চলে, ১৮৬১-এর আগস্টের কোনো এক সময় লিখিত। এর পরে, ৪৮-সংখ্যক চিঠিতে, ৪ জুন ১৮৬২ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে আবার লিখছেন : "Meghanad is going through a second edition with notes, and a real B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months."

এই দুটি চিঠির অর্থাৎ ৪৪-সংখ্যক ও ৪৮-সংখ্যক চিঠির মধ্যে ন'মাসের মতো ব্যবধান রয়েছে। প্রথম চিঠিতেই ইঙ্গিত রয়েছে, পরের সংস্করণে ক্রটিগুলি দূর করা হবে। এবং সম্ভবত তার পরেই, প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হবার পরে, তিনি কাব্যটির সংস্কারে হাত দেন। দ্বিতীয় সংস্করণেই যাতে কাব্যটি একটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কবির যে কী পরিমাণ আগ্রহ ছিল, তা ৪৮-সংখ্যক চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে। বস্তুত, ৪৪-সংখ্যক চিঠিতে মধুসূদন যে কথা বলেছেন, পরবর্তী সংস্করণগুলির সংস্কারের ভিতর দিয়ে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের ছ'টি সংস্করণে তিনি যে সংস্কার করেন, সেই সংস্কারগুলিকেই পাঠান্তর আখ্যা দেওয়া যায়।

ঠিক কোন্ তারিখে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় বৃত হন, তা বলা শক্ত। যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে সংকলিত ১৭-সংখ্যক চিঠির তারিখ ২৪ এপ্রিল ১৮৬০। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, কবি লিখেছেন, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রায় প্রকাশিত হতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকাহিনী 'celebrate' করতে চলেছেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি কাব্যটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনার আট মাসের মতো সময়ের ব্যবধানে মেঘনাদবধ কাব্য রচিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। খণ্ড দুটির পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১৩১ ও ১০৭।

অতঃপর 'a real B. A.' অর্থাৎ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। মধুসূদন তার আগেই য়ুরোপ রওনা হয়ে যান। ১৮৬৭-র

১। চতুর্থ সংস্করণ ১৯০৭, পৃ ৪৯২ দ্রষ্টব্য।

ফেব্রুয়ারির প্রথমে প্রায় পাঁচ বছর পরে য়ুরোপ থেকে ফেরার পর ২১ আগস্ট ১৮৬৭-তে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের। এর মধ্যে অন্য কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। ১৮৬৭, ৩ ডিসেম্বরে চতুর্থ সংস্করণ, পঞ্চম সংস্করণ ১৬ মার্চ, ১৮৬৯ এবং ২০ জুলাই ১৮৬৯ ষষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশকাল। চতুর্থ সংস্করণ থেকে হেমচন্দ্রের 'মুখবন্ধ'র পরিবর্তে 'ভূমিকা' অংশ সংযোজিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে ষষ্ঠ সংস্করণই মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বশেষ সংস্করণ।

এই তথ্যগুলি অনেকেরই জানা। কিন্তু অনেকেই লক্ষ্য করেন নি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ ও দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ একই সঙ্গে একত্রে একই বছরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। স্ট্যানহোপ যন্ত্রে ১২৭৪ সালে এই দুটি সংস্করণ 'যন্ত্রিত'।

এই ৬টি সংস্করণের পাঠ অনুসরণে পাঠান্তরের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থটি দেখবার সুযোগ পাই নি, অনেক অন্বেষণ সত্ত্বেও। এক্ষেত্রে, প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণের পাঠ তৃতীয় সংস্করণের অনুরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে। অন্যান্য সংস্করণগুলির পাঠান্তর পূর্বাপরতা সূত্রে উল্লিখিত। সর্গ অনুসারে পাঠান্তরগুলি এইরূপ :

প্রথম সর্গ

পঙ্ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৯	বন্দি ও চরণ অরবিন্দ, মন্দমতি	১ম, ২য়
	বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৪	ক্রৌঞ্চসহ ক্রোঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ,	১ম
	ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,	২য়
	ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৭	দস্যুবৃত্তি-প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম	
১৮	আছিল যে নর, এবে তোমার প্রসাদে,—	১ম
	নরকুলে নরাধম আছিল যে নর,	
	দস্যুবৃত্তি-রত এবে তোমার প্রসাদে,—	২য়
	নরাধম আছিল যে নর নরকুলে	
	চৌর্যে রত, হইল যে তোমার প্রসাদে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২২	বিষবৃক্ষ চন্দন-বৃক্ষের শোভা ধরে!—	১ম
	সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!	২য়
	সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩	হায়, মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার?	১ম, ২য়
	হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?	৩য়-৬ষ্ঠ
২৪	কিন্তু গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে	১ম, ২য়
	কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৭	স্ফটিক গঠিত;	১ম, ২য়
	স্ফটিকে গঠিত;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩	বসুধা। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,	১ম, ২য়
	ধরারে : ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৬	স্বয়ম্বর গেহে। ক্ষণপ্রভা সম হাসে—	১ম, ২য়
	রত্নালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭	রতনসম্ভবা-বিভা— ঝলসি নয়ন!—	১ম
	রতনসম্ভবা বিভা— নয়ন ঝলসি,—	২য়
	রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৮-	ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী।	
-৫০	ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে	
	না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে!	১ম
	সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী	
	ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি	
	চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা।	
	হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি	২য়
	... ... আহা!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫২	দাঁড়ান সুসভাতলে ছত্রধর-রূপে![1]	২য়
	দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৫	শূলপাণি! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ,	১ম, ২য়
	শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬	পরিমলময় বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি	১ম, ২য়
	অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৭	কাকলী লহরী, আহা মনোহর যথা	১ম
	কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা	২য়-৬ষ্ঠ
৬৩	পুত্রশোকে বাক্যহীন!	১ম

১। প্রথম সংস্করণে পঙ্ক্তিটি ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজন।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	বাক্যহীন পুত্রশোকে!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৪	বসন;	১ম, ২য়
	বসনে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬৫	যথা তরু, সরস শরীরে তীক্ষ্ণশর	১ম
	যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে	২য়-৬ষ্ঠ
৮৬	তোমা হেন ধন?	১ম
	তোমা হেন ধনে?	২য়-৬ষ্ঠ
৯৩	বৃক্ষ,	১ম
	বৃক্ষে,	২য়-৬ষ্ঠ
৯৫	নিরন্তর! সমূলে নির্ম্মূল হব আমি	১ম
	নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে	২য়-৬ষ্ঠ
১০২	এ ভুজগ?	১ম, ২য়
	এ ভুজগে?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১৭	শুনি, গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে	১ম
	শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে	২য়-৬ষ্ঠ
১২৩	তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে	১ম
	হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে	২য়-৬ষ্ঠ
১২৪	এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ মনে মনে—	১ম
	এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;	২য়-৬ষ্ঠ
১২৬	বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে	১ম
	বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর	২য়-৬ষ্ঠ
১৪৯	হুঙ্কার!	১ম, ২য়
	হুঙ্কারে!	৩য়-৬ষ্ঠ
১৫০	গর্জ্জন;	১ম, ২য়
	গর্জ্জনে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫১	সিংহনাদ; জলধির কল্লোল; দেখেছি	১ম, ২য়
	সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৬০	গগন;	১ম, ২য়
	গগনে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৬৪	"এই রূপে যুঝিলা শম্বর রিপুরূপী—	১ম
	"এই রূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে	২য়-৬ষ্ঠ
১৬৬	যুদ্ধে প্রবেশিলা	১ম
	প্রবেশিলা যুদ্ধে	২য়-৬ষ্ঠ
১৭১	সভাজন কাঁদিল সকলে।	১ম
	সভাজন কাঁদিলা নীরবে।	২য়-৬ষ্ঠ
১৭৯	যথা অগ্নিময় চক্ষু হর্যক্ষ দুর্জ্জয়,	১ম
	অগ্নিময় চক্ষু ঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে	২য়-৬ষ্ঠ
১৮০	কড়মড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি	১ম
	কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া	২য়
১৮১	বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রোষে—	১ম

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে	২য়-৬ষ্ঠ
১৯৬	মনস্তাপে। হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি	১ম
	মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে	২য়-৬ষ্ঠ
২০৪	নয়ন!	১ম, ২য়
	নয়নে!	৩য়-৬ষ্ঠ
২০৬	কনক উদয়াচলে যেন দিনমণি	১ম
	কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন	২য়-৬ষ্ঠ
২১৩	দেব গৃহ; বিপণি রঞ্জিত নানা রাগে,	১ম
	দেবগৃহ, নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,	২য়-৬ষ্ঠ
২১৬	রে চারুলঙ্কা,	১ম, ২য়
	রে চারুলঙ্কে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২২৬	কিম্বা নক্ষত্র মণ্ডল	১ম
	নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৭	শশী। সঙ্গে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হনু,	১ম
	শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,	২য়-৬ষ্ঠ
২৪০	যথা ঘোর কাননে, কিরাত-দল মিলি,	১ম
	গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,	২য়-৬ষ্ঠ
২৪৪	রণক্ষেত্রে। শকুনি, গৃধিনী, শিবাকুল,	১ম
	রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী,	২য়-৬ষ্ঠ
২৪৮	সমলোভী জীব;	১ম, ২য়
	সমলোভী জীবে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৪৯	রক্তস্রোতঃ!	১ম, ২য়
	রক্তস্রোতে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৫৪	ধনু,	১ম, ২য়
	ধনুঃ,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৫৫	তূণ, শর, পরশু, মুদগর, ভিন্দিপাল	১ম
	ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদগর, পরশু,	২য়-৬ষ্ঠ
২৬১	স্বর্ণচূড় শস্য কৃষীদলবলে ক্ষত,	১ম
	স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদল বলে,	২য়-৬ষ্ঠ
২৭৫	তবু, বৎস, মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়,	১ম
	তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে	২য়-৬ষ্ঠ
২৭৮	যিনি অন্তর্যামী;	১ম
	অন্তর্যামী যিনি;	২য়-৬ষ্ঠ
২৮০	কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি	১ম
	পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি	২য়-৬ষ্ঠ
২৮১	হও কি হে সুখী? পিতা পুত্রদুঃখে দুঃখী—	১ম
	হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—	২য়-৬ষ্ঠ
২৯৩	প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোত কলরবে	১ম
	প্রশস্তে; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৪	ভীম-পরাক্রম!	১ম, ২য়

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	ভীমপরাক্রমে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩১০	মাধব উরসে,	১ম
	মাধবের বুকে	২য়-৬ষ্ঠ
৩১২	উঠ, বলি; বীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,[1]	১ম
	উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,	২য়-৬ষ্ঠ
৩১৯	সভাতলে; নীরবে বসিলা মহামতি	
৩২০	শোকাকুল; পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি	১ম
	সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে	
	মহামতি; পাত্রমিত্র, সভাসদ আদি	২য়-৬ষ্ঠ
৩২৩	বসিল সকলে, হায়,বিষণ্ণবদনে।	
	হেনকালে সহসা ভাসিল চারিদিকে	
	মৃদু রোদন নিনাদ; তা সহ মিশিয়া	১ম
	বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!	
	হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল	
	রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৩২৬	দেবী চিত্রাঙ্গদা।	১ম, ২য়
	চিত্রাঙ্গদা দেবী।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৩৪	শাবক। শোকের ঝড় বহিল সভায়!—	১ম
	শাবক। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!	২য়
	শাবকে! শোকের ঝড় বহিল সভাতে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৫০	শাবক	১ম, ২য়
	শাবকে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৫২	অমূলরতন?	১ম-৪র্থ
	অমূল্যরতন?	৫ম-৬ষ্ঠ
৩৫৫	সে ধন?	১ম, ২য়
	সে ধনে?"	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৬৩	বারুইর বরদে সজারু পশি যথা	১ম, ২য়
	বরদে সজারু পশি বারুইর যথা	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৬৬	পরেছে শৃঙ্খল পায়ে	১ম
	পরেন শৃঙ্খল পায়ে	২য়-৬ষ্ঠ
৩৬৮	বুক ফাটিছে আমার	১ম
	বুক আমার ফাটিছে	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৩	ক্রন্দন? উজ্জ্বল আজি এ বংশ আমার	১ম
	ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৫	কাঁদ, হে বিধুবদনে,	১ম
	কাঁদ, ইন্দুনিভাননে,	২য়-৬ষ্ঠ
৩৯৫	শোভে জলনিধি।	১ম
	শোভেন জলধি।	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৫	রাক্ষসকুল	১ম, ২য়
	রাক্ষসকুলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪০৭	সঙ্গীদল লয়ে,	১ম
	সঙ্গীদলে লয়ে,	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৮	চলি গেলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,	১ম
	প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৯	ত্যজিয়া কনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া	১ম
	ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৪৩৯	অম্বরে। বাজিল চারিদিকে ঘোর রোলে	১ম
	অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	ভয়ঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস।—	১ম
	রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে!	২য়
	রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলহলে[2]!	৪র্থ
	রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলাহলে!	৫ম-৬ষ্ঠ
৪৬০	বায়ুবৃন্দ;	১ম
	বায়ুবৃন্দে;	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮২	গিয়াছেন চলি।"	১ম
	গিয়াছেন গৃহে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮৪	জলতল হ'তে,	১ম
	জলতল ত্যজি,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮৫	সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা[3]	
৪৯৭	দেউল।	১ম
	দেউলে।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৯৮	শত স্বর্ণ-পাত্রে সারি সারি উপহার—	১ম
	স্বর্ণ পাত্রে সারি-সারি উপহার নানা,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৯৯	বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণ দীপ শত	১ম
	বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী	২য়-ষষ্ঠ
৫০১	শশীকলা করে!	১ম
	পূর্ণশশীতেজে!	২য়
	পূর্ণ-শশী-তেজে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫১৯	মাধব-উরসে;	১ম
	হরির উরসে;—	২য়-৬ষ্ঠ

১। এই পঙ্‌ক্তিটির 'বলি' শব্দটি নিঃসন্দেহে ক্রিয়াপদ নয়, এবং বিরামচিহ্নও প্রমাদজনক। 'বলিন্' শব্দের 'বলিন্', ছন্দের জন্য কবি ব্যবহার করেছেন 'বলি'। বাংলায় বলী শব্দের সম্বোধনে 'বলী' হওয়া উচিত। এই কাব্যে বলী শব্দটি আরো কয়েকবার অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

২। 'কোলহলে!' অবশ্যই ছাপার ভুল।

৩। দীননাথ সান্যাল বলেছেন, কোনো সংস্করণে 'রজত-কান্তি-ছটা' করা হয়েছিল; তা কবিকৃত নয়।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৫৩	করে সুবর্ণ কঙ্কণ,	১ম, ২য়
	করে শোভিল কঙ্কণ,—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬২	গভীর নিক্কণে।	১ম
	গম্ভীর নিক্কণে।	২য়-৬ষ্ঠ
৫৬৩	উড়ে কেতু, রতনে খচিত, শত শত	১ম
	রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত	২য়-৬ষ্ঠ
৫৮৭	মুর-অরি! রণ-মদে মত্ত, ওই দেখ	১ম
	মুরারি! সমরমদে মত্ত, ওই দেখ,	২য়
	মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৯৬	ইন্দ্রজিত্‌	১ম, ২য়
	ইন্দ্রজিতে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৯৯	ভ্রমিছে কুমার,	১ম
	ভ্রমিছে আমোদে,	২য়-৬ষ্ঠ
৬০০	না জানি বাহু বলেন্দ্র বীরবাহু বলী	
—১	হত রণে। যাও তুমি বারুণীর পাশে,	১ম
	যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে	
	বীরবাহু। যাও তুমি বারুণীর পাশে,	২য়-৬ষ্ঠ
৬৩২	নির্ঝর। প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,	১ম
	নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে,	২য়
	নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬৪১	শর আয়ত লোচনে!	১ম
	আয়ত লোচনে শর!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫১	ভানুসুতে, যথা রাসবিহারী রাখাল,	১ম
	ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি,	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫২	দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,	
-৫৩	গোপিনী কামিনী সনে, তোর চারুকূলে!	১ম
	নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,	
	গোপবধূসঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৬৫	রাক্ষস-ঈশ্বর	১ম
	রাক্ষসাধিপতি	২য়-৬ষ্ঠ
৬৬৮	কে বধিল বলী	
-৬৯	বীরবাহু?	১ম
	কে বধিল কবে	
	প্রিয়ানুজে?	২য়-৬ষ্ঠ
৬৭১	প্রচণ্ড শর বর্ষণে বৈরীদল; তবে	১ম
	বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে; তবে	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৬৮৩	কহিলা গভীরে	১ম
	কহিলা গম্ভীরে	২য়-৬ষ্ঠ
৬৮৯	সাজিলা বীর-ঋষভ	১ম
	সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ	২য়-৬ষ্ঠ
৭০৬	পদাশ্রমে	১ম, ২য়
	পদাশ্রয়ে	৩য়-৬ষ্ঠ
৭১১	সে বাঁধ?	১ম, ২য়
	সে বাঁধে?	৩য় ৬ষ্ঠ
৭১৬	উজ্জ্বলি অম্বর।	১ম
	অম্বর উজলি!	২য়-৬ষ্ঠ
৭৩৬	তবে নিকষা নন্দন;—	১ম
	তবে স্বর্ণলঙ্কাপতি;—	২য়-৬ষ্ঠ
৭৪১	জলে শিলা ভাসে?	১ম
	ভাসে শিলা জলে?	২য়-৬ষ্ঠ
৭৪৩	উত্তর করিলা তবে অসুরারি রিপু;—	১ম
	উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু;—	২য়
	উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৭৫৪	তরুবর কিম্বা তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা	১ম
	ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা	২য়-৬ষ্ঠ
৭৬০	প্রভাতে যুঝিও, পুত্র, রাঘবের সাথে।	১ম
	প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"	২য়-৬ষ্ঠ

দ্বিতীয় সর্গ

২	ললাটে তারা রতন। ফুটিল কুমুদ;	১ম
	ললাটে একটি রত্ন। ফুটিল কুমুদ;	২য়
	একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬	আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি,[১]	১ম
	আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি	২য়-৬ষ্ঠ
৭	শর্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,	১ম
	শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে	২য়-৬ষ্ঠ
১২	বিরাম, জলদদল, খেচর, ভূচর,	১ম, ২য়
	বিরাম, ভূচরসহ জলচর-আদি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৯	ঢুলায় কিঙ্করী	১ম, ২য়
	ঢুলায় চামরী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২০	আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন	১ম
	আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন—	২য়-৬ষ্ঠ

১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে সংকলিত রাজনারায়ণ বসুকে লেখা ৪৪-সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য। এই চিঠিতে মধুসূদন এই পঙ্‌ক্তি দুটির (৬ ও ৭ সংখ্যক) পাঠান্তরের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠান্তরের আলোচনায় আগে উদ্ধৃত হয়েছে।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৭	সুধারস।	১ম, ২য়
	সুধারসে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৩	আলো করি সুর পুর,	১ম, ২য়
	আলো করি সুর-পুরী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪০	উত্তরিলা বাসব;—"হে বারীন্দ্র-নন্দিনি,	১ম, ২য়
	উত্তরে করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪১	রাঙা পদযুগ	১ম, ২য়
	রাঙা পা দুখানি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪২	সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ! যার প্রতি তুমি,	১ম, ২য়
	বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৪	জনম তার!—	১ম, ২য়
	জনম তারি!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭	স্বর্ণ লঙ্কাপুরে।	১ম, ২য়
	স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৯৩	সমূলে নির্মূল না হইলে	১ম
	না হইলে নির্মূল সমূলে	২য়-৬ষ্ঠ
৯৪	রসাতলে যায় ভবতল!	১ম
	ভবতল যায় রসাতলে!	২য়
	ভবতল রসাতলে যাবে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৯৯	কি দোষ দেখিয়া তার, না ভাবেন মনে?	১ম, ২য়
	কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১০১	জিজ্ঞাসিও, অদিতি নন্দন?	১ম, ২য়
	জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১০৬	গেলা নীচগামী,	১ম, ২য়
	গেলা অধোদেশে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১০৭	সোনার প্রতিমা, মরি, পড়িলে বিমল	
-০৮	সলিলে, উজলি জল, ডুবে যথা তলে!	১ম, ২য়
	সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে	
	ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১০	শচীকান্ত নিতান্ত মধুর	১ম, ২য়
	শচীকান্ত মধুর বচনে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১১	বচনে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।	১ম, ২য়
	একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১২	সহ বহিলে পবন,	১ম, ২য়
	সহ পবন বহিলে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১৫	শুনিয়া পত্রির বাণী,	১ম, ২য
	শুনি প্রণয়ীর বাণী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২০	দেবযান; চমকিয়া জাগিল জগত্‌,	১ম
	দেবযান; চমকিয়া জগত জাগিল,	২য়
	দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
১২৩	কূজনে; ফুটিল পদ্ম; মুদিল কুমুদ।	১ম, ২য়
	পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৪	বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি কুলবধূ,	১ম, ২য়
	বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৫	লজ্জাশীলা, আবরিলা কমলবদন।	১ম, ২য়
	কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৬	কৈলাস শিখর,	১ম, ২য়
	কৈলাসশিখরী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৩০	পীতধড়া যথা।	১ম
	পীতধড়া যেন!	২য়-৬ষ্ঠ
১৩৯	তোমা দুই জন?"	১ম, ২য়
	তোমা দুই জনে?"	৩য়-৬ষ্ঠ
১৬২	রণভূমে মেঘনাদ সাথে?	১ম
	রণ-ভূমে রাবণির সাথে?	২য়-৬ষ্ঠ
১৭৩	কহিলা বাসব;—	১ম, ২য়
	বাসব কহিলা;—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৮১	আছিল তাহার	১ম, ২য়
	তাহার আছিল	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৮২	অমূল	১ম, ২য়
	অমূল্য	৩য়-৬ষ্ঠ
২২৫	হেনকালে সহসা পূরিল গন্ধামোদে	১ম
	হেনকালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৩	খড়ি পাতি, করিয়া গণনা,	১ম
	খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৪	হাসিয়া বিজয়া কহে;	১ম
	নিবেদিলা হাসি সখী;	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৬	সিন্দূরে আঁকিয়া	১ম, ২য়
	সুসিন্দূরে আঁকি	৩য়-৬ষ্ঠ
২৬৬	ভাবিলা কিরূপে আজি ভেটিব মহেশে?	১ম, ২য়
	ভাবিলা "কিভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৬৭	স্মরিলা রতিরে—	১ম
	চিন্তিলা রতিরে।	২য়-৬ষ্ঠ
২৬৯	বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেন সুখে,	১ম, ২য়
	বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলো	
২৭৩	অঙ্গুলি পরশে! চলি গেলা কামবধূ,	১ম, ২য়
	অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৭৪	দ্রুতগতি মধুমতী, কৈলাস শিখরে।	১ম, ২য়
	দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।	
২৭৫	হায়রে, নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী	১ম, ২য়
	সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী	

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৮৯	বিবিধ ভূষণ	১ম, ২য়
	বিবিধ ভূষণে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯০	হীরা, মণি, মুকুতা-খচিত; আনি দিলা	১ম
	হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা	২য়-৬ষ্ঠ
২৯২	কৌষেয় বসন, রত্ন-সঙ্কলিত আভা	১ম, ২য়
	রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৩	আঁকিলা হরষে	১ম, ২য়
	চিত্রিলা হরষে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৪	শশীমুখী। ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি ধরি।	১ম
	শশীমুখী, ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী	২য়
	চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৭	ও চন্দ্র আনন,	১ম
	ও চন্দ্র-আনন;	২য়
	ও চন্দ্র-আননে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩০৫	শুনিয়া উল্লাসে!	১ম
	শুনি রে উল্লাসে!	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৮	যোগে মগ্ন এবে দেব,	১ম, ২য়
	যোগে মগ্ন এবে, বাছা;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩১৫	ত্যজি বিশ্বভার	১ম
	বিশ্ব-ভার ত্যজি,	২য়-৬ষ্ঠ
৩২৯	এ মম মিনতি"	১ম
	এ মিনতি পদে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৩৩৫	জীবন নাশক	১ম
	প্রাণনাশকারী	২য়
	প্রাণ-নাশ-কারী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৩৬	বিষ যথা বাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে।"	১ম
	বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪২	বাহির হইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে?	১ম
	বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪৩	জগত, হেরিয়া	১ম, ২য়
	জগত, হেরিলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৪৬	যবে মথিয়া সিন্ধুরে,	১ম, ২য়
	যবে মথি জলনাথে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৪৯	আইলা কেশব।	১ম
	আইলা শ্রীপতি।	২য়-৬ষ্ঠ
৩৫০	হেরি ত্রিভুবন,	১ম
	ত্রিভুবন হেরি,	২য়-৬ষ্ঠ
৩৫১	কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তাঁর পানে!	১ম
	হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!	২য়-৬ষ্ঠ
৩৫৫	কুচ যুগ	১ম, ২য়
	কুচ-যুগে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৬১	চারু অবয়ব	১ম, ২য়
	চারু অবয়বে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৭৮	পালাইল	১ম
	পলাইল	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮২	নিমগ্ন তপঃ সাগরে,	১ম, ২য়
	তপের সাগরে মগ্ন,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪২১	হানিলা কুসুমধনুঃ টঙ্কারি, কুসুম—	১ম, ২য়
	হানিলা কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৩	দেব কি মানব,	১ম, ২য়
	দেবে কি মানবে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৪	কার হেন সাধ্য	১ম, ২য়
	কোথা হেন সাধ্য	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৬	আদেশো,	১ম
	আদেশ,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	কুমুদ, কমল,	১ম, ২য়
	কমল, কুমুদী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৪৬	দেবদেব মহাদেব সহ মহাদেবী।	১ম
	দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৮	দাঁড়াইয়া বিধুমুখী	১ম
	দাঁড়াইলা বিধুমুখী	২য়-৬ষ্ঠ
৪৫৫	উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।	১ম
	দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৫৮	কহিলেন প্রিয়ম্বদা;—	১ম
	কহিলেন প্রিয়ভাষে;	২য়-৬ষ্ঠ
৪৬৪	হাসিয়া, হাসিয়া	১ম, ২য়
	সুমধুর হাসে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭০	বার্ত্তা। আরোহিয়া রথে দেবরথীবর	১ম
	বার্ত্তা। আরোহিয়া রথে দেবরাজরথী	২য়
	বারতা। আরোহি রথে, দেবরাজ রথী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭৩	অকম্প শির চামর;—	১ম
	অকম্প চামর শিরে;	২য়-৬ষ্ঠ
৪৭৬	ত্যজি রথবর	১ম, ২য়
	ত্যজি রথ-বরে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৮০	আভাময় আসনে বসেন কুহকিনী	১ম
	আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮১	করযোড়ে প্রণমি বাসব	১ম
	করযোড়ে বাসব প্রণমি	২য়
	কর যোড়ে বাসব প্রণমি	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৮৫	মহেশ আদেশে,	১ম, ২য়

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	শিবের আদেশে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৯৮	অস্ত্র।	১ম, ২য়
	অস্ত্রে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০১	তূণীর,	১ম, ২য়
	তূণীরে,	৪র্থ ৬ষ্ঠ
৫০৭	নয়ন!	১ম, ২য়
	নয়নে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫১৬	প্রেরো	১ম
	প্রের	২য়-৬ষ্ঠ
৫২১	হৈমদ্বার	১ম, ২য়
	হৈমদ্বারে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৪	গগন	১ম, ২য়
	গগনে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৫	আজ্ঞা দিব	১ম
	দিব আজ্ঞা	২য়-৬ষ্ঠ
৫৪৬	বায়ুকুল;	১ম
	বায়ু কুলে;	২য়-৬ষ্ঠ
৫৪৭	জগৎ পূরিব	১ম, ২য়
	পূরিব জগতে।"	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৮	প্রণমি, দেবেন্দ্রপদে, যতনে লইয়া	১ম, ২য়
	প্রণমি, দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৯	অস্ত্র,	১ম, ২য়
	অস্ত্রে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৫৩	বায়ুদল—	১ম, ২য়
	বায়ুদলে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৫৪	বৈরী তব সিন্ধুসনে	১ম
	বৈরী সিন্ধু তার সনে	২য়
	বৈরী বারি-নাথ সনে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৫৭ -০৮	তিমির গহ্বরে যথা রুদ্ধ বায়ু যত ভীমাকৃতি। কতদূরে শুনিলা পবন	১ম
	ভাঙিলে শৃঙ্খল লক্ষ্মী কেশরী যেমতি,[১] যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত গিরি-গর্ভে। কতদূরে শুনিলা পবন	২য়-৬ষ্ঠ
৫৫৯	ঘোর কোলাহল;	১ম, ২য়
	ঘোর কোলাহলে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬৬	তরঙ্গ নিকর	১ম
	তরঙ্গনিকর	২য়
	তরঙ্গ-আবলী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৮৫	নয়ন,	১ম, ২য়
	নয়নে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬২২	শান্তিল জলধি;	১ম
	শান্তিলা জলধি;	২য়-৬ষ্ঠ

তৃতীয় সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩৮	সে দাম	১ম, ২য়
	সে দামে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৯	ঝরিল শিশির নীর,	১ম, ২য়
	মুক্তিল শিশির-নীরে,	৪র্থ ৬ষ্ঠ
৫৬	এ পরাণো	১ম
	এ পরাণ	২য় ৬ষ্ঠ
৬১	ফুলচয়	১ম, ২য়
	ফুল-চয়ে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৭৬	জলধি উদ্দেশে,	১ম, ২য়
	সিন্ধুর উদ্দেশে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৯২	আস্ফালি ফলকপুঞ্জ	১ম, ২য়
	আস্ফালি ফলকপুঞ্জে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২১	কটিদেশ	১ম, ২য়
	কটিদেশে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৩	দুলিল ফলক,	১ম, ২য়
	ফলক দুলিল,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৪	নয়ন!	১ম, ২য়
	নয়নে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৮	ঝলমলি জ্বলে অঙ্গে	১ম, ২য়
	ঝলমলি ঝলে অঙ্গে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫২	মাতিলা	১ম, ২য়
	মাতিল	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫৪	বিভীষণ—	১ম, ২য়
	বিভীষণে—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫৫	বিপক্ষদল,	১ম, ২য়
	বিপক্ষ দলে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫৬	বিদ্যুত আকৃতি	১ম, ২য়
	বিদ্যুৎ-আকৃতি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২০২	পবন-নন্দন	১ম, ২য়
	বলীন্দ পাবণি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২১২	মন্দোদরীসহ যত	১ম
	মন্দোদরী-আদি	২য়-৬ষ্ঠ

১। বর্তমানে পঙ্‌ক্তিটির সংখ্যা ৫৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজন।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২১৮	রঘুকুলকমলিনী;	১ম, ২য়
	রঘু-কুল-কমলেরে:—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২২৩	কহিলা গভীরে:--	১ম, ২য়
	কহিলা গম্ভীরে:	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৩	উতরিল	১ম
	উতরিলা	২য়-৬ষ্ঠ
৩১১	ধীর দাশরথি	১ম
	বীর দাশরথি	২য়-৬ষ্ঠ
৩৩৯	বীরেশ্বর: বীর পত্নী তোমার ভর্ত্রিণী।	
৩৪০	কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি ললনে,	১ম, ২য়
	বীরেশ্বর; বীর পত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,	
	তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।[1]	
	কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি ললনে,	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৬৬	বারিদ পুঞ্জ!	১ম
	বারিদ-পুঞ্জে!	২য়-৬ষ্ঠ
৩৭৫	অটল: চলিছে বামাদল মধ্যপথে.	১ম
	অটল; চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!	২য়-৬ষ্ঠ
৩৯০	কুসুম শর!	১ম, ২য়
	কুসুম-শরে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৯৮	শূল কেহ	১ম, ২য়
	শূলে কেহ:	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪১৮	মহাশক্তি সম তেজঃ!	১ম
	মহাশক্তি-সম তেজে!	২য়-৬ষ্ঠ
৪২৪	এ নিগড়,	১ম, ২য়
	এ নিগড়ে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৬	সম অটল সমরে!	১ম
	সদৃশ অটল যুদ্ধে!	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	নিস্তারিলে ভবে,	১ম, ২য়
	নিস্তারিলা ভবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৮	এ দম্ভ.	১ম, ২য়
	এ দম্ভে.	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৪৯	সাগর বাঁধিয়া	১ম, ২য়
	সাগরে বাঁধিয়া	৪র্থ, ৬ষ্ঠ
৪৭৩	মেঘনাদ: পিতৃপাপে পুত্রের মরণ।	১ম
	মেঘনাদ: মরে পুত্র জনকের পাপে।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৭৮	কোথায় কে জাগে? মহাক্রান্ত আজি সবে	১ম
	কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্রান্ত সবে	২য়-৬ষ্ঠ
৪৯৫	কুম্ভ আস্ফালিল:	১ম, ২য়
	কুম্ভে আস্ফালিল;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০৮	পতঙ্গনিকর	১ম, ২য়
	পতঙ্গ-আবলী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০৯	আইলা ধাইয়া	১ম, ২য়
	আইল ধাইয়া	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১১	কুসুমাসার:	১ম, ২য়
	কুসুমাসারে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৩৫	ত্যজিলা বীরভূষণ; পরিলা দুকূলে	১ম, ২য়
	ত্যজিলা বীর-ভূষণে: পরিলা দুকূলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৩৯	উবসে, কামেব বাসা; ভালে তারা গাঁথা	১ম, ২য়
	উবসে, জ্বলিল ভালে তারা গাঁথা সিঁথি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪০	সিঁথি; কর্ণে কুণ্ডল; অলকে মণি-আভা	১ম, ২য়
	অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬০২	রবিচ্ছবিকরস্পর্শে	১ম, ২য়
	রবিচ্ছবি-করস্পর্শে	৩য়-৬ষ্ঠ

চতুর্থ সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
১৩	বঙ্গভূমি অলঙ্কার!—	১ম, ২য়
	এ বঙ্গের অলঙ্কার!—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৪	কবিতা রস সরসে রাজ-হংস-কুল	১ম, ২য়
	কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫	সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে?	১ম, ২য়
	মিলি করি কেলি আমি না শিখালে তুমি?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৬	গাঁথিব নূতন মালা, তুলিয়া যতনে	১ম, ২য়
	গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৭	তব কাব্যোদ্যান-ফুল;	১ম, ২য়
	তব কাব্যোদ্যানে ফুল;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৯	বৈরীদল সিন্ধুপারে;	১ম, ২য়
	বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩	পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে	১ম, ২য়
	পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, কাননে[2]	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৮	নীরব!	১ম
	নীরবে!	২য়-৬ষ্ঠ
৫৬	রহিয়া রহিয়া দূরে স্বনিছে পবন,	১ম

১ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে পঙ্‌ক্তিটি ছিল না, পরবর্তী সংস্করণে নব সংযোজন। স্বভাবতই 'কহ তাঁরে শতমুখে' পঙ্‌ক্তিটির সংখ্যা তৃতীয় সংস্করণে হয়েছে ৩৪১।

২ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণে 'দেউলে' শব্দটি বাদ পড়েছিল এবং এই ভুল চলে আসছিল। সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণের পরেই এই ত্রুটি ঘটেছিল।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৫৭	নিশ্বাসে বিলাপী যথা!	১ম
	উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৩	এ দুঃখ বারতা	১ম, ২য়
	এ দুখ-কাহিনী!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৭৯	সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু	১ম
৯২	মৈথেলী:	১ম
	মৈথেলী:—	২য়-৬ষ্ঠ
১০৫	তোমা রক্ষোরাজ, সতি?	১ম, ২য়
	তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১০	এ চোর? কি মায়া করি,	১ম
	এ চোর? কি মায়াবলে	২য়
	এ চোর? কি মায়া-বলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
[১] ১১১	পশিয়া, করিল চুরি অমূল রতনে?	১ম, ২য়
	প্রবেশি, করিল চুরি এহেন রতনে?"	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৮	ঘটাইল পরে!	১ম
	ঘটাইল শেষে!	২য়-৬ষ্ঠ
২৪৮	দেবতা যত	১ম, ২য়
	দেবতা-কুলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৭৬	মাগিনু কুরঙ্গ আমি	১ম, ২য়
	মাগিনু কুরঙ্গে আমি!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৩	রাক্ষস ভ্রমবে হেথা,	১ম, ২য়
	রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩০৭	দেখিব করুণা স্বরে	১ম
	দেখিব করুণ-স্বরে	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪২	কি গৌরবে ব্রহ্মশাপে কর অবহেলা?	১ম
	কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৩	আভরণ। দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।"	১ম
	আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৪১৫	স্বর্ণরথ হইল অস্থির!	১ম
	স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!	২য়-৬ষ্ঠ
৪১৮	কহিলা গভীরে	১ম
	কহিলা গম্ভীরে	২য়-৬ষ্ঠ
৪২২	প্রেমদীপ? জানি আমি এই ধর্ম্ম তোর	১ম
	প্রেমদীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।	২য়-৬ষ্ঠ
৪২৬	নাহি আর তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে!"	১ম
	আছে কি-রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?"	২য়-৬ষ্ঠ
৪৩৩	সে রণ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!	১ম, ২য়
	সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৯৭	অলঙ্ঘ্য সাগর	১ম
	অলঙ্ঘ্য সাগরে	২য়-৬ষ্ঠ
৫৯৬	মেলি আঁখি	১ম
	মিলি আঁখি,	২য়-৬ষ্ঠ
৬০০	উন্মীলিয়া দেখ চেয়ে, ইন্দু নিভাননে,	১ম
	উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে	২য়-৬ষ্ঠ
৬৪৯	জন্তুকুল	১ম
	জন্তু-পুঞ্জ	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫২	এ তব দুঃখ শর্ব্বরীর।	১ম
	এ দুঃখ শর্ব্বরী তব।	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫৬	যথা ঋতুকুলেশ্বরে।	১ম
	যথা ভেটেন মধুরে!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৬৮	মূর্ত্তিমতী তুমি দয়া	১ম, ২য়
	মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঞ্চম সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৪৯	নীরবে মুদিত পদ্ম।	১ম, ২য়
	নীরবে মুদিত পদ্মে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৯	বিরাজে সৌমিত্রি শূর, সুমিত্রার বেশে	১ম
	বিরাজেন রামানুজ সুমিত্রার বেশে	২য়-৬ষ্ঠ
১৯২	বীরবরদলে	১ম, ২য়
	বীর-বল-দলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৯৯	রাঘবের চিরদাস আমি অগ্রসরি	১ম
	রাঘবের দাস আমি। আশু অগ্রসরি	২য়-৬ষ্ঠ
২০৮	জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদ নিশাতে	১ম
	জাহ্নবীর ফেন-লেখা শারদনিশাতে	২য়-৬ষ্ঠ
২০৯	কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে যেন	১ম
	কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন;	২য়-৬ষ্ঠ
২২০	বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে!	১ম
	বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!	২য়-৬ষ্ঠ
২২৪	কহিলা গভীরে;	১ম
	কহিলা গম্ভীরে!	২য়-৬ষ্ঠ
২৩০	শুনিলা চমকি বীর ঘোর সিংহনাদ!	১ম
	ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি!	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৭	আবরিল শশী	১ম
	আবরিল চাঁদে	২য়-৬ষ্ঠ
২৪২	উপাড়িলা তরু	১ম, ২য়

১। সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পঙ্‌ক্তিটি বর্জিত হয়ে এসেছে। দীননাথ সান্যালের মন্তব্য : "ইহার অভাবে পরবর্ত্তী পংক্তির কোন অর্থ হয় না।"

পঙ্ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	উপড়িলা তরু	৩য়-৬ষ্ঠ
২৮৭	অমৃত সতত,	১ম
	অমৃত উল্লাসে;	২য়-৬ষ্ঠ
২৮৮	অমরী, স্থিরযৌবনা! বরিনু তোমারে	১ম
	অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;	
	উরদ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত,	
	না শুখায় সুধারস অধর-সরসে;	
	অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে[1]	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৪	রাক্ষস	১ম
	রাক্ষসে,	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৭	এতেক কহিয়া মহাবাহু	১ম
	মহাবাহু এতেক কহিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৩৩৬	সিংহাসনে মহামায়া!	১ম
	সিংহাসনে মহামায়ে।	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪৬	সাধিতে তোর এ কার্য্য	১ম
	সাধিতে এ কার্য্য তোর	২য়-৬ষ্ঠ
৩৬১	গর্ব্বে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,	১ম
	গর্ব্বে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮১	তুমি রবিছবি	১ম
	তুমি রবিচ্ছবি;—	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৪	(ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি)	১ম
	(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)	২য়-৬ষ্ঠ
৫২২	পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।"	
-২৩	জলদ প্রতিমস্বনে স্বনিলা কেশরী।	১ম
	পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি	
	কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"	২য়-৬ষ্ঠ
৫৩৫	জননীর পদে	১ম
	জননীর পদ	২য়-৬ষ্ঠ
৫৫৪	মুকুতাহার উরসে নয়ন বর্ষিল	১ম, ২য়
	মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল	৪র্থ-৬ষ্ঠ

ষষ্ঠ সর্গ

পঙ্ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩	রাঘব-পঙ্কজ-রবি; কিরাত যেমনি,	১ম, ২য়
	রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি।	৩য়-৬ষ্ঠ
৪	হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় বায়ুগতি	১ম, ২য়
	হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৬	সাধিতে তোর এ কার্য্য, শিবের আদেশে	১ম
	সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের আদেশে	২য়-৬ষ্ঠ
৫৮	স্ববন্ধুবান্ধব—	১ম, ২য়
	স্ববন্ধুবান্ধবে—	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯	হারাইনু ভাগ্যদোষে সকলে; আছিল	১ম, ২য়
	হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল	৩য়-৬ষ্ঠ
৬২	দুর-অদৃষ্ট!	১ম
	দুর-দৃষ্ট!	২য়
	দুরদৃষ্ট!	৩য়-৬ষ্ঠ
১০৭	স্বর্গীয় বাদিত্র, আহা, শুনিনু গগনে	১ম, ২য়
	স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে	৩য়-৬ষ্ঠ
১৩৪	কত যে সাধিলা সবে,	১ম, ২য়
	কত যে সাধিল সবে,	৩য়-৬ষ্ঠ
১৫৬	এ অররুপুরে	১ম, ২য়
	এ রাক্ষস-পুরে,	৩য়-৬ষ্ঠ
১৮৭	ফলক; দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত, কাঞ্চনে	১ম
	দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত ফলক,—কাঞ্চনে	২য়
	ফলক; দ্বিরদরদ নির্ম্মিত, কাঞ্চনে	৩য়-৬ষ্ঠ
১৮৯	শরময়।	১ম, ২য়
	শরপূর্ণ	৩য়-৬ষ্ঠ
১৯৩	সুচূড়া, কেশরী-পৃষ্ঠে হায়রে, যেমতি	১ম, ২য়
	সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি	৩য়-৬ষ্ঠ
২১৪	নিস্তারিনি, দেবদলে!	১ম
	দেবদলে, নিস্তারিণি!	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৩	অমূল রতন	১ম, ২য়
	অমূল রতনে	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩৪	ভিখারী রামের, রাম অর্পিছে তোমাবে.	১ম, ২য়
	রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,	৩য়-৬ষ্ঠ
২৯৫	মেঘনাদে? এতদিনে মজিলি, দুর্ম্মতি	
-৯৬	রাবণ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা	
	মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে	১ম
	রাবণ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা	
	মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে,	২য়
	রাবণিরে! ঘন বনে হেরি দূরে যথা	
	মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র, গুল্ম-আবরণে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৩০০	অদৃশ্য,	১ম, ২য়
	অদৃশ্যে,	৩য়-৬ষ্ঠ
৩০৫	শুক্তি শুষে যথা	১ম
	শুষে শুক্তি যথা	২য়-৬ষ্ঠ
৩২০	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য, বিগ্রহপ্রয়াসী।	১ম

১। 'অনন্ত বসন্ত জাগে ... অধর-সরসে', দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজন।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য; দুর্জ্জয় সংগ্রামে।	২য়
	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৩৭	মণ্ডিত রতনে, আহা, যথা সুরপুরে!—	১ম, ২য়
	মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৪৭	তুষার রাশিতে, মরি, প্রভাতে যেমতি	১ম, ২য়
	তুষার রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৫৫	এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?	১ম
	এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?	২য় ৬ষ্ঠ
৩৭৯	কোথাও, আমোদি পথ সৌরভে রূপসী,	১ম, ২য়
	কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪০৪	গলে ফুলমালা।	১ম, ২য়
	ফুলমালা গলে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৪১২	যোগীন্দ্র-কৈলাস, আহা! তোর উচ্চ চূড়ে!	১ম, ২য়
	যোগীন্দ্র-কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৩৪	সহসা হেরিয়া	১ম, ২য়
	সহসা হেরিলে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৪	এ অররুপুরে আজি?	১ম, ২য়
	রক্ষোরাজপুরে আজি?	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৭	উচ্চ এ পুর প্রাচীর:	১ম, ২য়
	এ পুর-প্রাচীর উচ্চ;	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৫০	দেবকুলোদ্ভব	১ম, ২য়
	দেবকুলোদ্ভবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৫১	কে আছে রথী এ ভবে,	১ম, ২য়
	কে আছে রথী এ বিশ্বে	৩য় ৬ষ্ঠ
৪৮০	রক্ষোরিপু তুমি, কিন্তু অতিথি হে এবে	১ম, ২য়
	রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৩৪	রক্ষিয়া	১ম, ২য়
	রক্ষিতে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৪৭	হে বীরকেশরী, কবে সম্ভাষে শৃগালে	১ম, ২য়
	কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৭	রাঘবপদ আশ্রয়ে	১ম
	রাঘবপদ-আশ্রয়ে	২য়
	রাঘবের পদাশ্রয়ে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৮	পরোদোষে	১ম
	পর-দোষে	২য়
	পরদোষে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৮	বহে বরষার কালে	১ম

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	বহে রবিযার কালে	২য়-৬ষ্ঠ
৬১২	যথা প্রহারকে হেরি, সম্মুখে কেশরী!	১ম, ২য়
	প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৩৯	আঃ মরি, যেমতি	১ম, ২য়
	কাঁদিল যেমতি	৩য় ৬ষ্ঠ
৬৪৯	দৈত্যকুলদম ইন্দ্রে	১ম, ২য়
	দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৯২	উঠ, অরিন্দম!	১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ
	উঠ, অরিন্দমি!	৩য়-৫ম
৭৩৩	এ অররুপুরে।	১ম, ২য়
	এ রাক্ষসপুরে।	৩য়-৬ষ্ঠ

সপ্তম সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২	পদ্মপর্ণে সুপ্ত, আহা, পদ্মযোনি যেন,	১ম, ২য়
	পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,	৩য়-৬ষ্ঠ
৩	উন্মীলি নয়ন দেব সুপ্রসন্ন ভাবে,	১ম, ২য়
	উন্মীলি নয়ন পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৮	প্রণমিলা পদে	১ম
	প্রণমিলে পদে	২য় ৬ষ্ঠ
১২৬	ব্যজনিল কেহ।	১ম
	কেহ বিউনিল।	২য়
	বিউনিল কেহ।	৩য়-৬ষ্ঠ
১৪৮	ভাগ্যহীন ভৃত্য	১ম
	ভাগ্যহীন ভৃত্যে	২য়-৬ষ্ঠ
১৮৮	জলমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে![1]	২য় ৬ষ্ঠ
২৯০	মহৎ যে জন, সদা উদ্ধারে বিপদে!	১ম, ২য়
	মহত্ত্ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে!	৩য়-৬ষ্ঠ
৩০৭	সেনানী, সুবর্ণরথে চিত্ররথ রথী।	১ম-২য়
	সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	চলিছে প্রতাপ অগ্রে, শব্দ তার পরে।	১ম, ২য়
	চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;	৩য় ৬ষ্ঠ
৪৪৪	পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি;	
-৪৫	চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টি পথ রোধি[2]	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৬	তদনু পরাগরাশি! টলিছে সঘনে	১ম, ২য়
	ঘন ঘনাকাররূপে! টলিছে সঘনে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৯	চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে আসিয়া।	১ম
	চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে সমরে।	২য়

১। পঙ্‌ক্তিটি প্রথম সংস্করণে ছিল না।
২। পঙ্‌ক্তিটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল না।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
	চির-অরি প্রভঞ্জনে দেখা দিলে দূরে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৫৫	কাঁদিছে জননী কোলে করি শিশুকুল	১ম
	কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৫৬	ভয়াকুল;	১ম, ২য়
	ভয়াকুলা;	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১৫	বসিবেন আর রমা, এ বিশ্ব আঁধারি!"	১ম, ২য়
	বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১৬	দেবরক্ষঃনরে	১ম
	দেব রক্ষোনরে	২য়
	দেবরক্ষোনরে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫২৯	যথা হেরিয়া বারণে।	১ম, ২য়
	যথা হেরি সে বারণে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৩২	শতজলস্রোতঃনাদে।	১ম
	শতজলস্রোতোনাদে!	২য়-৬ষ্ঠ
৫৪১	রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, বাসব যেমতি	
-৪২	স্বরীশ্বর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,	১ম, ২য়
	রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা	
	বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৬	কহিলা গভীরে,—	১ম, ২য়
	কহিলা গম্ভীরে,—	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৮৯	হানিলা	১ম
	হানিল	২য়-৬ষ্ঠ
৫৯২	দেখ লো	১ম, ২য়
	দেখ্ লো	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৪	দেখ	১ম, ২য়
	দেখ্	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৫	যাও তুমি সৌদামিনীগতি,	১ম, ২য়
	যা লো তুই সৌদামিনীগতি,	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৬	নিবার	১ম, ২য়
	নিবার্	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৩৩	লাড়িতে দম্ভোলি, হায়, দম্ভোলি-নিক্ষেপী!	১ম, ২য়
	লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৬৫	পালাইল রড়ে	১ম
	পালাইলা রড়ে	২য়-৬ষ্ঠ
৬৮৪	আবার তারার, মূঢ়? দেবর কে আছে	১ম-৫ম
	আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে	৬ষ্ঠ
৭২০	চুরিলি রাক্ষস-রত্ন—অমূল জগতে।"	১ম
	হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৭৫৬	চন্দ্রচূড়, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহ!"	১ম, ২য়
	বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ

অষ্টম সর্গ

২	রাজেন্দ্র, রাখেন দেব খুলি সযতনে	১ম, ২য়
	প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪	দিনান্তে দিনরতন তমোহা মিহিরে	১ম, ২য়
	দিনান্তে শিবের রত্ন, তমোহা মিহিরে,	৩য়-৬ষ্ঠ
২০	লক্ষ্মণ, কুটীর-দ্বারে নিত্য নিশাকালে,	১ম, ২য়
	লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩	তুমি! আজি রক্ষঃ-পুরে অরি-মাঝে আমি।	১ম, ২য়
	আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,	৩য়-৬ষ্ঠ
১০৬	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া	
-০৮	কি উপায়ে রামানুজ জীবন লভিবে,	
	পূজায় সন্তুষ্ট তাঁরে করিলে নৃমণি।	১ম, ২য়
	পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে	
	কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,	
	আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!	৩য়-৬ষ্ঠ
১১৯	লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; কৃতান্ত আপনি	১ম, ২য়
	লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা	৩য়-৬ষ্ঠ
১২৩	ত্রিশূলী, ত্রিশূল, সতি।	১ম
	ত্রিশূলীর শূল, সতি।	২য়-৬ষ্ঠ
১২৪	যমদেশ	১ম
	যমদেশে	২য়-৬ষ্ঠ
১৪০	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া	১ম, ২য়
	পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া	৩য়-৬ষ্ঠ
২১৬	ঘোরে অবিরাম গতি দ্বারের চৌদিকে!	১ম, ২য়
	ঘোরে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি!	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩৪	পচা সর্ব্ব দেহ	১ম
	বিগলিত দেহ	২য়-৬ষ্ঠ
২৬৪	রণ	১ম, ২য়
	রণে!	৩য়-৬ষ্ঠ
৩২৩	চিরোজ্জ্বল! চলে, রথি, চল, দেখাইব	১ম, ২য়
	জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল দেখাইব	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৪৫	হে ধম্বি, বিরত তুমি, চল এই পথে!"	১ম, ২য়
	হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!"	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৬৭	কর্ম্মদোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব	১ম
	ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব	২য়-৬ষ্ঠ
৩৬৮	ধর্ম্মরাজে, তেঁই আজি এ কৃতান্তপুরে।"	১ম, ২য়
	পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"	৩য়-৬ষ্ঠ
৪১৩	গরিমার পুরস্কার এই অবশেষে?	১ম, ২য়
	গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৪৩১	আবার কহিলা মায়া ...	
-৯৩	... পুরস্কার শেষে?"[1]	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৯৭	কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ? লইব মাগিয়া	১ম, ২য়
	কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৯৯	লহ দাসে দেব-ধামে, এ মম মিনতি।"	১ম, ২য়
	লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫০২	সহস্র বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি	১ম, ২য়
	দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি	৩য়-৬ষ্ঠ
৫০৫	করে বাস পতি-সহ পতিপরায়ণা	১ম, ২য়
	পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১৬	চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় যে কিছু যা চাহে,	১ম
	চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় যা কিছু যে চাহে,	২য়-৬ষ্ঠ
৫২১	অবিলম্বে ধর্ম্মরাজে পাইবে, নৃমণি!"	১ম, ২য়
	অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৪৪	লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ দক্ষিণ দ্বারে!	১ম, ২য়
	লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৫৫	কণক প্রসূন প্রসূ;—	১ম, ২য়
	কণকপ্রসূন-পূর্ণ;	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৬৫	উজ্জ্বল।"	১ম, ২য়
	উজ্জ্বলে!"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৩	সুরথে সুরথীবৃন্দ টঙ্কারিছে ধনুঃ[2]	১ম
৫৭৬	বীরকুল সংকীর্ত্তন।	১ম, ২য়
	বীরকুলসংকীর্ত্তনে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৫৫	বিনাশিনু বজ্রাঘাতে,	১ম, ২য়
	বিনাশিনু বহু রক্ষঃ,	৩য়-৬ষ্ঠ
৭৩৯	ফল, হায়, কে পারে বর্ণিতে ফলছটা?	১ম
	ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?	২য়-৬ষ্ঠ

নবম সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৭০	কহিল	১ম
	কহিল	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৮	কর্ব্বুর-গৌরব-রবি	১ম, ৫ম
	কর্ব্বরি-গৌরব-রবি[3]	৬ষ্ঠ
৩৯৭	কি বলে বুঝাব তারে? বুঝিতে না পারি!	১ম
	কি কয়ে বুঝাব তারে? বুঝিতে না পারি!	২য়
	কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?	৩য়-৬ষ্ঠ

মেঘনাদবধ কাব্যের এই পাঠান্তরগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, মধুসূদন মূলত প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণেই মূল কাব্যের সংস্কার করেন। সম্ভবত, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণেও বহুল পরিবর্তন করা হয়, অন্তত দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের পাঠান্তরের দিকে তাকালে তাই মনে হয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের পাঠান্তর খুব বেশি নেই, মূলত বিরাম-চিহ্নের, ক্বচিৎ শব্দগত। ষষ্ঠ সংস্করণের পাঠই পরবর্তীকালে গৃহীত হয়ে এসেছে।

এই পাঠান্তরগুলির পর্যালোচনা বা প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এগুলির সংখ্যা। সর্গ অনুসারে পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরের সংখ্যা এইরকম :

প্রথম সর্গ	:	১১৫	ষষ্ঠ সর্গ	:	৪৩
দ্বিতীয় সর্গ	:	১০২	সপ্তম সর্গ	:	৩১
তৃতীয় সর্গ	:	৩৯	অষ্টম সর্গ[4]	:	৩২
চতুর্থ সর্গ	:	৩৭	নবম সর্গ	:	৩
পঞ্চম সর্গ	:	২৪	মোট সংখ্যা	:	৪২৭

১। ৯৩, পঙ্‌ক্তির এই অংশটুকু তৃতীয় সংস্করণের নব সংযোজন।

২। এই পঙ্‌ক্তিটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত। দীননাথ সান্যাল প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন যে এই পঙ্‌ক্তিটির অভাবে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির 'পতাকাচয়' অর্থহীন (অর্থাৎ কিসের পতাকাচয়) হয়ে পড়েছে।

৩। সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ রক্ষিত হয়েছে।

৪। এখানে অষ্টম সর্গের ৪৩১-৪৯৩ সংখ্যক পাঠান্তর বা সংযোজনকে একটি পাঠান্তর হিসেবে ধরা হয়েছে, যদিও এই নব সংযোজিত অংশে ৬৩টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, প্রথম সর্গের পাঠান্তরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় সর্গ থেকে পাঠান্তরের সংখ্যা কমতে কমতে নবম সর্গে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন। প্রথম সর্গ রচনার সময় মধুসূদনের মনে ছিল দ্বিধা, সংশয়; ভাষার উপর হয়ত তেমন দখলও ছিল না। এক কথায় যথেষ্ট আস্থার অভাব ছিল। তারই প্রভাব পড়েছে প্রথম সর্গে। আর সেইজন্যই এই সর্গটির ভাষাগত শৈথিল্য সব চেয়ে বেশি। তার পর তিনি ক্রমশ সেই দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে উঠে উপযুক্ত আস্থা ফিরে পেয়েছেন। ফলে শৈথিল্যও ঘুচে গেছে অনেক পরিমাণে। কাব্যটির প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরে মধুসূদন নিজের কাব্যের পাঠক বা সমালোচক হিসেবে যখন তাঁর কাব্যকে দেখবার সুযোগ পেলেন, স্বভাবতই এই শৈথিল্য তাঁর চোখে পড়েছিল। যদিচ চিঠিতে তিনি 'earlier books'-এর 'metrical blemishes'-এর পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন, আসলে তা ভাষাগত। এবং পূর্বে উল্লিখিত পাঠান্তরগুলির দিকে মনোযোগী দৃষ্টিপাত করলেই এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করা যাবে। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাগত কোনো আলোচনাই, বস্তুত, পাঠান্তরপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চলতে পারে না। এবং এখানেই আলোচনার দিক থেকে পাঠান্তরগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব। মধুসূদন আত্মমনস্ক কবি, তাঁর আত্মমনস্কতার পরিচয় সব চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে এই সব পাঠান্তরে।

অতঃপর পাঠান্তরগুলির প্রকৃতি-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

১ বিরামচিহ্নের পরিবর্তন

২ বাক্যগঠনপ্রণালীর পরিবর্তন

৩ শব্দগত পরিবর্তন

৪ শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশের পরিবর্তন

৫ পঙ্‌ক্তি বা চরণের পরিবর্তন

৬ নব সংযোজন

মধুসূদন যদিও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা চর্চা করবার অবকাশ পান নি, তবু, বিদ্যাসাগরের মতো সেকালে বুঝেছিলেন, গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, ভাষার নিজস্ব একটা ছন্দ আছে এবং সেটা মূলত সৃষ্টি হয় লেখকের বা কবির অনুভূতি অনুসারে। অনুভূতির গাঢ়তা, তারল্য, আবেগময়তা বা আবেগহীনতার সঙ্গে ভাষার একটা নিবিড় আত্মীয়তা থেকে যায়। বলা চলে, লেখকের অনুভূতি ভাষায় অনূদিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং অনুভূতির প্রকাশে ভাষা যেমন একদিকে সহায়ক, অন্যদিকে তেমনি বিরামচিহ্নগুলি প্রতীক রূপে অনুভূতির আরো সূক্ষ্ম দায়িত্ব বহন করে। মধুসূদন বিরামচিহ্নের এই প্রতীকধর্মিতার ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, ছিলেন বলেই দেখতে পাচ্ছি তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে এ বিষয়ে যে কোনো বৈয়াকরণের বা ভাষাবিদের চেয়ে বেশি মনোযোগী।

ধরা যাক্, হাইফেন বা সংযোজক-চিহ্নের কথা। তিনি দুটি শব্দকে সমাসবদ্ধ বা সন্ধি-যুক্ত করবার সুযোগ না পেয়ে প্রায়শই এই চিহ্নটি ব্যবহার করেছেন। যেমন, চরণ-অরবিন্দ, স্ফটিক-গঠিত, দস্যুবৃত্তি-রত, সুচন্দন-বৃক্ষশোভা, রাক্ষস-ঈশ্বর, স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, অঙ্গুলি-পরশে, নক্ষত্র-মণ্ডল ইত্যাদি। এগুলির বেশির ভাগ প্রথম সংস্করণের দৃষ্টান্ত, পরের সংস্করণে তিনি যতদূর সম্ভব এই চিহ্ন বর্জন করে শব্দগুলি একত্র গেঁথে যুগ্ম শব্দে পরিণত করেছেন। যেখানে সন্ধির সুযোগ আছে, অথবা বিভক্তিযোগে শব্দকে সুষমা দেবার সুযোগ আছে, সেখানেই অবশ্য তিনি এই চিহ্ন বর্জন করেছেন।
যেমন : চরণ অরবিন্দ > চরণারবিন্দ

স্ফটিক গঠিত > স্ফটিকে গঠিত

মাধব উরসে > মাধবের বুকে। ইত্যাদি

এছাড়া, তিনি অন্যান্য বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারেও যথেষ্ট সতর্ক। প্রথম সংস্করণের পরবর্তী সংস্করণে এই ধরনের পরিবর্তন প্রায়শই চোখে পড়ে : ছত্রধর, (১ম/১ম/৫১) > ছত্রধর; (১ম/২য়): হায়; মা, (১ম/১ম/, ২য়/২৩) > হায়, মা, (১ম/৩য়); ত্রিভুবনে (৬ষ্ঠ/১ম, ২য়/৭১) > ত্রিভুবনে? (৬ষ্ঠ/৩য়) ইত্যাদি। সমগ্র কাব্য জুড়ে বিরাম-চিহ্নের বহুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন সংস্করণে। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনগুলি অর্থবোধের ক্ষেত্রে বা বাক্যগঠনের সুষমার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

'এ' বিভক্তি যোগে, সম্ভবত, ব্যাকরণ-শুদ্ধির দিকে প্রবণতা :

বসন; (১/১ম/৬৪) > বসনে,

বৃক্ষ, (১/১ম/৯৩) > বৃক্ষে,

ভুজগ (১/১ম/১০২) > ভুজগে

বিবিধ ভূষণ (২/১ম/২৮৯) > বিবিধ ভূষণে

বিভীষণ (৩/১ম/১৫৪) > বিভীষণে

সে রণ? (৪/১ম, ২য়/৪৩৩) > সে রণে?

সিংহাসনে মহামায়া (৫/১ম/৩৩৬) > সিংহাসনে মহামায়ে (৫/২য়)

দেবকুলোদ্ভব (৬/১ম/৪৫০) > দেবকুলোদ্ভবে

ভাগ্যহীন ভৃত্য (৭/১ম/১৪৮) > ভাগ্যহীন ভৃত্যে

ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তি যোগ না করলেও চলত। ব্যাকরণগত শুদ্ধির দিকে মধুসূদনের সতর্কতার এমনি আরো বিচিত্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। সপ্তম সর্গের ৪৫৬-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'ভয়াকুলা' বিশেষণটি 'জননী'র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে শব্দটি ছিল 'ভয়াকুল'। প্রথম সংস্করণে কোথাও কোথাও সংস্কৃতের অনুসরণে বিসর্গ ব্যবহৃত হয়েছিল, পরে তা বর্জিত হয়েছে। যেমন, রক্তস্রোতঃ। (১/১ম, ২য়/২৪৯) > রক্তস্রোতে! পূর্ণচ্ছেদের পরিবর্তে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহারের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। অবশ্য, কোথাও কোথাও আবার বিসর্গ রক্ষিত হয়েছে, যেমন, দ্বিতীয় সর্গের ৪২১ সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'ধনুঃ' শব্দটি। প্রথম সংস্করণে কতকগুলি শব্দ বিসর্গহীন ছিল, পরে সেগুলি বিসর্গযুক্ত হয়েছে। যেমন, তেজ, শির, মন, অহরহ, নভ, বক্ষ, চক্ষু প্রভৃতি। তবে, যতদূর সম্ভব, সংস্কৃতের অনুশাসন থেকে তিনি তাঁর কাব্যের ভাষাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। পঞ্চম সর্গের ২০৯-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'রজঃপ্রভা' শব্দটিকে সম্ভবত এই কারণেই পরিবর্তিত করে 'রজোরেখা' করা হয়েছে। এইভাবে মধুসূদন, মূল পাঠের বহুল পরিবর্তন করেছেন, মূলত ব্যাকরণ-শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তরের আলোচনায় বিরাম-চিহ্ন পরিবর্তনের বা ব্যাকরণ-শুদ্ধির পরির্তনের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের বা বাক্যগঠন প্রণালীর পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে :

ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ, (১/১ম/১৪)

ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা, (১/২য়/১৪)

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা, (১/৪র্থ/১৪)

এখানে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পঙ্‌ক্তিটিকে উত্তরোত্তর সুগঠিত পরিণতি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠান্তরে বা পরিবর্তিত পাঠে একটি অক্ষর কম রয়েছে,

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় রূপান্তরে পঙ্‌ক্তিটির অর্থগত অস্পষ্টতা দূব হয়েছে, ছন্দের সুষমাও এসেছে। বস্তুত, পাঠান্তরের বহুলাংশ এই বাক্যবিন্যাসগত পরিবর্তন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য বাক্যবিন্যাসের ভিতরেই নব সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে
না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে। (১/১ম/৪৮-৫০)

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা!
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সুসভাতলে ছত্রধর-রূপে! (১/২য়)

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা!
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে! (১/৩য়)

লক্ষণীয়, প্রথম সংস্করণে বর্ণনীয় বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য নতুন ভাবে পঙ্‌ক্তিগুলি সাজাতে হয়েছে। এই প্রয়োজনে, প্রথম সংস্করণের পঙ্‌ক্তিগুলির উপর নির্ভর করেই পঙ্‌ক্তিগুলি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে ৪৮-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটির শুরু 'ঢুলায়' ক্রিয়াপদ দিয়ে এবং এটি বস্তুত একটি চরণ। কিন্তু বর্ণনামূলক পঙ্‌ক্তি হিসেবে কারুকার্যহীন। দ্বিতীয় সংস্করণে 'চামরে'র বিশেষণ রূপে 'সুচারু' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় পঙ্‌ক্তিটির/চরণটির বিস্তার ঘটেছে এবং পরবর্তী 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি'-এর পরিপূরক পঙ্‌ক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ণনাটি পূর্ণতর রূপ নিয়েছে। এবং পরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে বর্ণনাটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, শব্দগত পরিবর্তনই মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তরের মুখ্য উপাদান। বাহ্যত ৪২৮টি পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর হলেও, তার অন্তর্গত শব্দগত পরিবর্তনের সংখ্যা বিপুল। যথাস্থানে সেগুলি উল্লিখিত। এই পাঠান্তর বা পরিবর্তন ঘটেছে কখনো একটি শব্দের ক্ষেত্রে, কখনো শব্দগুচ্ছে, কখনো আবার পঙ্‌ক্তি এমন-কি, স্তবকের ক্ষেত্রে। শব্দগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত :

বসুধা (১/১ম/৯) > ধরারে (১/৪র্থ)
স্বয়ম্বর গেহে (১/১ম/৪৩) > ব্রতালয়ে (১/৪র্থ)
সভাজন কাঁদিল সকলে, (১/১ম/১৭১) > সভাজন কাঁদিল নীরবে। (১/২য়)
গভীর নিক্কনে। (১/১ম/৫৬২) > গম্ভীর নিক্কনে। (১/২য়)
রাক্ষস-ঈশ্বর (১/১ম/৬৬৫) > রাক্ষসাধিপতি (১ম/২য়)
নিকষা-নন্দন; (১/১ম/৭৩৬) > স্বর্ণলঙ্কাপতি; (১/২য়)
আইলা তারা-কুন্তলা (২/১ম/৬) > আইলা সুচারু তারা (২/২য়)
জিজ্ঞাসিও, অদিতি-নন্দন (২/১ম/১০১) > জিজ্ঞাসিও বিজ্ঞ জটাধরে! (২/৪র্থ)

গেলা নীচগামী (২/১ম/১০৬) > গেলা অধোদেশে (২/৪র্থ)
শুনিয়া পতির বাণী (২/১ম/১১৫) > শুনি প্রণয়ীর বাণী (২/৪র্থ)
হায়রে নিশান্তে যথা পুটি, সরোজিনী (২/১ম/২৭৫) > সরসে নিশান্তের যথা ফুটি, সরোজিনী (২/৪র্থ)
মৈথেলী (৪/১ম/৯২) > মৈথিলী (৪/২য়)
এ অররুপুরে (৬/১ম/১৫৬) > এ রাক্ষসপুরে (৬/৩য়)
চুরিলি রাক্ষসরত্ন (১/৭ম/৭২০) > হরিলি রাক্ষসরত্ন (৭/২য়)
হে ধন্বি, (৮/১ম/৩৪৫) > হে রথি, (৮/৩য়)
কর্ম্মদোষে! (৮/১ম/৩৬৭) > ভাগ্য-দোষে! (৮/২য়)
কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ? (৮/১ম/৪৯৭) কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? (৮/৩য়)
সহস্র বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি (৮/১ম/৫০২) > দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি (৮/৩য়)
কি বলে বুঝাব তারে? (৯/১ম/৩৯৭) > কি করে বুঝাব তারে? (৯/৩য়)

মেঘনাদবধ কাব্যের শব্দগত পাঠান্তরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে মধুসূদনের শব্দচেতনার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথমেই বলা দরকার শব্দগত পাঠান্তরের বিশ্লেষণের আগে, ৭-সংখ্যক দৃষ্টান্তের অন্তর্গত পঙ্‌ক্তিটির শাব্দিক পরিবর্তনের ফলে পঙ্‌ক্তিটির 'music' কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কবি তা নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত, মধুসূদন যাকে বলেছেন 'improve the music of the line' সেই সংগীতময়তার বা ধ্বনিঝংকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই শাব্দিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে পাঠান্তরগুলির এইটেই মূল কথা। অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্যে যা কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বা সংস্কার করা হয়েছে—শব্দের, শব্দগুচ্ছের, পঙ্‌ক্তির অথবা স্তবকের, সংগীতময়তা বা ধ্বনিঝংকার সৃষ্টিই তার মৌল উদ্দেশ্য।

এই সংগীতময়তা বা ধ্বনিঝংকার, শব্দের অথবা পঙ্‌ক্তির/চরণের, সুষম অক্ষর-বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। অক্ষরের সামান্যতম বিচ্যুতির ফলে যেমন শব্দের সুষমা নষ্ট হয়, তেমনি সুমিত বিন্যাসের ভিতর দিয়ে শব্দ হয়ে ওঠে প্রাণময়, সংগীতময়। এবং এই সুমিত অক্ষর-বিন্যাসের উপরেই ছন্দের প্রতিষ্ঠা। অক্ষরের অন্তর্নিহিত ধ্বনির উত্থান-পতন, গুরুত্ব-লঘুত্ব, সংগীতময়তা—এ-সবই আসলে ধ্বনিগত। সুতরাং কবিকে শেষপর্যন্ত অক্ষরের বা অক্ষরের অন্তর্নিহিত ধ্বনি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হয়।

কবিতার ভাষার এই মৌল প্রকৃতির কথা মধুসূদন জানতেন। জানতেন বলেই, মূলত এদিকে লক্ষ্য রেখেই শব্দগত পরিবর্তন করেছেন। ধরা যাক্ প্রথম দৃষ্টান্তটির কথা : 'বন্দি ও চরণ-অরবিন্দ মন্দমতি'। এখানে বাহ্যত ছন্দের ত্রুটি নেই, পয়ারের কাঠামোয় ৮+৬ মাত্রার বিন্যাসেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু 'ও চরণ-অরবিন্দ' অংশটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি সুপ্রযুক্ত নয়। অন্তত ধ্বনিগত দিক থেকে। তাই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। পরিবর্তিত রূপ : 'বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি'। একদিকে যেমন দুটি শব্দের সন্ধি করে 'চরণারবিন্দ' শব্দটিকে সুষম করা হল, অন্যদিকে তেমনি 'অতি' শব্দটির বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে কবি-স্বভাবেরও পরিচয় পাওয়া গেল। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে উদ্ধত, রূঢ়। কিন্তু অন্তরে তিনি নম্র, কমনীয়। ভারতীয় কবিদের মতো তাই তিনি বাগ্‌দেবীর কাছে দীন সেবকের হৃদয় নিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন। 'মন্দমতি' শব্দটির সঙ্গে কালিদাসের অনুসরণে, 'অতি' শব্দ-যোজনার ফলে পঙ্‌ক্তিটি পরিবর্তিত রূপে হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। এমন আরো দৃষ্টান্ত এই কাব্যের পাঠান্তরে

রয়েছে। আপনি কৃতান্তদেব (৮/১ম/১০৬) > পিতা রাজা দশরথ (৮/৩য়), ধর্ম্মরাজে (৮/১ম/৩৬৮) > পিতায় (৮/৩য়), ইত্যাদি পাঠান্তরের সঙ্গে কবির বিশেষ একটি মানসিকতা বিজড়িত।

ব্যাকরণ শুদ্ধির জন্য বিভক্তি-যোগে শব্দান্তরের দৃষ্টান্ত আগে দিয়েছি। কিন্তু যেখানে নিছক বিভক্তি-যোগে ক্রটি সংশোধনের সুযোগ নেই, সেখানে তিনি মূল শব্দটি বদলে দিয়েছেন। প্রথম সর্গের অষ্টম দৃষ্টান্তের 'বসুধা' শব্দটি এই ধরনের পরিবর্তন। প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দটি ব্যাকরণের দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ। কিন্তু শব্দটিকে বিভক্তি-যোগে ক্রটিমুক্ত করতে গেলে এক মাত্রা বেড়ে যায়। তাতে ছন্দপতন ঘটে। সুতরাং. মূল অর্থ বজায় রেখে শব্দটিকে রূপান্তরিত করা হল : 'ধরারে'। প্রথম সর্গের ১৭১ সংখ্যক পঙ্‌ক্তির সভাজন শব্দটি সমষ্টিবাচক; তাই পুনরুক্তিজনিত শৈথিল্য দূর করে 'সকলে'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হল 'নীরবে', যা পঙ্‌ক্তির বাচ্যার্থ নিবিড়ভাবে বাড়িয়েছে। এই কাব্যের বিভিন্ন সর্গে প্রথম সংস্করণে প্রায়শই 'গভীর' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন, গভীর নিক্কনে (১/১ম/৫৬২), কহিলা গভীরে (১/১ম/৬৮৩), কহিলা গভীরে (৩/১ম/২২৩), কহিলা গভীরে (৭/১ম/৫৭৬), ইত্যাদি। শব্দটির রূপান্তর 'গম্ভীর'। শুধু অর্থের দিক থেকেই নয়, ধ্বনির দিক থেকেও এই পরিবর্তন যে কতখানি সার্থক আশা করি তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

সিসেরো বলেছেন, কবি-ব্যবহৃত শব্দগুলি সচেতন ভাবে আসে। শুধু যে সচেতন ভাবে আসে তা'ই নয়, তার সঙ্গে কবির মানসিকতাও যুক্ত হয়। শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে কবির মানসিকতার যে কী নিবিড় যোগ রয়েছে, তার উদাহরণ : তবে নিকষা নন্দন (১/১ম/৭৪১)>তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি। ঐশ্বর্যের প্রতি মধুসূদনের ছিল ঐকান্তিক আকর্ষণ ও মোহ। রাবণের প্রতি তাঁর অনুরাগের অন্যতম কারণ তাঁর অমিত ঐশ্বর্য; রাবণ যে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর। মধুসূদন নিজে এই স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছুটেছেন সারাজীবন। তাঁর অবচেতন মনে নিহিত ছিল এই স্বর্ণস্বপ্ন, ঐশ্বর্যের বাসনা। এই বাসনাই তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। তারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ৭৪১-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরে। ২/১ম/৬৬৫-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

সাহিত্যদর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসের অপকর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দগত দুঃশ্রবতা, অশ্লীলতা, অনুচিতার্থতা, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্যতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণের এই বিধি অনুসরণ করে হয়ত নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শব্দ ব্যবহারের এই আদর্শ পরোক্ষভাবে মধুসূদনের মধ্যে এসে গেছে। যেমন, 'গেলা নীচগামী,' (২/১ম/১০৬)>'গেলা অধোদেশে।' (২/৪র্থ/১০৬) : এই দৃষ্টান্তটির কথা ধরা যাক্। অনেক সমালোচক একদা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুসরণে তাঁর ভাষার নানা ক্রটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নে অতদূর পিছিয়ে যাবার দরকার নেই, কেননা, এ যুগের কবিরা শাস্ত্র সাক্ষী রেখে লিখতে বসেন নি, অন্তত মধুসূদন নন। সেক্ষেত্রে তাঁর রুচি, কাব্যবোধই শব্দ-ব্যবহারে সাহায্য করেছে। মধুসূদন নিশ্চিতভাবে জানতেন মহাকাব্যের 'Grand Style' বা 'Heroic Style' সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ভাষা বা শব্দসমবায় প্রয়োজন। এই বোধ কোনো মুহূর্তের জন্যই তিনি হারান নি। 'নীচগামী'র পরিবর্তে 'অধোদেশে'র ব্যবহার তার মূর্ত উদাহরণ। কথ্য ভাষায় বলা হয় 'নীচে গেল'। কিন্তু 'নীচ' ও 'নীচে' সমার্থক নয়। তা ছাড়া, নীচগামী শব্দটি অস্পষ্টও বটে। এমসন্-কথিত ambiguity বা অস্পষ্টতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই শব্দটিকে দাঁড় করানো যায়। 'কেশব বাসনা দেবী গেলা নীচগামী > কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে : এই পাঠান্তর মধুসূদনের শব্দ-সচেতনতার উজ্জ্বল পরিচায়ক। 'চুরিলি রাক্ষসরত্ন' থেকে 'হরিলি রাক্ষসরত্ন' পরিবর্তনও এমনি তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় সর্গের ২৯৪-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত 'শশীমুখী'র বদলে 'চারুনেত্রা' শব্দটি ব্যবহৃত। বলে দিতে হবে না, কীভাবে কবির দৃষ্টি মুখের সমগ্র অংশ থেকে বিশেষ এক অংশের সৌন্দর্যে মগ্ন হতে চেয়েছে পাঠান্তরে! এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখেছি মাঝে মাঝে। যেমন, আপাতত মনে পড়ছে 'সোনার তরী' কাব্যের 'মানস সুন্দরী' কবিতার শিরীষকেশরসম > শিরীষ কুসুমসম পাঠান্তরটির কথা। কবির দৃষ্টি কখনো সমগ্র থেকে অংশে, অথবা অংশ থেকে সমগ্রের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে থাকে। 'কর্ম্মদোষে' (৮/১ম/৩৬৭) > ভাগ্য-দোষে (৮/৩য়) : পাঠান্তরটির পিছনে অজ্ঞাতসারে কবি যেন নিজের বিড়ম্বিত জীবনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

শব্দগত দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন উঠেছে বারবার, মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে। সমালোচকরা যাই বলুন, মধুসূদন নিজে কিন্তু অহৈতুকভাবে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। যেমন, প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত 'অররুপুরে' শব্দটি পরবর্তী সংস্করণে সর্বত্র 'রাক্ষসপুরে' করা হয়েছে। এমন আরো দৃষ্টান্ত আছে।

অষ্টম সর্গের ৫০২ সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'সহস্র বৎসর' থেকে 'দ্বাদশ বৎসর'-পরিবর্তনের পিছনে কী কারণ নিহিত, তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধুসূদন ছিলেন এমনি সতর্ক প্রহরী। ৫৪৪ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটির 'এ দক্ষিণ দ্বারে!' (৮/১ম, ২য়/৫৪৪) > 'এ উত্তর দ্বারে!' (৮/৩য়) : এই পাঠান্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের **কুমারসম্ভবে** মহাদেবের অনুচরদের উত্তর দিকের দ্বার-রক্ষার কথা বর্ণিত। এই পাঠান্তরটির পিছনে সম্ভবত এই ধরনের কোনো প্রভাব রয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তরের/শব্দগত পরিবর্তনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য : 'সু' উপসর্গ যোগে শব্দগঠনের দিকে ঝোঁক। যেমন :

বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে (১/১ম/২২)
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে (১/২য়/২২)

অথবা, ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী (১/১ম/৪৮)
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী (১/২য়/৪৮)

অন্যান্য দৃষ্টান্ত : আইলেন সমীরণ (২/১ম/২০) > আইলা সুসমীরণ (২/২য়)
সিন্দূরে আঁকিয়া (২/১ম/২৩৬) > সুসিন্দূরে আঁকি (২/২য়)

এই ধরনের 'সু' উপসর্গযোগে শব্দ তৈরির দিকে মধুসূদনের আত্যন্তিক ঝোঁক রয়েছে, আরো অনেক ক্ষেত্রে। কাব্য-ভাষার পরিবর্তনে কবির দৃষ্টি কখনো নিবদ্ধ থাকে শব্দ-বিন্দুতে, কখনো আবার সমগ্রতায়। সমগ্র একটি পঙ্‌ক্তিতে বা পঙ্‌ক্তি-সমষ্টিতে। দুয়ের অন্বিষ্ট একই : ভাষার সংস্কার। মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর ঘটেছে দুদিক থেকেই। শাব্দিক পাঠান্তর যেমন মধুসূদনের শব্দ-সচেতনতার পরিচায়ক, পঙ্‌ক্তিগত পাঠান্তর তেমনি ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচয় বহন করছে।

পঙ্‌ক্তির পরিবর্তন মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্জন চোখে পড়ে :

ভয়ঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস (১/১ম/৪৪৩)
রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে (১/২য়/৪৪৩)

অথবা, কামাকুল চাহিয়া রহিল তাঁর পানে! (২/১ম/৩৫১)
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে। (২/২য়/৩৫১) ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে ভাবগত শৈথিল্য দূর করার জন্য পাঠান্তর ঘটেছে :

উরসে, কামের বাসা, ভালে তারা গাঁথা
সিঁথি; কর্ণে কুণ্ডল; অলকে মণি-আভা (৩য়/১ম, ২য়/৫৩৯-৪০)
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি;
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে। (৩য়/৪র্থ/৫৩৯ ৪০)

মধুসূদনের বিরুদ্ধে একসময় অভিযোগ উঠেছিল, তিনি আদিরসাত্মক বর্ণনার ভিতর দিয়ে দেবমহিমা ক্ষুন্ন করেছেন। পরোক্ষভাবে এ অভিযোগের মূল লক্ষ্য ছিল মধুসূদনের অসংযমী চিত্তবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত করা। মধুসূদনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ যে কত বিভ্রান্তিকর, এই পাঠান্তর তার দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি, কাব্যভাষার ক্ষেত্রে মধুসূদনের সংহতিবোধের পরিচয়ও এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

ভাবগত অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা দূর করার প্রয়োজনেও অনেক সময় পাঠান্তর ঘটেছে। যেমন, পঞ্চম সর্গের প্রথম সংস্করণে ২৮৭ ও ২৮৮-সংখ্যক পঙ্ক্তি দুটি ছিল এইরকম :

করি বাস; করি পান অমৃত সতত,
অমরী, স্থিরযৌবনা! বরিনু তোমারে

পরবর্তী, অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে এই পঙ্ক্তি দুটির পাঠান্তর :

করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ;—
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে

এই সর্গেরই ৫২২-সংখ্যক পঙ্ক্তিটি : "পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।" প্রথম সংস্করণে এই পঙ্ক্তিতেই মেঘনাদের উক্তি শেষ হয়েছে। কিন্তু, মধুসূদন দেখলেন, মেঘনাদের মাতৃভক্তির (না কি কবির নিজের!) প্রকাশে কোথায় যেন অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই সংযোজিত হল : "কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে!" এই একটি পঙ্ক্তির সংযোজনে শুধু যে মেঘনাদের চরিত্র-মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা'ই নয়, পূর্ববর্তী পঙ্ক্তির সম্পূরক হিসেবে এই সংযোজন, প্রকারান্তরে পাঠান্তর, প্রথম সংস্করণের ৫২২-সংখ্যক পঙ্ক্তিটির পূর্ণতা এনে দিয়েছে।

বক্তব্যের পরিস্ফুটনে অপরিমিত রূপায়ণের পরিমিত বিকাশে ও ভাবের অস্পষ্টতা দূর করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ একটি নতুন অংশ সংযোজন করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। যেমন, অষ্টম সর্গের ৪৩১-সংখ্যক পঙ্ক্তি থেকে ৪৯৩-সংখ্যক পঙ্ক্তি-সমষ্টি/স্তবকটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল না, তৃতীয় সংস্করণের সংযোজন। বস্তুত, এই নব সংযোজিত অংশটি রামচন্দ্রের নরক-দর্শনের অর্থাৎ নরক-বর্ণনার অংশ বিশেষ যেখানে "বেশভূষাসক্তা" "বামাদলের" নরক-জীবন-যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে এই চিত্রটি রূপায়িত হয়েছিল ৩৯৮-সংখ্যক পঙ্ক্তি থেকে ৪১৩-সংখ্যক পঙ্ক্তির মধ্যে। ৪১৩-সংখ্যক পঙ্ক্তিটি এই রকম : "গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?" এই নারীদের পরিণতি দেখাতে গিয়ে ১৬টি পঙ্ক্তিতে যে বর্ণনা করেছেন, তা যে অস্পষ্ট থেকে গেছে, মধুসূদনের তা মনে হয়েছিল। এবং বাস্তবিকই তাই। সুতরাং এর পাঠান্তরের প্রয়োজন ঘটল এবং তারই ফলে ৪৩১-সংখ্যক পঙ্ক্তি থেকে ৪৯৩-সংখ্যক পঙ্ক্তিটির অর্থাৎ ৬৩টি পঙ্ক্তির

আবির্ভাব ঘটল। এই নব সংযোজিত অংশটি শুধু-মাত্র পরিপূরকই নয়, অথবা শুধু যে বর্ণনীয় বিষয়কে পূর্ণতা দিয়েছে, তা'ই নয়, অংশটি তার অতিরিক্ত তাৎপর্য বহন করছে। এ শুধু নরক-যন্ত্রণা নয়, মনে হয় রামচন্দ্রের মাধ্যমে কবির অবচেতন ভাবনা-বেদনারও প্রকাশ এর মধ্যে ঘটেছে।

শেলী তাঁর A Defence of Poetry গ্রন্থে বলেছেন, কবিমনের মূল অনুভূতির অতি অল্প অংশই কবিতায় ধরা পড়ে। তাঁর বক্তব্য এই রকম : যখন কবির মনে কোনো অনুভূতির আবির্ভাব হয় এবং তার পর যখন তিনি সেই অনুভূতিকে কাব্যে রূপ দেন, তখন দেখা যায়, মূল ভাবটির অতি সামান্য অংশ তিনি কবিতায় ধরতে পেরেছেন। বলা উচিত, যা ব্যক্ত হয়েছে, তার চেয়ে অব্যক্ত থেকে গেছে অনেক বেশি। ফলে কবিরা আসলে যা বলেন, তার চেয়ে না-বলেন অনেক বেশি।

শেলীর এই কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত। তা হচ্ছে এই : যে কোনো কবির লিখিত কাব্যের চেয়ে অলিখিত কাব্যের মাত্রা অনেক গভীর। তাই ছোটো-বড়ো সব কবির মধ্যেই একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব থাকে, অতৃপ্তি ও অস্বস্তি থেকে যায়। কিন্তু, শেলী যেমন বলেছেন, কবির এই আত্মজিজ্ঞাসা শুধু ভাবগত নয়, বক্তব্য বা অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়ে কবির যা সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, তা কাব্যের ভাষাগত সমস্যা। রূপকার হিসেবে অনুভূতির রূপায়ণের জন্য চাই উপযুক্ত ভাষা ও আঙ্গিক। কবিতার শিল্প, আঙ্গিক বা প্রযুক্তি : সব কিছুরই ভিত্তি ভাষা। সেইজন্য কবিতার ভাষাই কাব্যের চাবিকাঠি, যা দিয়ে কাব্যের দরজা খুলতে হয়।

বলা বাহুল্য, শিল্পে যেখানে ভাষাই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম, সেখানে এমনিতেই তার আধিপত্য থাকে। কবির অনুভূতি ভাষায় অনূদিত হয়ে উৎসারিত হলেও, সেই ভাষা যে সবসময় স্বভাবজ হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিশেষত, আধুনিক কালে কবিতার নির্মাণকার্যের মধ্যে একটা সচেতন প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায়। তাই, লিখতে বসে প্রায়শই কবিকে উপযুক্ত ভাষা ও ভঙ্গি নির্বাচন করতে হয়। অনুভূতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কবি যখন ভাষা নির্বাচন করতে বসেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থার কথা সহজেই অনুমেয়। অনুভূতি-প্রবাহের সঙ্গে সমতা রেখে ভাষা-প্রবাহ যখন লিখিত রূপে উৎসারিত হয়, তখন অনেক কিছু অনুচ্চারিত থেকে যায়। এবং এই কারণেই, কবি তাঁর নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন। অপুষ্ট ভাব, অপরিণত শিথিল ভাষা বাক্য ও শব্দব্যবহার, এমন-কি, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা তাঁর চোখে পড়ে। পড়বেই, কেননা কবিতা-সৃষ্টির ইতিবৃত্ত কবির কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। তখন, কবিতা রচনার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কাজ হয় কাব্যের সংস্কার করা, সর্বতোভাবে এই-সব ত্রুটি দূর করা। এইরকম একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই সৃষ্টি হয় পাঠান্তর। এইজন্যই কবিমনের স্বরূপ ও কবিতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পাঠান্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কবিতা-হয়ে-ওঠার নেপথ্যবর্তী বিচিত্র অধ্যায়গুলি নিহিত থাকে এই-সব পাঠান্তরে।

শুধু তাই নয়, কবিতার পাঠান্তর আসলে কবির শিল্পসৃষ্টির আত্মসমালোচনা। প্রত্যেক কবির মধ্যেই একটা সহজাত সমালোচক-সত্তা থাকে। এই প্রবৃত্তির জন্যই তিনি তাঁর সৃষ্টিকে খুঁটিয়ে দেখতে চান; দেখতে গিয়ে সমালোচকের মতোই তাঁর চোখে ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। এবং তখন, সেই-সব ত্রুটি, বলা উচিত, কবিতা হ'য়ে-ওঠার বাধাগুলি অপসারণে যত্নবান হতে হয়। কবির এই চিত্তবৃত্তি নিরন্তর না হোক নিরলসভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, যতক্ষণ না তাঁর সৃষ্টি প্রতিমায় পরিণত হয়। সুতরাং পাঠান্তর বস্তুত, গভীরতর অর্থে শিল্পরূপের সমালোচনা। এদিক থেকেও পাঠান্তরের মধ্যে এক নিভৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

আর, যে কবি যত বড়ো, মহৎ, তাঁর দ্বন্দ্ব, সংশয়, দ্বিধা তত বেশি। দ্বিধা সংশয় যত বাড়ে, তত

বেশি তিনি অস্থিরতা বোধ করেন। যত বেশি অস্থির হন, তত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নেড়ে চেড়ে ঘষে মেজে শিল্পরূপের শিখরে পৌঁছতে ইচ্ছে করেন। ফলে সংস্কার বা পরিবর্তন চলে রূপ থেকে রূপান্তরে, এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে, মূল পাঠ থেকে পাঠান্তরে : কাব্য-হয়ে-ওঠার দিকে। বলা বাহুল্য, এটা আদৌ কোনো বাহ্যিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে একটা মানসিকতা, যাকে বলা যায় স্বর্ণকারী চিত্তবৃত্তি। তাই, কবি ও কাব্যকে জানার পক্ষে পাঠান্তর অন্যতম অপরিহার্য উপাদান।

বস্তুত, মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর এই-সব কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এর ভিতর দিয়ে তার ভাঙাগড়ার ইতিহাস একদিকে যেমন পাওয়া যাবে, অন্যদিকে তেমনি মধুসূদনের ভাষাচর্যা, শিল্পবোধ ও তাঁর কবিসত্তার একটি অন্তরঙ্গ চিত্রও পাওয়া যায়। ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর দৃষ্টি যে কী পরিমাণে আণুবীক্ষণিক, তার পরিচয় মেলে সর্বত্র; বিরামচিহ্নের পরিবর্তনে, বাক্যগঠনরীতির সংস্কারে, শব্দ ও পঙ্‌ক্তির পরিবর্জন ও সংযোজনে। এবং এর ভিতর দিয়ে মূল পাঠের ক্রমবিকাশের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধ কাব্যকে যদি মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা বলা যায়, তা হলে কবি হিসেবে তাঁর ভাষাশিল্পেরও পরিণত নিদর্শন এই কাব্য। কিন্তু, কিভাবে মধুসূদন সেই পরিণতিতে পৌঁচেছেন, এই পাঠান্তরগুলি তার নীরব সাক্ষী।

কিন্তু, পাঠান্তরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে কাব্যটি শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ সংস্করণে যে রূপ নিয়েছে, শিল্পের বিচারে তা কতখানি সার্থক, এমন একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এইজন্য, পাঠান্তরের লক্ষ্য সার্থক শিল্পসৃষ্টি। অন্তত নিজের দিক থেকে কবি যতক্ষণ এ বিষয়ে তৃপ্ত না হতে পারছেন, ততক্ষণ ভাঙাগড়ার কাজ চলে। শেষপর্যন্ত অবশ্য একজায়গায় থামতে হয়। ধরা যেতে পারে, সেইটেই চূড়ান্ত রূপ। সেই চূড়ান্ত রূপের মূল্যায়নে সমালোচক যা'ই বলুন না কেন, শিল্পবিচারে তা যেভাবেই প্রতিভাত হোক না কেন, কবির দিক থেকে সেইটেই সার্থক শিল্পরূপায়ণ।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে কবি য়ুরোপ যাবার জন্য ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কাব্যটির সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। মনোযোগী, কিন্তু দ্রুত ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে। তবু যেভাবে তিনি পরিবর্তন করেছেন, তাতে শব্দ ও পঙ্‌ক্তিগত শিথিলতা দূর হয়েছে অনেক পরিমাণে, শিথিল বাক্যবন্ধও সংহতি পেয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে আরো পরিবর্তন করা হয়েছে, য়ুরোপ থেকে ফিরে। তবে, এই সংস্করণের পরিবর্তন মূলত পঙ্‌ক্তি বিন্যাস ও নব সংযোজনের। এই পরিবর্তন কাব্যটির ভাষা আরো সুমিত করেছে। চতুর্থ সংস্করণেও সংস্কারের চিহ্ন চোখে পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ দুটি মোটামুটি চতুর্থ সংস্করণেরই অনুরূপ। এ দুটি সংস্করণে বিরামচিহ্ন ও শব্দের সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সর্গের অনুপাতে পরবর্তী সর্গগুলির পাঠান্তর ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এইভাবে। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত কবি ভাষাগত শৈথিল্য কাটিয়ে উঠেছেন বহুল পরিমাণে। এইভাবে কাব্যটিকে মধুসূদন একটি সার্থক শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার, মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর মূলত বাক্‌শৈলীর, আঙ্গিকের নয়। অর্থাৎ পাঠান্তরের ভিতর দিয়ে মধুসূদন বাক্‌শৈলীর পরিবর্তন করেছেন, আঙ্গিকের পরিবর্তন তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর বাক্‌শৈলী ছাড়াও আঙ্গিকের পরিবর্তন, অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু মধুসূদনের এই কাব্যের পাঠান্তর সর্বতোভাবে বাক্‌শৈলীর। বস্তুত, বাক্‌শৈলীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর কাব্যকে একটা সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন।

এমন যে হয়েছে, মধুসূদনের পক্ষে শেষপর্যন্ত এমন একটি সুমিত শিল্পায়নে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে, ভাবতে গেলে তা বিস্ময়কর ব্যাপার। বিস্ময়কর, কেননা, সত্যের খাতিরে মেনে নেওয়া

ভালো, মধুসূদনের পক্ষে বাংলায় কবিতা রচনার ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয়, নিদেনপক্ষে এমন একটি মহাকাব্য তো নয়ই। কারণ, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য তাঁর অনায়াত্ত ছিল, সমকালের কাব্যজগতেও তিনি ছিলেন অপরিচিত পথিক। তথাপি তাঁকে লিখতে হল এমন একটি মহাকাব্য। শুধু লিখেই নিরস্ত হলেন না, নিরন্তর নিরলস অধ্যবসায়ে নিজের সৃষ্টিকে সার্থক শিল্পরূপায়ণের কাজে নিমগ্ন থাকতে হল। এটা যে আদৌ সম্ভব হয়েছে, পাঠ থেকে পাঠান্তরে পৌঁচেছেন, তার পিছনে একটিই কারণ নিহিত : সদা সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়। এই শ্রবণেন্দ্রিয়ই ধ্বনিতরঙ্গের জাদুকারী মায়ায় তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে শব্দ থেকে শব্দান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে, পাঠ থেকে পাঠান্তরে। ধ্বনিতরঙ্গই শব্দের প্রধান সত্তা। মধুসূদন এই সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন শেষপর্যন্ত। বস্তুত, এক অনুপম ধ্বনিবোধের উপর সমগ্র কাব্যটি দাঁড়িয়ে আছে। ❑

প্রবন্ধের পাঠভেদ-তালিকায় উল্লিখিত ১ম সংস্করণে প্রথম সর্গের পঙ্‌ক্তি ২৬১ 'শস্য' স্থানে 'শষ্য', ১ম-৬ষ্ঠ সংস্করণে অষ্টম সর্গের পঙ্‌ক্তি ৫৫৫ 'কনক' স্থানে 'কণক' ও ১ম সংস্করণে নবম সর্গের পঙ্‌ক্তি ৭০ 'কহিল' স্থানে 'বহিল' এগুলি পাঠান্তর না হয়ে মুদ্রণ প্রমাদও হতে পারে। —লেখক

কাব্যকথায় সর্গনাম প্রসঙ্গ

কেশব আড়ু

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে, মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গ থাকতে হবে এবং প্রতি সর্গের শেষে মুখ্য বিষয়-কেন্দ্রিক সর্গনাম চিহ্নিত করতে হবে। মেঘনাদবধ কাব্যে নয়টি সর্গ আছে এবং প্রতি সর্গে একটি করে সর্গনামও আছে। এখন সর্গ-ভিত্তিক কাহিনী বিশ্লেষণ করে সেই সর্গনামের যাথার্থ্য বিশদ করা যেতে পারে। মধুসূদন 'রামায়ণে'র 'লঙ্কাকাণ্ড' থেকে সংক্ষিপ্ত কাহিনী চয়ন করে তাতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাহিনীকে একটি সম্পূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন। কাব্যের এই কাহিনী লঙ্কার মধ্যেই ঘটেছে এবং সমস্ত ঘটনা তিন দিন ও দুই রাত্রির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এদিক থেকে আবার গ্রীক অলংকার শাস্ত্রের কাল ঐক্য (Unity of time), স্থান ঐক্য (Unity of place) এবং ঘটনা ঐক্য (Unity of action) মান্য করা হয়েছে বলা যেতে পারে।

প্রথম সর্গের কাহিনী-বিন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, রাবণ-পুত্র বীরবাহু রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন—এই সংবাদ ভগ্নদূত মকরাক্ষ রাজসভায় পাত্রমিত্রসহ সমাসীন রাজা রাবণের নিকট পেশ করলেন। শোকাকুল রাবণকে মন্ত্রী সারণ সান্ত্বনা দিয়ে উজ্জীবিত করলেন। এদিকে বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় এসে পুত্র-বিয়োগের জন্য রাবণকে তিরস্কার করে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। ক্রুদ্ধ রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে গিয়ে প্রতিহিংসা নিবারণের জন্য মেদিনী কাঁপিয়ে যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত হতে লাগলেন। এমন সময় লক্ষ্মীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে প্রমোদ কাননে বিলাস-রত মেঘনাদকে সংবাদটি জানালেন। মেঘনাদ বীরবাহুর মৃত্যু এবং রাবণের যুদ্ধ-উন্মাদনার সংবাদ পেয়ে রাবণ-সমীপে এলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাবণ যুদ্ধাভিলাষী মেঘনাদকেই সেনাপতি পদে বরণ করে দিলেন।

প্রথম সর্গের এই কাহিনী-সূত্র ধরে প্রতিভাত হয় যে, কাব্যের নাম এবং কবির অভিপ্রেত বিষয় মেঘনাদবধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ মেঘনাদকে মুখ্য ভূমিকায় অভিষিক্ত করাই প্রথম সর্গের মুখ্য বিষয়। মধুসূদন তাই প্রথম সর্গের সমাপ্তিতে প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে সংস্কৃত ভাষাতে সর্গনাম করেছেন : 'ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ'। এদিক থেকে সর্গনাম যে যথার্থ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সর্গনাম বিষয়ে প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্রের সব বৈশিষ্ট্য তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, প্রতিসর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের আভাস দিতে হবে এবং ছন্দ-বৈচিত্র্য আনতে হবে। মধুসূদন এই বিধি-নির্দেশ গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয় সর্গ হলো 'অস্ত্রলাভ', লক্ষ্মী-ইন্দ্রাদি দেবতাদের সহায়তায় লক্ষ্মণের দৈবাস্ত্র লাভের কাহিনী সেটি। প্রথম সর্গের শেষে রাঘব-পক্ষের কোনো সংবাদই কবি দেন নি, বরং শেষ উল্লেখ করেছেন :

বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস; —
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেই লক্ষ্য করা যায়, স্বর্গে লক্ষ্মী-ইন্দ্র-শচী প্রমুখ দেবদেবীগণ মেঘনাদের সেনাপতিত্বে প্রবল চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা মেঘনাদ ইতিপূর্বে দুবার রামচন্দ্রকে পরাস্ত করেছেন, এবারও রামচন্দ্রের পরাভব অনিবার্য। তাই ষড়যন্ত্র শুরু হলো। অবশেষে লক্ষ্মীর পরামর্শে ইন্দ্র শচীসহ কৈলাসে শিব-পার্বতীর নিকট যাওয়াই স্থির করলেন। মাতলি রথ সজ্জিত করে এনে ইন্দ্র ও শচীকে কৈলাসে নিয়ে গেলে ইন্দ্রের কাছে পার্বতী যথাপূর্ব সব শুনলেন। এমন সময় বিপন্ন রামচন্দ্রও দেবী পার্বতীর কৃপা প্রার্থনা করে দেবীকে স্মরণ করলেন। পার্বতী ভক্ত রাম এবং

ইন্দ্রের অনুরোধে যোগাসন-শৃঙ্গে তপস্যারত শিবের নিকট যাওয়াই স্থির করলেন। এজন্য তিনি রতি ও কামের সাহায্য নিলেন। তপস্যারত শিবের ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি জানালেন, মায়াদেবীর সাহায্য নিতে। মায়ার সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবেন। মায়াদেবী মেঘনাদবধের জন্য দৈব অস্ত্র ইন্দ্রের নিকট দিলেন এবং জানালেন যে, দৈবাস্ত্রের দ্বারাও ন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে বধ করা যাবে না। এজন্য পরদিন প্রভাতে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মণের পাশে উপস্থিত থাকবেন, সুযোগ মতো মেঘনাদ বধের ব্যবস্থা করবেন। ইন্দ্র দৈবাস্ত্র সমূহ গন্ধর্বপতি চিত্ররথের মাধ্যমে রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে দিলেন।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হলো যে, লক্ষ্মী-ইন্দ্র-শচী-পার্বতী-শিব-মায়াদেবীর সক্রিয় ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণ দৈবাস্ত্র লাভ করলেন এবং মায়াদেবীর অলৌকিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি মেঘনাদবধকে অনিবার্য করে তুললো। মুখ্য কাহিনী এখানে 'অস্ত্রলাভ'। এজন্য মধুসূদন যথার্থভাবেই সর্গের শেষে উল্লেখ করেছেন : 'ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ'।

প্রসঙ্গক্রমে অভিযোগ উঠতে পারে যে, কাহিনী লঙ্কা থেকে দেবলোকে স্থানান্তরিত হয়েছে এখানে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, কাহিনী দেবলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মাত্র, তার রাস অর্থাৎ লাগাম একান্তভাবেই লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রথিত। রামায়ণ-কাহিনীতে এই ষড়যন্ত্রমূলক অস্ত্রলাভের কথা নেই। মধুসূদন এই কাহিনী চয়ন করেছেন হোমরের ইলিয়ড থেকে। কিন্তু কবি মধুসূদন এমন নিখুঁত কৌশলে ভারতীয় পৌরাণিকতার সঙ্গে হোমরের কাহিনী মিশিয়েছেন যে, কোনোপ্রকার অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় নি বরং দৈবাস্ত্রলাভ বিষয়টি প্রাচ্যরীতির মতোই মনে হয়েছে। এই দ্বিতীয় সর্গেও কবি তৃতীয় সর্গের কোনো ইঙ্গিত দেন নি। তবে চমকপ্রদ এই কাহিনী সর্গ ভিত্তিক নামকরণে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় সর্গের মুখ্য বিষয় হচ্ছে প্রমোদোদ্যান থেকে বিরহিণী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদের নিকটে আগমন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কবি এই সর্গের নাম দিয়েছেন 'সমাগম'। বীরবাহু-বধের অব্যবহিত পরেই মেঘনাদ প্রমোদোদ্যান থেকে লঙ্কাপুরে এসেছে। অবিলম্বে তাঁর প্রমোদোদ্যানে ফিরে যাবার কথা। রাত্রি অধিক হলে উৎকণ্ঠার বশবর্তী হয়ে প্রমীলা নিজ ঘোটক 'বড়বা'-র পৃষ্ঠে আরোহণ করে সদলবলে লঙ্কাপুরে সমাগত হলেন। বীর মেঘনাদের সঙ্গে বীরাঙ্গনা প্রমীলার সমাগম হওয়ায় রামচন্দ্রের শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। রামচন্দ্র বিভীষণকে বলেছেন :

সিংহসহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া
উথলিছে চারিদিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু!

প্রমীলার এই সমাগম "সিংহসহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে।" অতএব এই সমাগমের বিশেষ তাৎপর্য আছে—কেবল প্রমীলাকে চিত্রিত করা কবির লক্ষ্য নয়, পরোক্ষে মেঘনাদের গাম্ভীর্যও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৃতীয় সর্গের কাহিনীও রামায়ণ বহির্ভূত, এমন কী প্রমীলা নামও রামায়ণে নেই। প্রমীলা নামটি মধুসূদন সম্ভবত কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে পেয়ে থাকতে পারেন। আর কাহিনী-সূত্র ট্যাসোর 'জেরুজালেম উদ্ধার' থেকে মধুসূদন চয়ন করেছেন। মূলত সিংহ মেঘনাদ এবং সিংহী প্রমীলা এই সর্গে যথার্থ প্রতিভাত হয়েছেন। তাই 'সমাগম' নামকরণ অনিবার্য এবং আবশ্যিক ছিল বলা যায়।

চতুর্থ সর্গের সমাপ্তিতে কবি জানিয়েছেন : 'ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ'। অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হয়েছিল বলে এই সর্গের নাম 'অশোকবন' রাখা হয়েছে। অশোকবনে সীতার সঙ্গে সরমার কথোপকথন বিষয়টি রামায়ণী-কথার অল্প-বিস্তর অনুসরণ। তবে এই কথোপকথন-সূত্রে সীতার সঙ্গে জননী ধরিত্রীদেবীর স্বপ্নে আবির্ভাব-জনিত ভবিষ্যৎ ঘটনার যে-সব চিত্র পাওয়া যায় তা রামায়ণ-বহির্ভূত এবং ভার্জিলের ঈনিড্ কাব্যের অনুসরণ।

মেঘনাদ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হলে ঐ রাত্রিতেই যুদ্ধোদ্যমে লঙ্কাপুরী মত্ত হয়ে উঠল। সীতার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত চেড়িরাও যুদ্ধ-উন্মাদনায় মুখর হয়ে সীতা-সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এই অবসরে বিভীষণ-পত্নী সরমা সীতা সকাশে উপস্থিত হলেন এবং সীতাকে সিঁদুরাদি পরিয়ে দিয়ে রাবণকে ধিক্কার দিলেন। সীতা সরমাকে পরম সখীরূপে পেয়ে তাঁদের বনবাস বৃত্তান্ত এবং রাবণের অপহরণ-কৌশল বিবৃত করলেন। এই প্রসঙ্গে সীতা জানালেন যে, অপহরণকালে রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ যখন তীব্র আকার নিয়েছে, সেই সময় তিনি মূর্ছিত হন এবং জননী ধরিত্রী স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে সীতাকে ভবিষৎ ঘটনাবলীর চিত্র প্রদর্শন করেন। মধুসূদন এই সর্গে সীতা চরিত্র পূর্ণ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সরলতায়, পবিত্রতায়, ঔদার্যে, মাধুর্যে সীতা এখানে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। নিভৃত অশোকবনে একাকিনী সীতার অবস্থান ছিল একটিমাত্র প্রস্ফুটিত কুসুমের মতো। মধুকবির এই সীতা চরিত্র অঙ্কন অশোকবনকেও মহিমান্বিত করেছে। আবার সীতার পাশে সরমার কথোপকথন কল্পে উপবেশন—'সুবর্ণ দেউটি তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি দশদিশ'। চতুর্থ সর্গ কেবল সীতা-সরমাকেই আলোকিত করে না, অশোকবনকেও বিভাসিত করেছে। অশোকবন ব্যতীত এমন শান্ত-মনোরম চরিত্র অঙ্কন সম্ভব ছিল না। তাই 'অশোকবন' নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম সর্গ 'উদ্যোগ'। লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ আসন্ন যুদ্ধের জন্য উভয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই সর্গে। রাত্রি প্রভাত হলেই দুই মহারথী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। মায়াদেবী প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে গভীর রাত্রিতেই তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর আদেশে স্বপ্নদেবী মাতা সুমিত্রার বেশে লক্ষ্মণকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, লক্ষ্মণ যেন একাকী লঙ্কার উত্তর দিকের বনে অবস্থিত চণ্ডীর পূজা এই রাত্রির মধ্যেই সমাপন করেন। মাতা সুমিত্রাকে স্বপ্নে দেখে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হলেন এবং রাম-বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ করে একাকী বীরপদে বনমধ্যে প্রবেশ করে দেবী চণ্ডীর পূজা সমাপন করলেন। দেবীকে বর প্রার্থনা করলেন লক্ষ্মণ। দেবী জানালেন, দৈবাস্ত্র নিয়ে বিভীষণসহ লক্ষ্মণ যেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অকস্মাৎ প্রবেশ করেন এবং পূজারত মেঘনাদকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণের যুদ্ধ-উদ্যোগ এখানে সমাধা হলো।

এদিকে সুবর্ণ-মন্দিরে নিদ্রিত মেঘনাদ-প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হলো প্রভাত-পাখির কূজনে। মাতা মন্দোদরীকে প্রণাম করে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপনের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করলেন। তারপরই মহা-সমরে অবতীর্ণ হবেন। মেঘনাদের দিক থেকে এই হলো যুদ্ধোদ্যোগ। উভয় মহারথীকে যুদ্ধের অনিবার্য পরিবেশে সাজিয়ে মধু-কবি লিখলেন : 'ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।' তবে কাব্যের নাম যেহেতু 'মেঘনাদবধ' এবং পরবর্তী (ষষ্ঠ) সর্গেরই নাম "বধ" আর সেই বধ উদ্দেশ্যেই এই 'উদ্যোগ', সেজন্য মনে করা যেতে পারে লক্ষ্মণেরই উদ্যোগ মেঘনাদকে বধ করার জন্য। এই 'উদ্যোগ' সর্গনামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মধুকবিকেও উদ্যোগ নিতে হয়েছে তাঁর 'favourit Indrajit'-কে বধ করার জন্য। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'It cost me many a tear to kill him'। কিন্তু 'যেতে নাহি দিব' বললেও 'তবু যেতে দিতে হয়'। কবিকেও তাই বধকার্য-উদ্যোগে যত্ন

নিতে হলো। বলা যায় কবিরও মানস-উদ্যোগ।

ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদবধ রামায়ণ-অনুমোদিত। তবে বধের কার্যক্রম রামায়ণ-বহির্ভূত। মধুসূদনের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, লক্ষ্মণকে মেঘনাদ-সমীপে যুদ্ধ করতে পাঠানোয় রামের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আশঙ্কা। অবশেষে বিভীষণ আপন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানালেন যে, রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী শিয়রে এসে তাঁকে রক্ষোরাজরূপে বরণ করেছেন এবং লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু অনিবার্য। এছাড়া এক দৈববাণী অনুসারে রামচন্দ্র আকাশে তাকিয়ে দেখলেন যে, এক সর্প ও ময়ূরের ভীষণ যুদ্ধে ময়ূর পরাজিত হলো। রামচন্দ্র অতঃপর আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে দৈবাস্ত্রে সজ্জিত করে বিভীষণ সহকারে মেঘনাদ বধ উদ্দেশ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞগৃহে পাঠালেন। অনিবার্যভাবে মায়াদেবীর অদৃশ্য আগমন লক্ষ্মণের সহায় হলো এবং যজ্ঞরত নিরস্ত্র মেঘনাদকে তীক্ষ্ণ দৈবাস্ত্রে লক্ষ্মণ বধ করলেন।

কাব্যনামের কেন্দ্রবিন্দু এই সর্গে সাধিত হয়েছে। 'বধ' সর্গনামে কাব্য-কাহিনী চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এখানে। সর্গের এই নাম ব্যতীত অপর কিছু ভাবাও যায় না।

সপ্তম সর্গের নাম 'শক্তি নির্ভেদ'। রাবণ শিবের পরম ভক্ত। তাই রাবণের শোকে মহাদেব সমবেদনা জানিয়ে দূতরূপে বীরভদ্রকে পাঠালেন। বীরভদ্র রাবণকে মেঘনাদবধের বার্তা জানিয়ে পুত্র-বিয়োগে শোকাতুর রাবণকে মহাদেবের দেওয়া রুদ্রতেজ দান করলেন। রুদ্রতেজে বলীয়ান রাবণ ক্রোধান্ধ ও চরম প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে লক্ষ্মণ-বধে কৃতসংকল্প হলেন। রাবণের যুদ্ধযাত্রায় দেবলোকে চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং ইন্দ্র-কার্তিক-লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীগণ তথা দেবসৈন্যরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কিন্তু মহাবীর রুদ্রতেজা রাবণকে বাধা দিতে কেউ পারল না। রাবণ শক্তি অস্ত্রে লক্ষ্মণকে ভূপাতিত করলেন। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পতন এই সর্গের কেন্দ্রীয় ঘটনা বলে কবি যথার্থই এই সর্গের নাম 'শক্তিনির্ভেদ' রেখেছেন।

অষ্টম সর্গের শেষে কবি জানিয়েছেন : 'ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ'। এই সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। লক্ষ্মণ-বিয়োগে রাম শোকাচ্ছন্ন ও বিহ্বল হয়ে পড়লে দুর্গার আদেশে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে যমপুরে নিয়ে গেলেন। সেখানে নরকের ভয়ানক ও বীভৎস দৃশ্যাদি অবলোকন করে রামচন্দ্র পরিশেষে দশরথের সম্মুখীন হলেন। দশরথ জানালেন, লক্ষ্মণের প্রাণ-বিয়োগ হয় নি। গন্ধমাদন পর্বতের শৃঙ্গে বিশল্যকরণী নামে লতা আছে, তার প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনর্জীবিত হবেন। অনুচর হনুমান সেই ঔষধ-লতা আনতে গেলেন। এই সর্গে মিলটনের প্রভাবে কবি প্রেতলোকে ভ্রমণ করেছেন ঠিকই, তবে মহাকাব্যিক বিস্তার যেমন সফল হয়েছে সর্গনামও তেমনি যথার্থ হয়েছে।

কাব্যের শেষ তথা নবম সর্গের নাম 'সংস্ক্রিয়া'। মেঘনাদের শব-সৎকার বর্ণনাই এই সর্গের মুখ্য বিষয়। সংস্ক্রিয়া হলো সংস্কার-কার্য। সং সম্ + ক্রিয়া > সংস্ক্রিয়া।

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ পুনর্জীবিত হলে রাবণ সখেদে বলে উঠলেন :

বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে! হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি!

তিনি মন্ত্রী সারণকে নির্দেশ দিলেন, রামচন্দ্রের শিবিরে গিয়ে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালনের জন্য সাত দিনের যুদ্ধবিরতির যেন অনুরোধ করা হয়। সারণ যথাবিধি রামচন্দ্রের নিকট গিয়ে

অনুরোধ করলে রামচন্দ্র অনুমোদন করে বললেন যে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি কখনো অপরের ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে তাকে আক্রমণ করেন না।

যুদ্ধ বিরতিতে রাবণ-শিবির শোক-সাগরে নিমজ্জিত হলো। মেঘনাদের শব সৎকারের আয়োজন চলতে লাগল। এদিকে শোকমগ্ন লঙ্কার অশোকবনে সীতা-সমীপে সরমা পুনরায় উপস্থিত হলো। সীতা সরমার কাছ থেকে লঙ্কা-বিপর্যয়ের সমস্ত কাহিনী জানলেন।

ইতিমধ্যে সমুদ্রতীর অভিমুখী হয়েছে মেঘনাদের শবযাত্রা। অবশেষে শুভ্রবাস ও শুভ্র-উত্তরীয় পরিহিত বিশালকায় দীনবেশে রাবণের আবির্ভাব ঘটল—'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে'। প্রমীলাও সহমরণে গেলেন। 'সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

এই সর্গের নামকরণে একটা সাংকেতিক অর্থ দ্যোতিত হয়। শক্তি ও ঐশ্বর্যের দম্ভ, যুদ্ধ ও রক্তপাত, জীবনের আনন্দ-আড়ম্বর-উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই মৃত্যুর নিকট অতি তুচ্ছ। রাবণ যেন সেই কথাই দেহধারী মানবমনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা-শক্তি-ঐশ্বর্য যেন দেহের প্রতীক। তারই সংস্ক্রিয়া যেন রাবণ করলেন নগ্নপদে, শুভ্র উত্তরীয় গলে সিন্ধুনীরে। মনে করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বাণী : 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'। যিনি সর্ব নাশের ক্রীড়নক তারই ছোঁয়া লাগবে জীবনে অর্জিত সমস্ত বিকি-কিনিতে। তাই এই 'সংস্ক্রিয়া' গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন সুপরিকল্পিতভাবে মহাকাব্যের কাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং সেই ক্রম-পরিণতিমুখী কাহিনীকে নয়টি সর্গে বিন্যস্ত করেছেন। আর এটাও দেখা গেল যে, এই সর্গগুলির নামকরণ হয়েছে সংশ্লিষ্ট সর্গের মুখ্য প্রতিপাদ্য কাহিনীকে ভিত্তি করে। সর্গনামগুলির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য অন্বেষণ করা যায়, যা মহাকাব্যিক ভাব-গভীরতাকে ব্যঞ্জিত করে। এখানে আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় যে, মহাকাব্যের কোনো কোনো সর্গের চরিত্র-ভিত্তিক নামকরণও প্রশস্ত। মহাভারতের একাধিক পর্ব আছে চরিত্রের নামানুসারে। মধুসূদন কোনো চরিত্রের নামে কোনো সর্গের নামকরণ করেন নি। অথচ অন্তত দুটি ক্ষেত্রে এই সুযোগ ছিল—তৃতীয় সর্গে 'প্রমীলা' এবং চতুর্থ সর্গে 'সীতা' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তৃতীয় সর্গে প্রমীলা মুখ্য হলেও আসলে কবির লক্ষ্য ছিল মেঘনাদকে বীরাঙ্গনা প্রমীলার দ্বারা আলোকিত করা। আর চতুর্থ সর্গে সীতা প্রধানা হলেও অশোকবনের মধ্য থেকে লঙ্কার অভ্যন্তরীণ অবস্থা অবলোকন করা হয়েছে। তাই বলা যায়, সর্গনাম মধুসূদন যা ব্যবহার করেছেন তার বিকল্প নেই। ❑

পরিশিষ্ট

Michael Madhusudan Dutta
Bankim Chandra Chatterjee

The next author to be considered is Mr. Michael Madhusudan Dutta, a most prolific writer of poems and plays. There is probably no writer whose merits are more variously estimated—some enthusiasts thinking him fit to compare with Kalidasa, while others regard him as a mere poetaster For ourselves we agree with neither, and while admitting his considerable merits, we are not prepared to rank him among great poets. He has incurred much hostile criticism by his innovations in language, and by his introduction into Bengali of the use of blank verse, but his rightful place in Bengali literature is perhaps the highest.

His poetical works are the *Meghnadabadh*, the *Tilottama Shambhaba*, the *Birangana* and the *Brajangana*. The two former are what in Europe would be called epic poems, and in India mahakabyas. Both are written in blank verse—the first instances of the kind in Bengali. Of the two, the *Tilottama* was the earliest, but the *Meghnadabadh* is Mr. Dutta's greatest work. The subject is taken from the *Ramayana*, the source of inspiration to so many Inidan poets In the war with Ravana, Meghnada, the most heroic of Ravana's sons and warriors, is slain by Laksman, Ram's brother. This is the subject; and Mr. Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But, neverthless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Dutta's own creation. In their conception and development, Mr. Dutta has displayed a high order of art, and to do justice to it, or even to give a suitable idea of it, would require a much more minute examination of the poem than the space at our command will allow. To Homer and Milton, as well as to Valmiki, he is largely indebted in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali Literature. The characters are clearly conceived and capable of winning the reader's sympathy. The machinery, including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled. The imagery is graceful and tender and terrible in turn. The play of fancy gives constant variety. The diction is richly poetic, and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express. Nor is the verse broken up into couplets complete in themselves, in the Sanskrit fashion, but, abounding like Milton's in variety of pause, it seems to us musical and graceful, as well as a fitting vehicle for passionate feelings.

Mr. Dutta, however, is not faultless. He wants repose. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff. Clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind; and the sea grows terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All this bombast is unworthy of Mr. Dutta's genius and cultivated taste. Equally so is his constant repetition of the same images and phrases till they almost nauseate his readers. Nor is he altogether innocent of plagiarism. Homer and Valmiki are not unfrequiently put under contribution, and Milton and Kalidasa have equal reason

to complain.

Then again grammar might have been respected; and we must strongly protest against the constant introduction in imitation of the English idiom of such verbs as *stutila, swanila, nirghosila*

We have given no extracts from the *Meghnadabadh*, because we could give no adequate idea of its merits by isolated quotations. The poem is beautiful as a whole, but single passages would give no more idea of it than a brick could give of the building from which it was taken.

Of Mr Dutta's other works, the *Tilottama Sambhaba* was the earliest It is an epic like the *Meghnadabadh*, but far inferior to that poem. The subject is the birth of Tilottama, the fairest of Brahma's creation, created for the express purpose of causing discord between the powerful Titan brothers, Sunda and Upasunda, who had expelled the Aryan gods from Heaven.

We gladly turn from the *Tilottama* to a less ambitious but more mature work, the *Birangana*. It is a series of poetical epistles from heroes, wives to their husbands. It followed the *Meghnadabadh*, and there is the same gorgeous imagery, the same rich poetic diction, and the same musical variously modulated versification.

The *Brajangana* is a short and fragmentary poem in rhyme It sings the woes of Radha during the days of her bereavement—a subject so often treated before, that novelty might seem to be impossible Mr Dutta, however, has contrived to say much that is both new and beautiful, and he is just as successful in rhyme as in blank verse. In fact, his rhyme is the best in the language. Of his sonnets we are no great admirers, though they might serve to win a name for a less distinguished author. They were composed in Europe. One of them is dated from Versailles, and others are addressed to Dante, Professor Goldstucker, Tennyson, Victor Hugo and Italy,—a sufficiently miscellaneous list of subjects, it must be confessed.

As a Dramatist, Mr. Dutta is not generally successful Among his plays are *Sarmmistha, Padmabati*, and *Krishna Kumari;* and the first mentioned in particular is very generally admired. In our judgement none of them are of much value. No Bengali writer has yet shown any real dramatic power. Even Babu Dinabandhu Mitra, the best writer in this line, entirely fails when he attempts to portray any of the heigher emotions, and as for Mr. Dutta, his undoubted poetic genius seems entirely to desert him as soon as he sets about writing a play. His farces, however, are good. One of them, entitled *Is this Civilization?* is the best in the language. This little work deserves notice independently of its own really great merit.

The Bengali Press at the present day is very prolific, but by far the largest part of the books published are mere servile imitations of some successful author. There are imitators of Vidyasagar; imitators of Tekchand Thakur, of Hutam, of Babu Dinabandhu Mitra and of the author of *Durgesh Nandini;* but perhaps, no work has formed the model for so many imitators as *Is this Civilization?* It is a farce with a purpose, being intended chiefly to ridicule and so expose the vice of drunkenness and the other evils by which it is generally attended. The Burtolla Presses and shops actually overflow with little books, containing a dozen or twenty pages each, an selling for an anna or two, all directed against the vice of

drunkenness. There are farces, too, of larger bulk, one of which, called *Bujhile-kina*, or *do you understand?* is very popular, and often produced at private theatricals; and these, too, like the others, are mere copies of *Is this Civilization?* This little work, therefore, independently of its being in itself one of the two best farces in the language, gains additional importance from the large number of other books written after its model.

To give any adequate idea of this clever little work by translated extracts would be entirely impossible, because half the fun lies in the absurd jargon interlarded with English words and the cant of debating clubs in which the characters speak. The scene is laid in the "Gyan Tarangini Sabha"—a sort of scientific debating society which chiefly devotes itsell to nautch girls and tippling The types of life and character which it represents are sufficiently disgusting, and the impoitant question is, whether the representation is correct

To the shame of Bengal we must say that we fear the picture is a true one. The reformer who never gets beyond tipsy harangues full of English expressions, should not be confounded as he often is by Europeans with the really cultivated class. But it can not be denied that he is a fair representative of that great horde of partly educated Babus, whose only claim to enlightenment lies in the fact that they drink, wear shabby trousers and stammer out barbarous English. These are the men who swarm in every office, and plague officials with endless aplications for employment crowed the thoroughfares of the native town in the evening, drain the liquor shops and from the majority of his audience when Babu Keshub Chandra Sen lectures in the Town Hall. Of Education, they have had nothing worth the name. Having spent a few years very unprofitably in learning a smattering of English at some Anglo-vernacular school, they started in life—if poor, at the age of eighteen, as *umedwars*. If rich, they devoted themselves from the same age with their whole strength to swinish pleasures. The country is overrun with men of this sort, and Mr. Dutt's picture is true to life; but they must not be confounded with the really cultivated class, who, in spite of all that has been said regarding the spread of English education, are comparatively few in number.* ❑

*"The Calcutta Review," No. 104, Vol. 52, April 1871.

The Raja's New Clothes: Redressing Rāvaṇa in *Meghanādavadha Kāvya*

Clinton Seely

Michael Madhusudan Dutt (1824—1873) stated quite candidly

> People here grumble that the sympathy of the Poet in Meghanad is with the Raksasas And that is the real truth I despise Ram and his rabble, but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination, he was a grand fellow [1]

This confession—really more a proud declaration—appears in a letter to Raj-Narain Bose during the period when Dutt was writing his magnum opus, *Meghanādavadha Kāvya* (The slaying of Meghanāda) a poem retelling in nine cantos an episode from the *Rāmāyana*, composed in Bengali and published in 1861 Unlike more traditional Rāma tales, the poem begins in medias res and focuses on Rāvana's son Meghanāda, telling of his third and final fight in defense of the *rāksasa* clan, his demise, and his obsequies If one analyzes Dutt's characters closely, one finds that the main portagonists—Rāma, Lakṣmana and Rāvaṇa—are consonant with those characters as found in the most widely known Bengali *Rāmāyana*, composed in the fifteenth century by Kṛttivāsa Likewise, the events are fundamentally those narrated in one portion of *Kṛttivāsa's Rāmāyaṇa*. Rāvana's two sons, Virabāhu and Meghanāda, are slain, the latter by Laksmaṇa, Rāvana slays Lakṣmana, Lakṣmana, with help of a special herb procured by Hanumān, is revived Nothing in *Meghanādavadha Kāvya* leads the reader to assume any other conclusion than that Rāvana will eventually die at the hands of Rāma, as happens in the *Rāmāyaṇa*. But despite Dutt's rather remarkable adherence to traditional characterizations and events (remarkable, given his declared/ contempt for Rāma and his rabble), his poem engenders in the reader a response vastly different from that produced by the more traditional Rāma story Nirad C Chaudhuri may have put it most succinctly

> We regarded the war between Rāma and Rāvaṇa, described in the *Rāmāyaṇa*, as another round in the eternal struggle between right and wrong, good and evil We took Rāma as the champion of good and the Demon King Rāvaṇa as the champion of evil, and delighted in the episode of Hanumana the Monkey burning Lanka, the golden city of Rāvaṇa But Dutt would be shocking and perplexing us by his all too manifest sympathy for the Demon King, by his glorification of the whole tribe of demons, and his sly attempts to show Rāma and his monkey followers in a poor light ..He had read Homer and was very fond of him, and it was the Homeric association which was making him represent a war which to us was as much a struggle between opposites and irreconcilables as a war between rivals and equals When we were thinking of demons and of gods (for Rāma was a god, and incarnation of Vishnu himself). Dutt was thinking of the Trojans and the Achaeans. Rāvana was to him another Priam, Rāvaṇa's son Meghanād a second Hector, and Rāvana's city which to us was the Citadel of Evil, was to Dutt a second Holy Troy [2]

If both the characterizations and the events in Dutt's poem correspond, by and large, to the *Râmâyana's* core story, how did Dutt manage to "shock" and "perplex" people such as chaudhuri? Other readers moreover, take an even more extreme position and conclude that Dutt did not render Râma and Râvana as equals (as is the case with the *Iliad's* arch foes, Achilles and Hector) but reversed their conventional roles altogether, fashioning Râvana as the hero—the epitome of the sympathetic and respected raja, beloved by his subjects, as well as a devoted brother, husband, and father.[3] How can a work that purports to have as its template a rather predictable story skew the reader's perception of its protagonists so effectively? The answer is complex, for the talented and skillful Dutt employed various literary strategies to accomplish his ends. Elsewhere I have discussed how Dutt used similes to subvert the reader's preconceptions about the traditional epic tale by consistently aligning the *râksasas* with various heroes of Hindu Indian literature. By the process of elimination Râma and Laksmana, the nominal heroes of the *Râmâyana* become associated with the opposers of these heroic exemplars. In what follows, I extend my earlier argument, moving from the level of simile to that of storytelling, and argue that Dutt's epic poem tells not one tale but four tales simultaneously, with the three subordinate stories—three of the most prominent tales in Bengali Hinduism—running counter to and subtly undermining the dominant Râma story.[4] As this essay's title suggests, at one level *Meghanâdavadha Kâvya* is a tale about the invisible, almost subliminal, cloaking of Râvana in the finery of heroism while, "Ram and his rabble" go about stripped of their traditional grab of glory. But first a bit of background for those unfamiliar with Michael Madhusudan Dutt and Bengal of the nineteenth century. And like Dutt's opus, we begin at a beginning, but not necessarily the beginning.

BACKGROUND: MULTIPLE TRADITIONS

In 1816 a group of the leading Indian residents of Calcutta established Hindoo College, which opened its doors to Hindu students the following year, expressly "to instruct the sons of the Hindoos in the European and Asiatic languages and sciences."[5] Hindoo College proved to be the intellectual incubator for an amorphous group known as Young Bengal—youths eager to assimilate new and progressive ideas as well as to denounce what they viewed as superstitious, obscurant practices among their fellow Hindus. Starting in 1833, when he was nine years old, Dutt attended the junior department of this college.[6] He had been born in a village in Jessore district (now in Bangladesh) into a fairly well-to-do Hindu family. Dutt's father commanded Persian, still the official language of British India's judicial system, and was employed in Calcutta's law courts. It was to Calcutta that the senior Dutt brought young Madhusudan for his education.

Even outside institutions of formal education, there was at this time considerable enthusiasm for English and for knowledge of all kinds. Various periodicals helped satisfy this need, as did a number fo societies. One of these, the Society for the Acquisition of General Knowledge, came into being in 1838 with a membership of around 150 of Calcutta's educated elite, including one "Modoosooden" [Madhusudan] Dutt.[7] With such a supportive environment at Hindoo College and within the upper echelons of society (epitomized by the Society), it is not surprising that Madhusudan Dutt began his literary career writing in the English language. English, after all, was the language of the literature he had been taught to respect, the literature for which he had cultivated a taste. As his letters to a classmate make clear, he dearly loved English literature and wanted fiercely to become a writer in English. Boldly he sent off some of his poetry to a couple of British journals, identifying himself to the editor of *Bentley's Miscellany,*

London, in this way:

> I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year.—"a child" -to use the language of a poet of your land, Cowley, "in learning but not in age."[8]

Of his fantasies there can be no doubt, as a letter to his friend Gour Dass Bysack reveals:

> I am reading Tom Moore's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word! Oh! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be a great poet—which I am almost sure I shall be, if I can go to England.[9]

In 1843, the year after he wrote the above letters, Dutt went even further in his acceptance of things Occidental: he embraced Christianity, in the face of very strong opposition from his father. As a Christian, Dutt could no longer attend Hindoo College and so transferred to Bishop's College, where his curriculum included Greek, Latin, and Hebrew.[10] At the start of 1848, he left Bengal suddenly, going south to Madras, where he secured employment as a school-teacher and married, within his profession, the daughter of a Scottish indigo planter. Early on during his sojourn in Madras, the first signs appear of a shift in aspirations from that of becoming a noted poet in English to that of devoting his creative energies to writing in his mother tongue, Bengali

A year after he arrived in Madras, Dutt published "The Captive Ladie," a very Byronic tale (the epigram for the first canto came from "The Giaour") in two cantos of well-modulated octosyllabic verse. One reviewer—J E D Bethune, then president of the Council of Education, whose opinion Dutt personally sought—advised Dutt to give up writing in English and put his talents to work on Bengali literature Wrote Bethune to Dutt's friend Bysack, who concurred and passed the advice on to Dutt:

> He might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry, at all events, he must write.[11]

Bethune went on to say that from what he could gather, the best examples of Bengali verse were "defiled by grossness and indecency." He suggested that a gifted poet would do well to elevate the tastes of his countrymen by writing original literature of quality in Bengali, or by translating. Dutt's biographer points out that such counsel was not reserved for Dutt alone but offered by Bethune to the assembled students of Krishnagar College.[12] Given Bethune's stance, it seems safe to assume that he was not simply judging literary merit in the case of "The Captive Ladie." (The piece is actually quite effective poetry.) Rather, he wanted to encourage the writing of Bengali literature, not just good literature per se. It should be noted, moreover, that the following year Bethune was among the founders of the Vernacular Literature Society.[13]

Bysack rephrased parts of that letter and then encouraged Dutt to heed Bethune's words:

> His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. ... We do not want another Byron or another Shelley in English; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature.[14]

The precise impact of Bethune's and Bysack's advice cannot be known with certainty. In an oft-cited letter to Bysack a month later. Dutt boasted of a nearly impossible daily regimen of language study: "Here is my routine. 6 to 8 Hebrew. 8 to 12 school. 12-2 Greek. 2-5 Telegu and Sanskrit. 5-7 Latin. 7-10 English" He added that "I devote several hours daily in Tamil" and concluded. with rhetorical panache "Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?"[15]

Earlier that year. though. even before Bethune's unexpected. unenthusiastic reception of "The Captive Ladie." the first signs of Dutt's impending conversion to his mother tongue for creative writing had already shown themselves. well before "The Captive Ladie" had even been published He wrote Bysack. asking him to send from Calcutta two books. The books requested were the Bengali re-creations (not really translations) of India's Sanskrit epics and were among the first books printed in Bengali. published from the Baptist missionaries' press at Serampore. The stories and characters from these two epics. known to Dutt from childhood. provided about half the raw material for what he would write in Bengali. including *Meghanâdavadha Kâvya.*

In 1856. at the age of thirty-two Dutt returned to Calcutta. Between 1858 and 1862. when he finally got an opportunity to go to England (to study law). Dutt wrote and published in Bengali five plays. three narrative poems. and a substantial collection of lyrics organized around the Râdhâ-Krsna theme Along with all this. he found time to translate three plays from Bengali into English

By the latter half of the nineteenth century. the original ideals of the Young Bengal group--an earnest. enlightened quest for knowledge coupled with a rejection of what they viewed as demeaning superstition- had been misinterpreted by some to mean aping the British and flouting social norms. In particular. patronizing dancing girls. meat-eatig. and the drinking of alcohol (taboo among devout Hindus). along with speaking a modicum of English, came to symbolize for some their "enlightenment" Quite otherwise was Dutt's embrace of things Occidental. He had a good liberal education. was a practiced writer (although much of that practice had been in English). and had drunk deeply from European and Indian literature Of a fellow writer Dutt wrote in *1860*:

> Byron. Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"-- what "Alps on Alps arise!" As for me. I never read any poetry except that of Valmiki. Homer. Vyasa. Virgil. Kalidas. Dante (in translation), Tasoo (Do) and Milton. These *kavikulaguru* [master poets] ought to make a fellow a first rate poet--if Nature has been gracious to him.[16]

There was little or no doubt in his mind that in his case Nature had indeed been kind. And by the end of the 1850s he felt himself prepared "for the great object of embellishing the tongue of my fathers" The pattern--of beginning one's literary life writing in English and then switching to one's mother tongue--was not an uncommon one. R Parthasarathy, himself an Indian poet who also writes in English (not his mother tongue). refers to Dutt as "the paradigm of the Indian poet writing in English ... torn by the tensions of this 'double tradition.'[17] But it was in Bengali that Dutt made his lasting literary contributions. foremost among them *Meghanâdavadha Kâvya.*

THE TEXT: EPIC DEPARTURES

To reiterate. *Meghanâdavadha Kâvya* tells of the third and decisive encounter between Râvaṇa's son and Râma's forces, wherein Meghanâda is slain by Râma's brogher Lakṣmaṇa. In the first of his nine cantos, Dutt introduces us to Râvaṇa and Meghanâda

on the day prior to the slaying; at the epic's conclusion. Râvaṇa performs Meghanâda's obsequies, a scene that dramatically unifies Dutt's narrative while also foreshadowing the closure of the *Râmâyaṇa's* larger conflict, Râma and Râvana's battle over Sitâ. The reader can assume that events following Meghanâda's demise will largely correspond to those found in the traditional *Râmâyaṇa*, since Dutt's narrative throughout has conformed in essence to that epic. But Râma's story is merely the warp, if you will, of Dutt's poem: three other tales form the woof of this *Râmâyaṇa* fabric, interweaving with Râma's tale to create texture and, most importantly, to subvert the main narrative's purport—the aggrandizement of Râma.

Complex narrative structuring was by no means introduced into Indian literature by Dutt. Sanskrit boasts a type of multisemic narrative which, if read one way, tells a certain tale (of Kṛṣṇa, for instance) and, read another way, tells a different story (of Râma, for example). The two—or more—tales are simultaneously present in the same text, but, depending on choices the reader makes, one or the other story becomes manifest. Sanskrit, by its very nature, allows for ambiguous reading, and certain poets exploited that ambiguity for artistic effect. Owing to euphonic assimilation (*sandhi*), word boundaries can become difficult to discern. A string of phonemes can be variously divided to produce diverse words; different parsings of a sentence can thus produce diverse readings. On the simplest level, to take an example from the *Râmâyaṇa* itself, we have the mantra-like utterance by Ratnâkara, a thief who, thanks to the purifying nature of a spell, becomes Vâlmiki, devotee of Râma and author of the *Râmâyaṇa*. A penitent Ratnâkara is directed to chant the name of Râma, but he demurs, claiming he is too vile a sinner. So Ratnâkara is instructed to speak the word *marâ*, meaning dead. By chanting *marâ marâ* continuously—*marâmarâmarâ* Ratnâkara does in fact say Râma's name, by virtue of the contiguity of the two phonemes *râ* and *ma*. Divide the phonemes one way and one gets "dead"; divide them another way and Râma springs to life.

In his survey of Sanskrit literature, A. B. Keith mentions somewhat more sophisticated examples. In a poem entitled the *Râghavapâṇḍavīya* "we are told simultaneously the stories of the *Râmâyaṇa* and the *Mahâbhârata*," while another work, the *Rasikaranjana*, "read one way, gives an erotic poem, in another, a eulogy of asceticism." And yet a third narrative the *Râghavapâṇḍavīyayâdavīya*, narrates the tales of Râma, of Nala, and of the *Bhâgavata Purâṇa* simultaneously, using the same phonemes in the same order.[18]

Written Bengali, in which word boundaries are more recognizable and permanent, does not lend itself as readily as Sanskrit to such linguistic virtuosity. Though individual words may, apropos of *kâvya* or poetic literature, have more than one meaning, whole sentences or paragraphs cannot be construed to contain certain words in one reading and different words in another. Nevertheless, in the tradition of his Sanskrit poetic forefathers, Dutt creates in *Meghanâdavadha Kâvya* a multistory narrative. On the denotative level, it is simply an episode out of the *Râmâyaṇa*, but read another way, primarily through its similes, *Meghanâdavadha Kâvya* dons the clothing of Kṛṣṇa to tell Kṛṣṇa's tale. Read even differently, Dutt's poem alludes to the *Mahābhārata* and its internecine struggle between Kurus and Pāṇḍavas. And read from yet one more perspective, the fabric of *Meghanādavadha Kāvya* glitters with the myth of Durgâ and her annual autumnal visit to Bengal, when Bengali Hindus celebrate Durgâ Pūjâ [worship], the grandest public festival of the Hindu year.

All the subsidiary interwoven stories are present in one and the same reading of *Meghanâdavadha Kâvya*, albeit in far less narrative detail than Râma's story, just as

the threads in fine colth can be discerned but tend to blend into the total design. Because all are manifest and thus not only can but must be read and apprehended simultaneously, each tale affects the reader's understanding of all the other tales. As one reads on Meghanâda's demise and Râma's impending victory a joyous event for any Hindu one also reads the more dolorous tale of Kṛṣṇa, who grew up in bucolic Vraja, delighting the cowherd maidens, but who then had to leave, never to return. The conflation of characters, in this case Kṛṣṇa and Meghanâda, serves to confuse the reader's response. is the reader made uncomfortable by the departure of Kṛṣṇa or by the death of Meghanâda? The resulting subversion of the main story by a secondary tale leads at least some readers, as Chaudhuri attests, to react with shock and perplexity. Have the *rākṣasas* been glorified beyond what they are in more traditional *Rāmāyanas*? Well, no, not directly. Has Râma been shown in a poor light? Not exactly. These characters are precisely what they have always been. But Dutt's submerged tale of Krsna has complicated matters for the reader. In similar fashion, as one reads the episode drawn from the *Rāmāyana*, one is also presented with a vignette from the *Mahâbhârata* as well as the mythic tale of Durgâ, each bittersweet stories, each in its own way countering the emotional impact of *Meghanâdavadha Kâvya*'s main story line.

Let us examine the three substrata stories more closely. The tale of Krṣṇa is told entirely through similes, all of which compare him with Meghanâda. These similes are drawn from two periods in his life. According to his hagiography, Kṛṣṇa was born in Mathura (also called Madhupura) but taken immediately after his birth to *Vraja (Gokula)* to escape the wrath of King Kaṃsa, his uncle. In Vraja, by the banks of the Yamunā, Kṛṣṇa grows up to become the lover of the *gopīs*, the local cowherds' wives, Râdhâ chief among them. There comes a time, however, when the idyll must end. Kṛṣṇa leaves Vraja and returns to Mathura, there to slay his wicked uncle. That done, he moves on to the city of Dvārakā. But for Bengali Vaisnavas, it is the time Kṛṣṇa spent in Vraja with his *gopī* lovers that is most cherished.

Dutt's Kṛṣṇa similes are by no means randomly scattered throughout his poem. In the first half of *Meghanâdavadha Kâvya* while Meghanâda is still living with his fellow *rākṣasas*, the Kṛṣṇa similes refer to Vraja in the happy days when the deity resided there. Early in the first canto, for example, a passage describing Râvana's sumptuous court runs: "Constant spring breezes delicately wafted scents, gaily transporting waves of chirping ah yes! enchanting as the flute's melodic undulations in the pleasure groves of Gokula."[19] Toward the end of the same canto, we find Meghanâda, first compared to the moon (lord of night) and then to Kṛṣṇa (the herdsman), at ease. He has defeated Râma in open warfare not once but twice and assumes, reasonably enough, that the *rākṣasas* have won the war:

> That best of champions dallied with
> the maids of shapely bodies, just as the lord of night sports
> with Dakṣa's daughters, or, O Yamunā, daughter of the
> sun, as the herdsman danced beneath *kadamba* trees, flute to
> lips, sporting with the cowherds' wives upon your splendid banks! (1.648-53)

Alerted to the danger facing his father (for Râma is not dead as the *rākṣasas* suppose), Meghanâda leaves his wife behind in that country retreat and returns to the walled city and his father's court. We see in the opening lines of canto 3 that young Pramīlâ - who is likened to Râdhâ, the maid of Vraja does not react to the separation from her beloved husband with equanimity.

> In Pramoda Park wept Pramīlā, youthful Dānava

> daughter, pining for her absent husband. That tearful moon-
> faced one paced incessantly about the flower garden
> like the maid of Vraja, ah, when she, in Vraja's flower
> groves, failed to find her yellow-clad Kṛṣṇa standing beneath
> *kadamba* trees with flute to lips That lovelorn lady would
> from time to time go inside her home, then out, just like a
> pigeon, inconsolable in her empty pigeon house (3.1-9)

Donning warrior's garb, Pramīlā marches with her legion of women (a borrowing by Dutt from the *As'vamedhaparva* of the Bengali *Mahâbhârata*) through Râma's ranks--Rama grants her passage --and rejoins her husband in the walled city. Then in canto 5, Meghanâda is awakened by doves on the morning of the day he is to do battle once again. He wakes Pramīlâ, kissing her closed eyelids: "Startled, that woman rose in haste--as do the cowherds' wives/at the flute's mellifluous sounds" (5.387-88). Later that same morning he leaves Pramila, who watches him walk away from her for, unbeknownst to her, the last time.

> Wiping her eyes, that chaste wife departed--as cowherds' wives,
> about to lose their lover, bid farewell to Mâdhava
> on Yamunâ's shores, then empty-hearted return to their
> own empty homes -so, weeping still, she entered her abode (5.604-7)

Just as kṛṣṇa (Mâdhava) left pleasant Vraja to slay the evil Kaṃsa, so Meghanâda leaves, intending to slay Râma. Neither one will return. Kṛṣṇa goes to Dvārakā: Meghanâda dies. The remaining two Kṛṣṇa similes are set during the time after Kṛṣṇa has gone away

Meghanâda is slain in canto 6. Though at that moment his death is known only to Lakṣmaṇa and Vibhīṣaṇa, it affects the three individuals emotionally closest to him his father's crown falls to the ground: his wife's right eye flutters, an inauspicious sign: and his mother faints. "And," adds Dutt, "asleep in mothers' laps, babies cried/a sorrowful wail as Vraja children cried when precious/Syâma [Kṛṣṇa] darkened Vraja, leaving there for Madhupura" (6 638-41). It is not until the ninth and final canto that another Kṛṣṇa simile occurs, once more depicting Vraja after Kṛṣṇa's departure As the funeral cortege for Meghanâda files out of the walled city of Lanka toward the sea, "that city, now emptied, grew dark like Gokula devoid of S'yâma" (9.308-9) Again, the Kṛṣṇa woof, created here with similes is woven into the *Râmâyaṇa* story. If the two tales typically evoked the same audience response, then the anticipated reaction would simply be intensified. But in this case, the traditional audience responses are discordant: sadness at the loss of Kṛṣṇa: glee over Râma's triumph.

Similar subversion of the expected reader response to Râma's victory is fostered by the *Mahâbhârata* woof The *Mahâbhârata* is a compendium of stories, a far more eclectic text than the *Râmâyaṇa*, the many *Mahâbhârata* similes in *Meghanâdavadha Kâvya* are drawn from diverse episodes. One set of these similes, however, focuses on the specific tale of the ignominious slaughter of the Pâṇḍavas' sons by As'vatthâman. This particular episode takes place at the end of the war, after the outcome is clear Although both sides have sustained heavy losses, the five Pâṇḍavas have won. The Kaurava Duryodhana, the great enemy of the Pâṇḍavas, lies dying, his hip broken. At this point As'vatthâman, a cohort of Duryodhana's, decides to slip into the Pâṇḍava camp and slay the five Pâṇḍava warriors out of spite. Under cover of darkness, As'vatthāman and his accomplices proceed to the victors' bivouac, at the gate of which stands the god S'iva, as Sthâṇu (a veritable pillar). As'vatthâman manages to get by S'iva and penetrate the enemies' camp. Once inside, he kills those he takes to be the senior

Pândavas but who are in fact their five young sons. Pleased with himself, As'vatthâman hastens to tell the senior Kaurava, Duryodhana, what he has done.

The first canto of *Meghanâdavadha Kâvya* contains a reference to the encampment of the Pândavas, couched in a series of similes describing Râvana's grand court. "Before its doors/paced the guard, a redoubtable figure, like god Rudra [S'iva] trident clutched, before the Pândavas' encampment's gateway" (1 53-55). This same *Mahâbhârata* episode is alluded to again in canto 5 when Laksmana preparing to slay Meghanâda, must first proceed to the Candī temple situated in a nearby forest. As he approaches, his way is blocked by a huge S'iva, whom he must pass in order to enter the woods. Laksmana circumvents S'iva and overcomes several other obstacles in his path before successfully reaching the temple. It is there that Laksmana is granted the boon of invisibility for the following day so that he may enter the *râksasas'* walled city undetected. Just as As'vatthâman had first to bypass S'iva before entering the Pândavas' camp under cover of darkness in order to slay what turned out to be their sons, so Laksmana must get past S'iva, then penetrate under the cloak of invisibility the *râksasas'* stronghold to slay Râvana's son Meghanâda.

In the very next canto, Laksmana does slip into the *râksasas'* city and kill Meghanâda. As Laksmana and his accomplice flee the walled city, Dutt describes their action with a combination of two similes, one natural, the other based on the same episode from the *Mahâbhârata*.

> The two left hurriedly, just as a hunter, when he slays
> the young of a tigress in her absence, flees for his life
> with wind's speed, panting breathlessly, lest that ferocious beast
> should suddenly attack, wild with grief at finding her cubs
> lifeless! or as champion As'vatthâman, son of Drona
> having killed five sleeping boys inside the Pândava camp
> in dead of night, departed going with the quickness of
> a heart's desire, giddy from the thrill and fear, to where lay
> Kuru monarch Duryodhana, his thigh broken in the
> Kuruksetra War (6 704-13)

And like As'vatthâman, who ran to tell Duryodhana what he had done, Laksmana runs to Râma to bring him news of the slaying. Here again, two tales simultaneously told, one from the *Mahâbhârata* and the other from the *Râmâyana*, produce contrary effects: delight when Laksmana slays Meghanâda, disgust at As'vatthâman's heinous act. Small wonder the reader is perplexed.

Yet a third tale is woven into *Meghanâdavadha Kâvya*, that concerning goddess Durgâ's annual *pūjâ*. According to myth, on the sixth day of the waxing moon of the autumn month of Âs'vin, Durgâ arives at her natal home, there to stay until the tenth day, when she must return to her husband S'iva's home on Mount Kailasa. Her short visit is the occasion for Bengal's greatest public Hindu festival, the Durgâ Pūjâ, during which she is worshiped in the form of the ten-armed goddess who slays Mahisâsura, the buffalo demon. On that tenth day, called the *vijayâ* (victorious) tenth, she as the victorious one is bid farewell for another year as she leaves to rejoin her spouse. Durgâ's departure is, as departures tend to be, a somewhat bittersweet affair, for although she wants to return to her husband's side, she is sad to leave her parents and friends. Her mythic parents, Menakâ and Himâlaya, are loath to let their daughter go. The eighteenth-century Bengali poet Râm Prasâd Sen, a devotee of the mother goddess in all her sundry manifestations, sang eloquently and passionately of the plight of Menakâ

(or any mother), who had to say goodbye to her daughter for yet another year Those songs, called *vijayā* songs, were no doubt sung in Dutt's time and can still be heard today. Dutt captures this bittersweetness, setting an unexpected tone for his poem in the very first canto when he describes Laksmī--she who must leave Lankâ—with a simile drawn from the Durgâ Pūjâ Laksmī is the goddess of good fortune, as Râjalaksmī, she is the râjâ's luck or fortune Lankâ's grandeur (a feature common to all *Rāmāyanas*, not just Dutt's) attests to the presence of good fortune in Râvaṇa's realm, but with the advent of Râma, Laksmī must soon leave Lankâ

> With face averted, moon-faced Indirâ [Laksmī] sat
> glumly—as sat Umâ [Durgâ] of the moonlike countenance cheeks
> cradled in her palms, when the tenth day of the waxing moon
> of Durgâ Pūjâ dawned, with pangs of separation at
> her home in Gaur [Bengal] (1 502-5]

In one way or another both the warp and woof of *Meghanâdavadha* Kâvya narrate departures and death Krsna left Vraja. The Pâṇḍavas won the war but lost their sons and kinsmen Every year, on the tenth day of the waxing moon of Âs'vin, Durgâ must depart. And Meghanâda is slain. The first three are attended by sorrow: the fourth should be a cause for joy, were it not for the subversion wrought by the other three

In the concluding canto, Dutt again accentuates the Durgâ Pūjâ theme. As the cortege exits the city gates, Pramīlâ's horse is led riderless while Meghanâda's war chariot goes empty.

> Out came the chariots moveing slowly, among them that
> best of chariots, rich-hued, lightning's sparkle on its wheels,
> flags, the colors found in Indra's bow, on its pinnacles—
> but this day it was devoid of splendor, like the empty
> splendor of an idol's frame without its lifelike painted
> image, at the end of an immersion ceremony (9 251-56)

On the tenth lunar day of the Durgâ Pūjâ the iconic representation of the goddess, in all her ten-armed splendor, slaying the buffalo demon is immersed in the Ganges It is then that the life-force of the deity, which entered the idol several days before and has been present throughout the celebrations, leaves and travels back to Mount Kailâsa The images are made from straw tied around bamboo frames, the straw is covered with clay, which when dry is painted, and the image meticulously clothed to represent the supreme goddess When such an icon is immersed in the river the clay eventually washes away, leaving a stick and straw figure exposed Just so appears Meghanâda's chariot without its vital warrior

When the funeral procession reaches the seashore, a pyre is built of fragrant sandalwood, on to which is placed Meghanâda's corpse Pramīlâ mounts the pyre and sits at her dead husband's feet—the decorated pyre being likened to the goddess's altar during Durgâ Pūjâ (9.375-76) From Mount Kailâsa S'iva now commands Agni, god of fire, to transport the couple to him like Durgâ after the immersion of her icon, Meghanâda and Pramīlâ will travel directly to S'iva. Dutt invites—nay, forces—his reader to feel toward Meghanâda and Pramīlâ what they feel toward Durgâ on the day of her departure The loss of a traditional enemy becomes, by the subversive power of Durgâ's tale, a cause for lamentation

When the funeral fire is finally out, The *rāksasas* purify the site with Ganges water and erect there a temple To wash away some of the pollution which attends death, they then bathe in the sea Dutt concludes his epic poem as follows.

After bathing in waters of the sea, those *raksasas*
now headed back toward Lankâ, wet still with water of their
grief—it was as if they had immeresed the image of the
goddess on the lunar tenth day of the Durgâ Pūjâ,
then Lankâ wept in sorrow seven days and seven nights (9.440-43)

The Durgâ Pūjâ similes in the first and final cantos not only lend symmetry to *Meghanâdavadha Kâvya* but also, more than any of the other tales presage Râvana's death. In Bengal, it is the Durgâ Pūjâ that Hindus celebrate during the waxing Âs'vin moon, coming to an end on the tenth of that month, the victorious tenth In some parts of India however the Râm Līlâ, a reenacting of Râma's divine play is performed in that season, culminating on the very same tenth of Âs'vin with the slaying of Râvana by Râma.[20] Thus, the Durgâ Pūjâ similes in Dutt's text not only relate in part the tale of Durgâ's annual leaving but also imply the story of Râma's victory over Râvana, for Durgâ's and Râma's tale occur simultaneously in mythic time If the substratum story, Durgâ's tale and her departure, effect a bittersweet response then the elation at Râma's triumph—when the two tales are perforce read together—cannot but be vitiated. That was unquestionably Dutt's intent, for, as we recall, he had declared his dislike for Râma and his admiration for Râma's foe But dislike Râma or not, Dutt kept his Râma character true to the *Râmâyana* tradition, preferring to let his similes and simultaneously told secondary tales complicate his reader's response

THE RECEPTION: MIXED BLESSINGS

Different audiences received *Meghon*âdavadha Kâvya differently, though in general it met with approbation and congratulations Dutt himself, no disinterested judge, tells us throught his letters that his poem was gaining acceptance almost daily

> The poem is rising into splendid popularity Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton, many say it licks Kâlidâsa; I have no objection to that I don't think it impossible to equal Virgil, Kâlidâsa and Tasso Though glorious, still they are mortal poets, Miltion is divine
>
> Many Hindu Ladies, I understand, are reading the book and crying over it You ought to put your wife in the way of reading the verse[21]

Even before the entire work had been published (cantos 1 through 5 appeared first) a man of letters of the day and patron of the arts, Kâliprosanna Singh, understood the importance of Dutt's accomplishment and felt it essential that Dutt should be honored This was done under the aegis of the Vidyotsahinī Sabhâ (Society for Those Eager for Knowledge), one of various private organizations formed during the nineteenth century by educated Bengalis in Calcutta Singh's letter of invitation to a small circle of guests read in part

> Intending to present Mr Michael M S Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter[22]

Following the ceremony Dutt wrote to *Râjnârâyan* Bose

> You will be pleased to hear that not very long ago the Vidyotsâhinī Sabhâ—and the President Kâliprosanna Singh of Jorâsânko, presented me with a splendid silver claret jug There was a great meeting and an address in Bengali Probably you have read both address and reply in the vernacular papers

On the whole the book is doing well It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore [Rabindranath's father]. I hear, is quite taken up with it S—told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road [where Dutt resided], and "that his imagination goes as far as imagination can go."[23]

And still later, writing to the same friend:

Talking about Blank-Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English—

"I am reading a new poem, Sir!" "A poem!" I said, "I thought that there was no poetry in your language." He replied—"Why, Sir, here is poetry that would make any nation proud."[24]

And again

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavaour The great Jotindra has only said that he is sorry poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed But I am sure the poem has many faults What human production has not?[25]

Joytindra Mohan Tagore's reservation aside, few if any readers (and it should be noted that "readers" implies the educated elite who could in fact read this erudite work) took umbrage at Dutt's iconoclasm As Pramathanath Bisi, a contemporary literary scholar, tells us

Disgust toward "Ram and his rabble," the sparking of one's imagination at the idea of Râvana and Meghanâda—these attitudes were not peculiar to Dutt Many of his contemporaries had the very same feelings What was native seemed despicable, what was English, grand and glorious Such was the general temperament . Dutt cast Râvana's character as representative of the English-educated segment of society.[26]

We may not choose to accept all of Bisi's statement at face value, but history forces us to conclude that Dutt's attitudes were indeed not peculiar to him alone *Meghan*âdavadha Kâvya did not go unappreciated by the time Dutt died in 1873, his epic poem had gone through six editions

Four years after Dutt's death, Romesh Chunder Dutt (not a relative), one of the most respected intellectuals of the day, wrote in his *The Literature of Bengal*

Nothing in the entire range of the Bengali literature can approach the sublimity of the Meghanad Badh Kabya which is a masterpiece of epic poetry The reader who can feel, and appreciate the sublime will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and greatest that have ever lived, like Vyasa, Valmiki or Kalidasa, Homer, Dante or Shakespear.[27]

As might be expected, however over the years not everyone has been enamored with *Meghanâdavadha Kâvya*. Rabindranath Tagore, born the year it came out, was one of Dutt's harshest critics Dutt's "epic" was an epic (*mahâkâvya*) in name only, he declared. Tagore found nothing elevating or elevated about Dutt's characters or in his

depiction of the events There was no immortality, as he put it, in any of the protagonists, not even in Meghanâda himself, none of these characters, he contended, would live with us forever[28] Tagore published those opinions when he was twenty-one Later, in his reminiscences, he recanted.

> Earlier, with the audacity that accompanies youth, I had penned a scathing critique of *Meghanâdavadha Kâvya*. Just as the juice of green mangos is sour—green criticism is acerbic. When other abilities are wanting, the ability to poke and scratch becomes accentuated I too had scratched at this immortal poem in an effort to find some easy way to achieve my own immortality.[29]

But despite the retraction, Tagore never accepted Dutt fully Edward Thompson, Tagore's English biographer, quotes Tagore as follows

> "He was nothing of a Bengali scholar," said Rabindranath once, when we were discussing the Meghanadbadh; "he just got a dictionary and looked out all the sounding words He had great power over words But his style has not been repeated. It is n't Bengali '[30]

Whether something is or is not the genuine article, whether it is 'really Bengali," has been for some time a criterion by which Bengali critics judge the artistic accomplishments of their fellow artists. Pramatha Chaudhuri, colleague of Tagore and editor of one of the most prestigious and avant-garde journals from the early decades of this century, *Subuja Patra* (Green Leaves), wrote in the initial issue fo that magazine

> Since the seeds of thought borne by winds from the Occident cannot take root firmly in our local soil, they either wither away or turn parasitic. It follows, then, that *Meghanâdavadha Kavya* is the bloom of a parasite And though, like the orchid, its design is exquisite and its hue glorious, it is utterly devoid of any fragrance [31]

But what Pramatha Chaudhuri looked upon as suspect has since come to be recognized as the normal state of affairs As our colleague A K Ramanujan, a man of many literatures, has commented,

> After the nineteenth century, no significant Indian writer lacks any of the three traditions: the regional mother tongue, the pan-Indian (Sanskritic, and in the case of Urdu and Kashmiri, the Perso-Arabic as well), and the Western (mostly English) Poetic, not necessarily scholarly, assimilation of all these three resources in various individual ways seems indispensable [32]

Perhaps Dutt was just a bit ahead of his time.

Attacked by Tagore and Pramatha Chaudhuri as un-Bengali, Dutt's poem has also been praised for—of all things—being in line with international communism Since in *Meghanâdavadha Kâvya* Râma is more man than incarnation of Visnu, Bengali Marxists lauded Dutt, in their underground publication *Mârksavâdi* (The Marxist), for debunking religion and the gods.[33]

Though now, like Milton's *Paradise Lost*, read more as part of a university curriculum, as the first great modern work of Bengali literature, than as a best-seller, there was a day when *Mehanâdavadha Kâvya* qualified as required reading for the educated Bengali-speaking public at large, the sine qua non of the cultured Bengali. Of Dutt's standing in Bengali literature, an assessment by Nirad C. Chaudhuri, though made some four decades ago still applies today "In addition to his historical importance," wrote Chaudhuri, "the absolute value of his poetry is also generally undisputed, only

his reputation, like that of every great writer, has had its ebbs as well as tides, its ups and downs, and his most modern Bengali critics have tried to be as clever at his expense as the modern detractors of Milton."[14] Also generally undisputed has been the conclusion that Dutt's *râksasa* raja is decked out in some very regal new clothes. That this conclusion has been so widely accepted proves how deceiving appearances can be, for Râvana, in truth, wears no new attire. Instead, the master poet has slyly—to borrow Chaudhuri's term—woven his central *Râmâyana* episode so as to suggest heroic raiment for Râvana rather than for Râma. Clothed in cunning finery, *Meghanâdavadha Kâvya* presents a deceptive exterior. The raja—redressed though he may be—wears no new clothes, even though the reader sees what in fact is not there.

NOTES

1 Yogindranath Bose, Kâikela *Madhusūdana Dattera jīvana-carita* (The life of Michael Madhusudan Dutt) (5th ed., Calcutta: Chakravarti, Chatterjee, & Co., 1925), 489. We are most fortunate to have a sizable collection of Dutt's letters preserved for us by his friends and published in the above biography and, in expanded form, in Ksetra Gupta ed., *Kavi Madhusudana O Tâmra Patrâvali* (Poet Madhusudan and his letters) (Calcutta: Grantha Nilaya, 1963). Nearly all of these were written in English, as is the case with the one cited here; a rare few are in Bengali. We also know he wrote in Italian, to Satyendranath Tagore, because Dutt himself tells us so, and in French, while he lived at Versailles—one of these letters being to the king of Italy, on the occasion of Dante's sixth birth centenary.

2 Nirad C. Chaudhuri, *The Autobiography of an Unknown Indian* (New York: Macmillan, 1951), 188.

3 See, for instance, Mohitlal Majumdar, *Kavi Srīmadhusudana* (Poet Madhusudan) (3d ed., Calcutta: Vidyodaya Library, 1975), 44-45; Nilima Ibrahim, *Bâmlâra kavi Madhusudana* (Bengal's poet Madhusudan) (3d ed.; Dhaka: Nawroz Kitabistana, 1978), 56; Suresh Candra Maitra, *Mâikela Madhusudana Datta: Jīvana O sâhitya* (Michael Madhusudan Dutt: His life and literature) (Calcutta: Puthipatra, 1975), 192; and Mobasher Ali, *Madhusudana O navajâgrti* (Madhusudan and the Renaissance) (3d ed.; Dhaka: Muktadhara, 1981), 91.

4 Those interested in subversive similes and how Dutt used them might like to read my "Homeric Similes, Occidental and Oriental: Tasso, Milton, and Bengal's Michael Madhusudan Dutt," *Comparative Literature Studies* 25, no. 1 (March 1988): 35-56.

5. Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century: 1757-1857* (2d ed., Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962), 480.

6. the earliest biography of Dutt gives his age as "about thirteen" at the time he entered Hindoo College—in 1837, according to that source. Bose, *Jīvana-carita*, 25 and 48. An editor of Dutt's collected works cites a subsequent scholar's opinion- that the year was in fact 1833--and then notes that the college magazine dated 7 March 1834 mentions Dutt reading aloud at the college's awards ceremony. Kshetra Gupta, ed., *Madhusudana racanâvali* (The collected works of Madhusudan) (Calcutta: Sahitya Samsad, 1965), xi. Hindoo College was at that time divided into a junior and a senior school, the former admitting boys between the ages of eight and twelve. See *Asiatic Journal* (September-December 1832), 114-15, cited in Brajendranath Bandyopadhyay ed., *Samvâdapatre sekâlera kathâ* (From the periodicals of bygone days) (Calcutta: Bangiya-Sahitya-Parisad-Mandir, 1923), 2:15.

7 Goutam Chattopadhyay, ed., *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents)* (Calcutta Progressive Publishers, 1965), lxi-lxvii

8. Bose. *Jīvana-carita*, 114; letter dated October 1842

9 Bose, *Jīvana-carita*, 60; letter to Gour Dass Bysack Dated 25 November 1842

10. Gupts, *Madhusūdana racanāvalī*, xiv

11. Bose. *Jīvana-carita*, 159-60. letter of J E D Bethune to Gour Dass Bysack dated 20 July 1849.

12. According to Bethune

> If you do your duty. the English language will become to Bengal what, long ago, Greek and Latin were to England; and the ideas which you gain through English learning will, by your help, gradually be diffused by a vernacular literature through the masses of your countrymen. . [I have told] those young men in Calcutta, who have brought for my opinion, with intelligible pride, their English compositions in prose and verse [that they] would attain a more lasting reputation, either by original compositions in their own language, or by transfusing into it the master-pieces of English literature.

Quoted in Bose, *Jīvana-carita*, 160-61

13 Nilmani Mukherjee, *A Bengali Zamindar Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times, 1808-1888* (Calcutta Firma K L Mukhopadhyay, 1975), 169-70. The founders met in 1850, the Society came into being in 1851

14 Bose, *Jīvana-carita*, 161-62, letter of Bysack to Dutt. undated

15 Bose. *Jīvana-carita*, 182, letter to Bysack dated 18 August 1849

16 Bose, *Jīvana-carita*, 322; letter to Rajnarain Bose dated 1 July 1860

17 Quoted in Homi Bhabha, "Indo-Anglian Attitudes," *Times Literary Supplement*, 3 February 1978, 136

18 A Berriedale Keith, *A History of Sanskrit Literature* (London Oxford University Press, 1920). 137-39

19 Canto I, lines 55-58, subsequent citations appear in the text All translations of *Meghanādavadha Kāvya* are mine

20 Although the length of the entire Râm Līlâ performance varies in different towns and villages, the crucial event, the slaying of Rāvana, happens on the same day everywhere See Norvin Hein. *The Miracle Plays of Mathura* (New Haven and London: Yale University Press. 1972), 76-77 and appendix.

21 Bose. *Jīvana-carita*, 480, letter to Rajnarayan Bose. undated [1861]

22 Bandyopadhyay, ed. *Saṁvādapatre sekālera Kathā* 2.16

23. Bose. *Jīvana-carita*, 480-81, letter to Rajnarayan Bose, undated [1861]

24 Bose, *Jīvana-carita*, 487, letter undated [1861] Dutt's metre in *Meghanādavadha Kāvya* and in his earlier, shorter work (which he referred to as an "epicling"), *Tilottamā sambhava* (The birth of Tilottama), is a blend of Milton and medieval Bengali's most common narrative verse structure, called *payāra*, a rhymed couplet of fourteen-foot lines, with patial caesura after the eighth-foot in each line In Dutt's supple hands, Milton's iambic pentameter gives way to *payāra*'s fourteen

syllables. while *payâra*'s rhyming and eight-six scansion are sacrificed to the demands of Miltonic blank verse, replete with enjambment To a friend, he wrote· "You want me to explain my system of versification for the conversion of your skeptical friend I am sure there is very little in the system to explain, our language. as regards the doctrine of accent and quantity. is an 'apostate', that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English let them read the Paradise-Lost, and they will find how the verse. in which the Bengali poetaster writes, is constructed" Bose, *Jīvana-carita.* 320-21; letter to Rajnarayan Bose dated 1 July 1860

25 Bose, *Jīavana-carita.* 494, letter dated 29 August 1861 Jotindra Mohan Tagore may have been the first to take exception to the way Dutt has Laksmaṇa slay Meghanâda Rather than engaging his adversary in open combat, Laksmana enters by stealth the *râkṣasa*'s place of worship and fells an unarmed Meghanâda. who is doing *pūjā* to Agni at the time and would have become invincible had he been allowed to complete the ritual Many critics have subsequently concurred with Jotindra Mohan Tagore that Dutt might have gone a bit too far by casting Lakṣmana in this rather cowardly role Dutt was. however, drawing on an aspect of the *Râmâyana* tradition here Although Lakṣmaṇa does not slay Meghanâda by stealth in the *Râmâyana*, in Kṛttivâsa's telling of the tale, Hanumân travels to the netherworld and there is instructed by Mâyâ how, by stealth, to slay Mahirâvaṇa. Dutt has Mâyâ (also referred to as Mahâmâyâ) instruct Laksmana precisely how to vanquish his formidable opponent. Dutt thus borrowed a stratagem from Kṛttivâsa but had a different character (albeit still on Râma's side) make use of it.

26 Pramathanath Bisi, *Bâmlâ sâhityera naranâri* (Men and women in Bengali literature) (Calcutta. Maitri, 1953, repr. 1966). 25.

27. ARCYDAE (Romesh Chunder Dutt), *The Literature of Bengal. Being an Attempt to Trace the Progress of the National Mind in Its Various Aspects. as Reflected in the Nation's Literature, from the Earliest Times to the Present Day; with Copious Extracts from the Best Writers* (Calcutta: I. C Bose & Co., 1877), 176.

28 Rabindranath Tagore, "*Meghanâdavadha Kâvya,*" in *Ravindra-racanâvali* (The collected works of Rabindranath Tagore) (Calcutta. Visvabharati, 1962). Addenda 2:78-79.

29 Tagore, *Jīvanasmṛti* (Reminiscences), in *Ravindra-racanâvali* (Calcutta· Visvabharati, 1944), 17:354.

30. Quoted in Buddhadeva Bose, "*Mâikela*" (Michael), in his *Sâhityacarcâ* (Literary studies) (Calcutta: Signet Press, 1954), 35

31. Pramatha Chaudhuri, "*Sabuja patrera mukhapatra*" (Sabuj Patra's manifesto), in *Nânâ-kathâ* (Miscellany) (Calcutta. By the author, 3 Hastings Street, [1919]), 109-10

32. A. K. Ramanujan, "On Bharati and His Prose Poems" (paper presented at the 16th annual conference on South Asia, Madison, Wisconsin, November 1987), 3

33 *Mârksavâdi* no. 5 (September[?] 1949): 132

34 Chaudhuri, *The Autobiography of an Unknown Indian,* 183.

ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য

জগদ্বন্ধু ভদ্র

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনাথ—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্ক্কারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু-আশুগ-ইরম্মদ গমে সন্‌সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মবিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ-বিশ্বম্ভরা দশভূজা কাছে,—
(ক্ষ্মাধ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্য মাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্ম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
সুবিরল তনুরুহে তনু আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলী।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মূষিক বপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায়রে যেমতি
চতুর্দ্দণ্ড সহযোগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম
অতি ক্ষুদ্র, সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্য্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতস দ্রুমের কিম্বা সূচ্যগ্র তনিষ্ঠ
তথা ন্যুব্জ আকর্ষ্যগ্র ভাগ সমতুল)
সুদীর্ঘ মস্তক, বসুমিত্রাস্য যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজী
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র-অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি, সুষমা কি সুন্দর।
ত্রপিষ্ঠা তকুণাঙ্কক-তুল্য নেত্রযুগ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক—মরীচি নিকর
অসহ্য সে দৃশে:—হায় ত্বিষাম্পতি তেজঃ
দিবাভীত নেত্র যথা না পারে সহিতে
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুসতী গুরু বলি মানে;
দাস-রাজ-তনয়া সুরভিগন্ধি তব
শরীর সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পবিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম
লইতেন পূতিগন্ধা আখ্যান বিষাদে
(বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুন্যাযন্ড পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব
জগতের হিতহেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশলিনা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?
পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—
মহেষ্বাস—উর্ম্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও, ধনী, যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিষ ক্রূর
মণ্ডূকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্র্যক্ষি সম্ভবে;
কিম্বা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা।
ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা
নাম প্রথমসর্গ সমাপ্ত। ❑

১২৭৫ সালের ১২ই আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুচ্ছুন্দরীবধকাব্য' নামে এই হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। লেখক ঢাকা জেলার পানকুণ্ড গ্রাম নিবাসী ছিলেন।